প্রথম প্রকাশ
২৩ ভাদ্র ১৯৮৮



প্রকাশক
শঙ্খনীল দাস
শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন
ঋষি বঙ্কিমনগর
বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

প্রচ্ছদ
সুব্রত চৌধুরী
অনুপ রায়

লেখকের আলোকচিত্র
অর্ধেন্দু রায়

উৎসর্গ

সন্তোষকুমার ঘোষের
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কাকলি চক্রবর্তী
জামাতা শ্রীকৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী
সুজনেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ্

উপন্যাস

উপনদী শাখানদী, শীতের বেলা, বিষণ্ণ পরবাস,
নির্জন দর্পণ, সমুদ্রের শব্দ, সামনে যুদ্ধ, অন্তর্ঘাত, দুরন্ত হাওয়া (যন্ত্রস্থ)

ছোটগল্প

অমিল পয়ার, পুরনো পট ধূসর ছায়া, জলবিন্দু, বনান্তরে, খেলার ছলে,
হিসেব নিকেশ, পাহাড়ে সমুদ্রে, সহজ কঠিন, মধ্যদুপুর, যীশুর পুতুল,
শান্তিপর্ব, আমি ও সে, মায়াবী মঞ্চ, শ্রেষ্ঠগল্প ১, বিবাহবার্ষিকী, প্রেমের গল্প,
স্বনির্বাচিত গল্প, কঠিন প্রবাসে, পোড়ামাটির পুতুল, শ্রেষ্ঠগল্প ২
খুনের স্বপক্ষে (যন্ত্রস্থ)

প্রবন্ধ

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র, রানার চলেছে, রানার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বাংলা ছন্দের সেকাল একাল,
সাহিত্যে অস্তিবাদী চিন্তাভাবনা, কবি ও কথাকার,
বাংলা কথাসাহিত্যের একাল : ১৯৪৫-১৯৯৮, প্রবন্ধ : মনে মননে, কল্লোল প্রেক্ষিত ও
ছোটগল্প, সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার

নাটক

তিনতাস ও অন্যান্য

কাব্যগ্রন্থ

জন্ম জন্মদিন

অনুবাদ

রেজারেকশান

শিশু সাহিত্য

কুঁইমামার হাঁচি (যন্ত্রস্থ)



বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা 'পুস্তক বিপণি' ও 'শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন'-এর যৌথ উদ্যোগ এবং আন্তরিক সহযোগিতায় অবশেষে প্রকাশিত হল 'সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার' গ্রন্থটি। 'আপনাকে নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখব'—এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সন্তোষদাকে, তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে আনন্দবাজার পত্রিকা আয়োজিত সাহিত্য বাসরের সভায়। বর্তমান গ্রন্থটি সেই প্রতিশ্রুতিরই লিখিত অভিজ্ঞান। আসলে, একজন খ্যাতকীর্তি সর্বভারতীয় স্বর্গত কথাকারের প্রতি এই গ্রন্থটি আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ। যাঁরা এই গ্রন্থ পরিকল্পনায় ও প্রকাশে নানাভাবে নানা দিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন সকলকে গভীর, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত তালিকা মুদ্রিত হল। ব্যক্তি ও শিল্পী সন্তোষদার কথা মনে রেখে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে ও পরে তাঁর সম্পর্কে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির বেশ কিছু সাধ্যমত সংগ্রহ করে 'ক্রোড়পত্র' অংশে সন্নিবিষ্ট করেছি। গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন একটি অসমাপ্ত উপন্যাস ও কয়েকটি কবিতা ক্রোড়পত্রের 'ব্যতিক্রমী কথাকার' অংশে সংকলিত। গ্রন্থটি সর্বস্তরের স্বভাবী পাঠকদের কাছে গৃহীত হলে আমার প্রয়াস কিছুটা সার্থক হবে বলে মনে করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ও সাপ্তাহিক 'দেশ'
২. সন্তোষকুমার ঘোষ স্মরণিকা ১৯৮৬ / বিধান নিবাস সংস্কৃতি পরিষদ / ৪ বিধান শিশু সরণী / কলকাতা ৭০০০৫৪
৩. দরবারী সাহিত্য ৩০ লেনিন সরণী কলকাতা ৭০০০১৩ / সম্পাদক : কল্যাণ চক্রবর্তী / ষষ্ঠদশ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৯২ / সন্তোষকুমার ঘোষ স্মরণ সংখ্যা
৪. 'মালিনী' পত্রিকা ১১ অক্রুর দত্ত লেন কলকাতা ১২ / ষষ্ঠ বর্ষ, মার্চ ১৯৮৫
৫. পক্ষীরাজ / অষ্টম বর্ষ ১ম সংখ্যা / মে ১৯৮৫
৬. গঙ্গোত্রী / সম্পাদক : শান্তনু দাস / সন্তোষকুমার ঘোষ ও দিনেশ দাস সংখ্যা ১৯৮৬
৭. কলকাতা লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র / সন্দীপ দত্ত / ১৮/এম ট্যামার লেন কলকাতা ৯
৮. প্রচ্ছদ শিল্পী সুব্রত চৌধুরী ও অনুপ রায়
৯. পুস্তক বিপণি / অনুপকুমার মাহিন্দার
১০. শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন-এর পক্ষে সমীর দাস
১১. 'শনিবারের চিঠি' (নবপর্যায়)
১২. ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

ক্রোড়পত্র ১ ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব

ক্রোড়পত্র ২ ব্যতিক্রমী কথাকার

ক্রোড়পত্র ৩ পথিকৃৎ সাংবাদিক

প্রথম ভাগ

শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিবেদিত দু'টি কবিতা

১. অগ্রিম

[সন্তোষদার জন্যে]
কীভাবে মুহূর্তে মরছো, বিলাপ করছো না
হেসে হেসে বলছো, দ্যাখ জীবনে একবারই
মৃত্যুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি!
কে যে কার সন্নিকট বলাও মুশকিল...
কাল যা দেখেছি আজ কৃশ হয়ে গেছো
কালকের হাসি আজ দুগুণ হেসেছো
কীভাবে মুহূর্তে মরছো, বিলাপ করছো না।
[কবিতাটি সন্তোষদার মৃত্যুর চারদিন আগে লেখা]

২. খেলার পুতুল

শিশুকালেও তার হাতে কোনো খেলার পুতুল
তুলে দেওয়া হয় নি।
দেওয়া হয়েছিল বেশ কিছু রঙে-রঙিন বর্ণমালা,
সে এমনই ছিল যে একটা গোটা জীবন
সেই বর্ণমালা নিয়ে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে কাটিয়ে গেল
একটা গোটা জীবন—এক বড়োধরণের শিশুর মতো।
[সন্তোষদার মৃত্যুর পরে লেখা]

সন্তোষদা : সঙ্গ প্রসঙ্গ

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়। কিছু স্মৃতি।

সে সময়ে এক তরতাজা তরুণ এসেছে কলকাতায়। কলেজের ছাত্র। সদ্য গ্রাম ছেড়ে আসা বলেই তার স্বভাবে সে সময়ের গাঁয়ের গন্ধ আদৌ মুছে যায়নি। স্বভাব-লাজুক, ভীরু, অল্প কথার তরুণ। গুছিয়ে কথা বলতেও শেখেনি সে। শুধুই বহুজনের মধ্যে নীরব-নিবিষ্ট শ্রোতা তখন।

একসময়ে সেই তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল নিজের কলেজের বাইরের কিছু সমবয়সীর সঙ্গে। কলেজের পাশাপাশি বেঞ্চে বসা দু'-একজন সহপাঠীর সঙ্গে তখন অন্তরঙ্গতার বাইরে আলাপ-পরিচয়ের কিছু পাট শুরু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! সেই তরুণ তাদের থেকেও সরে এসে বাইরের সমবয়সীদের সঙ্গে কবে কী করে যেন আপন হয়ে গেল। কলেজের কেতাবি জীবন থেকে এর স্বাদ অন্যরকম। নতুন পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দু-একজন ছিল যারা পাস করে বিলেত-আমেরিকা যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কেরিয়ারিজম, শিক্ষা আর অর্থে 'ব্রাইট' জীবন গড়ার জন্যই যেন তাদের সেই তারুণ্যের যাবতীয় প্রয়াস, লক্ষ্য। তাদের কেউ কেউ সেই তরুণকে স্বপ্ন দেখায়, তার মধ্যে স্বপ্ন জাগায়। নতুন নতুন বিদেশি লেখকদের বই পড়ার কথা বলে। তারই উৎসাহে একদিন সেই গাঁ থেকে আসা তরুণ পড়ে ফেলে আলবার্তো মোরাভিয়ার 'দি ওম্যান অফ রোম', ফ্রাঁসোয়া সাঁগার 'এ সার্টেন স্মাইল', পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' ইত্যাদি।

আসলে তরুণটির মনের গভীরে ছিল নতুন নতুন উপন্যাস-গল্প পড়ার অফুরন্ত প্রেরণা, ছিল সাহিত্যস্রষ্টাদের সম্পর্কে অনাবিল বিস্ময় ও আকর্ষণ। সেই তরুণ মোরাভিয়া পড়ে যেমন বোঝা-না-বোঝার মাঝখানে এক অনাস্বাদিত শিহরণে বিস্ময়ে ডুবে যেত, তেমনি 'চতুষ্কোণ' পড়ে সাতদিন, সাতরাত নির্ঘুম সময় কাটিয়েছে অদ্ভুত উদাস খেয়ালে। সে সবই ছিল সেই তরুণের নতুন এক নিরবয়ব মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একদিক। এরই মধ্যে একদিন সেই তরুণকে কলেজের এক সহপাঠী দূর থেকে দেখিয়ে দেয় কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়ানো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 'পথের পাঁচালী'র লেখক! এ এক অভিভূত দর্শন। ময়লা রং, ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি পরা, মাথা ভর্তি চুল অগোছালো। দাঁড়িয়ে কিছু যেন খাচ্ছেন হাতের ঠোঙা থেকে। সেই তরুণের কাছে তা ছিল দেবদর্শন! যাঁর হাত দিয়ে 'পথের পাঁচালী' লেখা, তাঁকে সামনা-

সামনি এভাবে দেখতে পাওয়া! এক গাঁয়ের অবুঝ কৌতূহলী তরুণের কাছে এ দর্শন যেন মূল্যবান সঞ্চয়।

এ ভাবেই নানা ধরনের বন্ধুদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আর এক সমবয়সী তরুণের দেখা পায় সেই গ্রাম্য ছেলেটি। তারা কবিতা লেখে, গল্প লেখে। কী না! বেকার আর কলেজে পড়া প্রায় সকলেই। অফুরন্ত আড্ডা, চা, সিগারেট, রবীন্দ্রনাথের গান, কারণহীন উচ্ছল রাগ, তর্ক, প্রতিবাদ—এ-সব মিলিয়ে মিশিয়ে সাহিত্যের এক অদ্ভুত পরিবেশে দিন-রাত ডুবে থেকে অফুরান প্রাণশক্তিতে মত্ত হয়। সে অনেক কথা, অনেক মিল-অমিলের উদ্দামতার দিক। এসবের মধ্যে সেই তরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, মতি নন্দী, আনন্দ বাগচীর মত তরুণ তুর্কি শিল্পী-কবি-গল্পকাররা। তাদের আড্ডা চলে আসে বারবার আর যে কোনও ছুটির দিনে, কৃত্তিবাস পত্রিকাকে কেন্দ্র করে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে, শ্যামবাজার মোড়ের জমজমাট কফি হাউসে—এখন যেখানে বিরাট এক বস্ত্রপ্রতিষ্ঠানের সাজানো দোকান। কৃত্তিবাস পত্রিকা বেরুত উত্তর কলকাতা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায়। সুনীল তখন থাকত বৃন্দাবন পাল লেনে। আজ সেই তরুণের, যতদূর মনে পড়ে, কৃত্তিবাসের প্রথম সম্পাদনার যৌথ দায়িত্বে ছিল আনন্দ বাগচী আরও কারা যেন। এই তরুণ যখন ওদের সান্নিধ্যে আসে তখন সুনীল সম্পাদক। এই আড্ডায় ভিড় করত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, তন্ময় দত্ত, মোহিত, শিবশম্ভু, তারাপদ রায়। অনিয়মিত হলেও চোখে পড়ার মত মতি নন্দী, আনন্দ বাগচী, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষ, মৃণাল দেব এবং সে সময়ে আরও অনেক অনেক উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বিচিত্র স্বভাবের তরুণেরা।

এমন ঘন আড্ডার গাছের ছায়ার মত জমায়েতের মধ্যেই গ্রাম্য তরুণটির বেশি ঘনিষ্ঠ হয় মোহিত, শিবশম্ভু পাল, আনন্দ বাগচী এরা। প্রথমে পাইকপাড়া থেকে শিবশম্ভু আসত এই তরুণের বাড়ি, সেখান থেকে মোহিতের বাড়ি। তারপর কখনো মতি, কখনো বা আনন্দ এক হয়ে এসে পৌঁছত সুনীলের ডেরায়, ওখান থেকে সদলবলে বেরিয়ে সেই দেশবন্ধু পার্কের ছায়ায়। মতি নন্দী তখন থাকত ২৫ নং তারক চ্যাটার্জী লেনে। যাই হোক, সে ইতিহাস এক বুঝিবা কবিতা, হয়তো বা সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাস—কৃত্তিবাস কেন্দ্রিক এক সর্বস্তরের তরুণ কবি গল্পকার শিল্পীর আত্মবিকাশের ইতিহাস। তা এমন সাহিত্য শিল্পচর্চার মূল প্রসঙ্গের প্রধান অন্যদিক।

এদের থেকে সরে এসেই এক দিন মতি বলল, 'সন্তোষকুমার ঘোষ এসেছেন পাইকপাড়ায়, চলো, আমরা ওখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করে আসি।'

নাম শুনে সেই তরুণের অদ্ভুত এক উত্তেজনা, আবেগ, অনুভব। 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখক! তাঁর এই উপন্যাসটি সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় নিয়মিত পড়ত তরুণটি। সেই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন'। দুটি উপন্যাসই তরুণটির কাছে ছিল গভীর বিস্ময়। একজন এত বড় মাপের লেখককে এর মধ্যে সামনে দেখতে পাবে

সেই তরুণ, এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ।

মোহিত ছিল সামনে। সঙ্গে সেই তরুণও! মতি আবার তরুণকে জিজ্ঞেস করে, 'কি, যাবে তো বীরেন?'

মোহিত খুব খুশি। বলল, 'সময় ঠিক করে নে বীরেন। চল তিনজনে যাই। শিবু (শিবশম্ভু) পাইকপাড়ায় থাকে। ওকে ওখান থেকেই সঙ্গে নেব।'

চাপা উত্তেজনায় আর গ্রাম্য ভীরুতায় সেই তরুণ রাজি হয়ে যায়।

এক সকালে আমি মোহিতের বাড়ি যাই। ওখান থেকে মতির বাড়ি। এতদিন আগের স্মৃতি। যতদূর মনে পড়ে, শিবশম্ভু সে দিন আমাদের সঙ্গে আসেনি যেন কোন কারণে—যদিও শিবশম্ভু থাকত সন্তোষদার একতলার ভাড়া নেওয়া বাড়ির কাছেই। সন্তোষদা তখন দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় এসেছেন। আগে স্টেট্সম্যান পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিল্লি গিয়েছিলেন। কলকাতায় সন্তোষদার ঠিকানা তখন ৫৯নং পাইকপাড়া রো। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য থাকতেন ১৩নং-এ। সন্তোষদার আসার আগেই এই পাড়ার কাছাকাছি জড়ো হয়েছিলেন বাসিন্দা হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ, যুগান্তরের সে সময়ের বার্তা সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু। কলকাতায় দিল্লি ফেরত সন্তোষদার সামান্য সংসারপাতা নিয়ে আশ্রয় বদলে কী পরিমাণ অস্থিরতা ছিল, সে বিষয়ে প্রসঙ্গত পরে বলব, তবু পাইকপাড়ার আপাতত 'স্থায়ী' হয়ে বসার ব্যাপারেও গৌরীদার (গৌরীশংকর ভট্টাচার্য) চেষ্টা, আন্তরিকতা মনে রাখার মত। কথাকার গৌরীদা ছিলেন 'মিত্রালয়' প্রকাশনার মালিক। সে সময়ে আমি সন্তোষদার 'যাদুঘর', 'চীনেমাটি', 'বিষ'—এমন সব গল্প একটার পর একটা হাতে এলেই পড়ে ফেলেছি। আবার বলি, আমি সুদূর গাঁয়ের তরুণ। তখনো সন্তোষদার 'নানা রঙের দিন' পড়া হয়নি। বেকার এই তরুণের 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত 'মোমের পুতুল'ও পড়া হয়নি। 'কথাশিল্প' সংকলনের দৌলতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশংকরের 'কামধেনু', এবং এখন মনে পড়ছে না, আরও বেশ কিছু গল্প পড়া হয়ে গেছে।

আমার সে সময়ের পড়াশুনার এই সামান্য পুঁজিটুকু মনে রেখে সেই সকালে মতি আর মোহিতের সঙ্গে চলেছি পাইকপাড়ায় সন্তোষদার ডেরায়। মতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েকটা গলি পিছনে রাখতে রাখতে এসে দাঁড়ালাম গ্রে স্ট্রিট-সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড়ে গ্রে স্ট্রিটের স্টপে। তিনজনেই বেকার, অবশ্যই ছাত্রও। ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে ওঠার পর একটা ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। ট্রাম দ্রুতলয়ে হেলতে দুলতে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে চলেছে। ভাড়াটা আমিই দেব ভেবে ছোট মানি-ব্যাগ থেকে পয়সা বের করতে গেছি। একটা একটাকার কয়েন গেল পড়ে রাস্তায়। তখন একটাকার মূল্য অনেক, একজন বেকারের কাছে তার দাম বুঝিবা আমার দৈনন্দিনের হাত খরচের নিরাপত্তাও। চোখের সামনে দেখলাম রাস্তায় পড়ে গেল টাকাটা। তুলব কী করে। ট্রাম ছুটেছে। ভিতরে পাইকপাড়ায় দ্রুত পৌঁছনোর প্রচণ্ড

আবেগ!

ঘটনাটায় মতি আমাকে ধমক দিল। ট্রামের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল এক শতছিন্ন পোশাকে হতমূর্তি যুবক। আমরা টাকাটার জন্যে কেউ নামছি না দেখে সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল যুবকটি। তাকিয়ে দেখি টাকাটার জন্যে দৌড়চ্ছে সে। আমি নির্বিকার। পরে বুঝেছিলাম কোনও অভাবের, বা কিছু হারানোর অথবা অধিকার হারিয়ে ফেলে আসার দীনতা আমাকে আড়ষ্ট করেনি, আসলে 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখকের সামনে যাব, কথায় কথায় অনেক জিজ্ঞাসার জট তাঁকে বলে খুলিয়ে নেব—এই উৎসাহে, আনন্দে আমি তখন এক সাহিত্য পাগল, গোপনে নেশাগ্রস্ত অন্য এক গাঁ-গঞ্জের সংসারজ্ঞানহীন নির্বোধ তরুণ।

না, সন্তোষদার বাড়ি পৌঁছে ওঁর সামনে বসে সেদিন কোনও প্রশ্নই হয়নি। আসলে করার সাহসই ছিল না। সে সময়ে আমি আর মোহিত পরতাম ধুতি-পাঞ্জাবি, মতি প্যান্ট-বুশশার্ট। পরে মতিকে কোনওদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখিনি। ও তখন ক্রিকেট পাগল, নিজে ক্রিকেট খেলত, আর পাশাপাশি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে ছোটগল্পে শক্ত মোটা কব্জির চর্চা করত। মতি আমাদের নিয়ে যখন সন্তোষদার ঘরে ঢুকল, বোঝা যায় সন্তোষদার সঙ্গে মতির পরিচয় আগেই ঘটেছে।

একটা ছোট টেবিলের উল্টোদিকে সন্তোষদা বসে। ব্যস্ত কোনও একটা লেখা নিয়ে। আমাদের বসতে বললেন, ইঙ্গিতে। সন্তোষদার থেকে সামান্য দূরে একজন দাঁড়িয়ে। পরে জেনেছি তিনি আনন্দবাজার থেকে পাঠানো লোক। সন্তোষদার কাছ থেকে কোনও একটা ধারাবাহিকের কিস্তির লেখা নিতে এসেছেন। আমাদের বসিয়ে সন্তোষদা তখন লিখে চলেছেন। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছেন। আজ হুবহু সে সব কথার কিছু মনে নেই। আগেই মতি আমাদের দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এই কি 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখক? এমন কথা বলতে বলতে কি লেখা হয়? লেখা যায়? আমি আড়ষ্ট, লাজুক, অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে চলেছি। লেখাটা কি দেশ পত্রিকার 'মুখের রেখা'র? সন্তোষদা কী যেন বলেছিলেন আজ মনে পড়ছে না।

সেদিন সন্তোষদাকে এক অবোধ তরুণের বিস্ময় নিয়ে দেখেছি। সুদর্শন, সুপুরুষ, এক ছোটখাটো মাপের মানুষ। মাথাভর্তি ঘন চুল। কণ্ঠস্বরে আকর্ষক ব্যক্তিত্বের চুম্বক আবার অন্তরঙ্গতার মায়াও। দু'চোখে বুদ্ধিতে, নাকি জীবনকে গভীর নিবিড়ভাবে দেখার দীপ্তিতে চাপা আলো। হাসিমুখে সব সময় কথা বলে চলেছেন। পরে শুনেছি, সন্তোষদা কাকে যেন বলেছিলেন আমাদের তিনজনের কথা, মনে নেই, হয়তো আমাকেই—'তোমাদের যখন দেখি তখন তো তোমরা হাফপ্যান্ট পরা বয়সের সদ্য কৈশোর পার হওয়া তরুণ!' সে সময়েও যে অস্থিরতা ছিল—পরবর্তী কালের ভয় স্বভাব মিলিয়ে কখনো বা স্মৃতিতে ধরতাম সন্তোষদাকে। এত যে কথা বলতে পারতেন সন্তোষদা সেদিন কিছু সময় সন্তোষদার সামনে বসে থেকেই বুঝেছিলাম। যে সময় সন্তোষদার সঙ্গে দেখা, পরিচয় হওয়া, সে সময়ে, মোহিত-মতির, সুনীল-শক্তি-আনন্দ-শিবশম্ভুর মত

লেখায় মেতে উঠতে পারিনি, বলার মত আমার কোনও লেখাই ছিল না। কিন্তু সন্তোষদাকে দেখলাম, উনি মোহিত-সুনীল-শক্তির, মতির লেখাপত্তরের, কৃত্তিবাসের সমস্ত লেখার পাঠক ছিলেন। এদের মধ্যে আমি ছিলাম যেমন এদের পাঠক, তেমনি সন্তোষদারও একজন নিবিষ্ট পাঠক।

এমন প্রথম দেখা হওয়ার পর পর পর তিন-চার বছরের মধ্যে সন্তোষদার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় তখন 'মুখের রেখা' ধারাবাহিক বেরুচ্ছে। আমি তার নিয়মিত পাঠক। মনে পড়ে, উপন্যাসটি পড়তে পড়তে সন্তোষদাকে আনন্দবাজার পত্রিকার ঠিকানায় 'মুখের রেখা'র প্রাথমিক কয়েকটি পরিচ্ছেদের ভাললাগার অভিজ্ঞতা নিয়ে ছোট চিঠি লিখি ডাকে। কি লিখেছিলাম তা এতদিন মনে থাকা সম্ভব নয়। কলকাতায় থেকেও সন্তোষদার ভারতের বাইরে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে কিছু জানতাম না। অনেক পরে সামনা-সামনি দেখা হলে একদিন কথা প্রসঙ্গে সেই চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেন অবশ্যই।

এরপর ১৯৫৯ সালের আগে আর একবারও সন্তোষদার মুখোমুখি হইনি। আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে মাঝে-মধ্যে যাওয়া-আসার কোনও সুযোগও ছিল না। থাকার কথা নয়। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে ফল বেরুবার আগের ছ'মাস আমি হাওড়ার জগাছা হাইস্কুলে শিক্ষকতার অস্থায়ী চাকরি পাই। এই পাঁচ মাসের মধ্যেই একদিন যোগাযোগ হয়ে যায় সন্তোষদার সঙ্গে—রবীন্দ্রজয়ন্তীর এক অনুষ্ঠানে। আমার নিজের গ্রাম পানিত্রাস, পাশের গ্রাম গোবিন্দপুর। মাটির এক উঁচু বাঁধ সোজা দুটি গ্রামের মাঝখান দিয়ে দু'টো বর্ধিষ্ণু গ্রামকে ভাগ করে চলে গেছে সেই সুদূর দেউলগ্রাম, কল্যাণপুর, মানকুর হয়ে বাক্‌সী পর্যন্ত। দেউলগ্রামের আগেই বিরামপুর গ্রাম, রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী। সেখানে জয়ন্তী পাঠাগারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। বিরামপুরে আমার এক বন্ধু উমাশংকর মান্নার বাড়ি। ওর বাবা ছিলেন ডি. এম. বি. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পুলিনবিহারী মান্না। অত্যন্ত দাপুটে এবং প্রিয়তম শিক্ষক। তাঁর বাড়িতেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে সন্তোষদারা অতিথি হন। সঙ্গে আসেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ। সে সময়ের তরুণ লেখককুলের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, বিমল রায়চৌধুরী, জয়শ্রী চৌধুরী, প্রণব মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, মোহিত চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একাধিক জন আমন্ত্রিত হয়। এতজনের এভাবে সমবেত হওয়ার মূলে ছিল গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের সঙ্গে উমাশংকরের ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সূত্র। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনার মূলে আমার মতেই উমার সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

সে যেন ছিল এক মহোৎসব। রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী বিশাল তৃণাচ্ছাদিত চর। গল্পের অনুষ্ঠানের স্থান ছিল কালীবাড়ির সামনে বড় বড় সবুজ গাছপালার সবুজ ঢালা ছোট প্রান্তর। দলবল সন্ধের মধ্যে পৌঁছনোর পর প্রাথমিক আতিথেয়তার পর্ব শেষ হলে প্রায় সবাই চলে যায় চর পিছনে ফেলে দূরের নদীর ধারে। আমাকে উমাশংকর

বলেছিল সভার সঞ্চালকের কাজের দায়িত্ব নিতে। সেদিন দেখেছি, সন্তোষদার দায়িত্ববোধ। মাটিতে পাতা ছোট তক্তাপোষের ওপর সাদা চাদর পাতা মঞ্চ। দুটি মাইক্রোফোন। বসে বসেই বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা। অনেক কিছুই বিস্তারিত আমার মনে নেই। তবে মঞ্চেই একবার রীতিমত রেগে যেতে দেখেছি সন্তোষদাকে। যে মানুষটি মাইকের ব্যবস্থায় ছিল, তার কী এক মন্তব্যে রীতিমত রেগে ধমক দিয়েছিলেন। মাইকম্যান আর একটি কথাও বলার সাহস পায়নি। সভা সঞ্চালনায় আমি একেবারেই নবিশ। তার ওপর পাশে সন্তোষদা! ভিতরে ভয়ে রীতিমত তটস্থ আমি।

সভা শেষ হবার পরেই অবশ্য আর সকলের সঙ্গে চরের শেষপ্রান্তে চলে যান সন্তোষদা আমার সঙ্গে। মঞ্চে থাকে স্থানীয় গ্রাম্যশিল্পীদের ভিড়। উদার উন্মুক্ত চরের বুকে তখনকার দক্ষিণীর ছাত্রী জয়শ্রীর গান, শক্তি-সুনীল-বিমল-প্রণব-মতি-মোহিতদের আড্ডা—সমবেতভাবে সবকিছুই একসময় ডুবে যায় চরাচরব্যাপী প্লাবিত জ্যোৎস্নার মধ্যে। সম্ভবত শক্তির নেশার গোপনে আনা মদের জোগানেই সন্তোষদা বিভোর হয়ে যান। সে রাতে সন্তোষদা, সেই সঙ্গে এতটুকুও মদ্যপান না করেও গৌরীদা ও গৌরকিশোর ঘোষ—তিনজনে কিছু না খেয়েই ঘুমের মধ্যে সারা রাত ডুবে থাকেন।

আতিথেয়তা প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। পুলিনবাবুর বাড়িতে মাটির লম্বা দালানে অসামান্য রুচিকর পরিচ্ছন্নতার পরিবেশে সমস্ত অতিথির খাদ্য সাজানো হয়েছে। একটু বেশি রাতেই! কারণ মূল অনুষ্ঠানের থেকে রূপনারায়ণের জ্যোৎস্নার বন্যায় প্লাবিত চরে এক অভিভূত আড্ডা হুল্লোড় চলে। তাকে কেউ বাধা দেয়নি। তাই রাত। দর্শকরা সব উঠোনে দাঁড়িয়ে। এতজন কথাকার-কবি-শিল্পী একসঙ্গে খেতে বসেছেন! পরিবেশকরা খুঁটি-নাটির ভাবনায় তটস্থ। সকলে যখন আসন গ্রহণ করেছেন, সদ্য থালায় হাত রাখতে উৎসুক, হঠাৎ মতি নন্দী মুখ টিপে হাসতে হাসতে পাশের বসা অতিথিদের বললেন, 'মাংস আছে দেখছি! অনেক! তাই বাইরে একটা কুকুর কম দেখলাম না?' হঠাৎ পরিবেশক এবং বাড়ির লোকজন অবাক বিস্ময়ে থ। এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। মতির স্বভাব সুলভ হাসি ছিল স্মিত এবং হ্যাজাক বাতির উজ্জ্বল আলোরও আড়ালে। হিউমারটা মাঠে মারা গেল—কেউ তাতে শব্দও করেনি। কথাটা বাড়ির অনেকেই কেমন যেন অন্যভাবে ভেবে নিলেন। সারা বাড়ি তখন থমথমে, কথা-কম, যেনবা গোমড়া মুখ!

অথচ গৃহকর্তা পুলিনবিহারী মান্না আতিথেয়তার যে বিপুল আয়োজন করেছিলেন, যে গভীর আন্তরিকতা, সৌজন্য ও মূল্যবান সুরুচিসম্মত আহারাদির ব্যবস্থা করেছিলেন, সর্বোপরি যে এক আনন্দের যজ্ঞ হয়েছিল তা তুলনারহিত। পরে গৌরীশংকর ভট্টাচার্য তারই এক চমৎকার বিস্তারিত লেখচিত্র এঁকেছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার পাতায়। পরের দিন কলকাতায় ফেরার পথে সন্তোষদার এক কৌতুক মনে পড়ে। তখন তো স্টিম ইঞ্জিন। তার জল নেওয়ার স্টেশন হল বাউড়িয়া। গাড়ি এখানে দাঁড়ায় দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত। সন্তোষদা হঠাৎ বললেন, 'ডাব খাবো। ব্যবস্থা করো'। ডাব এল।

প্রায় সকলেই ট্রেন থেকে নেমে এদিক-ওদিক ঘুরছে। সন্তোষদা মুখ কাটা ডাবটা নিয়ে হাতের মুঠোয় ডাবের জল ঢাললেন, জলটা নিয়ে না খেয়ে সারা মুখে ঘষতে থাকেন। আমি অবাক। বললাম, 'কি ব্যাপার সন্তোষদা, জল মুখে মাখছেন?' সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'জানো না তো। ডাবের জল মুখে মাখলে মুখ পরিষ্কার হয়, ঠাণ্ডা থাকে।' আমি একই রকম অবাক হয়ে সন্তোষদাকে দেখছি। সেই সময়েই সেই ধুতি-পাঞ্জাবির বিলাসে নিখুঁত 'বাবু' সন্তোষদার এমন ডাবের জলের ব্যবহার কৌতুক, না বিলাস?

প্রসঙ্গত আগের দিনের রাত্রের মদ্যপানের কিছু মজার ঘটনা পর পর মনে পড়ে যায়। সন্ধের পর অনুষ্ঠান চলার মধ্যেই সন্তোষদা ফিরে কিছু মদ্যপান করেন শক্তির পাল্লায় পড়ে। খাওয়ার পর বমি। ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বাগানের বেড়ার ধারে শব্দ করে বমি করছেন। হঠাৎ দূর থেকে চীৎকার উমাশংকরের রাশভারী বাবা পুলিনবাবুর, 'এই কে ওখানে! এমন বিচ্ছিরি শব্দ করছে?' উমাশংকর বাবাকে ভয়ও করে। তাড়াতাড়ি বাবাকে নিয়ে অন্য কথায় বুঝিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমি সন্তোষদার সামনে থেকে সামলাতে থাকি। সে এক অপ্রস্তুত অস্বস্তিকর অবস্থা।

জ্যোৎস্নায় ভেজা চরে সেই বিলাসী মত্ততার আর এক ছবি। কবি প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন (সম্ভবত সামান্য মদ্য পান করে) বিলাসী মেজাজে সদাহাস্য সুকণ্ঠী জয়শ্রীর পিছনে লাগছে। হাতে ফুলের মালা। প্রণব না-ছোড়, জয়শ্রীর গলায় পরাবেই, আর স্বভাব-লাজুক জয়শ্রী দৌড়ে পালাতে থাকে। কবিতা সিংহ, বিমল, মোহিত, শক্তি, সুনীল—সবাই সে দৃশ্যে মজা কম পাচ্ছে না? এ-ও এক সম্মেলন!

আর এক মদ্য পানের ঘটনা প্রায় ক্লাসিকের মত। রূপনারায়ণ নদের একেবারে ধারে। নদীতে মন্থর জলের স্রোত। পাড়ে চলেছে আড্ডার আসর। সন্তোষদা, গৌরদা, গৌরীদা—সবাই মিলে গল্পগুজব। কেউ কেউ জটলাব স্বভাবে চরে বেড়াচ্ছে, গলায় উদাত্ত গান যেনবা স্বর দিয়ে অফুরন্ত জ্যোৎস্না পান করা! সন্তোষদার সামনে উমাশংকর এনে দিয়েছে বেশ কয়েকটি কাঁচের গ্লাস, ছোট ছোট। গৌরদা তো খান নি, গৌরীদাও নয়। শক্তি ছিল। সন্তোষদা গ্লাসে মদ ঢালছেন আর চুমুক দেওয়ার পর সেই গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন নদীতে। যুক্তি, 'এটায় তো আর কেউ খেতে পারবে না, এঁটো হয়ে গেছে। তা-ই!' এইভাবে একের পর এক গ্লাস ব্যবহার করছেন, আর ছুঁড়ে জলে ফেলছেন। এবং এইভাবেই সমস্ত গ্লাসই নদীর গর্ভে চলে গেল। উমাশংকর আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটায় মজা পাচ্ছে খুবই, তবু মুখের রেখায় ভয়, আড়ষ্টতা, বিস্ময় ও বিষণ্ণতা ছিল কিনা আজ মনে করতে পারছি না। এতগুলি নতুন গ্লাস বিসর্জিত হল—বাড়িতে কি কৈফিয়ৎ দেবে ও?

পঞ্চাশের দশকের প্রথম তিন-চার বছরের মধ্যে প্রমথনাথ পাল সম্পাদিত 'প্রভাত' পত্রিকায় আমি লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সঙ্গে, নতুন কিছু না লিখে, ভিড় জমিয়েছি। আমার মত গাঁয়ের তরুণ তখন বুঝতে চেষ্টা করছি কৃত্তিবাসের তরুণরা

কী লিখতে চাইছে, এবং কেমনভাবে। অবশ্যই কাউকে না বুঝতে দিয়ে তলে তলে আমার, প্রথম উপন্যাস, 'উপনদী-শাখানদী'র পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তখন আমার আদর্শ! কাউকে না জানানোর কারণই হল প্রচার বিমুখ আমার স্বভাবের আড়ষ্টতা, লজ্জা। এই দশকের শেষ বছর চারেকের মধ্যে লিখি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের পাতায় 'অনুক্ত' গল্প। ছাপেন, সে সময়ের ওই পাতার সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। লিখি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'একতা'য় 'অন্যঋতু' গল্প। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'জনসেবক' পত্রিকার রবিবারের পাতার দায়িত্ব পেলে লিখি তিনটি গল্প। হাওড়ার এক তরুণতর মনোহর দাস—তখন ব্যাঁটরা পাল চৌধুরী হাইস্কুলের শিক্ষক—বের করে 'সম্প্রতি' নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকা। তাতে আমি একটি বড় গল্প লিখি 'দুপুর' নামে—লেখার প্রেরণা ছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখার বিষয় ও টেকনিক। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফসল'-এ বেরোয় 'অন্তঃপুর' নামের গল্প।

এইসব গল্প নিয়ে ১৯৬২-তে বেরোয় আমার প্রথম গল্প সংকলন 'অমিল পয়ার'। সুনীল আনন্দবাজার-এ এর একটা রিভিউ-ও ছাপে। কথাটা হল পত্রিকায় 'দুপুর' গল্পটি ছাপার পরেই মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে একদিন সন্তোষদার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। বেশ কয়েক বছর পর। সম্ভবত সন্তোষদা কিছু সময় ভারতের বাইরে গিয়েছিলেন। কোনও এক বছরে বঙ্গ সংস্কৃতির সম্মেলনের ভিড়ে কৃত্তিবাসের স্টল ছিল। যাই হোক সেই বিশেষ দিনে শক্তি (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) আমাকে বলল, 'তোকে সন্তোষদা খুঁজছেন। তোর একটা গল্প পড়েছেন বোধহয়।' দেখা হল সন্তোষদার সঙ্গে। আমি তখন ভাবছি, সন্তোষদার মত লেখক একটি সদ্যোজাত পত্রিকায় আমার গল্পের পাঠক হয়েছেন! সন্তোষদা বললেন, 'তোমার 'দুপুর' গল্পটা পড়লাম। ভাল লাগল। গল্পের ডিটেল আমাকে রীতিমত এমন জড়িয়ে নিয়েছে, ছাড়তে পারিনি।' আমি এর কী উত্তর দেব! সন্তোষদা সঙ্গের কিছু পরিচিতদের নিয়ে তখন মাঠের ভিড়ে হাঁটছেন। আমিও সঙ্গ নিলাম। একসময় থমকে দাঁড়ালেন। 'চলো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' এসে দাঁড়ালেন দুই সুন্দরী রমণীর সামনে। আমি তাঁদের চিনি না। 'দেখো, এ বীরেন্দ্র দত্ত। ভাল লেখে'। আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। ওঁরা কে উনি বললেন না। আমি যে ওঁদের চিনি, এটাই ওঁর হয়তো ধারণা ছিল। আসলে উনি ভুলে গিয়েছিলেন আমি এক গেঁয়ো মানুষ। পরে বুঝেছিলাম, একজন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।

এই হলেন সন্তোষদা। লেখার ব্যাপারে যখন যেটা ভাল লাগত, তরুণ, খ্যাত-অখ্যাত কোনওরকম বাছবিচার না করে, পড়ার ও ভাল লাগার অকৃত্রিম আবেগে অকপটে তা বলতে পারতেন, কাছের করে নিতে পারতেন। আমৃত্যু সন্তোষদার এই নিবিষ্ট এক পড়ুয়া স্বভাব আমাকে ব্যতিক্রমী লেখক-মানসিকতার কারণে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় ধরে রাখে। এই সরল শিশুসুলভ ব্যক্তিত্ব তাঁর সমকালে, এমনকী উত্তরকালেও মিলবে কিনা সন্দেহ—যেখানে কোনও লেখকই নিজের লেখা ছাড়া অন্যের লেখা আদৌ পড়েন না,

কেউ কেউ পড়লেও ঈর্ষায় বা অন্য কোনও জটিল স্বভাবে নীরব থেকে অন্যভাবে সক্রিয় হন। আমার এতদিনের নিবিড় সম্পর্কের সূত্রে এটা বুঝেছি, সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর সমকালে ও উত্তরকালে এক বিরলতম ব্যক্তিত্বের মানুষ।

সন্তোষদার যে কোন বৈঠকি আড্ডায়, সভা-সমিতিতে এবং কোনও ব্যক্তি, লেখক, তাঁদের 'ক্রিয়েশান' সম্পর্কে যে কোনও প্রসঙ্গ অবতারণায় ছিল অসাধারণ, একেবারে মৌলিক চিন্তা-ভাবনার বাকপটুতা। এমন অনর্গল কথা বলায় যে সৃজন-মায়ার উঁচু মানের বিলাস, তা তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্বাতন্ত্র্যে স্ব-মহিম করে তোলে। নিজেরই লেখা সম্পর্কে কেউ যদি কোনও মন্তব্য করতে উদ্যোগী হন, উনি গভীর নিবিষ্ট হয়ে তা শুনতে এত উদ্‌গ্রীব হন যে বিস্মিত হতেই হয়। সেই আলোচনা শোনায় কেউ বাধা দিলে উনি বিরক্ত হতেন। শোনার পর, তা তাঁর সৃষ্টির পক্ষে বা বিপক্ষে হলেও সমান সমাদরে গ্রহণ করতেন। একদিন দুপুরে পত্রিকা অফিসে ওঁর ঘরে আমার ডাক পড়ে ওঁর সদ্য লেখা একটি গল্প শোনার জন্য। অনেক দিন পরে একটি গল্প লিখেছেন। কাউকে সঙ্গে সঙ্গে শোনানোর আগ্রহ। আমি উপস্থিত। সেদিনই সে সময়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এসে হাজির। দরজা বন্ধ করে সন্তোষদা গল্পটির আদ্যন্ত পড়ে শোনান। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতীনের মন্তব্য ঃ 'গল্পটা কিছুই হয়নি। ভাল লাগল না।' এর পর আমি যে কিছু মন্তব্য করব তা সন্তোষদার সামনে বলতেই পারলাম না। সন্তোষদা নীরব থেকে আমাদের দু'জনের ওপর দৃষ্টি বোলাচ্ছেন। দৃষ্টিতে এক প্রশ্নহীন শূন্যতা। নীরবতা ভেঙে আমি শুধু বললাম। 'সন্তোষদা আপনি কিন্তু অনেকদিন পরে অন্তত একটা গল্পের গদ্য লিখলেন! এটা আমাদের কম পাওয়া নয়!' সন্তোষদা তখন অদ্ভুত এক অন্যমনস্কতায় গল্পের পাণ্ডুলিপির পাতা উলটে যাচ্ছেন। মনে পড়ে সেদিন সেই সময়েই সন্তোষদা আর অতীনকে ছেড়ে আনন্দকে খবর দিলাম--সন্তোষদা একটা গল্প শেষ করেছেন। আনন্দ বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষদাকে ফোন করে 'দেশ' পত্রিকার জন্যে চেয়ে রাখে। আনন্দ তখন 'দেশ'-এর জন্য গল্প জোগাড়ে খুবই ব্যস্ত। তার ওপর সন্তোষদার গল্প!

একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিনের বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে আলোচনায় সন্তোষদা আমন্ত্রিত হন। সে বক্তৃতায় তিন দিনই আমি উপস্থিত ছিলাম। সমস্ত আলোচনাটি ছিল সন্তোষদার মৌলিক চিন্তা-ভাবনার মূল্যবান অভিজ্ঞান। পড়ার পর একদিন সন্তোষদার পত্রিকা অফিসের ঘরে যাই। সন্তোষদা ওঁর পাণ্ডুলিপি দেখালেন। এত হিজিবিজি স্বভাবে পাণ্ডুলিপি লেখা, যা থেকে ওঁর সেই তিন দিনের বক্তৃতার বিস্তার সমুদ্রের গভীর স্বভাবের আকর্ষণ আনে।

মনে পড়ে সন্তোষদা একবার হাওড়ার বাগনানে আমন্ত্রিত হন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলার জন্য। কলকাতা থেকে আমরা বেশ কয়েকজন সন্তোষদার সঙ্গে ছিলাম। বাগনানের আমাদের ও সন্তোষদারও পরিচিত মদন গড়াই সে সভার উদ্যোক্তা। বাগনান কলেজের হলে সে সভার আয়োজন! সভায় বসার আগে সন্তোষদার একজন স্থানীয়

ভক্ত-পাঠক ওঁকে বলেন, 'আপনি একটা জায়গায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র একই আকাশে সূর্য আর চন্দ্রের মত। উপমাটা একেবারে মৌলিক। আপনি কথাটা আমাদের সভাতেও শোনান।'

সন্তোষদা যেতে যেতে থমকে দাঁড়ান। 'ধন্যবাদ, তবে আমি তো কখনো এক কথা দু'বার বলি না। কখনো না।'

এই মৌলিক কথাটি সেদিন সেই সভায় হুবহু বলেননি, তবে কথাটির তাৎপর্য সুন্দরভাবে গুছিয়ে আলোচনা করেন অন্য অনেক কথার মধ্যে। এমন ছিলেন আমাদের ব্যতিক্রমী সন্তোষদা।

একদিন সন্তোষদার অফিসঘরে বসে আছি। কথা প্রসঙ্গে সন্তোষদার নিজের লেখা প্রেমের গল্প, প্রেম নিয়ে কথা উঠল। বললেন, 'দেখো, একবারে শুধু প্রেম নিয়ে গল্প কম লিখেছি। তবে তোমাকে একটা প্রেমদৃশ্যের কথা শোনাই। শুধুমাত্র প্রেম এমন এক জিনিস, যা সমস্ত জগৎকে ভুলিয়ে দিতে পারে, তার সঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক-বৈধ-অবৈধ যৌনতা যতই জড়িয়ে থাক। আমি রোমে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের চৌরঙ্গীর মত ব্যস্ত এক ক্রসিং। অবশ্য সে মোড় চৌরঙ্গীর থেকে অনেক চওড়া। এক সন্ধেয় দেখি, রাস্তার এপাশ থেকে এক মাতাল যুবক-যুবতী একটানা বিরামহীন চুমু খেতে খেতে এত বড় ক্রসিং পার হচ্ছে। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, অশান্তি নেই! পার হয়ে গিয়েও তারা আরও কিছু সময় বিরত হয়নি! কী প্যাশন, কী ডিভোশান!'

কথা প্রসঙ্গেই ওঠে ওঁর 'স্বয়ম্বরা', 'কানাকড়ি'র কথা। অন্য আর একজন, সন্তোষদার ঘরে, আমার পাশে কে ছিল মনে নেই। 'কানাকড়ি'র প্রসঙ্গ উঠতেই সন্তোষদা বলে উঠলেন, 'ওটা কিন্তু প্রেমের গল্প নয়।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই তা নয়, তবে জটিল অবক্ষয়ের প্রেম-ভাবনার একটা 'ফয়েল' গল্পের টানে আছে সন্তোষদা!'

'তা বলতে পার!'

'তবে গল্পের শেষটা অসামান্য প্রতীকী করেছেন।'

সন্তোষদার সেই সময়ের দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে। কথাটা শোনার জন্য কী সেই উন্মুখতা! একজন লেখকের এই ঔৎসুক্য, আগ্রহ দেখার মত। আমার বলার শুরুতে পাশের সঙ্গী কী যেন বলতে চাইছিল। সন্তোষদা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন, 'তুমি এখন কোনও কথা বোলো না, বীরেনের কথা শুনতে দাও।'

আমি যেন ভরসা পেয়েই বললাম, 'গোড়াতেই বলি সন্তোষদা, 'কানাকড়ি'র শেষের সঙ্গে কোথায় যেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোর' গল্পের গভীর ব্যঞ্জনায় মিল আছে। 'চোর' গল্পের চোর স্বামী যখন দেখে যে তার স্ত্রী রেণু সত্যিই চুরি করতে পেরেছে হাতঘড়ি, তখন তাঁর কাছে 'পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।' ঠিক তেমনি আপনার 'কানাকড়ি'র নায়িকা সাবিত্রীর ভাবনায় ছিল। হাফ-গেরস্থ পাশের ভাড়াটে মল্লিকা আর সে 'একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন'। গল্পের একেবারে শেষে

স্বামীর কাছে ধাক্কা খাওয়া আপনার সাবিত্রী বাধ্য হয়ে টলতে টলতে চলে আসে মল্লিকার ঘরে। নিজের ঘরে সে থাকতে পারবে না। 'এসে মল্লিকার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল, মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি।' এই যে সাবিত্রী মল্লিকার একই বিছানায় বসা, মল্লিকার ঘরে সাবিত্রীর কিছু সময়ের আশ্রয় নেওয়া—তা কি প্রতীক নয় সাবিত্রীর পতন স্বভাবের? ছবিটা এত স্বাভাবিক আর সূক্ষ্ম যে গল্পের মূল্যবান শ্রেষ্ঠ অলংকরণ এটাই। তাই না? আপনি বলুন, এটা কি ভুল হবে বললে?'

সন্তোষদাকে দারুণ খুশি দেখলাম। 'তোমার কথা আমার কাছে একেবারে নতুন বীরেন।' একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকারের মুখেচোখে যে স্বীকৃতির ইঙ্গিত, তা যেন লেখকের নিজেকেই নিজের চেনার পালা ছিল। একটানা কথা বলতে পারতেন তিনি। একদিন পত্রিকা অফিসেই ওঁর ঘরে কী জন্য গিয়ে বসেছি। নানান প্রসঙ্গে সন্তোষদার কোনও মন্তব্যই ধরা-বাঁধা ছক ধরে এগোয়নি। স্মৃতি এত প্রখর, তীক্ষ্ণ যে কোনও প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে আরও অনেক অন্য কথা বলতে বলতে কেমন অবলীলায় মূল প্রসঙ্গে চলে আসতেন। একবার 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের কথা উঠল। তাঁর একটি মৌলিক দৃষ্টি—চণ্ডালিকা প্রসঙ্গে—ভোলার নয়। বললেন, 'চণ্ডালিনী প্রকৃতির হাতে জল খেয়েছে এক বৌদ্ধ শ্রমণ, তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আর একবারও তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না সেই শ্রমণ। প্রকৃতি তার মাকে বলছে, 'মনে হয়েছিল, আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না, আমি যে ওর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি।' পরে প্রকৃতির মা যখন জিজ্ঞেস করছে, 'তোর মনে ভয় হল না?' প্রকৃতির উত্তর 'ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি...আমার মনে ফুলতে লাগল এক আনন্দ। তাকে কী বলব? নতুন সৃষ্টির বিরাট বৈরাগ্য।...' আসলে বীরেন, বৌদ্ধভিক্ষুর হাতে প্রকৃতি তো নতুন সৃষ্টি! আর তার যিনি স্রষ্টা, তিনি তো আর কখনো ফিরে তাকাবেন না। যে কোনও স্রষ্টাই বলো। সে কোনও দিন পুরনো সৃষ্টির দিকে তাকাবে না। এক নিশ্চিত নিরাসক্তি তার সব কিছু ফেলে রেখে সামনের দিকে তাকে ঠেলে দেয়। যে কোনও স্রষ্টা আর সৃষ্টির এই তো ভেতরের সম্পর্ক।' চমৎকার ব্যাখ্যা শোনান সন্তোষদা—মনে রাখার মত।

গীতবিতানের বহু পাতা যেন মুখস্থ। সেখান থেকে চণ্ডালিকার তার মাকে বলা প্রকৃতির মুখের গান হুবহু বলে গেলেন—

'মা, ওই যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে!
ওই যে তিনি চলেছেন।
ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না—
তাঁর নিজের হাতের এই নূতন সৃষ্টিরে
আর দেখিলেন না চেয়ে।

বলার মধ্যে নাটকের কথাগুলোর, একের পর এক গানের স্মৃতি এত নিখুঁত, বিস্ময়ে থ হয়ে যাই।

বন্ধু বার্ণিক রায় বলে, 'একবার সন্তোষদার সঙ্গে কথা বলো। দু'জনে ওঁর সঙ্গে দেখা

করব। অফিসে নয়, বাড়িতেই।' তখন সন্তোষদা থাকতেন ভবানীপুরের এক ফ্ল্যাটে তিনতলায়। ফোন করলাম অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বললেন, 'এসো। তবে সময় নিয়ে আসবে। ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করবে না।' আমাদের সময়ের বন্ধুদের সঙ্গে ওঁর কথা বলার সে কী আগ্রহ, কৌতূহল! একটানা কথা বলে জমিয়ে রাখতেন। আমরা দু'জন গেলাম নির্দিষ্ট সেই সকালে। সব কাজ সেরে আমাদের নিয়ে বসলেন। কতরকম যে আলোচনা তা বিস্তারিত মনে নেই। তবে আমরা দু'জন শুধু ওঁর কথা শুনেই গেছি। অনেকটা সময় কাটিয়ে যখন উঠব-উঠব করছি, সন্তোষদা হাসতে হাসতে বললেন, 'আর একটু বসো। তোমাদের সঙ্গে এক নামী লেখকের তৃতীয় স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেব।' লেখকের নাম পরে প্রকাশ্য। বেশ কিছুটা পরে ভদ্রমহিলা এলেন। সন্তোষদার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আমাকে অতি শান্ত স্বরে বললেন, 'ভাল আছেন!'

সন্তোষদা অবাক হয়ে ওঁকে বললেন, 'তুমি এদের চেনো নাকি!'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'আমাদের সঙ্গে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন সম্ভবত। তাই না?' বার্ণিকও ওকে চেনে।

আমরা কিছু কথাবার্তায় ব্যস্ত হলাম। সন্তোষদা তখন সেই লেখকের নাম আর করেননি। আমরা অবশ্য কিছুটা জানতাম।

আমাদের সমসাময়িক কবি, লেখক-বন্ধুদের সম্বন্ধে সন্তোষদার অদ্ভুত এক নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার ছিল। অনেককেই তাঁর কর্মক্ষেত্রে কাজের সুযোগ দিয়ে আপন করেছেন তিনি। আর সেই সঙ্গে ছিল—তাঁর কাছ থেকে স্নেহ, প্রীতি, উপকার পাওয়া কিছু লেখক—একাধিক ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞের মত আচরণ করলেও, ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হলেও সহনশীলতা দিয়ে তাদের সহজভাবে নিতে পারতেন শেষে। একসময়ে সন্তোষদা এমন একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের নাম করেছিলেন যার বিরূপ ব্যবহারে প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকলেও 'দেশ' পত্রিকা থেকে তার লেখা ফেরত আসার পরেও সন্তোষদা নিজে সেটি নিয়ে গিয়ে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এক দুপুর গড়ানো বিকেলের মুখে পত্রিকার ঘরে সন্তোষদা আর আমি কথা বলছি। হঠাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঢোকে। শক্তি তখন পত্রিকার একজন স্টাফ। নিজস্ব নেশায় শক্তি তখন বেশ কিছুটা অস্থিত। আমার পাশের চেয়ারে বসেই আমার দিকে তাকাল, 'কী রে! কৃষ্ণা (আমার স্ত্রী) কেমন আছে?' বললাম, 'ভাল'। তারপর সন্তোষদার দিকে তাকাল। সন্তোষদা তখন নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে শক্তির দিকে, কোনও কথা বলছেন না। বুঝি সন্তোষদা এই চেহারার সঙ্গে বহুল পরিচিত। সন্তোষদার দিকে তাকিয়ে শক্তি হঠাৎ বলল, 'এই, আমাকে দশটা টাকা দে।'

সন্তোষদা তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'তোমাকে কুড়ি টাকা দিয়েছি, তুমি ফেরত দাওনি শক্তি।'

'সে যাক। এখনি দশটা টাকা দরকার। তাড়াতাড়ি দে।'

সন্তোষদা যতবার বলেন, শক্তি ততবার ওর চাওয়ার চাপ বাড়ায়। কিছুতেই

সন্তোষদার কথা শুনছে না।

একসময়ে সন্তোষদা হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, আমাকে ইশারা করেন। 'আমি আসছি'। বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সন্তোষদা সে সময়ে যেন নিজ গৃহে পরবাসী।

শক্তি, আমি চুপ করে বসে আছি। ও মুখে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। বেশ কিছুটা সময় চলে যাওয়ার পর আমি উঠে পড়লাম। 'আমি আসছি শক্তি। তুই বোস।'

'চল, আমিও যাব'। উঠে দাঁড়ায়। শক্তি যে শক্তির মধ্যে নেই ওর দাঁড়ানো, হাঁটা, ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটের দিকে যাওয়া দেখে বুঝেছি।

শক্তি চলে যাওয়ার পর আবার সন্তোষদার ঘরে ঢুকি। সন্তোষদা হাসছেন, 'বুঝলে বীরেন, এভাবে এড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই।' খুব স্নেহ করতেন শক্তিকে। ওর কবিতার প্রশংসা ও সীমা নিয়ে সে অনেক কথা। আমি এক গভীর রাতে নেশায় নিদ্রিত বেলাল চৌধুরীকে রিকশায় করে আমার বাড়ি এনে, শেষে বাইরে থেকেই জল বয়ে যাওয়া নালার কাছে ফেলে চলে যাওয়ার গল্প করলাম। সেই প্রসঙ্গেই একদা গভীর রাতে লালবাজার পুলিশ অফিসারের ফোন পেয়ে সন্তোষদা শক্তির বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে তাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটাও বলেন। বেহেড মাতাল শক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় পুলিশ তুলে এনে লালবাজারে রাখে। সেই বলার মধ্যে সন্তোষদার কোনও রাগ, বিরক্তি ছিল না। তিনি শক্তিকে যে কত ভালবাসতেন, তার নানান অত্যাচার, অসঙ্গত আচরণ সহ্য করতেন, তা শুনতে শুনতে আমি মুগ্ধ হতাম। এদের সঙ্গে সন্তোষদা এভাবেই জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সন্তোষদা খুব রাগী, রাগলে মাথার ঠিক থাকে না, যা মনে আসে তা-ই বলে দিতেন। আবার একসময়ে একেবারে সহজ হয়ে যেতেন। সন্তোষদার রাগ আর সেই সূত্রে নানান কথাকে পদের অহংকার বলে মনে করেন অনেকেই। এ নিয়ে সন্তোষদার বিষয়ে এক প্রবাদের মত কথা রটে। কিন্তু আমি অবাক হই, এতদিন এতভাবে মিশেও আমার কোন ভুলে, আচরণে এতটুকুও রাগতে দেখিনি।

একবার সন্তোষদা আমাকে বললেন, 'বীরেন, একদিন আমার বাড়ি এসো, মণীন্দ্র (রায়) তোমার কথা খুব বলে। আমি তো তোমার 'অমৃতে'র সব গল্পেরই পাঠক। এসো, খুব ভাল সময় কাটবে।' যেদিন উনি এটা বলেন, তা থেকে পনেরো দিন বাদে এক রববার সকালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমি এই পনেরো দিন নিজের মধ্যে তৈরি হয়েছি ওই আড্ডায় বসার জন্যে। সন্তোষদা তখন নিউ আলিপুরে থাকেন। আমি সেদিনের আড্ডায় যেতে পারিনি এক একান্ত পারিবারিক গোলমালে। আমার ফোন ছিল না তখন। সন্তোষদাকে জানাতেও ভয় পাই। এর পর দিন সাতেকের মধ্যে দেখা হয়। সন্তোষদা বললেন, 'তুমি সেদিন এলে না কেন?' অদ্ভুত শান্ত গলা। কোথায় সেই রাগ! বললেন 'মণীন্দ্রকে আমি দু'ঘণ্টা আটকে রেখেছিলাম তুমি আসবে বলে, তোমায় ছাড়া সেদিন আর কারোর আসার কথা ছিল না।' আমি অপরাধীর মত সামনে দাঁড়িয়ে থাকি শুধু বলি, 'হঠাৎ বাড়িতে আটকে পড়ি সন্তোষদা, বেরুবার সময়েই গেস্ট এসে গিয়েছিল।'

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। কেন যেতে পারিনি সত্যি কথা বলা যাবে না। যে সন্তোষদার এত রাগের কথা শুনেছি, কোথায় সেই রাগ! এমন অদ্ভুত মনের মানুষ ছিলেন তিনি। আমাকে তাঁর এমন ক্ষমা।

একবার নিউ আলিপুরের সন্তোষদার ফ্ল্যাটে সকালের দিকে কিছু সময় কাটিয়ে উঠব ভাবছি, সন্তোষদা বললেন, 'এখন উঠতে হবে না। আমি এখনি বেরুব। তুমিও আমার এখানে খেয়ে নাও। দু'জনে একসঙ্গে বেরুব।'

খাওয়ার কথায় আমি বললাম, 'সন্তোষদা বাড়িতে কিন্তু মিল অফ করে আসিনি।'

'তাতে কী? খেয়েই নাও। আসলে তোমার বৌদি সত্যি ভাল রাঁধতে পারেন কিনা বলে যাও। আমাদের কথায় তো আর বিশ্বাস রাখে না, আর খাওয়া মানে সামান্য ঝোল ভাত। ঝোল রান্না কিন্তু সহজ নয়।' কথাগুলো বলে সন্তোষদা ভিতরে চলে গেলেন। সেই সকালে সন্তোষদার গাড়ি করেই এলাম আনন্দবাজার অফিসের সামনে। সন্তোষদা নামতে যাবেন, কে যেন নিচু গলায় কী বললেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে। সন্তোষদা আর নামলেন না। গাড়ি ঘুরিয়ে পত্রিকা অফিস থেকে সামান্য দূরত্বে এসে এক হোটেলের দোতলায় এলেন। সঙ্গে আমি। বলতেও পারছি না 'সন্তোষদা এবার যাই', টেবিলে দু'জন বসে আছেন আমার বয়সী। সন্তোষদা তো নানা বিশেষণ দিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এল নেশার পানীয়। আমার এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনও ছুঁৎমার্গ ছিল না। তবু আদৌ অভ্যস্ত নই বলে বললাম, 'আমি কিন্তু খাবো না সন্তোষদা'। সন্তোষদা হাসলেন। 'ঠিক আছে বোসো।' তিনজনে খাচ্ছেন, আমি একা বসে। এখানেই খারাপ লাগে। নেশার আসরে চারজনের মধ্যে একজন না খেলে দলের অস্বস্তি তো থাকেই। একসময় লজ্জা সরিয়ে বলি, 'আমি বরং চলি সন্তোষদা।' 'যাবে! এসো। পরে ফোনে যোগাযোগ কোরো। কথা আছে।' সেদিন প্রায় পালিয়ে বেঁচেছিলাম। নেশা করি না বলে নয়, এই অবস্থায় যদি কিছু ভেবে বসেন, আমার আড়ষ্টতা, আহারের বিধিনিষেধ যদি পছন্দ না করেন, তাই এমন পলায়নের মত চলে আসা। দেখেছি, কোনও কাজে আমার ওপর কোনও জোর খাটাতেন না উনি।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। 'দেশ' পত্রিকায় দরকারে সুনীল আর আনন্দর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। শেষে যাই সন্তোষদার ঘরে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'তুমি এসে গেছ, আমার সঙ্গে অ্যাকাডেমিতে চলো। আমার একটা নাটক হচ্ছে, দেখবে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন নাটক?' 'অপার্থিব। দেখি আমাকে তুমি নতুন করে কিছুটা দেখতে পাও কিনা!' সন্তোষদার গাড়িতে এলাম অ্যাকাডেমিতে। সন্তোষদার পোশাক হল প্যান্ট আর চকরাবকরা বুশশার্ট। এমন পোশাকে খুব একটা দেখতাম না কলকাতায়। বললাম, 'এ পোশাকে তো কোনওদিন দেখিনি! একেবারে ইয়ং!' 'বলছ! এই বুশশার্ট দেখে তো?' কে যেন সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যাকাডেমির লনে। পরিচিত। হাসতে হাসতে বললেন, 'সন্তোষদা কোনওদিন একটা শার্ট একবারের বেশি পরেন না।' সন্তোষদার আশপাশ একটু খালি হতে, হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোনো,

আমি কদিন দীঘায় কাটাব। ফুর্তি আর কি? একটা মেয়ে নিয়ে। তুমি এর মধ্যে অফিসে এসো না।' আমি তাকিয়ে রইলাম। সে সময়ে মহিলা সংসর্গ বিষয়ে সন্তোষদাকে নিয়ে দুর্মুখরা নানান গুজব ছড়াত। সন্তোষদার কথায় আমি ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছি, সন্তোষদা কি সেই গুজবের কোনও দিক যাচাই করতে চাইছেন? আমি ভিতরে ভীত। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, 'জিজ্ঞেস করলে না তো কাকে নিয়ে যাব?' কী উত্তর দেব? উনি মুখ টিপে হাসছেন। নিজেই বললেন, 'তোমার বৌদি'। আমি হেসে উঠলাম। 'অজাতক' নাটক শুরু হবে। নাটকের মোট তিনটি চরিত্র। নায়িকা ছিলেন নামকরা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্য, নায়ক নিমু ভৌমিক। একজন আবার নাটকের শেষে প্রম্পটার হয়ে মঞ্চে ঢোকেন। কে অভিনয় করেছিলেন মনে নেই। নাটকটি অবশ্যই মঞ্চসফল ছিল। 'শো'য়ের পর আমি আর অপেক্ষা করিনি। সন্তোষদা বললেন, 'এবার তো যাবে। পরে এসে বলো কেমন লাগল নাটকটা, সেই সঙ্গে অভিনয়ও অবশ্যই।' সে সম্পর্কে আর বলার সুযোগ হয়নি পরে।

সন্তোষদার লেখক ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক বলতেই হয়। সন্তোষদা তাঁর পরবর্তী কালের তরুণ, তরুণতর লেখকদের সম্পর্কে যত বেশি 'ভোক্যাল' ছিলেন, নিজের সমবয়সী বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে কখনোই কোনও মন্তব্য করতেন না। একেবারে নীরব। আমাদের সময়ের ও পরবর্তী ষাট, সত্তর, আশির দশকের লেখকদের লেখা, তাঁর মৃত্যুর আগের সময়ের লিটল ম্যাগাজিন, বইপত্তর সব নিয়মিত ও নিবিষ্টতায় পড়তেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তাঁর। কোনও লেখা পড়েই ফোনে, সামনে দেখা হলে, এমনকী পরে সপ্তাহ বা মাসের ব্যবধানে কাছে গেলে একেবারে গল্প ধরে মন্তব্য করতেন, কখনো কখনো গল্পের লাইন পর্যন্ত বলে যেতেন।

১৯৭২ সালে আমার 'বিষণ্ণ পরবাস' উপন্যাস বেরোয়। উনি কলকাতায় ছিলেন না। ওঁর ঘরে টেবিলের ওপর বই রেখে এসেছিলাম। ফিরে ঠিক আমার বই পড়েছেন। কলকাতায় ফেরার পর আমি ফোন করি। উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেন যে কোনওদিন দুপুরে ওঁর ঘরে যেতে। বললেন, 'তোমার উপন্যাস আমার খুব ভাল লেগেছে। রীতিমত ম্যাচিওরও'। আমি হঠাৎ একদিন গেলাম ওঁর ঘরে। ঢুকেই দেখি প্রায় সাত / আট জন বয়স্ক, মধ্যবয়সী মানুষ ওঁর টেবিল ঘিরে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। তিনি সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের কাছে 'পল্টুদা' নামে পরিচিত। শেকসপিয়র ইত্যাদির অনুবাদক। উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। সন্তোষদা আমাকে দেখেই বললেন, 'আজ তো এখানে ভিড়। পরে দেখা করবে।' একটু থেমে বললেন, 'তোমার উপন্যাসটায় 'লেসবিয়ানিজম' (দুই স্ত্রীলোকর স্বকামী স্বভাব) চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছ। এত সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছ!' এমন কথায় আমি কীই বা বলতে পারি। আমার লেখা সম্বন্ধে যে কোনও প্রশংসা আমাকে লাজুক, ভীরু, আড়ষ্ট করে। সেদিন এত ভিড় থেকে প্রায় পালিয়ে বেঁচেছিলাম। আমার 'শীতের বেলা' সন্তোষদাকে উৎসর্গ করেছিলাম। একদিন বললেন, 'তোমার লেখায় কী

আছে বলো তো! বই বাড়িতে ঢুকলে আর বাড়িতে থাকেই না। আর একটা কপি থাকলে দিয়ে যেও।'

মনে পড়ে, একবার 'শান্তিপর্ব' গল্প পড়ে আনন্দ বাগচীর সামনে ওঁর অফিস ঘরে মুখস্থের মত গল্পের উদ্ধৃতি দিয়ে ভাললাগার কথা জানিয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার সব গল্প পড়ি বীরেন।' অমৃতের 'যখন তুমি', দেশ-এর 'চৌকাঠ পেরিয়ে' উনি সম-সময়কালের কোনও গল্প বাদ দেননি। শুধু আমার গল্প নয়, আমাদের পরিচিত অনেকের গল্পের উনি ছিলেন আন্তরিক পাঠক। পড়েই মন্তব্য করায় কোনও ভান, কৃত্রিমতা ছিল না। আবেগ ছিল শিশুর মত অকৃত্রিম।

একদিন কবি বন্ধু গৌরাঙ্গ ভৌমিক আমাকে বলে, 'বীরেন, তুমি কি রিসেন্টলি সন্তোষবাবুর কাছে গিয়েছিলে?' আমি তখন বেশ কয়েকমাস ধরে সন্তোষদার থেকে দূরের মানুষ হয়ে থাকি নানান পারিবারিক কারণে। গৌরাঙ্গ তখন 'সাহিত্যচর্চা' নামে একটি অতি সুরুচিপূর্ণ সিরিয়াস সাহিত্য পত্রিকা বের করে। ত্রৈমাসিক। প্রথম সংখ্যায় ছোটগল্প সম্পর্কে বিতর্কমূলক লেখা ছিল। গৌরাঙ্গ পত্রিকার এক কপি সন্তোষদাকে দেওয়ার জন্য ওঁর ফ্ল্যাটে যায়। সেখানে নানান প্রসঙ্গে সে সময়ের চারজন কোন কোন গল্পকারের লেখা সবচেয়ে ভাল লাগে—প্রসঙ্গ তোলে গৌরাঙ্গ। সন্তোষদা সুনীল, শীর্যেন্দু আর দিব্যেন্দুর নাম বলার পর আমার নাম বলেন। খবরটা গৌরাঙ্গ দেয়। এরকম সংবাদ, আজ বলতে দ্বিধা নেই, আমার লেখকজীবনে মূল্যবান প্রেরণা ও পাথেয় বলেই মনে হয়েছিল। এসবে আমার বিন্দুমাত্র কোনও আত্মপ্রশংসায় ডুবে থাকার ব্যাপার নয়, আসলে তাঁর সময়ের সমস্ত তরুণ লেখকদের কাছে তিনি যে একজন একেবারে অকৃত্রিম, মুক্তমনের পাঠক-সমালোচক, এই বিরাট প্রাপ্তি তরুণদের কাছে আশীর্বাদই।

সন্তোষদার ছোট মেয়ে কাকলির (মিলুর) বিবাহের তোড়জোড় চলছে। আমি জানতাম না। হঠাৎ একদিন সন্তোষদার সঙ্গে দেখা পত্রিকা অফিসে ঢোকার মুখে দরজার কাছে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার বীরেন! তোমার যে পাত্তাই নেই।' পাশেই ছিলেন সৌম্যদর্শন অরুণ বাগচী। তাঁকে বললেন, 'বীরেনের নামে লেখা কার্ডটা দিয়ে দাও তো!' আমি বোকার মত তাকিয়ে আছি। 'দেখছ কী? মিলুর বিয়ে। আসবে।' ছেলের বিয়ের ক'দিন আগে ওঁর সঙ্গে দেখা। তখন, আমার ফোন এসে গেছে, উনি অফিস থেকে বেরুবার জন্যে ব্যস্ত। 'তোমার তো ফোন নম্বর এসে গেছে। ঠিকানাটাও একদিন আমার কাছে দিয়ে যাও।' কী যেন ভাবলেন, 'অরুণবাবু, এখনি বীরেনের ফোন নম্বরটা লিখে নিন তো।' সে এক অন্য সন্তোষদা। সম্পূর্ণ পারিবারিক ঘরোয়া সামাজিক ব্যক্তিত্বের মানুষ। এর পর ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি উনি নিজেই আমার হাতে দেন। ডেকে পাঠান আনন্দ বাগচীকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে। ১৯৭৫-এর এমারজেন্সির সময় মেয়ের বিয়েতে সন্তোষদা সরকারি নিমন্ত্রণের কঠিন বিধি অক্ষরে অক্ষরে মেনেছিলেন। ছেলের বিয়েতে তার বিপরীত। আদর আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় ছিল চোখে পড়ার মত রুচি, আড়ম্বর। উত্তপ্ত আন্তরিকতা। পারিবারিক অনুষ্ঠান শেষ

হলে কয়েকমাস পরে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্যবাসরে দেখা হয় সন্তোষদার সঙ্গে। অনুষ্ঠান শেষ হলে গ্র্যান্ড হোটেলের লবির ভিড়ে দেখা হয় সন্তোষদার সঙ্গে। চারপাশের অতিথির ভিড় কমলে গলা নামিয়ে বলি, 'সন্তোষদা, এবার আপনার সম্পর্কে বেশ কিছু বলার সময় এসেছে। আপনাকে নিয়ে একটি গ্রন্থ লেখার ইচ্ছে আছে। আপনার আপত্তি নেই তো?' সন্তোষদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মুখে উজ্জ্বল অথচ চাপা হাসি। শিশুর মত, ঘনিষ্ঠ কাউকে কাউকে, আমার এই পরিকল্পনার কথা নিজেই বলেন—অনেকটা কৌতুকের স্বরে।

আজকের এই গ্রন্থ সেই দেওয়া কথার কিঞ্চিৎ বাস্তব প্রয়াস এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা, অগ্রজের প্রতি এক গভীর সশ্রদ্ধ নিবেদন।

এমন সংলাপ বিনিময় সন্তোষদার গলার অস্বস্তি ও অসুখ ধরা পড়ার মাস কয়েক আগেই সম্ভবত।

এক দুপুরে কী একটা দরকারে যেন সন্তোষদার ঘরে গেছি। উনি একাই বসেছিলেন। কিছুটা বুঝিবা অন্যমনস্ক। হাতের কাছে যেন কোনও কাজই নেই। আমাকে আচমকা দেখে বললেন, 'এসে ভালই করেছ, বোসো।' আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার পিছন পিছন এসেছে, এমনি আকস্মিকতায় ঢুকল কথাকার সমরেশ মজুমদার। সমরেশ তো প্রায়ই যায় সন্তোষদার ঘরে। আমার ডান দিকে সামান্য দূরের চেয়ারে বসে সমরেশ।

সন্তোষদা সেই মুহূর্তে কী অন্যমনস্ক ছিলেন? আজ লিখতে বসে সে রকম এক ভাবনা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। সন্তোষদার মুখটা কেমন বিষণ্ন, কোনও বেদনাদায়ক ছায়া বুঝিবা সারা মুখ ঢেকে। হঠাৎ বললেন, 'তোমাদের দু'জনকে একটা জিনিস পড়ে শোনাবো।' আমরা দু'জনেই উৎসুক। বেল টিপে বাইরের দরজার সামনের পাহারাদার লোকটিকে বলে দিলেন, 'এ সময় কেউ যেন ঘরে না ঢোকে।' ডান দিকের ড্রয়ার টেনে একটা ডাকযোগে আসা খামের চিঠি বের করলেন। আট পাতার একটি দীর্ঘ চিঠি। 'শোনো, আমি পড়ছি'। আমরা বিস্ময়ে স্থির হয়ে শুনতে থাকি। নীরব, নিশ্চুপ! কিন্তু এ কী চিঠি! চিঠির ভাষার বাক্যে, শব্দে গণিকালয়ের অন্দরমহলের থেকেও নিম্নস্তরের অকথ্য শব্দের, ইঙ্গিতের এক বিষয় জড়ানো! স্তম্ভিত আমরা দু'জনেই লজ্জায়, অস্বস্তিতে অধোমুখ।

পড়ার পর বললেন, 'তোমাদের সময়েরই একজন লোকের এই চিঠি।' আমি বললাম, 'আপনাকে কেন এই চিঠি?' 'জানি না।' সন্তোষদার উত্তর। 'তবে হাতের লেখাটা যে তার নয়, বোঝা যায়। কিন্তু নিচের সইটা, তোমাদের দেখাতে পারছি না, আমার একেবারে চেনা।' আমি দুঃখে বেদনায় বলি, সন্তোষদা আপনি কি চিঠির এই লেখক সম্বন্ধে কোথাও কোনও মন্তব্য করেছেন?' সন্তোষদা সবেগে মাথা নাড়লেন, 'না'। এত কুৎসিত চিঠি কোনও লেখক (?) লিখতে পারে, কল্পনাতীত। আমরা কী বলব। বললাম, 'আপনি চিঠিটা রাখছেন কেন, ছিঁড়ে ফেলে দিন।' উনি খুব সহজ গলায়

বললেন, 'আমি রাখছি, কারণ আমার এক ঘনিষ্ঠ পরিচিতকে এটা পড়াব। সে-ই এই পত্রলেখকের বিশেষ পরিচিত। তাকে দেখিয়ে তারপর ডেস্ট্রয় করার কথা ভাবব। তার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তোমরা মাঝখানে এসে গেলে।'

সেদিন সেই দুপুরে সন্তোষদার সঙ্গে দু'জনে আর কোনও কথাই বলতে পারছিলাম না। কে লিখেছে, তার নাম উনি বলেননি, আমরাও জানতে চাইনি একবারও। শুধু সন্তোষদার মুখচোখ, সারা অস্তিত্ব ঢেকে যে বেদনা ছিল, যে দুঃখ ঘিরে ধরে ছিল, হয়তো বা অপমানের অক্ষম অসহায়তাও, তা উপলব্ধি করে ভাঙা বিধ্বস্ত মনে এবং আমাদেরই লজ্জাকর অপমান ভেবে সন্তোষদার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। এতদিন সন্তোষদার যে পরিচয় পেয়ে আমরা ওঁর কাছাকাছি থেকেছি, সেদিনের সেই চেহারা আমাদের চরম রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, অপমান জাগিয়ে বেশ কিছুকাল নিথর করে রাখে।

সন্তোষদার ছোট মেয়ে কাকলির (মিলু) বিয়ে হয় চোদ্দই ডিসেম্বর, উনিশ শ পঁচাত্তর-এ। দেশীয় রাজনীতির সে এক ভয়ংকর অস্থিত সময়—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। সারা দেশেই জরুরী অবস্থা ঘোষিত। সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত এবং কথাকার-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ সে সময়ে জেলে অন্তরীণ। একমাত্র পুত্রসন্তান টিটোর বিয়ে হয় নয় মে উনিশ শ তিরাশিতে। এর প্রায় এক বছরের কিছু সময় পরে উনিশ শ চুরাশির অক্টোবরে সন্তোষদার গলায় কর্কট রোগের আক্রমণ প্রায় হঠাৎ-ই ধরা পড়ে। ধরা পড়ার প্রাক সময়ে জামাতা কৃষ্ণরূপ, কন্যা কাকলির সঙ্গে দিল্লী-আগ্রা ইত্যাদি উত্তরভারত ভ্রমণে সন্তোষদা তখন কলকাতার বাইরে। এরই মধ্যে তিনি অনুভব করেন গলায় কি যেন কাঁটার মত বিঁধছে! সন্তোষদা যে নিজের মত করে অসুখটার ইতিবাচক দিক ভেবে নিয়েছিলেন, তা এগারোই অক্টোবরে এমন আক্রমণের সংশয়ে তার প্রকাশ মেলে। সতেরোই অক্টোবরে কলকাতায় ফিরে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি হন। পরীক্ষা চলে দ্রুত ব্যবস্থাদির মধ্যে। ধরা পড়ে—অসুখটা কর্কট রোগই!

এমন একজন অসম্ভব প্রাণবান সদা-সক্রিয় উজ্জ্বল স্বভাবের মানুষ, বুদ্ধিদীপ্ত সফল কথাকার, পথিকৃৎ সাংবাদিক যে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কী উত্তাল আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন শারীরিক সমস্ত জটিলতম অসুস্থতার সীমা অতিক্রম করে, সমস্ত যন্ত্রণা, অসহায়তাকে তুচ্ছ করে, তার প্রমাণ আছে 'যাত্রারম্ভ' গল্প রচনায়। অনেক বড় এবং বিস্ময়কর অভ্রান্ত প্রমাণ আছে 'চলার পথে' রচনায়। এই জাতীয় প্রাণশক্তি, উদ্যম, মৃত্যুভয়-অতীত সক্রিয়তা, আমার মনে হয়, তাঁর পূর্বসূরী ও সমসময়বর্তী লেখক-শিল্পীদের কারোর নেই। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী যাবতীয় সৃজন মৃত্যুকে তুচ্ছ করার, সবলে অস্বীকার করার মূল্যবান অভিজ্ঞান হয় তাঁর লেখা শেষ গল্প। যাঁরা 'চলার পথে' পড়বেন তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন বলেই আমি মনে করি। রবীন্দ্রনাথ রচিত সেই চরণ : 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'—এমন ভীষণের সঙ্গে এই অমৃত-সমান আত্মীয়তার, ভাষণের জীবন্ত ফলক হলেন সন্তোষদা—সন্তোষকুমার ঘোষ।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আগের সেই গোপনতম অভিজ্ঞতার প্রায় মাস দেড়েক পর

খবর আসে, সন্তোষদা বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অবশ্য আগেও একবার বেলভিউ-এ ভর্তি ছিলেন অন্য এক ঘটনার সূত্রে। ইতিমধ্যে ত্রৈমাসিক 'চতুর্দোলা' পত্রিকার সম্পাদক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্তোষদার যোগাযোগ করিয়ে দিই। বাসুদেববাবু সন্তোষদার লেখার রীতিমত এক ভক্ত পাঠক। লেখক-বন্ধু সুভাষ সিংহ সন্তোষদার একটি উপন্যাস ধারাবাহিক করার ব্যাপারে সন্তোষদাকে বলতে বলে। বাসুদেবের মতামত জেনে আমি আর সুভাষ সন্তোষদার সঙ্গে বেলভিউতে দেখা করি। সঙ্গে দামি মিষ্টির বাক্স। আমরা বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার-এ যেতে খুব খুশি সন্তোষদা। বললেন, 'তোমরা মিষ্টি এনেছ। আমার তো বারণ।' সন্তোষদার সে সময়ে কথাবার্তায়, হাসি-ঠাট্টায় এতটুকু জড়তা নেই। একেবারে সম্পূর্ণ সুস্থ। সমান আড্ডাবাজ মানুষটা। একেবারে নরমাল। ঠিক হয়ে যায় উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে 'চতুর্দোলা'য় ছাপার ব্যাপারটা। বেরুতে থাকে নিয়মিত।

ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন সন্তোষদার সম্পাদনায় 'সানন্দা' নামে এক মাসিক প্রকাশের। আমাকে বললেন, 'খুব তাড়াতাড়ি, পারলে কাল-পরশুর মধ্যে একটা গল্প দাও। প্রথম সংখ্যায় তোমার লেখা যাবে।' দিয়েছিলাম 'বিশ্বাসঘাতক' নামে একটি গল্প। একদিনের মধ্যে তা পড়েই আমাকে ফোন, 'খুব ভাল গল্প দিয়েছ বীরেন। কনগ্র্যাচুলেশান'। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে সন্তোষদার সম্পাদনায় সে পত্রিকার প্রকাশের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বন্ধ রাখেন। তার ওপর ধরা পড়ে সন্তোষদার গলায় ক্যানসার রোগের লক্ষণ।

চতুর্দোলা'য় তিনটি সংখ্যায় ছ'টির মত কিস্তি ধারাবাহিকভাবে ছাপা চলছে। রোগের লক্ষণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় সন্তোষদার বাকি লেখা বন্ধ হল। ছয় পরিচ্ছেদের কিস্তিটি লিখে দেওয়ার পরেও প্রেসের দায়িত্বজ্ঞানহীন অসাবধানতায় কিস্তির শেষ কয়েকপাতা হারিয়ে যাওয়ায় অসম্পূর্ণ বাক্য ছেপেই উপন্যাস স্তব্ধ হয়ে যায়। উপন্যাসটির নাম 'করকমলেষু'—'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসের যে এটি দ্বিতীয় খণ্ড হবে, সন্তোষদা তা গোড়াতেই জানিয়েছিলেন।

আমার জীবনে সন্তোষদার মত কথাকারের সঙ্গ তাঁরই জীবন-প্রসঙ্গের প্রমাণ রেখে গেছে। একসময়ে কথায় কথায় 'কিনু গোয়ালার গলি'র এক প্রধান নারী চরিত্রের সঙ্গে ওঁর চেনা মেয়ের প্রবল সাদৃশ্যের কথা বলেন। ওঁর অল্পবয়সের দৈনন্দিনের জীবনে ফাঁকা মাঠের ব্যবধানে পাশের বাড়ির ভাড়াটে ছিল সেই বিবাহিত মহিলা। আমাকে একদিন বললেন, 'জানো বীরেন, সেই মহিলা এখনও আমার এই অফিসে আসে। কেন জানো? ওঁর ছেলের একটা চাকরি করে দেওয়ার জন্যে। ওকে নরেনও (নরেন্দ্রনাথ মিত্র) চিনত। মেয়েটি বলে, আমার আঁকা চরিত্রই ঠিক। নরেনের হাতে তৈরি হওয়া মেয়েটির মধ্যে ও তেমন কোনও ভিতরের মিল পায়নি। সুযোগ এলে তোমার সঙ্গে একদিন পরিচয় করিয়ে দেবো। বুঝতে পারবে, কঠিন বাস্তব আর কল্পনা কীভাবে কোন মেরুর কী আকার নেয়।'

সন্তোষদার স্বভাবের মধ্যে সম্ভবত অন্তঃশীল ছিল এক অনন্ত অস্থিরতা—যা শিল্পের মাটি তৈরি করে। এই অস্থিরতা বাইরে আর এক আকারে পারিপার্শ্বের মধ্যে তরঙ্গ তোলে। ওঁর শরীরে কালব্যাধি প্রবেশের মাস দুয়েক আগে থেকেই সন্তোষদা আমাকে বলতেন, 'তোমার কি কোনও উপন্যাস বেরুচ্ছে? মানে লেটেস্ট কোনও উপন্যাস ছাপা হচ্ছে?' 'কেন সন্তোষদা?' 'আমার খুব দরকার। বেরুলেই আমাকে আগে দেবে।' তখন আমার 'সমুদ্রের শব্দ' ছাপা চলছে। বড় উপন্যাস—সাপ্তাহিক 'অমৃতে' ধারাবাহিক প্রকাশের কথা ছিল, অমৃত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। সন্তোষদাকে একদিন বললাম, 'একটু দেরি হচ্ছে, বেরুলেই দেব'। এর পর যখনি, যতবার দেখা হয়েছে, বলতেন, 'কই তোমার উপন্যাস কোথায়?' কেন এভাবে উপন্যাস চাইতেন আমি জানি না। তবে যতবার চাইতেন, তাগাদা দিতেন, আমি অবাক হতাম, অসহায় বোধ করতাম। কেন এত এভাবে চাইছেন জিজ্ঞেস করতে ভয় পেতাম। ওঁর বেলভিউ-এ প্রথম থাকার সময়, ফিরে এসেও তাগাদা বন্ধ করেননি। অসুখটা প্রবল হলে কথা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই তাগিদও বন্ধ হল। আর যিনি 'সমুদ্রের শব্দ' ছেপেছিলেন, তিনি এমন একজনকে পরিবেশনার ভার দেন, যিনি নিজের নামে প্রকাশক ছেপে সমস্ত টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেন মূল প্রকাশকের। বইও সন্তোষদা বেঁচে থাকতে আর বেরোয়নি।

আজও সমান অবাক হই, কেন সন্তোষদা উপন্যাসটি চাইতেন! কেন? কেন? এর উত্তর কে দেবে?

নিজের গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে পাঠকদের কী চিন্তা ভাবনা, তা নিয়ে সব সময় ঔৎসুক্য কম ছিল না। বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'চতুর্দোলা'য় তাঁর নতুন উপন্যাস ছাপার আগে সমস্ত গল্প নিয়ে আলোচনা চান বড় মাপের আমার কাছ থেকে। বাসুদেববাবু ও সুভাষ সিংহ দু'জনেই তা আগে জানিয়ে দেন তাঁকে। সেই লেখাটা পড়ার জন্য কী প্রতীক্ষা তাঁর! বার বার বলতেন, লেখা হলে আমাকে একবার দেখাবে বীরেন। সন্তোষদার সঙ্গে কথা বলেই আর দেখাইনি ছাপা হবার পর দেখাব বলে। লেখাটি ছাপা হতে বেশ দেরি হয়। যখন বেরোয় তখন তিনি মুম্বই থেকে বেলভিউয়ে চলে এসেছেন! হাসপাতালের শয্যাবন্দি এর আগে মুম্বই থেকেই শানুকে (কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী) একটি চিঠিতে বলেন, 'চতুর্দোলায় বীরেন দত্তের প্রবন্ধটা কি বেরোল? জোগাড় করতে পারলে চিঠির মারফত air packet-এ পাঠিও। উৎসুক আছি।' (চলার পথে পৃষ্ঠা ৬৩) শেষ বেলভিউতে আসার পর আমি দু'বার সন্তোষদার সঙ্গে দেখা করতে গেছি। প্রথমবার এক ভদ্রমহিলা, সামান্য পরিচিত, কিন্তু নাম কিছুতেই মনে পড়েনি, আজও পড়ে না, সন্তোষদার সঙ্গে দেখা করতে ওঁর ঘরে ঢুকেছিলেন। আসলে একা আসার সাহস পাচ্ছিলেন না বলেই আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। সেদিন আমার প্রবন্ধের একটা ফাইন কপি দিয়ে এসেছিলাম সবিনয়ে এবং ভয়ে ভয়ে। ভদ্রমহিলা সন্তোষদাকে দূর থেকে এই অবস্থায় দেখে আমার আগেই নিশ্চুপ বিষণ্ন মনে ফিরে যান। পরে আর একদিন গিয়ে তাঁর মন্তব্য আমি শুনেছি। তা আমার 'একটি সাক্ষাৎকার' অংশে আছে।

এখানে পুনরুক্তি করছি না।

বহু মানুষ সন্তোষদার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে, পেশার জীবনের, এমনকি সৃষ্টিধর্মী লেখার ভাব-ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত থেকে ছিলেন। অনেক অভিমান, রাগ, তর্কবিতর্ক, ক্ষমা ও ক্ষমাহীনতার, করুণা ও আড্ডার ব্যাপার তাঁদের মধ্যে থেকেছিল। কাছাকাছি থাকার ফলে, সন্তোষদার এক দরাজ অকৃত্রিম মনের আকর্ষণেই অনেকেই তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছেন। হয়েও আবার অনেকে জনান্তিকে তাঁর বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞের মত কথা বলেছেন। উপকার পেয়েও তাঁকে মানসিক, এমনকী দৈহিক আঘাত করতেও (পরিবেশ যাই হোক না কেন) পিছপা হয়নি। সন্তোষদা তাদের বুঝতেন, কিন্তু তাঁর আবেগ, ভালবাসা, মানবতাবোধ, অনুভূতিপ্রাণ মন, বিবেকবান ব্যক্তিত্ব তাঁকে কোনও সংকীর্ণতার জলা-জমির দিকে ঠেলে দেয়নি।

আমি সেভাবে কোনও দিক থেকেই সন্তোষদার কাছাকাছি হতে পারিনি, চাইনিও। যেটুকু নিজে থেকে এগিয়েছি, আর তাতে সন্তোষদা নিজের মত করে আমাকে নিতে চেয়েছেন, সেইটুকুই কাছাকাছি থেকেছি। আমার তো কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু ছিল একজন সফল স্রষ্টাকে সম্পূর্ণ করে দেখার বাসনা ছাড়া (যদিও সেই সাফল্যে সন্তোষদার ভিতরের বাধা বড় ব্যথাকাতর ব্যথাদীর্ণ ছিল)।

সন্তোষদা তাঁর সাংবাদিকতার পাশাপাশি তেমন করে লিখতে পারছেন না গল্প-উপন্যাস—এর জন্য গভীর বেদনা অনুভব করেছি একান্তভাবে সামনাসামনি বসে। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর সামনে তাঁর না লিখতে পারার প্রশ্ন তুললাম। কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হতেন, বলতেন, 'তাই বুঝি!' তার পরেই নীরব হয়ে যেতেন। কোনও কি গভীর ক্ষতস্থান ছুঁতো এমন প্রশ্ন? আমি সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে গুটিয়ে নিতাম। আসলে সন্তোষদার নিজের লেখা সম্পর্কে একেবারে নিজের মত করে নিজেরই জমা রাগ ছিল, অভিমান ছিল। খাঁচায় পোরা কোনও বাঘের মত রাগ, অসহায় শিশুর মত কান্নাঝরা অব্যক্ত অভিমান। সাংবাদিক হওয়ার জন্যই সেই বিপরীত রাগ-অভিমান কিনা, বলতে পারব না, বলা যায়ও না। সাংবাদিকতার ব্যাপারটাই একমাত্র মানুষ, জীবন, সমাজের একেবারে Practical দিক, সেখানে বুদ্ধি-বিচারকে একমাত্র সম্বল করে সহজ কথা সহজ করে সত্য ভাষণে বলার ব্যাপার। এই বুদ্ধির সহজতা, সারল্যের স্বভাব সাংবাদিকের মনকে টানে চুম্বকের মত, মনের গভীর অনুভবের বুঝিবা বিনাশ ঘটে এভাবেই।

আর 'ক্রিয়েটিভ' লেখা দাবি করে মুক্ত মনের। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে তাঁর এত সব প্রবন্ধ লেখার কথা মনে রেখে একবার যা বলেছিলেন, তার অর্থ-তাৎপর্য ব্যাখ্যা এভাবে আমরা করি, এত তর্ক বিতর্ক, বুদ্ধি-বিচার দিয়ে লেখা প্রবন্ধ মনের ধর্মকে নষ্ট করে দেয়। কথাকার সন্তোষদার কি সাংবাদিক সন্তোষদার কাছে এভাবেই হেরে যাওয়ার দিক মাথা চাড়া দেয়? তাই কি সারাজীবন এক বিভ্রান্ত কথাকারের মধ্যে জন্ম নেয়, তীব্র অতৃপ্তি, নিরন্তর অস্থিরতা, ডুবে যাওয়া থেকে শ্বাস নেওয়ার জন্য মাথা তুলে শ্বাস

নেওয়ারই নৈর্ব্যক্তিক আর্তি, উৎকণ্ঠা, আরোগ্যের অনন্ত সম্ভাবনাহীন বাসনালোক!

সন্তোষদার সঙ্গে নানান বিষয়ে কথা বলতে বলতে বিদ্যুৎচমকের মত এমন বাসনালোকের অস্তিত্ব টের পেয়েছি। বুঝেছি, সাংবাদিকতার জগৎ থেকে কিছু মুহূর্ত সরে এসে একটা বড় আকাশে শ্বাস ফেলার প্রয়াসে তাঁর কত ক্লান্তি। বাইরে প্রয়োজনের জগৎ, উল্লাস, আনন্দ, শান্তি, গৌরব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরায়াস জনসাধারণের প্রস্তুতি, প্রসার ভিতরের আত্মপ্রকাশের আকুতিতে মেলে গভীর শূন্যতা থেকে বাঁচার জন্য নিঃসঙ্গতার নিরন্তর সংগ্রাম। এই দুই বিপরীত অবস্থাতেই তাঁর আচরণে ছিল বৈপরীত্য—এক দিকে ছিল ব্যবহারিক জগতের মানুষদের নিজেদের মত করে বাঁচার অর্থযোগ, আর একদিকে ছিল শিল্পী মানুষটিকে ঠিকমত বুঝে না ওঠার বিভ্রান্তি।

দোষ সন্তোষদারই—তিনি ব্যবহারিক জীবনের নিয়তির একমাত্র লক্ষ্যের উপকরণ। তা, তাঁর মৃত্যুর আগের রচনাগুলিতে অন্য এক জাত শিল্পীর অভিজ্ঞান উজ্জ্বল করে দেয়। সন্তোষদার কোনও কোনও গুণগ্রাহী অনুরাগী পাঠক তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র সৎ সাংবাদিক মানুষ সন্তোষদার কথা ভেবে, আশাতিরিক্ত অত্যধিক বেতন পাওয়ার কথা মনে রেখে তাঁর স্বভাবনিহিত দাপটের অপব্যবহার বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন। সন্তোষদার পরিচিত একাধিক সাহিত্যিক সম্পর্কে, সহকর্মীদের সঙ্গে বিসদৃশ আচরণ সম্পর্কে চরম 'স্বেচ্ছাচারী স্বভাবে'র দিক লক্ষ করেছেন। মৃত্যুর আগে তাঁর মধ্যে নাকি কিঞ্চিৎ করুণার ভাব এসেছিল—এসবও তাঁর মনে হয়েছে!

অথচ তাঁর সারাজীবনের আচারে-আচরণে সাংবাদিক হয়ে যে বিপুল বৈপরীত্যের তালিকা মেলে, তাতে তিনি যেমন তাঁদের আঘাত করেছেন ক্রোধে অভিমানে, তেমনি উল্টোদিকে তাঁদেরই আবার বুকে জড়িয়ে ধরেছেন অনেক বড় হৃদয়ের মাপে। বৈপরীত্যের অভ্যন্তরে যে বিশুদ্ধ মানবিকতা ও সহনীয়তা—তার জন্ম এই মানুষটির মধ্যে কোথায়? তাঁর একটা আচরণ যে মেরুতে, সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত আচরণ অন্য মেরুতে। এতে কি তাঁর দুই সত্তার ক্রিয়া চোখে পড়ে না? আসলে আমরা জানি, একজন জাত প্রতিভাধর লেখক দরকার হলে সাংবাদিক হতে পারেন, কিন্তু যিনি আগাগোড়া কেবল সাংবাদিকই, তিনি তাঁর পেশায় সৎ থেকে কোনওদিনই জাত লেখক হতে পারেন না। কথাকার সন্তোষদা ছিলেন একেবারে গভীর রক্তের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়। সাংবাদিকতায় তাঁর যে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি তা এই লেখক সত্তার কারণেই। তাই পেশায় তিনি যে মেরুর, সৃজনে তিনি আর এক প্রান্তের, অন্য মেরুর। আমরা যদি এই লেখক মেরুর মানুষটিতে ধরে তাঁর আচার-আচরণের যৌক্তিকতা বিচার করি, তবে নিশ্চিতই দেখব, তাঁর লেখক সত্তার যে অসহায় যন্ত্রণা, তার অসহনীয় স্বভাব ও অভিমানে, মহাদুর্বলতায় এক এক সময় ক্রোধের উদ্রেকে অন্যদের আহত করেছে বিসদৃশ ব্যবহারে। তা যদি না হত, এত রাগ, অভিমানেও অন্যদের বুকে জড়িয়ে নিতে পারতেন না! যে কোনও কারণে আর লিখতে না পারার যে অন্তর্লীন বেদনা, পরাজয়, তা-ই তাঁকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, নানান চেনা-জানা মানুষ, কাছের সহকর্মীদের সঙ্গেও

বিপরীত বিসদৃশ ব্যবহারে মিথ্যা স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। কিছু পরেই স্বাভাবিক।

সন্তোষদা যখন বুঝতেন তাঁর আচরণের বিসদৃশ দিক, তখনই এক আত্মভোলা শিশুর মত লেখকের স্ব-ক্ষেত্রে ফিরে এসে সুস্থ মানবিক হয়ে উঠতেন। তা 'কিঞ্চিৎ করুণার ভাব' নয়, তা তাঁর অন্তর্গূঢ় লেখক সত্তারই আর এক রূপাবয়ব। এ কোনও সাধারণ মানুষের মত 'স্বেচ্ছাচারী স্বভাবে'র বহিঃপ্রকাশ নয়, এক জাত লেখকের বিশুদ্ধ সত্তার আর এক রূপ। অন্তত দীর্ঘদিন, মাঝে-মধ্যে হলেও, সন্তোষদার সঙ্গে কথায় কথায় তাঁর লেখা সম্পর্কে যখন কোনও এক বা একাধিক প্রশ্ন করেছি, তিনি হাসির মুখোশ পরে বিশুদ্ধ বেদনার মুখ সহজ স্বভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন। সন্তোষদার মধ্যে তাঁর পেশার পদাধিকারে যাকে বলা হয় 'স্বেচ্ছাচারী স্বভাব', বলা হয় সাহিত্যিক সহকর্মীদের 'হেনস্থা' করার 'দাপট', বলা হয় 'ক্ষমতার অপব্যবহার', বলা হয় 'অহংকৃত মনের তৃপ্তি'—তা ভুল, একেবারেই ভুল, আসলে একজন অভিমানী লেখকের গ্লানি, ক্লেদ, সেসব তিনি মনের গভীরে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই তাদের সকলকে পরে পরেই বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছিলেন। সন্তোষদার পরিচিত সহকর্মী, অনুজ লেখক ও অন্যান্যদের একাধিক স্মৃতিচারণে তার অভিজ্ঞান মেলে। আসলে অসামান্য ক্ষমতাবান আবেগবান লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ ও নির্ভীক বিবেকবান সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ একই মনের, প্রাণের মানুষ—মহাপ্রাণ প্রাণিত, কিন্তু স্বভাব প্রকাশে স্বতন্ত্র। তাই তাঁর জীবন স্বভাব বিচার একেবারে জটিল ভিন্ন মাত্রার (Dimension) অপেক্ষা রাখে।

সন্তোষদা সম্পর্কে আমার কথা শেষ হওয়ার মুখে, কিছু প্রসঙ্গ আগে বলা উচিত ছিল, আপাতত এখানেই বলে শেষ করছি। সেটা ছিল চুরাশি সালের ডিসেম্বর মাস, বা তারও আগে হয়তো। মোটকথা পুজোর পর কলকাতায় চাপা শীত। তখনো মৃত্যু ডেকে আনার অসুখটা ওঁকে ধরেনি। জানানও দেয়নি। আমি গেছি পত্রিকার কার্যালয়ে। উনি একা বসে সেই বড় টেবিলটার এক দিকে। দরজা বন্ধ। ঠেলে ফাঁক করে বললাম, 'সন্তোষদা ঢুকব'। 'এসো, কী ব্যাপার বলো তো? মাঝে মাঝে এমন ডুব দাও।' 'আগেভাগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ঢুকেছি কিন্তু'। উনি হাসলেন, উল্টো দিকের চেয়ারে বসলাম। বসতেই বললেন, 'বাসুদেব এসেছিল'। 'কে? চতুর্দোলার?' 'হ্যাঁ, উপন্যাসটা ওকে দিয়েছি। একটা ইনস্টলমেন্ট।' 'ভাল করেছেন। আমি ভীষণভাবে চাইছিলাম। অন্তত এই সূত্রে আপনার একটা বড় লেখা তৈরি হয়ে যাবে।' এড়িয়ে গেলেন প্রসঙ্গটা। 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ওর? ওর তো অনেক প্ল্যান দেখলাম। ও একটা বড় মাপের অনুষ্ঠান করতে চাইছে আমাকে নিয়ে।' 'আমি জানতাম, আপনাকে আগে থেকে বলতে বারণ করেছিল।'

সন্তোষদা হাসলেন, 'মানুষটি বেশ ভাল। পড়াশুনা আছে।' একটু থেমে বললেন, 'ও সুনীলের লেখার কথা বলছিল।' 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়?' 'হ্যাঁ, সুনীল সম্পর্কে অনেক কথা বলল।' সন্তোষদা হঠাৎ বললেন, যা এতদিন আমাকে একবারও বলেননি, 'সুনীলের লেখা তোমার কেমন লাগে বলো তো?'

আমি কিছুটা অপ্রস্তুত, আড়ষ্ট। সন্তোষদা একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললাম, 'সন্তোষদা, সুনীলের লেখার একটা বড় দিক আমাকে ভীষণ টানে। যেমন, যে কোনও গল্প, উপন্যাস, এমনকী প্রবন্ধও, যেখান থেকে হোক একবার পড়তে শুরু করলে তর তর করে পড়াটা শেষ করার আগ্রহ ঘিরে ধরে। ছাড়তে পারা যায় না। হয়তো এটাই বোধহয় রচনার প্রসাদগুণ।' মন দিয়ে শুনছেন সন্তোষদা। 'ও তো মূলত কবি। যে কোনও কথা, যতই তা নিয়ে বিতর্ক হোক, অদ্ভুত নিশ্চিন্তিতে বলে যায়। যা বিশ্বাস করে তা প্রতিষ্ঠা করেই। আর একটা হল, দেখার চোখ একেবারে স্বচ্ছ। জটিলতাকে জটিল রেখেই সহজ করতে জানে বিস্ময়করভাবে। ওর গদ্য তাই ওরই।'

থেমে যেতে সন্তোষদা হাসলেন। 'বাসুদেব অনেক কথা বলেছে, তবে ওর গদ্য নিয়ে কিছুটা আপত্তি আছে দেখলাম।'

বাসুদেব ঠিক কী বলেছে, কীভাবে বলেছে জানি না। সন্তোষদাও ঠিক আর শোনালেন না। নিজে থেকেই এবার নিজের কথা বললেন। 'অবশ্য সুনীলকে তো আমরাই তৈরি করেছি।' কথাটা বলেই থেমে গেলেন। মনে হয় সুনীলের গদ্যে যে সাংবাদিকতার একটা ছায়া আছে সেদিকেই ইঙ্গিত দিলেন।

সেদিন সন্তোষদা অনেক কথা বলেন। ওঁর কাছে তখন মতি নন্দী, সুনীল, শীর্ষেন্দু, দিব্যেন্দু এই চারজনই সে সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাবান লেখক। কথায় কথায় বোঝা গেল, ওদের লেখার নানাদিক থেকে কিছু ছোট ছোট মন্তব্যের মধ্যে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন হাতে কিছু কাগজপত্তর নিয়ে। এবার ব্যস্ততা। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি। 'আমি উঠছি।' 'এসো।' কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'আমার 'করকমলেষু' বেরুচ্ছে। পড়ে বলবে। গদ্যটা কঠিন কিনা জানাবে।'

সন্তোষদার গদ্য নিয়ে অনেকে কঠিন বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'-র গদ্যরীতিরই আর এক ছাঁদ এখানে মেলে। তা আর বলা হয়নি। আসলে বুঝি, একজন জাত প্রতিভাবান কথাকার পরিণত লেখায় বুদ্ধির ওপরেই নির্ভর করেন বেশি। বুদ্ধি মুখ্য, অন্তর্গূঢ় আবেগ সেখানে গৌণ নয় বুদ্ধির বিকাশক শক্তি। অন্তত পরিণতমন সাংবাদিক এক লেখকের কাছে তা তাঁর উত্তরণই।

একটি সাক্ষাৎকার

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল—তাঁর গল্প নিয়ে বেশ কিছু কথা বলার স্থান ও সময়, তাই উনিশশো চুরাশি সালের ২৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর দুটোয় সন্তোষকুমার ঘোষের কর্মক্ষেত্র আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের তিনতলার সেই নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছই। সামান্য কিছু টুকিটাকি কাজের ব্যস্ততা, দু-তিনবার ফোনে কথা বলা—এসব সেরে নিয়ে আমার সঙ্গে আড্ডার মেজাজে বসলেন। যেন অনেক কাজের রুদ্ধশ্বাস চাপ থেকে হাঁপ ছেড়ে চেয়ারে ঠেস দিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। তাঁর কাছে কিছু সময় বসে থাকলেই ক্রমশ যে অনুভূতি, অভিজ্ঞতা হয় একজন তাঁর পরিচিত মানুষের পক্ষে, এখন সেগুলিই গুছিয়ে বলে নিই।

সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা কথাসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, রসিক, আড্ডাবাজ, চঞ্চল। স্বভাবে অকৃত্রিম সহজ, অকপট শোভন মানুষ। অসম্ভব ভাল কথা বলতে পারেন, এবং অনর্গল। সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী, গলার স্বর ভারি মিষ্টি, মায়া-জড়ানো। অবলীলায় কাছে টানতে পারেন মানুষকে। চৌষট্টি বছর বয়সে আমৃত্যু অটুট যৌবনের অধিকারী ছিলেন এই মানুষ। কথায় বুদ্ধির দীপ্তি এবং চমক, আবেগ আর অন্তরঙ্গতায় মিলে-মিশে এই লেখক তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে সমগ্রভাবে সামনে আনেন। তখন সিগারেট প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। মাঝে-মধ্যে পানভর্তি ডিবে খুলে পান মুখে দেওয়াটাই ওঁর প্রায় অভ্যাসের মত নেশা!

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর সময়ের অন্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মত বড় ক্ষমতা পাওয়ার সুযোগে কোনও বানানো লেখক-স্কুল গড়ার পণ্ডশ্রম করেননি, সে মানসিকতাও তাঁর ছিল না। তিনি লেখক হিসেবে নিজেই একটা স্বতন্ত্র 'লেখক-স্কুল' ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় এবং লেখায় কোনও বানানো ব্যাপারই ছিল না। হৃদয় ও বুদ্ধি মিশিয়ে তিনি ছিলেন সদা-সপ্রাণ স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ, লেখক। তাঁর ছিল অক্লান্ত মৌলিক পড়াশুনা। এমন মৌলিক পড়াশুনা ক'জনের আছে? এখনকার অধিকাংশ লেখকই নিজের লেখা ছাড়া আর কারোর লেখা পড়েন বলে মনে হয় না। ছাত্র, অধ্যাপক, পণ্ডিত আর গবেষকদের পড়াশুনা তো তথ্য আর তত্ত্বের কৃত্রিমতা দিয়ে ঢাকা, সন্তোষকুমার ঘোষের পড়াশুনা এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। যা কিছু পড়তেন, সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক ভাবনায় তাকে নিজের করতেন। একেবারে একান্তভাবেই নিজের, এবং তা হয় নতুন সৃষ্টি। আর সেই সৃষ্টির প্রকাশ দেখি আড্ডার কথাবার্তার মধ্যেও। আড্ডায় সন্তোষকুমার ঘোষ নিজেই ঈশ্বর। সুরসিক এই লেখক যখন কথা বলতেন কোনও কিছু রেখে-ঢেকে বলতেন না। কথা বলতেই তিনি যেন এক

আত্মভোলা মানুষ। বলার মধ্যে-মধ্যে হঠাৎ সচেতন হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'কী, বোর করছি না তো?' পরমুহূর্তে একটু থেমে, যেন বা দম নিয়ে, আবার আমাদের চমকে দিয়ে নতুন নতুন কথা শোনাতেন। কোনও বিশেষ প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্য প্রসঙ্গে অনেক দূর চলে যেতেন। তারপর হঠাৎ সেই আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা ঘটে এবং অবলীলায়। স্মৃতি ছিল এত সপ্রতিভ, উন্মুখ, যে আগের প্রসঙ্গ কাউকে ধরিয়ে দিতে হত না। এই হল গল্পকার আর বৈঠকী আড্ডাবাজ সন্তোষকুমার ঘোষের চরিত্র-ব্যক্তিত্ব।

সেদিন সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে এসবের অনাবিল উন্মুক্ত পরিচয় পেয়েছি তাঁর দীর্ঘ সময়ের সান্নিধ্যে। মানুষটি হঠাৎ কখনো রেগে গেলে ভীত হই। রেগে গেলে উনি অকপটে তা প্রকাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর শক্তি, রাগের পরেই আবার শান্ত হতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে, যেন সেই মানুষই নন। প্রতিপক্ষকে বুকে টেনে নিতে পারেন নির্মল নীল আকাশের স্বভাবে। আমি তাই ভয়ে ভয়েই সেই সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করি। কিছু বলার আগে পানের ডিবেতে হাত দিলেন। অন্য কথা মনে পড়ে যায়। পান খাওয়ার আগে কলিং বেল টিপে বেয়ারা ডেকে চায়ের অর্ডার দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিলেন, যেন আমাদের কথা বলার মধ্যে কেউ এসে ভেতরে না ঢোকে।

আমি আর দেরি না করে আমার কথা বলতে শুরু করি।

প্রশ্ন : সন্তোষদা, আপনার লেখকজীবনের একেবারে শুরুর কথাটা একটু বলুন। শুরু মানে সদ্য কিছু লিখে যে শুরু—সেই কথাটা।

উত্তর : দেখো, প্রথম কিন্তু গল্প নয়, পদ্য দিয়েই শুরু করি। তখন অল্প বয়স, ছাত্রজীবন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' পড়েছি, সুভাষের (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) কবিতারও আমি পাঠক। আমি তো তখন কবিতা লিখছি, কিন্তু বুঝতে পারছি আমার কবিতা ঠিক আমার মত হচ্ছে না। আর অন্য কবিতা পড়েও একটা অতৃপ্তি থেকেই যাচ্ছে।

প্রশ্ন : সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তো আপনাকে ধরে রাখত।

উত্তর : ভীষণ, আমার লেখা তখন অনেকটাই রাবীন্দ্রিক। অবশ্য এ সময়ে আমি কিছুটা বামপন্থীও ছিলাম।

প্রশ্ন : গল্পে এলেন কী করে? আপনার প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম মনে পড়ে?

উত্তর : বলছি, কবিতা লিখতে থাকার মধ্যে একটা অতৃপ্তি গল্পের দিকে ঠেলে দেয়। তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর তৃতীয় খণ্ড পড়ার পরও অতৃপ্তি থেকে গেছে। এক সময়ে গল্প লিখতে বসি। প্রথম দিককার গল্প কিন্তু আমার সাধু ভাষায় লেখা। তখনকার 'নবশক্তি' পত্রিকায় বেরতে থাকে। সে সব গল্প লেখার ব্যাপারটা কিন্তু প্রায় 'ভগ্নাংশ' গল্প সংকলন বেরবার আগের। তারাশংকরের 'ছলনাময়ী' পড়ার পর কিছুটা প্রভাবিত হয়েই সাধু ভাষায় যে গল্প লিখি, তার নাম 'বিলাতী ডাক'। যতদূর মনে পড়ছে ১৯৩৭ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কোনও একটি সংখ্যায়। এটাই আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প।

প্রশ্ন : আপনি যখন লিখতে শুরু করেন, তখনকার আপনার কাছাকাছি কোন কোন লেখকের কথা মনে পড়ে?

উত্তর : আনন্দবাজার পত্রিকার পুজোসংখ্যায় আমার গল্প বেরয় সাধু ভাষায় 'শীত ও বসন্ত'। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র তখন জীবিত। আমার যে সংখ্যায় গল্প বেরয়, তাতেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রেরও গল্প ছিল। এঁরা আমার কাছাকাছি সময়ের লেখক।

প্রশ্ন : সাধু ভাষায় আরও কতদিন গল্প লেখেন?

উত্তর : বেশিদিন এমন গদ্যে লিখিনি যদিও, তবে বেশ কয়েকটা গল্প লিখেছি তখনকার কেশরী, স্বদেশ এমন সব পত্রিকাতেও। মনে পড়ছে এখনি, 'ক্ষণনীড়' নামের একটা গল্প সাধু গদ্যে লিখেছিলাম, এর পরের বেশ কিছু গল্পও সাধু গদ্যে ছিল।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম গল্পের বই যৌথ সংকলনে তো জানলাম 'ভগ্নাংশ'। কবে বেরয়?

উত্তর : ১৯৩৯ সালে। বন্ধু জগৎ দাশের সহযোগে প্রকাশিত। জগৎ দাশ সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি বীরেন। তখন আমার কাছে সবচেয়ে আধুনিক মনের মানুষ ছিল জগৎ দাশ। গল্প লিখলেও আমি যে চলতি বাংলায় লেখা শুরু করি, তা কিন্তু জগৎ দাশের প্রভাবেই। যখন আমি চলতি বাংলায় লেখা শুরু করি, তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' বেরিয়েছে, ছাপা হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী' উপন্যাস।

প্রশ্ন : 'ভগ্নাংশ' সম্পর্কে আপনার কোনও বিশেষ ভাবনা বা দুর্বলতা আছে বলে মনে হচ্ছে?

উত্তর : হয়তো। একটু বিস্তারিত করে বলি, কী বলো? আমি তখন ৩য় বর্ষের ছাত্র। 'পূর্বাশা'য় চলতি গদ্যে লিখলাম 'দক্ষিণের বারান্দা'। এখানেই আমার লেখায় আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ বলতে পারো। এই সময়েই পূর্বাশাকে কেন্দ্র করে আসেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, কবি হিসেবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন সদ্য আবির্ভূত। (একটু থেমে) এবারে 'ভগ্নাংশ' সম্পর্কে বলি। ভগ্নাংশ জগৎ দাশের ছাপানো, কভারের শিল্পী আমি নিজেই। আমার মনে পড়ছে তখনকার 'প্রগতি' পত্রিকায় এর আলোচনা বেরয়। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও তখন সমালোচনা করেন স্টেটসম্যানে। সে সব প্রশংসা আমার উৎসাহ, প্রেরণা ছিল তখন।

প্রশ্ন : ভগ্নাংশ প্রকাশের পর থেকেই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল পড়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে তীব্রভাবে আপনাকে নাড়া দিয়েছে, তা বুঝি পরের গ্রন্থ পড়ে, মাঝে 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস ইত্যাদি থেকেও। এই সময়কে কি আপনার লেখক-জীবনের একটা পর্ব বলা যায় না?

উত্তর : তা জানি না, তবে ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৩ সম্ভবত—আমি 'ভগ্নাংশ' থেকে সরে আসি। ১৯৫২-৫৩-এর মধ্যে বেরল 'মহাবীর দীপজ্যোতি' প্রকাশনীর আমার 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র সংকলন। সে সময়ে শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকাতেও আমার গল্প বেরল। একটা কথা কী জানো বীরেন, আমি মনে করি সব লেখাই মূলত আত্মজৈবনিক। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই। আর সেই অর্থে 'কিনু গোয়ালার গলি' নয়, 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসটিই সার্থক। এ উপন্যাসে আমার বাল্য, কৈশোর নানাভাবে ফিরে ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন : আত্মজৈবনিক যখন বলছেন, তখন আপনি তো পরিপার্শ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একজন লেখক নন। তা হলে এই সময়ের অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে আপনার মানসিকতার সম্পর্ক বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাটিয়ে এসে আমি কিন্তু বদলাচ্ছি। 'ভগ্নাংশ' থেকে সরে এসেছি অনেক। এ সময়ে আমি হয়েছি কবি বুদ্ধদেব বসুর খুব ভক্ত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছি প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

প্রশ্ন : প্রভাবের বিষয়টা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

উত্তর : মনে করিয়ে দি বীরেন, প্রথমেই আমার গল্পে কিন্তু রবীন্দ্র প্রভাব বলতে কিছু নেই। তোমরা সকলেই জানো, আমি ভীষণভাবে রবীন্দ্রনাথ পড়ি! রবীন্দ্রনাথকে মনে রাখি। কিন্তু আমার কথা--রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, কিন্তু অনুরাগে আপত্তি কি? রবীন্দ্রনাথ এখন থাক, যে কথা শুনতে চাইছ সেটা প্রভাবের কথা তো? দেখো, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে আমি দেখেছি অসামান্য সংক্ষিপ্তি, ব্যঞ্জনা, মায়াময় মোহমুগ্ধ দিক, মানিকের আছে রূঢ় বাস্তবতার ভাবনা, আর তারাশংকরের আছে বিস্তার, বিশালতা। এঁদের এমন মানসিকতার স্পর্শে আমার লেখা মনঘেঁষা হতে থাকে।

প্রশ্ন : যাঁদের কথা বললেন, তাঁরা আপনার অগ্রজ, প্রতিষ্ঠিত, খ্যাতকীর্তি লেখক সে সময়ে। আপনার সমকালের সমবয়সী বা কাছাকাছি বয়সের লেখকদের সঙ্গে যোগের কথাটা একটু বলুন।

উত্তর : আগেই নাম করেছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের। এ সময়ে ননী ভৌমিক এসেছেন গল্পে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে দেখেছি জীবনের বৃত্তপরিধি বিস্তীর্ণ নয়, আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন-পরিধি বিস্তীর্ণ, কিন্তু লেখা প্রাণবন্ত নয়। মনে পড়ছে, তখন নারায়ণবাবুর 'গন্ধরাজ' গল্প খুব খ্যাতি পায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও তখন সামনে আছেন। যাঁদের কথা এখন বললাম বীরেন, এঁদের একটু পরেই আসেন বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ, সমরেশ বসু।

প্রশ্ন : এদেশীয় লেখকদের মত বিদেশি লেখকদের কিছু প্রভাবও নিশ্চয় আপনার আগের লেখার মধ্যে আছে। এখন আপনার মনের দিক থেকে খুব কাছের বিদেশি লেখক কারা?

উত্তর : হ্যাঁ আছে। অনেক লেখকের লেখাই আমি পড়ি, পড়েছিও। তবে আগে লরেন্স আর মম্ আমাকে সবচেয়ে বেশি টানত। এই দুজন আমার খুবই প্রিয় ছিলেন, 'দ্বিধা' নামের আমার গল্প পড়ে দেখো, এতে 'মম্'-এর 'ফ্রোটসাম ডেক্‌সাম' গল্পের প্রভাব থেকে গেছে। আর আমার প্রিয় বিদেশি লেখকদের মধ্যে তিনটি নাম লেখো–সার্তর, কামু, হাকস্‌লে। আরও অনেকের লেখা আমি পড়ি, ভালও লাগে।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে যা লিখেছেন, দেখেছি–সব লেখাতেই শহর আছে, গ্রাম অনুপস্থিত–আপনার লেখা কী গল্প, কী উপন্যাস দু'য়ের মধ্যেই। এর কারণটা যদি একটু বলেন।

উত্তর : প্রধান বিষয় গ্রাম নিয়ে তেমন কিছু লিখিনি, যদিও আমি গ্রামের মানুষ, গ্রামেই আমার জন্ম, তবু আমাকে শহর বেশি টানে। আমার লেখায় তখন শহরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন প্রধান হয়ে দেখা দেয়। প্রত্যক্ষভাবে কথাটা বাদ দাও, স্বপ্নে বা প্রতিভাসে নানাভাবে আমার কোনও কোনও লেখায় গ্রাম ফিরে এসেছে। যেমন ধরো, আমার 'ভেবেছিলাম' গল্প। এটা পড়লে আমার এ কথার প্রমাণ পাবে। 'মোমেব পুতুল' উপন্যাস—যেটা পরে ১৯৭৩-এ এসে 'সুধার শহর' নামে বেরিয়েছে, এর মধ্যেও তার কিছু প্রমাণ পাবে।

প্রশ্ন : আপনার কথা শুনে বোঝা যায়, কলকাতা-দিল্লি আবার ফিরে কলকাতা—এইভাবে কর্মজীবনের অস্থিরতার মধ্যে আপনার লেখার মনও অস্থির থেকেছে। কথাটা এভাবে বললে কি ভুল হবে?

উত্তর : কথাটা তোমার এক অর্থে ঠিকই। গ্রামের কথা বাদ দিলে লেখক হওয়ার প্রথম জীবন আমার কাটে এই শহরেই—কলকাতায়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত কলকাতায় কাটাই। এরপর চলে যেতে হয় দিল্লিতে। সেখানে ১৯৫৯ পর্যন্ত আমাকে থাকতে হয়। এই দিল্লি-প্রবাস আমার তিরিশ থেকে সাঁইতিরিশ বছর বয়সের মধ্যে। এই সময় কিন্তু আমি চার-পাঁচটির বেশি গল্প লিখিনি, (একটু কী ভেবে) হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে বলি, আমার জনপ্রিয়তা, তুমি যে কথাটা আগে 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রসঙ্গে বার বার বলেছ বীরেন, তার সমাপ্তি এই সময়েই, ধরো ১৯৫৮-তেই। 'মুখের রেখা' বেরল ১৯৫৯-এ। এখান থেকে আমি বদলাতে শুরু করি লেখায়, আর যে সময়ে আমি খুবই কম গল্প লিখছি, সেই সময়টার শেষ 'ঠাকুরমার ঝুলি' গল্প দিয়েই। এখানেই আগের--তোমার কথার আর একটু উত্তর দি, 'মুখের রেখা'তেই কিছু ফ্ল্যাশব্যাকে গ্রাম জীবন আছে, এসেছে নিজের জীবনও।

প্রশ্ন : আপনার লেখা হঠাৎ কমে যাওয়া ব্যাপারটায় আমার কিন্তু খুব অবাক লাগে সন্তোষদা, সাংবাদিকতাকে ঘনিষ্ঠভাবে নেওয়ার ব্যাপারটাই কি এর একটা কারণ?

উত্তর : (প্রবলভাবে মাথা নাড়ে) তোমার হয়তো মনে হতে পারে, কিন্তু ১৯৫৯ সাল থেকে যে আমার লেখা ক্রমশ কমতে থাকে, তার অন্য কারণ আছে। (একটু থামেন) নানা কারণে লেখার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত sensitive হয়ে পড়ি, এটাই বড় কারণ। (প্রসঙ্গ থেকে দ্রুত সরে যান) লেখা কমলেও আমার 'জল দাও'-এর মত উপন্যাসও তো লেখা হয়ে যায় বীরেন। তাছাড়া, 'রেণু, তোমার মন' গল্পটা পড়েছ তো? এই গল্পে আমি আগাগোড়া সেকেন্ড পার্সনে গল্পটা বলেছি। এখানে গল্পের থেকে ফর্মটাই বড়। এই গল্পের আগে কেউ এভাবে গল্প বলেননি।

প্রশ্ন : এটা বুঝি, আপনি লেখায় সব সময় একটা অস্থিরতায় থাকতেন, সব সময় বদলাতে চান। পুরনো কথা, বা একবার বলে দেওয়া কথা দ্বিতীয়বার বলতে চান না! আমি কি ভুল বললাম?

উত্তর : (হাসতে হাসতে) ঠিকই বলেছ, জীবনটা খুব ছোট তো, এমন ছোট জীবনে আমি যা কিছু লিখতে চাই, তাতে নতুন কথা বলার চেষ্টা করি সব সময়েই। (একটু

থেমে) দেখো, কীভাবে বাঁচতে হয়, শিখতে শিখতে একটা জীবন কেটে যায়, আর লেখার বিষয়টা আরম্ভ হলে আর একটা জীবন তখন পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : আপনার 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' তো পুরস্কার পায়। আমার মনে হয় এই একটিমাত্র উপন্যাস যা একালের এক সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত, মননধর্মী উপন্যাস ; কিন্তু এই উপন্যাসের পরের অংশ আপনি লিখবেন বলেছিলেন—

উত্তর : (আমার কথা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে) কেন, 'চতুর্দোলা'য় তো ছাপা হচ্ছে, দেখেছ! ওটাই। বলো তো, বোধ হয় একটু স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, না? গদ্যটা সাধারণ পাঠক নিতে পারবে? বোধ হয় নিতে পারছে না।

প্রশ্ন : না, না, তা নয়। সামান্য দু'টো ইনস্টলমেন্ট পড়ে বোঝা যাবে না। আপনি ওটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন তো!

উত্তর : কী জানি, শেষ করতে পারব কি না। তাছাড়া এমন একটা পত্রিকা, দেখো না এত দিনেও পরের সংখ্যা বেরল না!

প্রশ্ন : সন্তোষদা, আপনি নিজেই যখন গদ্যের প্রসঙ্গ তুললেন, তখন সেই প্রসঙ্গই ধরি। আপনার গদ্যে, এতদিন ধরে দেখছি, আপনি কিন্তু ভীষণভাবে বদলেছেন ক্রমশ। ধরুন, 'কিনু গোয়ালার গলি' বা ঐ সময়ের আগে বা কিছু পরে যে সব গদ্য লিখেছেন, ষাটের দশকের লেখায় সেই গদ্য আর পাই না। গদ্য অনেক বদলে গিয়ে অন্য এক বুদ্ধিদীপ্ত স্মার্টনেসকে সামনে ধরে। এর কারণ কী মনে করেন?

উত্তর : আমার গদ্যে ইংরিজির প্রভাব আছে, সেই সঙ্গে সংস্কৃতেরও। আসলে ইংরিজিতে দখল আর সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়—এই দুই মিলে আমার গদ্যের এমন স্মার্টনেস বাঁচিয়ে রাখবে হয়তো।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম দিকের লেখায় কোথাও কখনো সামান্য কিছু ঘটনা থাকলেও আপনি কিন্তু গল্পে বা উপন্যাসে ক্রমশ ঘটনাকে একেবারে বাদ দিতে চেয়েছেন। কারণটা একটু বলবেন?

উত্তর : ঘটনা তৈরির ব্যাপারে আমার উদ্ভাবনা শক্তি খুবই দুর্বল বলে আমি মনে করি। তাছাড়া, প্রথমত, গল্পে ঘটনাকে ততটা অপরিহার্য বলে মনে করি না। দ্বিতীয় কথা হল, বক্তব্যের পক্ষে যতটা দরকার, ঘটনার দিক থেকে ততটাই গল্পে থাকবে। তৃতীয়, প্রধানত লেখা বুদ্ধির ওপর দাঁড়ানোর ফলে ঘটনা কমে গেছে। বিশেষ করে নরেন মিত্রের মত অস্থিরতা ছিল বলেই ঘটনা কমেছে।

প্রশ্ন : আপনার সময়ের, আপনার আগে কল্লোলের কালের আর পরের সময়ের লেখকদের প্রায় সকলেই প্রেমকে প্রধান বিষয় করে একাধিক গল্প লিখেছেন। আপনার 'স্বয়ম্বরা' গল্প মনে রেখেই বলি, আপনিই কিন্তু একমাত্র লেখক যিনি কখনোই সোজা, সহজ প্রেমের গল্প লেখেননি। কেন?

উত্তর : হয়তো আমার প্রেম সম্পর্কে একটা সিনিক ভাবনা ভেতরে কাজ করে। প্রেমের কথায় বিদ্রূপ, অবিশ্বাসের ব্যাপারটাই লেখার সময় ঠেলে ওঠে। (একটু থেমে)

'স্বয়ম্বরা' প্রথম দিকে লেখা, কিছুটা প্রেমের গল্প ; 'রজ্জু' গল্পে straight প্রেম কম, রাজনীতি আছে। সহজ সরল প্রেমের বিষয়কে নেওয়ায় ম্যাচিওরিটি বাধা দেয়।

প্রশ্ন : আপনার লেখায় ক্রমশ দেখছি, সমাজ-ব্যক্তিত্বের থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই বড় হয়ে উঠছে!

উত্তর : ঠিকই। আমি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওপরেই বেশি জোর দিই। তাতে সমাজ যতটুকু উঠে আসে, ততটুকু আমার লেখায় সত্য হয়ে থেকে যায়।

প্রশ্ন : যখন লেখার কথা ভাবেন, বা লিখতে বসেন, সেই বিশেষ সময়টা আপনাকে কীভাবে নাড়া দেয়?

উত্তর : আমার গল্প তো অনেক পড়েছ, দেখো, আমার সব গল্পেই সময়-ভাবনা নানাদিক থেকে আছে।

প্রশ্ন : সত্যিকারের রবীন্দ্র-পাঠক, বা বলা ভাল, রবীন্দ্র-সাহিত্যমনস্ক হিসেবে আপনি আজকের বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রায় এক প্রবাদ-পুরুষ হতে চলেছেন। আপনার লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ কতটুকু?

উত্তর : এর একটিই উত্তর বীরেন, আমার কোনও 'ক্রিয়েটিভ' লেখায় রবীন্দ্র প্রভাব নেই।

প্রশ্ন : আপনার ব্যক্তিগত রাজনীতি-ভাবনা নিয়ে আমি কোনও প্রশ্ন রাখছি না, তবে আপনার লেখায় আদৌ তা আছে কি? থাকলে রাজনীতি কতটা থেকে গেছে?

উত্তর : রাজনীতি নিয়ে এখন বেশি কথা না বলাই ভাল। তবে আমি মনে করি, বাংলা কথাসাহিত্যে ডিরেক্ট রাজনীতির বক্তব্য কমই। তা সত্ত্বেও আমার লেখার প্রসঙ্গে এটুকু বলতে পারি, আমার 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে ভাবনা আছে। অংশত রাজনীতি আছে, 'সময়, আমার সময়' উপন্যাসেও। আর একটা কথা, লেখার ব্যাপারে আমি মনে করি, লেখার লক্ষ্য হবে একদিকে মানসিক, আর একদিকে মানবিক—বিষয়ের তারতম্য যাই থাক।

প্রশ্ন : হাল আমলের কথাকারদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : হাতে পেলে আমি সকলের লেখাই পড়ি। অনেকের লেখাই খুব ভাল লাগে। সুনীল (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), শীর্ষেন্দু (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়), দিব্যেন্দুর (দিব্যেন্দু পালিত) লেখার আমি নিয়মিত পাঠক। এরা এ সময়ের উল্লেখযোগ্য লেখক। আর তোমার লেখা তো প্রায় সবই পড়েছি। তোমার লেখা আমার খুবই প্রিয়, অনেক ম্যাচিওর। তোমার 'শান্তিপর্ব' গল্পটির প্রতিটি লাইন ধরে ধরে পড়েছি। ভীষণ টেনে রেখেছিল আমাকে। তোমার একটা শ্রেষ্ঠ গল্প কিন্তু। ওটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা তোমায় বলতে পারতাম। (একটু ভেবে) একবার আনন্দর (আনন্দ বাগচী) সঙ্গে তুমি আমার এখানে এসেছিলে। তখন কিছু কথা বলেছিলাম না?

প্রশ্ন : সেসব কথা এখন থাক, এখনকার গল্প সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী—একটু বলুন।

উত্তর : একটাই কথা—গল্পকে গল্পের কাছে ফিরতে হবে।

প্রশ্ন : সন্তোষদা, আপনার 'স্বয়ম্বরা'-কে নিশ্চয়ই খুব ভাল প্রেমের গল্প বলে মনে করি। কিন্তু কত আগের লেখা 'কানাকড়ি' আজও পাঠকদের রীতিমত চমকে দেয়। এ গল্প কিন্তু গল্পকার হিসেবে আপনার লেখার একটা মাইলস্টোন। গল্পটা রচনার পিছনের কথা কিছু মনে পড়ে?

উত্তর : (হাসলেন সন্তোষদা, এবার একটা পান ডিবে থেকে বের করে মুখে দিলেন) মনে পড়ে। আমরা তখন কলকাতার একটা গলির ভাড়াটে। সেই বাসাবাড়ির পাশেই একটু ফাঁকা জায়গার ওপাশের ফ্ল্যাটে একটি বউ থাকত। রাতে বউটির স্বামী ওকে ভীষণ মারধোর করত বোধ হয়, প্রায় বেশির ভাগ দিনই চিৎকার, কান্না শুনতে পেতাম গভীর রাতে। আমার খুব খারাপ লাগত। মেয়েটির প্রতি একটা গোপন মমতা তৈরি হতে থাকে ক্রমশ। কিন্তু দিনের বেলা ওকে দেখে আমি অবাক হতাম। কেমন সুন্দর সেজেগুজে জানলায় বসে থাকত। আবার প্রায়ই পাউডার-স্নো মেখে ফিটফাট হয়ে বাইরে কোথায় যেত। (একটু থেমে) ওর কথা ভেবেই 'কানাকড়ি'র সাবিত্রীকে এঁকেছি। চরিত্রটা আমার খুবই চেনা। একে নরেন মিত্রও চিনত, পরে একটা গল্প লেখে। তখনকার 'অচলপত্রে' 'মিস রুচি রায়' নামে একটা লেখাও যেন বেরয়, মনে পড়ছে। (আবার ঈষৎ অন্যমনস্ক) মজার কথা কী জানো বীরেন, সেই মেয়েটি আমার আর নরেনের--দুটি লেখাই কিন্তু পড়ে। তার কথা, আমার লেখাতেই নাকি তার ছবি একেবারে ঠিক, নরেনের হয়নি। যাক সে কথা, তবে মেয়েটি এত বছর পরেও আমাকে মনে রেখেছে। একদিন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছেলের একটা চাকরির ব্যবস্থা যদি করে দি (পিকদানি বের করে পানের পিক ফেললেন)।

প্রশ্ন : সন্তোষদা, প্রায় আড়াই ঘণ্টা হয়ে গেল, আপনার কাছ থেকে সময় নিয়েছি। এবার আমার শেষ প্রশ্ন রাখি। একেবারে হাল আমলের গল্পে, যেমন 'তীর্থের কাক' ইত্যাদিতে দেখেছি, আপনি অনেক সহজ হচ্ছেন আপনার গদ্যভঙ্গিতে, আর বিষয়েও! কেন?

উত্তর : দেখো বীরেন, আমার গল্প লেখার মধ্যসময়ের ব্যাপারটা তুমি তো জানোই। দেখেছ তো, তখন আমি নানাভাবে নানাদিক থেকে আমার গল্পে পরীক্ষা করে গেছি। এখন কিন্তু একটা কথা স্থির জেনেছি, বিশ্বাসও করি, রিয়্যালিটিকে বাদ দিয়ে, মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে, শুধু মনন দিয়ে সার্থক গল্প কেন, কোনও ভাল গল্পই লেখা হয় না। এই বিশ্বাস নিয়েই এখনকার গল্প লিখতে বসেছি। দেখি কী হয়।

প্রশ্ন : আর আমার কোনও কথা নেই। আমি শুধু অবাক হচ্ছি সন্তোষদা, আপনি আমাকে এভাবে এতটা সময় যে দেবেন, ভাবতেই পারিনি।

উত্তর : ও কথা থাক। শোনো, এর পর তুমি যে বড় প্রবন্ধটা লিখছ আমার সমস্ত গল্প নিয়ে, ওটা বাসুদেব বাবুর (বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, 'চতুর্দোলা'র সম্পাদক) কাছে পাঠাবার আগে আমাকে একবার দেখাবে। আমি কিছু বাদ দিতে বলব না, শুধু একবার পড়ে নেব। কী? দেখাবে তো? আর হ্যাঁ, 'স্বরলিপি' থেকে আমার 'গল্প-সমগ্র'-এর তৃতীয় খণ্ডটা নিয়ে নিও।

দেখাব বলে এসেছিলাম, কিন্তু দেখানো হয়নি। সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের ওপরে দীর্ঘ লেখাটি লেখার পর কপি করে পাঠাবার সময় ইচ্ছে করে তাঁকে দেখাইনি। একথা পরে দেখা করে বলেছিলাম। বলি, 'সন্তোষদা, লেখাটা ছাপা অবস্থায় প্রথম পড়ার চমকটার জন্যেই পড়ালাম না; রচনার নামটাও কী দিয়েছি তা বলছি না।' উনি হাসলেন, শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, পত্রিকা তো তাড়াতাড়ি বেরবেই, তা হলে বেরলেই পড়ব।'

সে পত্রিকা নানা কারণে আজও বেরয়নি। আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার কয়েক মাস পরেই সন্তোষকুমার ঘোষ হঠাৎ বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি হন গলার চিকিৎসার জন্য। বেলভিউ থেকে মুম্বই-এর 'ব্রিচক্যান্ডি' হাসপাতালে। এই ঘটনার আগেও বেশ কয়েকবার দেখা হয় ওঁর সঙ্গে। তার মধ্যে উনি নিউ আলিপুর থেকে আবাস বদল করেন নিজের কেনা ফ্ল্যাট 'বিধান ভবন'-এ। আমার সঙ্গে যতবার দেখা হয়, ততবারই উনি 'চতুর্দোলা'য় আমার লেখাটি পড়ার জন্য ভয়ংকর রকম উৎসুক, আগ্রহী থাকেন।

শেষ 'বেলভিউ'-এ থাকার দিনগুলিতে বার বার আমাকে খবর পাঠাতেন লেখাটা ওঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিন্তু পত্রিকা তখনো বেরয়নি। আমি নিজে যোগাযোগ করে, আমার দীর্ঘ লেখাটির ছাপানো ফাইল কপি জোগাড় করে ভয়ে ভয়ে একদিন বেলভিউ যাই সন্ধেয়। তারিখটা ১৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। ওঁর সুইটে ঢুকে দেখি উনি ঘুমোচ্ছেন। আমি ওঁর সেবায় নিযুক্ত সিস্টারকে ডাকতে বারণ করে সামনের কোচে একটি চিঠি লিখতে বসি। চিঠিটি লেখা প্রায় শেষ, উনি হঠাৎ সামান্য কাশতে কাশতে উঠে বসেন। আমার লেখা বন্ধ। উনি আমার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত। চোখ অনেক বিবর্ণ। শীর্ণ হয়ে গেছেন কত! একটু পরেই একটা বিষণ্ণ হাসি ঠোঁটে ভেসে ওঠে। এবার চিনতে পারি ওঁকে। সঙ্গে সঙ্গে কাছে এগিয়ে যাই। উনি যাতে কথা না বলেন, তাই ফাইল কপি ও চিঠিটা হাতে দিয়ে আমি আমার সমস্ত কথাই একটানা বলে যাই। উনি সিস্টারকে বলেন চশমাটা দিতে। আলো জ্বেলে দেন সিস্টার। উনি কোনও কথা না বলে পড়তে থাকেন চিঠিটা। পরে মুখ তুলে কথা বলতে থাকেন। স্বর তখন অনেকটা এসেছে গলার।

কিছু কথা বলার পর উনি আমায় পরের বৃহস্পতিবার ২১ ফেব্রুয়ারি যেতে বলেন। পত্রিকা তখনো না বেরনোর কিছুটা বিরক্ত হয়তো। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চলে আসতে চাইছিলাম। উনি স্থির তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। নির্দিষ্ট তারিখে আবার যাই। সেদিনই প্রথম বোধ হয় মাস্ক পরে দেখা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। গলায় বেশ ভাল স্বর এসেছে সন্তোষদার। সামান্য সময়ের বিচিত্র কয়েকটি কথায় উনি শুধু জানালেন, 'তোমার লেখা পড়েছি। তিন-চারটে ভাল গল্পের উল্লেখ নেই কেন? আমার "সমগ্র গল্পে" কি সেগুলি নেই?' আমি বললাম, 'না'। 'বেশ, আমি রোববার বাড়ি চলে যাচ্ছি, তুমি বরং সোমবার নয়, মঙ্গলবার আমার ওখানে এসো, অনেক কথা হবে।'

আমি কথামত ঠিক মঙ্গলবারই ওঁর কাছে গেছি সন্ধেয়।

ওঁর বাড়িতে নয়, দক্ষিণের কেওড়াতলার অন্তর্জলী ক্ষেত্রে।

ছোটগল্পে তিন তরঙ্গ

১.

সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের, অর্থাৎ উনিশশো উনচল্লিশের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর। তারপর থেকে টানা দীর্ঘ ছ'টি বছর এমন যুদ্ধ ভারত তথা বাংলাদেশের মাটি কাঁপায়, বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে যেনবা সমস্ত ঘরের দরজা জানলা সশব্দে সদম্ভে উত্তাল করে নিজের সশরীর উপস্থিতির জানান দেয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে ক্লিষ্ট, জর্জরিত, রুদ্ধশ্বাস ভারত তখন এক চিহ্নিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। যুদ্ধে লিপ্ত অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেন ভারতকেও যুদ্ধে টেনে নেয়। এমন নেওয়ার স্বার্থ ছিল নানা দিক থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রতীচ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। এই যুদ্ধ তারই এক প্রসারিত, কালো, বুভুক্ষু, সর্বগ্রাসী ডান হাত।

এই সময়ে একদিকে দেশীয় নানান রাজনৈতিক আন্দোলন, নতুন গড়ে ওঠা সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের সমূহ তৎপরতা, আন্তর্জাতিক নীতিনির্দেশ, অন্যদিকে যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের তটস্থ রূপ। যে যুদ্ধ ছিল ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব, সেই যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া নেমে পড়ায় যুদ্ধের গতিমুখ ফেরে। এক জটিল স্নায়ুতন্ত্রের 'ক্রস-কারেন্ট' তৈরি হয় এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে। সাধারণ মানুষ অস্থির, শঙ্কিত, কখনো বা বিভ্রান্ত, বুদ্ধিজীবী ও ভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কারোর আন্দোলনের তীব্রতা, কারোর অস্বস্তি, অসহায়তা।

এসবের মধ্যেই সে সময়ের শাসকরা নিজেদের যুদ্ধের প্রবল শক্তির কাছে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে সমস্ত রকম কৌশলে ভারত তথা বাংলাদেশ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে থাকে। কৃষক শ্রমিক শোষিত হয়, মধ্যবিত্ত মানুষের অসহায়তা ও সমাজরূপের ভাঙন এক অভূতপূর্ব অবক্ষয়কে তুলে ধরে। একদিকে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনী, আর একদিকে ক্রমশ নামতে নামতে আশ্রয়হীন পথে বসা মানুষ—দু'য়ের মাঝখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আত্মস্বার্থ সিদ্ধ করে।

আসে মন্বন্তর। বাংলাদেশ সেই মন্বন্তরে আক্রান্ত এক পঙ্গু বিকলাঙ্গ মূর্তি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার প্রত্যক্ষত নেমে পড়ায় যুদ্ধ রূপ পায় 'জনযুদ্ধে'! গান্ধীজির 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে রাজনীতির স্বদেশী রূপ আসে 'Culminating point'-এ, আসে নিয়তির নির্দেশের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর বৃটিশ প্রভুদের সৃষ্ট কৃত্রিম, স্বার্থ নির্দেশিত মন্বন্তর। এসবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছিল সহজ ললাট-লিখন।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশের সেপ্টেম্বরেই আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শেষ ঘোষিত হয়। কিন্তু

তারপর। এই যুদ্ধ থেকেই রাজনীতির দাবা খেলার চাল যে ভাবে চলে, তাতে একে একে আসে মানবতার মাথা-নীচু-করা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছেচল্লিশ সালে, সাতচল্লিশে আসে ভারতের পক্ষে লিখিত স্বাধীনতা, দেশবিভাজন, বাস্তুহারাদের তৎকালীন পাকিস্তান ত্যাগ করে এদেশে অগণন আগমন।

বিশ শতকের গোটা চারের দশকটি এইভাবেই এমন রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। যে আগুন জ্বালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বলা ভাল, দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে আগুন নিয়ে ভয়ংকর খেলায় মাতে, সেই আগুনেই এই বাংলাদেশে একে একে পুড়ে যায় মানুষে মানুষে সম্পর্কের মূল্য, সমস্ত রকম সামাজিক ন্যায়-নীতিবোধ, হিন্দু-মুসলমানের এতদিনের সম্পর্ক, মানুষের সহজভাবে বাঁচার সমস্ত রকম রসদ, কৃষক-মজুরদের পায়ের নীচেকার মাটি।

এ এক অগ্নিপরীক্ষার কাল। শিবের তপস্যার মধ্যে যে নেত্রের রোষ-বহ্নিতে পৃথিবী ধ্বংসের আয়োজন, এই সময় বুঝিবা তারই মত ভয়ংকর। এমন অস্থিত কালে জাতীয় সংস্কৃতি সাহিত্যিক পরিবেশে ভাঙচুর হতে বাধ্য। এমন কালে সৃজনশীল রচনাও বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে, বরং বলা ভাল, চারের দশকের সমগ্র অংশেই সাহিত্যের সৃষ্টিভাণ্ডার তেমন উদ্দীপিত হবার মত নয়। গতানুগতিক লেখককুল ছিলেন ঠিকই সক্রিয়, কিন্তু কল্লোলের কালের লেখক সমকাল নিয়ে রচনা করতে বসেন, আর ঠিক এই সময়েই কিছু নতুন সাহিত্যিকের জন্ম হয়।

অনেকটা সেই গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখিদের মত। যুদ্ধ ও তার নানান অনুষঙ্গে যে বিশাল ভস্মস্তূপ রচিত হয় বাংলাদেশে, তার মধ্য থেকেই নতুন করে জন্ম নেন কিছু লেখক। যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিলেন, কল্লোল কালিকলমে যাঁরা ছিলেন দীপ্ত, সক্রিয়, সোচ্চার, অত্যন্ত তৎপর, তাঁদের দৃষ্টিও বদলালো এমন যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায়। কিন্তু যুদ্ধের ভস্মস্তূপের বিভূতি গায়ে মেখে যে সব লেখক এলেন, সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

যুদ্ধ শেষ, তার পরের পরিবেশে পুরনোদের মধ্যে যে সব নতুন তরুণ লেখকদের পাই ; বিমল কর, সমরেশ বসু, গৌরকিশোর ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধ শুরুর মুখে আমরা পেয়েছি নরেন্দ্রনাথ মিত্র, একটু আগে সামান্য সময়ের আগে পিছে আবির্ভূত সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এঁদের। সন্তোষকুমার ঘোষ এই দুই দলের মধ্যবর্তী অথচ দ্বিতীয় উল্লিখিত গোষ্ঠীর ক্রান্তিশায়ী লেখক। সন্তোষকুমার ঘোষের চোখের সামনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের বিবিধ বিচিত্র সব ঘটনা, আড়ালে মনের গভীরে অভিজ্ঞতায় তার স্বরূপ সঞ্চয়। প্রাণে ও আত্মায় অধিগত থেকেছে নিখুঁত শিল্পের সঙ্গে সুস্থ জীবন যৌবনের আর্তি।

২.

ব্যক্তিজীবনে সন্তোষকুমার ঘোষ পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের মানুষ, লেখকজীবনে সর্ববঙ্গের, বোধ হয় বলা ভাল, সর্বভারতের। আজও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই প্রতিষ্ঠিত লেখক

কম লিখলেও যে সক্রিয় মনেপ্রাণে, যে সর্বাধিক জীবন্ত, উৎসাহী, উৎসুক—তাঁর এ সময়ের একাধিক গল্প ও উপন্যাস তা প্রমাণ করে। সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প উপন্যাস রচনার কোষ্ঠী ঠিকুজি একবারও প্রমাণ করে না যে তিনি কোনও সময়ে দুহাতে গল্প লিখেছেন। কিন্তু যেটুকু লিখেছেন, তা আমাদের, একালের স্বভাবী পাঠকদের শুধু বিস্মিত করে না, বাংলা কথাসাহিত্যের একটা বিশেষ দিকের অপূর্ণতাকে তিনি দুঃসাহসী দক্ষতায় ও শিল্পীর মর্মস্পর্শিতায় পূর্ণ করেছেন, এটা নিশ্চয়ই বলা যায়। আমরা এমন বক্তব্যের স্বপক্ষের যুক্তিতে পরে আসব, তার আগে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিচিত্রতার কিছু দিক বলা প্রয়োজন।

প্রয়োজন এই কারণে যে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁকে তাঁর লেখক-মনস্কতার সার্থক একটা জায়গায় নিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, আমরা আগেই বলেছি, উনিশশো উনচল্লিশে। এই সাল থেকে দীর্ঘ দশ-এগারো বছরের মধ্যে যে সব তরুণ নতুন লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের দায়িত্ব নেন আত্মোৎসর্গের মত, তাঁদের সকলকেই কোনও না কোনওভাবে রূঢ় বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিমল কর, সমরেশ বসু প্রমুখদের কথায় এই ভাবনা দৃঢ় হয়। সন্তোষকুমার ঘোষ নিশ্চিতভাবে এই পঙ্‌ক্তির বাইরে থাকেননি। উনিশশো উনচল্লিশ থেকে উনিশশো একান্ন সাল পর্যন্ত রূঢ় বাস্তব জীবনের সঙ্গে লড়াই করেছেন। নিজের বাস্তব অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন অবিরাম।

কলকাতা তখন সারা বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 'আদ্যাপীঠ'। সন্তোষকুমার ঘোষ তখন কলকাতায় জীবনধারণের সংগ্রামে রত। জীবনযাপনও তার পাশাপাশি। অর্থাৎ ব্যক্তি ও লেখক-মনস্ক—দুই সন্তোষকুমার ঘোষ তখন নাগরিক জীবনের সমস্ত রকম পতন ও পচনকে যেনবা চাখতে চাখতে কথাসাহিত্যের আঙিনায় পা রাখতে সচেষ্ট। যে তরুণ সন্তোষকুমার ঘোষ উনিশশো ছত্রিশে কলকাতার কলেজজীবন শুরু করেন, তাঁর কাছে তার সঙ্গে সঙ্গে এমন শহর হয় গায়ে জড়ানো নামাবলীর মত। কলকাতা তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তম, আর ফরিদপুরের রাজবাড়ি গ্রাম হয়ে ওঠে গ্রামবাংলার স্মৃতিটুকু।

সন্তোষকুমার ঘোষের লেখায় তাই তেমন বড় করে নেই গ্রাম, আছে নগর, নাগরিক জীবন ও নাগর মানুষ। ষোলো বছরের একেবারে নরম যৌবনে পা-রাখা এক রোমান্টিক এমন কলকাতাকে ভালবেসেছিল প্রিয়তমার মত। ন'মাসে ছ'মাসে যে গ্রাম্য কিশোর দূর থেকে ভালবাসার কলকাতাকে দেখতে আসত, স্থায়ীভাবে এসে, যুদ্ধবিধ্বস্ত কলকাতাকে দেখতে দেখতে সেই একদিন হয়ে-ওঠা-যুবক কি কলকাতাকে, কি নগরজীবনকে হতাশায় ঘৃণা করেছিলেন? না, বরং কলকাতা হয়েছে আরও বেশি প্রিয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার রক্তে কলকাতা তাঁর কাছে হয়েছে আরও বেশি জীবন্ত, এক উৎসুক শিল্পীর কাছে তা হয়েছে একান্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়।

'মুখের রেখা' উপন্যাসের লেখক-পরিচিতিতে সন্তোষকুমার ঘোষ এইভাবে তাঁর

কলকাতা-প্রিয়তার কথা জানিয়েছেন ঃ

"দ্বিতীয় পর্বের শুরু কলকাতায় পড়তে এসে, যখন শেষ কৈশোরে যা দেখলুম, টের পেলুম জীবনটা নেহাত মধুর বায়ে রঙ্গে ভেসে যাওয়া নয়, কাঁচা মনের সব বোধ, স্বপ্ন প্রচণ্ড রকমের একটা নাড়া খেল। যে কলকাতা আগে দেখে গিয়েছি, এ তার থেকে স্বতন্ত্র কৃপণ, সংকীর্ণ কুটিল। অতি দুস্থ, নিম্নবিত্ত পরিবার, আমাদের থাকতে হল একটি তস্য গলিতে, সে এঁকেবেঁকে সরু হতে হতে অবশেষে একটা আস্তাবলের দরজায় ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে।

"বাসা বদল হল। এবার ভদ্রতর পরিবেশ, কিন্তু কিছুমাত্র উন্নত নয়। অন্য শরিকদের সঙ্গে সেই ঝগড়া, একটি মাত্র শার্ট আর্জেন্ট কাচিয়ে কোনওমতে কলেজে মুখরক্ষা, আত্মীয়স্বজন এলে মুখে খুশির ভাব দেখাতে হত। কিন্তু মনে অস্বস্তি, শুনতুম বাজারের থলে হাতে নিয়ে বাবা মাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছেন, 'কদিন থাকবে কিছু আন্দাজ পেলে?' একতলার একটি ঘরে জানলার দিকে মুখ রেখে একটি বউকে বসে থাকতে দেখেছি। সে কারও সঙ্গে মেশে না, চোখে চোখ পড়লে মুখ সরিয়ে নেয়। মাঝরাতে গোঙানির মত কান্না শুনতুম—স্বামী দুর্দান্ত মাতাল। পরে কানাকানি শুনেছি স্বামীই নাকি না, মেয়েটাকে ধরে এনেছে। মেয়েটিকে মুক্ত করার শিভাল্‌রাস্ সাধও সেই কিশোর বয়সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত, যদি না কোনওদিন বিকেলে তাকে সেজেগুজে পাউডারে চোখের দাগ লুকিয়ে হাসিমুখে ষণ্ডা লোকটার পিছে পিছে থিয়েটার কি বায়োস্কোপ দেখতে বেরিয়ে যেতে দেখতুম।"

ব্যক্তিজীবনের এমন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দৃশ্যের বর্ণনা, তার অদ্ভুত প্রতিরূপ মেলে একাধিক গল্পে। সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পগুলি, এমনকী একাধিক উপন্যাসও এমন সব নাগরিক জীবন-মন্থনজাত অভিজ্ঞতার শিল্প-আধার, নাগরিক জীবন হয় শিল্প-আধেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ক্লাসের ছাত্র থাকতে থাকতেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে চলে যান বিহারে, সেখান থেকে কলকাতায় এসে কেরানির পদ নেন। তার পরে 'প্রত্যহ' পত্রিকার সাংবাদিকতার পদ, এর পর থেকে একের পর এক পত্রিকা ছেড়ে অন্য পত্রিকায় সাংবাদিকতার পদে চলে যাওয়া।

উনিশশো উনচল্লিশ থেকে উনিশশো একান্ন পর্যন্ত সন্তোষকুমার ঘোষ ছিলেন কমবেশি কলকাতায়। তারপর উনিশশো আটান্ন পর্যন্ত প্রবাসী হন দিল্লিতে। এই দীর্ঘ উনিশ বছরের ব্যস্ত, নানাভাবে বিপর্যস্ত জীবনে কখনোই এই লেখক প্রচুর গল্প লেখেননি। তবু যা লিখেছেন, তা অনেকই। আর সেসব রচনাই তাঁর জনপ্রিয় হবার উপযোগী। আমি কোনও অর্থেই তথাকথিত 'জনপ্রিয়তা'র কথা বলছি না। সত্যিকারের জীবন ও সমাজের কথা বলিষ্ঠ কব্জিতে লিখে মানুষের হৃদয়ের কাছে আসার নাম যে জনপ্রিয়তা—সেই অর্থেই বলছি।

কিন্তু উনিশশো আটান্ন সালই তাঁর জনপ্রিয় রচনার ধারায় একটি বড় ছেদ টানে। সন্তোষকুমার ঘোষের মানসিকতার বদল ঘটতে থাকে। সেই বদলের প্রসঙ্গটি বিস্তারিত

করা যাবে পরে, আপাতত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও তার অব্যবহিত প্রাক্কালে এই লেখকের মানস গঠনের পর্বটি কীরকম ছিল, তা নির্ণয় করা দরকার। লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ উনিশশো উনচল্লিশে প্রকাশিত 'ভগ্নাংশ'। ভগ্নাংশের গল্পগুলি রচনার আগে ও সমসময়ে সন্তোষকুমার ঘোষ মুখ্যত পদ্যরচনা দিয়েই লেখকজীবন শুরু করেন। এ সময়ে তিনি প্রধানত রাবীন্দ্রিক। একসময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেন, 'তিনি প্রথম তিনি অদ্যাপি জীবিত এবং উত্তরকালের লেখকদের প্রবলতম প্রতিযোগী—সেও কি কম দুর্ভাগ্য? তাঁকে ঈর্ষা করি।' (সোজাসুজি / রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য / আনন্দবাজার পত্রিকা ১২ মে, ১৯৭০)। এই লেখকই সচেতন মনে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর তৃতীয় খণ্ড পড়ে অতৃপ্তি বোধ করেন। গল্প লেখার দিকে তাঁর টান আসে।

সন্তোষকুমার ঘোষের কবিতা লিখতে যাওয়ার পিছনে ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থ পাঠ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একাধিক কবিতা পাঠ। সেখানেও এক অতৃপ্তি তাঁকে কবিতা রচনায় টানে একেবারে প্রথম দিকে। পদ্য ছেড়ে ক্রমশ আসেন গদ্যে। প্রথম লেখা গল্পগুলি সাধুভাষায় রচিত। প্রথম প্রকাশিত গল্প সম্ভবত ভারতবর্ষ পত্রিকার উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের কোনও এক সংখ্যায়, নাম 'বিলাতী ডাক'। তারাশংকরের 'ছলনাময়ী' লেখা পড়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়েই এমন গল্প লেখেন। যে সময় শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় 'শীত ও বসন্ত' নামের গল্পটি বেরয়, তখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র দুজনেই জীবিত। এই সংখ্যার অন্যতম লেখক ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রও। এইভাবে 'কেশরী' 'স্বদেশী' নামের পত্রিকায় যতগুলি গল্প লেখেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সবই সাধুভাষায়। 'ভগ্নাংশ' প্রকাশের আগের এমন পর্বের রচনাগুলি গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষের হাত তৈরি করার মাধ্যম।

৩.

'ভগ্নাংশ' প্রকাশ ও প্রকাশের পর থেকেই গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ সাধুভাষার মাঝে মাঝে চলতি গদ্যেও লিখতে সচেষ্ট। এই লেখকের ব্যক্তিগত মত—"জগৎ দাস ছিলেন সে সময়ে সবচেয়ে আধুনিকতম। তাঁর চলতি গদ্যে লেখা শুরুর মূলে ছিলেন জগৎ দাস।" 'ভগ্নাংশ' এই লেখকের শিল্পীজীবনের প্রেরণার অন্যতম অধ্যায়। গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিল্পী লেখক স্বয়ং, সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্টেটসম্যানে সমালোচনা করেছেন এই গ্রন্থের. সে সময়ের 'প্রগতি' পত্রিকাতেও এই তরুণ লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থের সপ্রশংস গ্রন্থ আলোচনা রেরয়। এর প্রকাশের সময়েই শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' গল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী' উপন্যাস।

এদিকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'-কে কেন্দ্র করে একে একে ভিড় করছেন লেখক হিসেবে গল্পে অমিয়ভূষণ মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই কবি কবিতা নিয়ে তখন সদ্য আবির্ভূত। সন্তোষকুমার ঘোষ তখন কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। 'পূর্বাশায়' প্রথম বেরল চলতি গদ্যে লেখা গল্প 'দক্ষিণের জানালা'। লেখক স্বয়ং

মনে করেন, তাঁর গল্পে প্রথম আধুনিকতার পদক্ষেপ এখান থেকেই। উপন্যাসে পাঁচের দশকের প্রথমে যখন 'কিনু গোয়ালার গলি'র প্রকাশ ঘটে, তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হন 'বীতংসে'র লেখক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'অসমতলে'র। এমন পরিবেশেই লেখকের পুরনো দিনগুলির অবসান ঘটে।

এমন পরিবেশের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ যেমন অন্য পূর্বসূরি লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন যেমন সমকালীন সমবয়স্ক লেখকদের সৃষ্টির মাধ্যমে, তেমনি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করার মত সাহস ও বাসনাও সক্রিয় থেকেছে তাঁর মধ্যে। উনিশশো বাহান্ন-তিপান্ন সালে 'মহাবীর দীপজ্যোতি প্রকাশনী' থেকে বেরয় সন্তোষকুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন। শারদীয় দেশ পত্রিকায় সেই সময়েই তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়। ক্রমশ গল্পকার এবং বড় অর্থে কথাসাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকেন এই লেখক। কোনও গল্পে তাঁর নিরঙ্কুশ সক্রিয়তা, অভাবনীয় বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য, কোনও গল্পে কোথাও বুঝি প্রচ্ছন্ন প্রেরণার মত প্রভাব। আকৈশোর রবীন্দ্রভক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ। কখনো প্রবন্ধে কখনো বা উপন্যাসে তাঁর প্রভাব কিছু কিছু থাকতেই পারে, কিন্তু তিনি মনে করেন, গল্পে কোথাও সেই মহত্তম স্রষ্টার প্রভাব নেই। তাঁর নিজের কথা—'অনুকরণ নয়, অনুসরণও নয়, কিন্তু অনুরাগেও আপত্তি কী?' রবীন্দ্রপ্রীতি ও প্রভাব সম্পর্কে এমন লেখকের স্বকণ্ঠ স্বীকৃতির স্বাক্ষর গল্পে মেলে।

কিন্তু তিনি নানাভাবে যে প্রভাবিত হয়েছেন কল্লোলের কোনও কোনও লেখকের দ্বারা, তা মানেন। আমরা গল্পেও তার প্রমাণ পাই। প্রভাব পূর্বসূরিদের থাকা স্বাভাবিক। প্রভাব মানেই তো পূর্বকাল ও সমকালকে মানা—যদি সেই প্রভাবকে উত্তরণে পাশে ফেলে রেখে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে কোনও লেখকের। সন্তোষকুমার ঘোষের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে। তিনি কল্লোলের অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসুর বাগবৈদগ্ধের একজন ভক্ত, কিন্তু প্রভাবিত হয়েছেন কমবেশি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের সংক্ষিপ্তি, ব্যঞ্জনা, মায়াময়-মোহময় ভাষা ও পরিবেশ রচনার অদ্ভুত কৃতিত্ব তাঁকে আকর্ষণ করে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূঢ় নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তাঁকে বিস্মিত করে, তারাশংকরের গল্প ও উপন্যাসের বিষয়ের বিস্তার ও বিশালতা তাঁর বিষয় ভাবনায় উদার আকাশ নির্মাণ করে। এই তিন লেখক যেন সন্তোষকুমার ঘোষের শিল্পীসত্তার বিবেক রচনার সহায়ক, যেন বা তাঁর শিল্পীজীবনের পাহারাদার। এঁদের শিক্ষা তাঁর লেখকজীবনের মূল্যবান পাথেয়। তবু এঁদের মানসিকতার প্রতিক্রিয়া সন্তোষকুমার ঘোষের মধ্যে অন্য তাৎপর্য খোঁজে। এই লেখক মনের মধ্যে বিষয় খুঁজতে ব্যস্ত হন।

সতীর্থ সমকালীন লেখক বন্ধুদের সম্পর্কে সন্তোষকুমার ঘোষের 'Mental attachment' ভিন্ন ধরনের। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খেলনা' নামের প্রথম গল্পগ্রন্থ বেরয় উনিশশো চল্লিশে। তাঁর দৃষ্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভস্মস্তূপ থেকে অন্য তির্যক কোণ নিয়ে দেখা দেয়। সমকালে লিখতে বসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর জীবন বৃত্তের পরিধিকে বিস্তীর্ণ

করতে পারেননি গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের বিষয় বিস্তীর্ণ হলেও লেখা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে প্রাণবন্ত হতে যে পারেনি, তাঁর 'গন্ধরাজ' ইত্যাদি গল্প তা প্রমাণ করে। লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ এঁদের থেকে ছোটগল্পে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের সন্ধিৎসু পথিক। এমন পথে চলতে চলতেই আসেন তাঁর পরের সময়ের লেখকদের মধ্যে—যেখানে আছেন বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ। এঁদের ভিড়েও সন্তোষকুমার একেবারে স্বতন্ত্র জাতির ও জগতের লেখক। নিজের লেখার একই সঙ্গে বিষয় উপস্থাপনা ও রীতি নির্ণয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ যে সতর্ক সচেতনা ও সনিষ্ঠ শ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে তিনি একজন সব্যসাচী। বিশ শতকের আধুনিকতার সংজ্ঞা হৃদয়ে নয়, বুদ্ধি সচেতনায়। রচনার মধ্যে তেমন বুদ্ধি সচেতনায় প্রবর্তনায়—ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সন্তোষকুমার ঘোষ প্রথম পথিকৃৎ নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু যে একজন অন্যতম প্রাজ্ঞ পুরোহিত, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তাঁর একাধিক ছোটগল্প, যেমন প্রমাণ আছে তাঁর 'মুখের রেখা', 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' এবং 'জল দাও' উপন্যাসে।

৪.

সন্তোষকুমার নিজেও স্বীকার করেন, 'সব লেখকই মূলত আত্মজৈবনিক।' এই অর্থে তিনি মনে করেন, 'কিনু গোয়ালার গলি' নিশ্চয়ই নয়, 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসটিতে যেভাবে লেখকের বাল্য-কৈশোর নানাভাবে ফিরে এসেছে, তাতে এই গ্রন্থেই লেখক স্বয়ং উপস্থিত বেশি সবচেয়ে। আমরা মনে করি, ছোটগল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর দীর্ঘ বহু অভিজ্ঞতার তারাখচিত জীবনাকাশের অনেক খণ্ড খণ্ড অংশ আয়নার মত বিম্বের মায়ায় রাখতে পেরেছেন। কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো বা পরোক্ষে তাঁর ছোটগল্প তাঁর সুদীর্ঘ বহুবিচিত্র ব্যক্তিগত জীবন ও মনের নানান অভিজ্ঞতার মুক্তোমালা।

প্রসঙ্গত তাঁর গল্পের বিষয়গত শ্রেণীবিন্যাস, বিষয় বৈচিত্র্যের আলোচনার আগে বিদেশি লেখকদের সম্পর্কে সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের যোগের দিকটির কিছু উল্লেখ করি। এই লেখক নিজেই স্বীকার করেন, তাঁকে বিদেশি লেখকদের মধ্যে গল্পের ক্ষেত্রে ডি. এইচ. লরেন্স ও সমারসেট মম সর্বাধিক টানে। এমন কোনও কোনও গল্প আছে, যেমন সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিধা' নামের গল্পটি—এর মধ্যে সমারসেট মমের কোনও বিশেষ গল্পের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না, সন্তোষকুমার ঘোষ শুধু যে রবীন্দ্রনাথকে গভীর নিবিষ্ট পাঠ করে নীলকণ্ঠের মত আত্মস্থ করেছেন নিজেকে, তাই নয়, তিনি বিদেশি সাহিত্যও একজন ভোজনরসিকের মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের নানান ডাইমেনশান, দূরবীন-এর বৈশিষ্ট্যে চমক আনে।

যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী পরিবেশে সন্তোষকুমার ঘোষের শিল্পী চোখ ক্যামেরার দামি লেন্সের কাজ করেছে, তাই, সে সময়ের অবক্ষয়িত জীবন ও সমাজকে এই লেখক কোনওক্রমেই বিস্মৃত হতে পারেননি। জীবনে বাঁচা মরার স্থায়িত্ব যেমন

আছে, তেমনি প্রেম আছে, যৌনতা আছে, যৌনবিকার, মনোবিকলন—এসবও আছে। আবার জীবন যেহেতু সমাজ-বিবিক্ত কোনও অস্তিত্ব কোনওক্রমেই হতে পারে না, তাই জীবনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর ক্যামেরার মত ছোটগল্পের লেন্সকে সমাজের দিকেও ঘুরিয়েছেন, নানাখানা করে সমাজকে দেখতে চেয়েছেন গভীর-নিবিষ্ট থেকে।

এক এক করে জীবন ক্ষয়ে যাচ্ছে। ঘুণপোকার মত জীবনকে কুরে কুরে ফাঁকা ফাঁকা করছে সেই সময়। জীবনকে নিক্ষেপ করছে মন্বন্তরের দিনে কলকাতার রাস্তায় রাখা ডাস্টবিনের আবর্জনার মধ্যে। সন্তোষকুমার ঘোষ নিখুঁতভাবে বুদ্ধির তীব্র তীক্ষ্ণ ছুরি হাতে নিয়ে তার 'ডিসেক্শান' করেছেন। আবার সমাজকে, তার ক্রমশ ভেঙে-যাওয়া অসহায়তা, হতাশা, কান্না, ক্ষয়, পক্ষাঘাত, পঙ্গুতা, কুষ্ঠাক্রান্ত হওয়ার মত বীভৎসতাকে সেই বুদ্ধির আগুনরাঙা ছুরির তপ্ততায় 'ডিসেক্ট' করেছেন। এক কথায় প্রথম দিকের একাধিক গল্পে এই লেখক সমকালের জীবনকে গল্পে নিয়েছেন। অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল একমাত্র মূলধন, বুদ্ধিবৈদগ্ধ্য ছিল তাঁর মনের সবচেয়ে ধারালো দিক। মূলধনকে তাই অনায়াসে শিল্পের গরিমা দিতে পেরেছেন ছোটগল্পে।

এসব গল্প লিখেছেন উনিশশো আটান্ন সাল পর্যন্ত। তারপর থেকেই সন্তোষকুমার ঘোষ নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছেন নিজের মধ্যেই। গোড়ার গল্পে ছিল মানবিক সমতার সঙ্গে বুদ্ধি মেশানো। ক্রমশ মমতা থাকে, কিন্তু তা প্রধান আবরণ পায় আত্মগত বুদ্ধিতে। লেখক নিজের মনের মধ্যে ডুব দিতে থাকেন। গল্প লেখা ক্রমশ বিরল হতে থাকে। আমরা আগেই বলেছি, উনিশশো একান্ন থেকে উনিশশো আটান্ন পর্যন্ত সময়ে লেখকের বয়স তিরিশ থেকে সাঁইতিরিশ-এ থামে। লেখক তখন দিল্লিপ্রবাসী। চার-পাঁচটির বেশি আর গল্প লেখেননি, তাঁর অভিনিবিষ্ট সাংবাদিক জীবন এর মূলে, না অন্য কোনও শিল্পীর মানসিক প্রতিক্রিয়া এর অন্তস্থলে তা অস্পষ্ট থাকে পাঠকের কাছে।

তবু যে কটি গল্প লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ এরপর, তা-ও একটা পর্যায় রচনা করে তাঁর গল্পের ধারায়। সংখ্যায় অল্প হলেও, সেগুলি ধূলিমুঠি সোনার মতই। লেখক ক্রমশ ব্যক্তি, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের নির্মম নিরীক্ষায় নামতে যে উৎসুক-উৎসাহী, অনেকটা আত্মসমালোচনার মত, তা এই সময়ের কিছু গল্পে প্রমাণ মেলে। যখনই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে এক বুদ্ধি-সচেতন গল্পকার তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে অভিনন্দিত করেন, তখন সমাজ সমগ্ররূপে আসে না, আসতে পারে না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সমাজ যতটুকু, ততটুকুই গল্প সত্য হয়। সুতরাং যে সময়ে জীবন ও সমাজকে লেখক চওড়া বুক দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ের গল্প থেকে এই সময়ের গল্পে লেখকের সমাজ-মন সংকুচিত হয়, বলা যায়, ব্যক্তির কাছে সমাজ অনেকটা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় গোপন থেকে যায়। সমকালের গল্প ও সমকালের গল্পকারদের কাছ থেকে সন্তোষকুমার ঘোষ বিচ্ছিন্ন হলেন, এবং এই বিচ্ছিন্নতাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য যেমন, তেমনি বাংলা ছোটগল্পের ও ধারায় তাঁর গল্প এক উজ্জ্বল মণিখণ্ডের মত স্বতন্ত্র দীপ্তির পরিচয় দেয়।

গল্পে এমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে এই লেখক এবং সম্ভবত একালে, অদ্বিতীয়। বুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোক আর হৃদয়বৃত্তির জটিল অন্ধকার মধ্যবর্তী যে অস্থির অঞ্চল, তাকে সন্তোষকুমার ঘোষ আলোকিত করেন বুদ্ধির দ্যুতিতেই। বুদ্ধির দীপ্তি সেই অন্ধকারকে হঠাৎ হঠাৎ এমনভাবে চকিত করেছে এই ধারার গল্পে, যাতে ব্যক্তি, ব্যক্তিত্বই নিরাসক্ত স্বভাবে উঠে আসে। ছোটগল্পে ব্যক্তির হৃদয়ের দরদ ও দ্বিধার উন্মোচনে এমন বুদ্ধির দীপ্তি ও দ্যুতির ব্যবহার সন্তোষকুমারের বিশেষ মানসিকতারই বিম্বন।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পর্বে, যেখানে একেবারে হাল আমলের গল্পগুলিই একমাত্র দৃষ্টান্ত, সেখানে দেখি, লেখক নতুন করে মানুষের মধ্যে ফিরতে চাইছেন। আমরা আগেও বলেছি, সন্তোষকুমার ঘোষ সেই লেখক যিনি কখনোই দুহাতে গল্প লেখেননি, এখন নতুন করে বলি, সন্তোষকুমার ঘোষ সেই লেখক যিনি কোনওদিনই জনপ্রিয়তার মোহে গল্প লেখেননি। বিপুল সংখ্যায় নয়, সেই জনপ্রিয়তার স্বভাবে নয়, সন্তোষকুমার ঘোষ একালেও সামান্য কটি গল্প লিখেছেন। সেখানেও বোঝা যায়, তিনি ক্রমশ ব্যক্তির নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব থেকে মানুষের মানসিকতায় ফিরতে চাইছেন। সামান্য কটি গল্প যেগুলি সাম্প্রতিক কয়েক বছরে লিখিত তার মধ্যে এর প্রমাণ মেলে।

আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের ধারার তিনটি স্তর চিহ্নিত করি। প্রথম স্তরে—জীবন, দ্বিতীয় স্তরে—ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, তৃতীয় স্তরে—মানুষ, লেখকের এই তিন লক্ষ্য ক্রমান্বয়ে এসেছে। জীবন কখনোই সমাজ-বিবিক্ত ও প্রেম যৌনতা বিকার শূন্য নয়। তাই এসব মিলেই এই পর্বের গল্প। সময় 'ভগ্নাংশে'র পর থেকে উনিশশো আটান্ন পর্যন্ত লিখিত গল্প এখানে তার নতুন দিকে মুখ ফেরাবার মত 'মাইল স্টোন' গল্প 'ঠাকুমার ঝুলি'। দ্বিতীয় স্তরে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের নিরীক্ষা-মনন-এর সংলগ্ন মানসিকতা। 'যুবকাল' গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলিতে তার প্রমাণ মেলে। শেষ স্তরে মানুষ ও মানবিকতাকে স্পর্শ করার প্রবণতা ও আর্তি। 'তীর্থের কাক' ইত্যাদি গল্পে তার প্রমাণ আছে। অর্থাৎ সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে তিন তরঙ্গ ঃ জীবন ব্যক্তি মানুষ। এই তিন তরঙ্গই লেখকের ছোটগল্পের ক্রমপ্রসারিত শিল্পের ও শিল্প মানসিকতার একমাত্র পরিচায়ক।

৫.

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ে যুদ্ধ সমকালকে আদৌ বিস্মৃত হননি। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা গল্পে নিয়েছে শিল্পের শরীরী রূপ, ব্যঞ্জনায় হয়েছে অলংকার, জীবনকে দেখার দৃষ্টিকোণে পেয়েছে বড় দর্শন হয়ে ওঠার বীজাভাস। 'একমেব' গল্পের নায়ক অনন্ত মোক্তার এক নিম্নবিত্ত সংসারী মানুষ। সুখের খোঁজেই তো তার সাংসারিক জীবনধারণ। কোনও রকমে সামান্য অর্থ উপার্জন করে, এতগুলি সন্তান প্রতিপালন করে অনন্ত মোক্তার সংসার চালায়, তার জীবনযাপনের সুখটুকুও দরকার। তার স্ত্রী

অনেকগুলি সন্তানের মা। কিন্তু প্রতিবারই মুমূর্ষু স্ত্রীর সন্তান-জন্মের সময় যে ডাক্তারকে ডাকে মোক্তার, তার অভিজ্ঞতা তাকে বিস্ময় বিমূঢ় করে। স্ত্রীর প্রতি জৈব সম্পর্কের ভালবাসাতেই অনন্ত মোক্তারের একমাত্র জীবন। 'শনি' গল্পের নায়িকা বেশ্যার মেয়ে যমুনার জাতে ওঠার মধ্যে যে বাসনা ও বিড়ম্বনার চিত্র সেখানেও আছে সামাজিক মানুষের স্বার্থ ও গ্লানির কলঙ্ক।

'কানাকড়ি' গল্প সন্তোষকুমার ঘোষের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প, বাংলা ছোটগল্পের ধারাতেও স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হবার মত গল্প। এখানে লেখক সেকালের সমাজের প্রেক্ষিতে এঁকেছেন মানুষের নীচে নামার ছবি। স্ত্রী সাবিত্রী সেই সুবিধাবাদের একমাত্র উপায়। অর্থনীতির অসাম্য মধ্যবিত্ত আদর্শকে, নীতিকে ক্রমশ নড়বড়ে করে দেয়। সাবিত্রী তারই শিকার। অভাবে যে মন্মথর সংসার চলে না, সেই একদিন প্রতিবেশিনী মল্লিকার পরিচিত পুরুষ শশাঙ্কের সঙ্গে সাবিত্রীর সিনেমা দেখতে যাওয়াকে অপছন্দ করে না, করে না যদি সাবিত্রী তার সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফেরে। কিন্তু সাবিত্রী তো এত সহজে মূল্যবোধ হারাতে চায় না, পারে না। তার অবচেতন মনে পুরুষ সম্পর্কে যে ভয় তা এক সময় চলে যায় শশাঙ্কর পাশে বসে অন্ধকারে সিনেমা দেখার সময়। ভয় পায়, কিন্তু নিজের বাইরের রূপ সম্পর্কে ঘৃণা জাগে। আবার শশাঙ্কর সঙ্গে একই গাড়িতে আসেনি বলে, একটু শারীরিক সান্নিধ্য দেয়নি বলে স্বামী মন্মথ যখন নোংরা অভিযোগ করে, তখনো সাবিত্রীর ভিতরের শেষতম নৈতিক শক্তিটুকুও দুর্বল হয়ে যায়। সাবিত্রী ভিতরের ও বাইরের—দুই বিশ্বাসই ভাঙে, নীচে নামতে থাকে। পাশের ঘরের মল্লিকা—হাফগেরস্ত পতিতা রমণী। লেখক গল্পের শেষে সাবিত্রীর সেই ভয়ংকর কান্নার চিত্রকে দেখিয়েছেন মল্লিকার ঘরে সাবিত্রীকে এনে—'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা, এতদিন নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরের মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনওদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।' এক বধূ সাবিত্রীর এমন ভুল ভাঙার কথা লেখক শুনিয়েছেন মল্লিকার ঘরে, মল্লিকার হাত সাবিত্রীর পিঠে স্থির রেখে'। গল্পের শেষে মধ্যবিত্ত মানুষের এমন পতনের প্রতীক-প্রতিম চিত্রের অনবদ্যতা গল্পটির শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দিক।

'কানাকড়ি' গল্পের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' এর শিবনাথ রুচির প্রসঙ্গ এবং সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি'র ভাবনাগত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। 'ধাত্রী' গল্পে বিপত্নীক নায়ক হরষিতের দ্বিতীয় বিবাহিত স্ত্রী নার্স বীণার মানসিকতার যে করুণ পরিণতি—প্রথম পক্ষের স্ত্রী বাসন্তীর ছেলেকেই আজীবন মানুষ করার মধ্যে এঁকেছেন, তার মূলে আছে সামাজিক নড়বড়ে অর্থনৈতিক বনিয়াদ। 'যাদুঘর' লেখকের আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের নায়িকা যামিনীর মনের মধ্যে নিরঞ্জনের মত একাধিক আগন্তুকের বিধুর বিষণ্ণ স্মৃতি নিশ্চয়ই চাপা ছিল, ঠিক তেমনি সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের নায়িকা হোটেলের

ঝি সুরমার মনের যাদুঘরে লেখক স্পষ্ট করেই এমন একজন আগন্তুকের নিষ্ফল প্রতিশ্রুতিগুলি স্মৃতির সমাধির মত সাজিয়েছে। তার কারুণ্য বেদনাবিধুর।

'দুই প্রস্থ' গল্পে আছে ধনী গ্রাম সম্পর্কে দাদা সুহৃদ ও বাস্তুহারা বস্তিবাসী মমতার অসবর্ণ সম্পর্কের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। এমন অসবর্ণ সম্পর্কের অসহায় প্রতিরূপ এঁকেছেন লেখক 'অমিত্রাক্ষর' গল্পের নায়িকা সীতার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক চিত্রণেও। সীতার আত্মিক মৃত্যুর কারণ অবশ্যই তার তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন মায়ের ব্যবস্থাপনা। 'পারাবত' গল্পের সীতেশ-শিপ্রার মেকি, বানানো প্রেমের সম্পর্ক অর্থ উপায়ের নোংরা পথ। 'পনেরো টাকার বউ' গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সচেতনা ও বিকৃতিকে এঁকেছেন। 'বসুধৈব' এক নিষ্করুণ একান্নবর্তী পরিবার জীবনের অভিভাবক-নায়ক ইংরাজির অধ্যাপক সুরপতির ট্র্যাজেডি করুণ পরিণতির কাহিনী। যে মানুষটি একটি একান্নবর্তী পরিবারকে স্ত্রী অনুপমার নীরব কঠিন বাধার মধ্যেও এবং মনের বড় সম্পর্কেই বাঁচায়, তার অসহায়তার দিনে স্ত্রী অনুপমা তার প্রত্যুত্তর দেয় তেমনি নীরব কঠিন নিশ্চুপতা দিয়েই। এখানেও সেই সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাই গল্পে নায়ক নায়িকার বিশেষ মনোভঙ্গির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। 'ঘর' গল্পে নায়িকা কাঞ্চনকুন্তলার যাবতীয় গোপন সক্রিয়তা, সুরেনের ঘর বাঁধার জন্য তৎপরতা এসবের মধ্যে তার ব্যর্থ জীবনের আর এক অলিখিত দিককে তুলে ধরে।

'গিল্টি' গল্পের মেসের সলিলবাবুও একসময়ে তার ভালবাসা ও ভালবাসার মত মেয়ে সীতার সম্পর্ক ভয়াবহ, রুদ্ধশ্বাস এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে পরিবেশ মানুষের আত্মিক সংকটের, যার মধ্যে নীতি-দুর্নীতির অন্য নখ, দাঁত। জীবনযাপন-উপযোগী অর্থ উপায়ের সম্পর্ক ব্যবসায়িক থেকে মানসিকতায় মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে, গল্পের শেষে উত্তমপুরুষে নায়কের মন্তব্য তার প্রমাণ—জানি না সীতা আর কোনোদিন মেসে ফিরে এসেছিল কিনা। সেদিন কে সত্যি কথা বলেছিল তাও জেনে নেওয়া হয়নি। হয়তো দুজনেই, হয়তো কেউ না। দুলটা খাঁটি, গিল্টি দুই-ই হতে পারে, নোটটা আসল বা জাল।...ওদের বিচিত্র যৌথ চুক্তির পরমায়ু বেশি দীর্ঘ হয়নি, যেখানে দুই অংশীদারের মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস, সেখানে হয় না।

'পরমায়ু' সন্তোষকুমার ঘোষের আর একটি উল্লেখ্য গল্প। এককালের নামকরা লেখক, এখন ব্যবসাদার সুরপতির আগের প্রেমিকা বিবাহিতা নিম্নবিত্ত সুমিতার কাছে লেখক মনের বাঁচার আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে নিজের যে অভিজ্ঞতার জগতে আসে, তা পলায়ন ছাড়া আর কি? 'এই ছুটিতে' গল্পেও রজনাথবাবুর বাইরে বেড়াতে যাওয়া সংক্রান্ত গোপনতায়, ছলনায়, মিথ্যাভাষণে আছে দারিদ্র্যের অভিশাপ। 'বিষকণ্ঠ' গল্পটি প্রবোধকুমার স্যান্যালের 'অঙ্গার' গল্পকে মনে করায়। স্বামী শুভেন্দু দীর্ঘদিন বাদে বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী সতী, শাশুড়ী মৃণালিনী, বাড়ির বিধবা বৌদি সুহাস, কিশোরী-শ্যালিকা কণিকা-মিনিদের যেভাবে দেখে, প্রতুল চৌধুরীর সঙ্গে এ সম্পর্কে যে বিষাক্ত কীটদংশনের অনুরূপ ধারণা হয় তার, তা একটি গলিত সমাজেরই

রূপ, এক অবক্ষয়িত জীবন ও সমাজের ভয়াবহ অস্তিত্ব। 'ভেবেছিলাম' গল্পেও বাবা মা ছোটভাই তার দিদি ও পাড়ার নিমাইদা—এসব মিলিয়ে যে সামগ্রিক চিত্রটি এঁকেছেন লেখক, তা এক ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের ক্রমশ অবতরণের নির্মম-করুণ চিত্র। 'ছোটকথা' গল্পে ঊষার সংসারচিত্র ও বিজু মাসিমার সংসার ভাবনা—দু'য়ের মধ্যে নায়ক সরসিজ যে নির্মম অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাও দারিদ্র্যজনিত পতনের নীতিহীন রূপ। 'কিশোরীর মন' গল্পের চব্বিশ বছরের দিদির মৃত্যুতে ছোটবোনের শেষতম ভাবনাটির বাস্তবতা আমাদের একই সঙ্গে স্তম্ভিত ও অসহায় করে।

এমন সব গল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ যেমন জীবনের অন্যতম আশ্রয় ও আধার সমাজকে নিপুণ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে জীবনদায়ী শক্তি যে প্রেম, তার স্বরূপকে নানা কোণ থেকে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ কোনও সময়েই নিটোল প্রেমের গল্প লেখেননি, প্রেমের কথা বলতে গিয়ে দগদগে ঘায়ের মত মোটা দাগে যৌনতা ও সঙ্গমের চিত্র উপহার দেননি। তাঁর প্রেমভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ্মভাবে যৌনতা, তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ব, মনোবিকলন। প্রেম মানুষকে কখনো কখনো কত যে অসহায় করে তার সার্থক শিল্পরূপ সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে মেলে।

'স্বয়ম্বরা' তাঁর একটি বিখ্যাত প্রেমের গল্প হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু নিছক প্রেমই এর সর্বাঙ্গে লেখা নেই, আছে একটা কাঠের হাত নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস ও চেষ্টায় দীপিত থেকে সেলসম্যান নায়ক স্মরজিতের মত মানুষ যার শেষ বাঁচার আশ্রয় হয় সমস্ত জাগতিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে সেই প্রেরণাদায়ী শক্তি প্রেমই। লীলা সেই শক্তি স্মরজিতের কাছে। কিন্তু লীলার কাছে আর একদিকে আছে অনুপম, এমনকী অনুপমকে গৌণ করলেও আছে লীলার একান্ত ব্যক্তিমনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা ও অসহায়তা। যে প্রেম অন্তিমে সমস্ত বাধা, দুর্বলতা, অসহায়তাকে জয় করে বলিষ্ঠ হয়, লীলার সেই মানসিকতাতেই গল্পের চমক। নিঃসঙ্গ লীলার নির্ভরতা স্মরজিতের কাছে ফিরে আসাতেই গল্পের উপসংহার।

'কস্তুরীমৃগ' গল্পের অধ্যাপক অজয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর নীচের তলার ভাড়াটে অজয়ের গোপন প্রেমে ধন্যা বিধবা নির্মলার বেদনা ও অজয়ের স্ত্রীর করবীর বিপরীতে তার নিঃসঙ্গ অসহায় ভাবনা প্রেমের অন্য ঘ্রাণ দেয়। এই গল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ রোমান্টিক, 'চীনেমাটি' গল্পের একদিকে আছে কুঞ্জর পাতানো দিদি বকুলের দুঃখময় সংসার জীবনের স্মৃতি, তার স্বামী প্রাণকৃষ্ণর কঠিন ভারি শাসন ও সুবোধ চক্রবর্তীর কাছে বকুলকে সমর্পণ করার গোপন বিকৃত বাসনা, অন্যদিকে কুঞ্জর দেখা তার মনিবাণী 'মেমসাহেব' ইন্দ্রাণীর তার স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে মেকি ভঙ্গুর জীবন অভ্যাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কুঞ্জর সুখ ভাললাগা ও ভালবাসায় আঘাত তার সব সাজানো বাসনার ঘর মুহূর্তে ভেঙে দেয়। 'শরিক' গল্পে লেখক সুধাময়ের প্রতি প্রেমের সম্পর্কে স্ত্রী উমা ও শ্যালিকা নীলিমার অন্তিম আশাহীনতা ও ব্যর্থতা ও শূন্যতা-বোধ দুজনকেই একই মানসিকতার অংশীদার করে তোলে। 'সমান্তর' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম দুজনের

জীবনযাপনের রুচিভেদে সম্পর্কশূন্য হয়, তারা একে অপরের মত করে গড়ে ওঠার পরেও এক জটিল মানসিকতার ক্রমচিত্রে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়।

'প্রেমপত্র' গল্পটি এক যুবতী প্রেমিকা নারী কনককে পত্র লেখার ভঙ্গিতে রচিত। স্ত্রী যূথিকা অসুস্থ, প্রৌঢ়া, যৌবন শেষের এক বিষণ্ণ রমণী। কনক এক ভরা যৌবন, প্রাণোচ্ছল নারী। প্রৌঢ় নায়ক পত্রলেখক সুধাময়ের পক্ষে মনের মধ্যে যেমন থাকে প্রৌঢ় বাসনার দ্বন্দ্ব, তেমনি আছে কল্পনায় কনকের মধ্য দিয়ে যৌবনের স্বাদ গ্রহণ। গল্পের শেষে লেখক যৌবনেরই অন্য নাম দিয়েছেন ভালবাসা—'শুধু মাত্র ভালবাসতে পারাই যৌবন।' 'সম্রাজ্ঞী' গল্পের চারুর বড়লোক বিবাহিত দুর্দিনের রক্ষক সুরজিতকে ছেড়ে বিষ্ণুপদ শর্মা নামক এক পাণ্ডার ঘরণী হয়ে থাকার মধ্যে সংসার জীবনের আভিজাত্যকে সত্য করে আঁকড়ে থাকার গৌরব ও গর্ব অভিব্যক্ত। এটি জীবনকে ভালবাসার আর এক দিক। 'সুচিরাকে' গল্পটি অলক নামের এক তরুণের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এক যুবতীর প্রতি রোমান্টিক মোহমুগ্ধ ভালবাসার মোহভঙ্গের নিঃসঙ্গ করুণ কাহিনী। 'স্ত্রৈণ' গল্পে লেখক স্ত্রী কমলার মৃতদেহ দাহের পরেই বেশ্যা বেলার সংসর্গে কাটানোর মধ্যে ভালবাসা সম্পর্কে নায়কের যে উপলব্ধি তা হল—'কয়েকটি অভ্যাসের ভালবাসাই হল ভালবাসা।' ভালবাসার আর এক ডাইমেনশান ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক এখানে। 'ছায়াঘর' গল্পের নায়িকা প্রণতির অন্ধকার ঘরে অন্ধ স্বামীর বিছানার পাশে ডাক্তারের স্পর্শে যে অনুভবের জাগরণ, স্বামীর মৃত্যুর পর সেই অনুভূতি তাকে উপলব্ধির এমন এক স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে সম্পর্কের রহস্যময়তা আরও জটিল মানসিকতার রহস্যই থেকে যায়। 'ঘ্রাণ' গল্পেও প্রেম আছে, কিন্তু দুই মেয়ে বেবি ও দেবযানীর মা কৌশলা উপাধ্যায়ের যে মানসিক কমপ্লেক্সকে লেখক এঁকেছেন, তা প্রেম নয়, এক গহন গভীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই। গল্পটিতে সুবোধ ঘোষের গল্পের পরিবেশের ভাবময়তার আস্বাদ মেলে, 'মনসিজা' গল্পে কিশোর বয়সের পাওয়া স্পর্শধন্য প্রেম একজন পুরুষের প্রৌঢ় বয়সের কালে সেই সংসারী মেয়ের রূপান্তরিত স্থূল বাস্তব বুদ্ধির মানসিকতার আড়ালে বেদনাহত হয়, মোহ ছুটে যায়। পুরনো সেই অল্প বয়সের মুগ্ধ প্রেমকেই স্নেহে, প্রেমে, কল্পনায় এতদিন ধরে লালন করার মধ্যে প্রেমের চরিতার্থতা আসে। 'নেপথ্য' গল্পে দেখা যায়, ভাললাগা ও ভালবাসার গোপনে একাধিক বার কাছাকাছি আসা বাড়ির ভাড়াটে কুমারী মল্লিকা ও বিবাহিত নয়নমোহনের যখন পরস্পরের সান্নিধ্য রচনার বাধাহীন সুযোগ আসে, তখন স্ত্রী অতসীর সাধারণ একটি কথা 'স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাস আছে'—বলে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরও একটা অদ্ভুত আড়াল তৈরি হয় দুজনের মনে। যা সর্বদা প্রার্থিত, কাম্য ছিল দুজনের, তা যখন সুযোগ হয়ে এল, তখন তার সদ্ব্যবহারে আসে আড়ষ্টতা, দ্বিধা, সংকোচ, বিশ্বাসহীনতা, ভয়। তারা দূরেই থেকে যায়। প্রেম বা ভালবাসার এখানে আর একদিক, আর এক গভীর জটিল মানসিকতাকে সন্তোষকুমার ঘোষ নিপুণভাবে এঁকেছেন। এই গল্পের সঙ্গে লেখকের পূর্বসূরি প্রবোধকুমার সান্যালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে লেখা 'অন্ধ' নামের

গল্পের তাৎপর্যগত সাদৃশ্য পাঠকের মনে ভেসে উঠতে পারে। 'চিররূপা'র নায়িকা দ্বিতীয় স্ত্রী যমুনার স্বামী—প্রেমবাসনা—স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর দেয়ালে টাঙানো ছবির সত্যে স্থির হওয়ার দিকটি মনস্কতার অভিনব আবিষ্কার। প্রথম প্রেম যখন শুকনো গাছের মত, বা গ্রীষ্মের নীরস মাটির মত অবিশ্বাসে, সন্দেহে অবয়বহীন, অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, তখন তার নাম হয় ঘৃণা। জীবনধারণের অসহায়তা থেকে যে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, তা একদিন শূন্য হয়। 'সে আমার প্রেম' গল্পের পরিণতি চিত্রে তারই ইঙ্গিত আছে। 'গহনমোহ' গল্পের অভিনেত্রী নায়িকা বিবাহিতা রেবার বিবাহবার্ষিকীর অনুভাবনার পাশে সদ্য আলাপ হওয়া শ্রীমন্তের সাময়িক সংসর্গের প্রচ্ছন্ন মোহ, আবেশ, সুখ—ভালবাসায় দুদিককেই সত্য প্রমাণ করেছেন লেখক। 'যে কোন' গল্পের যুবক নায়কের প্রেমিকা প্রীতির অবর্তমানে অন্য অপরিচিত মেয়ে নিয়ে সিনেমা দেখার যে তাৎক্ষণিক সঙ্গমাধুর্য ভোগ, তার তাৎপর্য ও ওই 'গহনমোহ' গল্পের নায়িকার মনোভঙ্গির অনেকটা অনুরূপ। 'জীয়নকাঠি' গল্পে যে স্ত্রী মণিকা স্বামী রতীনের অন্য নারী প্রীতিলতার প্রতি আসক্তির কারণে এক সময়ে বিষপ্রয়োগে আত্মহননের মত ঘটনা ঘটায় এবং তাতেও যখন মৃত্যু না হয়ে অসহায় জীবন্মৃত পঙ্গুত্বই প্রধান হয়, তখন রতীন, যে একদিন প্রীতিলতার প্রতি ভালবাসায় এবং স্ত্রীর প্রতি ঘৃণায় তাকে মারতে চেয়েছে, সে, সেই বিষ নিয়ে এসে অসহায় স্ত্রীর প্রতি অন্য এক ভালবাসায়, তার এমন পরিণাম সহ্য করতে না পেরেই স্ত্রীকে নতুন করে বিষপ্রয়োগের আগে ভাবে—'ঘৃণার বশে সেদিন তোমাকে মারতে চেয়েছি, আজ ভালবেসে তোমায় বাঁচাব, তোমাকে মারব। এই জীবনমৃত্যুর নিগ্রহ থেকে তোমাকে রেহাই দেব। মণিকা ভয় পেয়ো না।' মণিকার মৃত্যু ঘটে, এই ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু রতীনের যে ভালবাসার উপলব্ধি তা প্রেম বিষয়ে অতিরিক্ত একটি জটিল তাৎপর্য নিয়ে আসে।

আগেই বলেছি, সন্তোষকুমার ঘোষ কখনোই নিছক প্রেমের গল্প লেখেননি, লেখেননি প্রেম নিয়ে যৌনতার বাড়াবাড়ির গল্প। তিনি সব সময়েই প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে বুদ্ধি দিয়ে, মননের আলোয় নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জীবনের আর এক নাম যদি প্রেম হয়, আবার জীবনের একমাত্র আধার যদি সমাজ হয়, তবে জীবন, প্রেম ও সমাজ—এই তিনের মিলিত স্বরূপেই যেমন জীবনকে লেখক বুঝতে চেয়েছেন, সমাজের ওঠা-নামা, অবক্ষয় আদর্শকে আঁকতে চেয়েছেন, তেমনি প্রেমের স্বরূপকে জীবন ও সমাজের সম্পর্কের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করতে সদা প্রয়াসী থেকেছেন।

কিন্তু এর পরেও আর একটি দিক আছে। প্রেম নিশ্চয়ই সোজা পথে চলে না। সমস্ত সুস্থ সম্পর্কের দরজার মঙ্গলঘটে তার অধিষ্ঠান সম্ভব নয়। যেহেতু সমাজ আছে, জীবনের নানান চাহিদা আছে, মানুষের মনের গভীর-জটিল রহস্যময় অন্ধকার আছে, তাই তার বিকার বিকলনকে সন্তোষকুমার ঘোষ আঁকতে ভোলেননি। 'বিষ', 'মনে মনে', 'দুই কাননের পাখি', 'আড়াল', 'লেখকের চিঠি', 'কোন অসতীর কথা', 'কোন কুলবধূর

কথা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ইত্যাদি একাধিক গল্পে তার জটিল অস্তিত্বের পরিচয় মেলে।

'বিষ' গল্পের নায়িকা জমিদার বধূ মৈত্রেয়ীর যে গল্পের অন্তিমে অসহায় আত্মহনন, তার মূলে আছে তার একান্ত নিজস্ব গোপন মনোভঙ্গি যা তার একান্ত ব্যক্তিগত আভিজাত্যের অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বার বার সে মনেপ্রাণে গূঢ় বিরোধিতা করে শাশুড়ি মণিমালার জমিদারি অত্যাচারী ও শোষক আভিজাত্য, গর্বকে—যা ছিল অহংসর্বস্ব দম্ভের মত, অথচ মণিমালার মৃত্যুর পর মৈত্রেয়ীর মধ্যে এক এক করে শাশুড়ির স্বভাবের ছায়া তাকে গ্রাস করতে চায়। স্বামী অনঙ্গর শেষ প্রশ্নের উত্তরে তার ভাবনা—'মৈত্রেয়ী আত্মহত্যা করতে চায়নি, বিষ খেয়ে শেষ করতে চেয়েছিল তাকে, নিজের মধ্যে যাকে দেখতে পেয়েছে।' সন্তোষকুমার ঘোষ এমন মনস্তত্ত্ব, মানস-বিকার ও বিকলনকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। 'মনে মনে' গল্পের মূলে প্রেম, কিন্তু মেলনার্স সুবিমল ও সীতার সম্পর্ক-ভাবনায় হাসপাতালের বেডে সুজাতাকে যে 'আঁতের কথা' তাতে আছে সুবিমল সম্পর্কে সেই অদ্ভুত মানসিকতা—'সুবিমল তবে তুমি জীবনে কাউকে ভালোবাসনি। তোমার মাকে না, সীতাদিকেও না। ভালোবেসেছ তাদের অসুখকে। অসুখকে ভালোবাসাও তোমার একটা অসুখ, তুমি নিজেও জান না। আজও আমার এই রোগটাই তোমাকে টানছে। এটুকু গেলে তোমাকে ভোলবার মত আমার কি থাকবে।' 'দুই কাননের পাখি'র নায়ক ডাক্তার সুভদ্র ও নায়িকা নার্স করবীর বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার ও হতাশার মূলে আছে পেশার জীবনের যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা—যা অভিশাপ হওয়ায় তারা বিবাহবিচ্ছেদে রাজি হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। 'সমীকরণ' গল্পের নায়ক প্রৌঢ় প্রতিবেশী অধ্যাপক স্বদেশবাবুর ঝিনুক নামের পাড়ার তরুণীর প্রতি গোপন লোভ, আকর্ষণ ও আচরণ তার অন্তিমে বিবেক দংশনেই শেষ হয়—'আমরা অনেকেই সচ্চরিত্র যেহেতু কাপুরুষ।' 'আড়াল' গল্পে নীলিমা স্বামী অসীমের কাছে নীলিমার বৌদির ভাই রজতের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের বিষয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে তার অসহায় অজুহাত প্রেমে নয়, প্রচ্ছন্ন মানসিক বিকারেই প্রকাশ্য হয়ে যায়।

'লেখকের চিঠি' একটি সার্থক মনোবিকলনের গল্প। বড় বড় তিন ছেলেমেয়ের সংসারে মধ্যবয়সী গৃহবধূ মৃণাল সুধীরবাবুর মত সুন্দর স্বামী থাকতেও বয়সে যথেষ্ট তরুণ স্বামীর পাঠানো দেখতে অসুন্দর পরিমলের আতিথেয়তার মধ্যে একদিন এক জটিল মানসিকতায় তার সঙ্গে বাড়ি থেকে চলে যায়। ফিরে আসে বেশ কদিন বাদে। এমন আচরণের মূলে আছে নারীমনের সেই জটিল তত্ত্ব—মধ্যবয়সী মেয়েকে তরুণী ভেবে যে কেউ, বিশেষ করে তরুণ—প্রেম নিবেদন করলে মহিলার মনের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। হয়তো কোনও প্রচ্ছন্ন যৌবন ফিরে আসে। এ এক জটিল মনোবিকার যা এই সমাজ-সংসারেই সম্ভব। 'কোনও অসতীর কথা' গল্পে স্বামীর সন্দেহপ্রবণ মনের বন্ধন, অন্যদিকে অন্য পুরুষের দেওয়া সাময়িক মুক্তি—দুই টানাপোড়েনে এক নায়িকার জটিল-মনস্কতা ধরা পড়ে। এমন আর এক গৃহবদ্ধ বধূর এক একটি দিনযাপনের কৌতুক ও কৌতূহলের মধ্যে থেকে উঠে আসা মানস বিলাসের সার্থক রূপ দিয়েছেন

লেখক 'কোনও কুলবধূর কথা' গল্পেও। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের কেন্দ্রে আছে স্ত্রী অহল্যার প্রতি প্রবাসী স্বামী ওমপ্রকাশের এক অদ্ভুত-ঈর্ষা—যার ফল অহল্যার একান্ত প্রিয় স্বামীর অবর্তমানে পোষা রাজহাঁসকে একদিন স্বামী খুন করে তার মাংসের রোস্ট গল্পের কথক সম্পূরণ সিংকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোয়।

৬.

উনিশশো আটান্ন সালেই সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প ভাবনায় একটা উল্লেখযোগ্য পর্বের সমাপ্তি ঘটে। যে জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল তীব্র, যে ক্ষয়ধরা সমাজ ও মধ্যবিত্ত সমাজ মানুষের সামাজিক ক্রম-ক্ষয়িত সুস্থ ব্যক্তিত্ব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত সমাজদেহের পতন, পচন, অবক্ষয়জনিত বেদনাবিধুর ভাবনা, মানুষের অসহায়তা, হতাশাবোধ, নৈতিক সমস্ত রকমের আদর্শের অবলোপ বিষয়ে স্থিরনির্দিষ্ট শিল্পভিত্তি, উনিশশো আটান্নর পরে লেখা তাঁর মুষ্টিমেয় কিছু গল্পে তা অপসৃত। এই সময়ে গল্প লিখেছেন কম, ভেবেছেন বেশি এবং সেই ভাবনার কেন্দ্রও হয়েছে একক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সমস্যা। সেখানেও প্রেম আছে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের সংঘাত-সংঘর্ষের চিত্র আছে, বিকার আছে, উচ্চবিত্তের মানসিক মত্ততা আছে, কিন্তু সমস্ত কিছুর ওপরেই নিঃসঙ্গ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আলোকসম্পাত ঘটেছে। ব্যক্তিই মুখ্য, আর সব থেকেছে গৌণ।

কিছু আগে লেখা 'সাধ' গল্পে বৃদ্ধা বৈষ্ণবী গিরিবালার মুমূর্ষু মানসিকতায় যে আর্তকণ্ঠের আবেদন—'এই পাকা চুল থাক, এই ঝুলে পড়া চামড়া থাক, কিন্তু-কিন্তু আমিও থাকি'—এর মধ্যে ব্যক্তির বাঁচার বাসনা তীব্র যৌবন ও জীবনপ্রেমের আলোয় চকিত। 'একটি চরিত্র একটি দিন' গল্পেও আধুনিক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের মূলে আছে এক সূক্ষ্ম প্রেমানুভব, কিন্তু গল্পের শেষ হয় এক সত্তর বছর বয়সের সংসারী, এক সচেতন বৃদ্ধার মৃত্যু ভাবনার নিঃসঙ্গতা দিয়ে, সে নিঃসঙ্গতায় তার যৌবনকাল শুধু নয় একালেরও সেই একান্ত প্রিয় সীতেশ ঠাকুরপো, তার সাম্প্রতিক মৃত্যুশোকটুকুও নেই, 'তা তো নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই শোকে'—এমন ব্যক্তিত্বের, এমন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-অস্তিত্বের প্রকাশ্য ঘোষণা আছে।

গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ এইভাবে 'যুবকাল' গ্রন্থভুক্ত একাধিক গল্পে নিজেকে গল্পের বিষয় নির্বাচনে নিবদ্ধ রাখেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম বিচারণায়, ব্যক্তিত্বের অভিনব অন্তর্লোক ও মোচনে। 'মরামাছি' গল্পের মানুষগুলি একেবারে ওপরতলার। সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনধারণের দায়িত্বের কথা তাদের আদৌ ভাবতে হয় না ; যা ছিল প্রথম পর্বের গল্পগুলির একাধিক নায়ক-নায়িকার মধ্যে। এখানে জীবিতেশের স্ত্রী পদ্মিনী, বন্ধু শুভংকরের ছন্দা। দুই নায়ক ও দুই নায়িকা পরস্পর বিপরীত রূপ ও স্বভাবের। পদ্মিনীর প্রতি শুভংকরের আকর্ষণ ব্যক্তিক কামনা-বাসনার অন্তর্গত। এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা ছন্দার প্রতিবাদ ও বিজয়ের সুখ একান্ত ব্যক্তিগত

অস্ত্রেই—'কি তৈরী হচ্ছে ভিতরে ভিতরে? ভ্রূণ? আর একটি ভ্রূণও কি তৈরী হচ্ছিল কোথাও? ভাবসাবের? ভালোবাসার? ছন্দা কি এই মুহূর্তে তাকে মরতে দেখল? কাঁটা দিয়ে কাঁটা। ভ্রূণ দিয়ে আর একটি ভ্রূণ?'

'দুই রাত্রি'র বিবাহিতা নায়িকা সুধা ও নায়ক নিরুপমের যে সম্পর্কচিত্র সেখানেও সেই ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা-যন্ত্রণার ছবি, সমাজ, জীবন, সংসারের কোনও সমস্যা এখানে নেই। কিন্তু সব চরিত্রই সাংসারিক লোকালয়ের, শরীর মনপ্রাণের ঊর্ধ্বে এক অশরীরী অস্তিত্বের অনুভবেই গল্পের শেষ। নিরুপমের যে উপলব্ধি তা এমন এক প্রেমের,যা জীবনাতিশায়ী। এক রাত্রির সুধাকে ভোগের অভিজ্ঞতা আর এক রাতে অন্য স্বর্গের সুষমায় ধুয়ে মুছে যায়—'আর এখানে? বাইরে যতদূর চাওয়া যায়, ধু-ধু জ্যোৎস্না শুধু। সব সত্যকে আবৃত করে দিয়ে সেই জ্যোৎস্না এক স্নেহক্ষীরা জননী।'

'ফেরা না ফেরা' গল্পের নায়ক সরিৎ, তার স্ত্রী সুপর্ণা ও প্রেমিকা নায়িকা শমিতার যে সমস্যা—সবই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে স্থির। ট্রেনের কামরায় সরিৎ-শমিতার একান্ত গোপন আপন সংলাপে যেমন তার প্রমাণ আছে, তেমনি গল্পের শেষেও ফিরে আসা স্বামী সম্পর্কে সুপর্ণার চিন্তাতে তারই অটল সিদ্ধান্ত—'না সরিৎ, নিজের সঙ্গে ওই বাজিটাও আমি ঠিক এখনই ধরতে চাইছি না, সাহস নেই, পাচ্ছি না।' এই গল্পের ভিত্তি যেমন ব্যক্তিক প্রেম, তেমনি 'বলা না বলা' গল্পেরও। সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নিশীথ-এলার সমস্ত সংলাপ প্রতি-সংলাপের শেষে নিশীথের ভাবনা—'নিহত হল তাদের আগামী দিন-রাত্রির সবগুলি। সামনের দিকে চেয়ে নিশীথ যেন তাদের বাকি জীবনটার পড়ে থাকা লাশ দেখতে পেল।' 'শব—পেছনে এবং সামনে' গল্পে নায়িকা স্থিরার প্রথম স্বামী অসিত, প্রেমিক দেবর মনোময় এবং দেবরের ছাত্র দ্বিতীয় স্বামী বাসুদেব—এদের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা তার শেষ রূপ আরও এক গভীর জটে—বাসুদেবের আত্মহননে—'পিছনের ঘরে এখন তার মৃতদেহ এর পর সামনে চলে আসবে। সারাজীবনে ঐ শব শোধ তুলবে।' স্থিরার এমন উপলব্ধি ব্যক্তির মনের অন্ধকারে জ্বলে-ওঠা আলো হয়নি, হয়েছে জ্বালিয়ে দেওয়া জ্বালা। 'একটি দিনের জন্য' গল্পের মূলেও আছে স্বামী-স্ত্রী অরিন্দম-মিত্রার পুত্রকন্যার সংস্কার থেকেও বহিরাগত সঞ্জয়ের সঙ্গে মিত্রার প্রত্যক্ষ সম্পর্কসূত্রে একটি ফাঁপা মেকি কৃত্রিম মানব মন বন্ধনের জোড়াতালির ছবি।

'যুবকাল' গ্রন্থের শেষতম গল্প 'নিহতের নাম'। মনে হয় সন্তোষকুমার ঘোষ ব্যক্তির কথা বলতে বলতে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমস্যায় ডুব দিয়ে শেষমেশ মানুষ যে কৃত্রিম, যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে এই বোধে স্থির হতে চেয়েছেন। এ গল্পের পরিবেশে পরোক্ষে আছে বাংলাদেশের তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতার কাল। সম্ভবত সেই কালের সমস্ত মানুষের পরিবেশের চাপে মনের দিক থেকে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার, ক্লীব হয়ে ওঠার অনুভূতিই লেখককে এমন গল্প রচনায় টেনে আনে। গল্পের নায়ক শচীপতি স্ত্রী প্রতিমার মৃত্যুকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত কৃত্রিম অনুভবে মেনে নেওয়ার ঘটনায় স্থির হয়ে থাকে। তাকে ডাক্তার

একসময় বলে, 'আপনার ভিতরে যে পাহারাদার সে খুব কড়া।' এই 'পাহারাদার' নায়কের সুস্থ সচেতন সতর্ক বিবেক নিশ্চয়ই। ক্লান্ত শ্রান্ত শচীপতির উক্তি ঃ 'সুখ কোথাও নেই। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় না, কাজে সাফল্য বা উন্নতিতেও না, কিছু কিছু দিয়েও ওসব—কি যেন রেখে দেয়। একটু একটু সন্দেহও করতে থাকি সকলকে, যারাই আমার চারপাশে, সর্বত্রই অবহেলা, অবিচার দেখি। সরে আসি, তারা সরে যায়, ক্রমে ক্রমে একা সেই ভীষণ নিঃসঙ্গতা, প্রচণ্ড শীতে খোলা প্রান্তরে চূড়ান্ত নগ্নতা, সে যে কি অসহ্য তুলনা নেই। একমাত্র আপনার মধ্যেই ডুবে যাওয়া, আর কিছু ভালো লাগে না, সঙ্গ না সান্নিধ্য না, কিছুতে আর দারুণভাবে উল্লসিত হই না, না সমুদ্র-পর্বত ইত্যাদি প্রাকৃতিক শোভায়, না মানবিক সমাজে।' এই নায়ক তার ব্যক্তিত্বের সকরুণ পরিণতির দিক তুলে ধরে। তার আত্মজিজ্ঞাসা আগের স্বীকারোক্তির প্রসারিত রূপ 'নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে, গচ্ছিত রেখে, সমর্পণ করে দিনযাপন, বলুন এর নাম কি জীবন? ঘ্রাণ নেব না কিছুর, স্পর্শ করব না, সব ইন্দ্রিয়কে ছুটি দিয়ে নির্বাসন? নিজেকে নিয়ে খেলে থাকে শুধু নিতান্ত শিশুরা। আমি ভেবেছি, আমিও কি ফিরে যাচ্ছি সেই শৈশবে?' 'সুখ নাই বা থাকল, আমার ইদানীং কোনও কষ্টও নেই, সেই তো আপনাকে বলছি।' নায়কের স্ত্রীর মৃত্যুতে সম্পূর্ণ শোকহীনতার অনুভব এক অর্থে ব্যক্তিসম্পর্কের শোচনীয় অপমৃত্যুই!

৭.

বস্তুত 'যুবকালে'র শেষ গল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ যেখানে এসে থেমেছেন 'কুসুমাদপি' গল্প সংকলনের গল্প এবং সমকালে লেখা গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন একাধিক গল্পে আবার নতুন করে মুখ ফিরিয়েছেন মানুষের দিকে। এখানেই সেই গল্পের বিষয়ের তৃতীয় তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে যে সমাজ, জীবন, প্রেম ভাবনা ছিল, দ্বিতীয় তরঙ্গের ব্যক্তিত্বের বিচারণায় তা ঢাকা পড়ে যায়। ব্যক্তির একা হয়ে থাকায় যে নিষ্ফলতা, তাকে কাটিয়ে উঠেছেন এই পর্বের গল্পে মানুষকে ধীরে ধীরে বরণ করার, অভিনন্দিত করার বাসনায়। এখানে নিশ্চয়ই সেই সময়ের সমাজ ও জীবন পরিবেশ নেই। বিশ্বযুদ্ধের সমকাল থেকে সময় অনেকটা সরে এসেছে। সে সমাজ নেই, জীবনও নেই। সন্তোষকুমার ঘোষ এই পর্বের ছোটগল্পে নতুন করে মানুষকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন।

'কুসুমাদপি' গল্পের নায়ক উর্মিলার প্রেমিক স্বরূপ সমকালের সমাজের সমস্ত আদর্শহীনতার বৈশিষ্ট্য পোশাকের মত নিয়েছে জীবনে। সে প্রবঞ্চক, নারী লোলুপ, অর্থলোভী, ঘৃণ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত। টাকাপয়সা তছনছ করে সে লুকোয় উর্মিলার কাছে, ভোগ করে তাকে। কিন্তু মানুষটা একসময় উর্মিলার বন্ধু নিরালার কাছেও যেতে চায়। যেতে পারে না। ফিরে এসে দলের অন্যদের গুলির ঘায়ে মারা যায় উর্মিলার ঘরেই। কিন্তু নিরালাকে বলা, উর্মিলার উপলব্ধি—'সে মরে নি, নিরালা, ওই ফুলগুলোই

বাঁচিয়েছে তোকে। মরা, ঝরা শিউলির গণ্ডী যে ডিঙোতে পারে না, কে জানে ওই ফুলগুলোই চাঁদের আলোয় ওর কাছে মস্ত বাধা হয়ে উঠেছিল কিনা।' লেখকের নায়ক এইভাবে পরিবর্তিত হয় ব্যক্তির শূন্যতা থেকে মানুষের চিরন্তন মানবিক বোধের পূর্ণতায়। গায়ক স্বরূপ সম্পর্কে নিরালার সঙ্গে কথোপকথনে উর্মিলার শেষতম উক্তিটি —'যে ফুলের গণ্ডী পার হতে পারল না, তার অন্তত একটা মুহূর্ত ফুলের মতই হয়ে উঠেছিল তো?'—এর মধ্যেই জীবনের দিকে ফেরার ব্যঞ্জনা।

'বিবাহ বার্ষিকী' গল্পে মিলিতা নীলেশ শোভনা-র সম্পর্ক বর্ণনার শেষে স্ত্রী মিলিতার স্বীকারোক্তি ব্যক্তির নয়, একদা সাংসারিক মানুষের সমস্ত রকম শূন্যতা, ফাঁকা ফাঁপা মেকি জীবন থেকে বাঁচার বাসনাকেই স্পষ্ট করে—'বলার কথা কিছু নেই, অথচ থাকবেও।...না, নীলেশ, তুমি বরং ক্লাবেই যাও, তাতে নিজেকে খানিকটা পেতে পারো তো পাও। কেউ কথা বলছি না, সেই মূকাভিনয়ের চেয়ে ঢের ভাল। আর আমি?...একলা হয়ে পারি তো আমিও আমাকে একটু পাই, খানিকক্ষণের জন্যে একটুখানি তো বাঁচি—অন্তত বাঁচা যায় কিনা সেটা দেখি।' 'তীর্থের কাক' গল্পের নায়ক চরিত্র আঁকতে বসে লেখক একেবারে নেমে এসেছেন মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে। দেবকান্ত সেই নায়ক যে অফিস, সংসার, অফিসের বস, মেয়ের যুবতী দিদিমণি সুরমা, তার স্ত্রীর প্রতি গতানুগতিক ভাব ভালবাসা—সব নিয়ে এক সমসময়ের টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত চরিত্র। একটি সাদামাটা মানুষের সুস্থতা, উচ্চাভিলাষ ও বিকারগ্রস্ততা, যান্ত্রিকতা সব মিলিয়ে লেখক নতুন করে মানুষকে আঁকতে বসেন এ গল্পেও। এটি একটি মোড় ফেরানোর গল্প সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের ধারায়। 'বাঁচার ভয়' গল্পে স্কুলের উঁচু ক্লাসের দুই ছাত্রী পাপড়ি-বিনুনির সমমৈথুনের ঘটনাই কিন্তু একমাত্র সত্য এবং কেন্দ্রবিন্দু নয়। সেই প্রসঙ্গে স্কুলের অবসর আসন্ন প্রধানশিক্ষিকা অনিন্দিতার সুস্থ থেকে বাঁচার যে বাসনালোক প্রসারিত মঞ্চের ওপর উজ্জ্বল আলোর মত জ্বলে ওঠে, তা-ই সত্য। এ গল্পেও সেই মানুষ এবং মানুষের জন্য লেখকের সহমর্মিতা ও বেদনাবোধ তীব্র।

'কুসুমাদপি'-র শেষ গল্প 'যখন প্রথম।' এখানে বাবা-মা দিব্য ও সীমার একমাত্র মেয়ে মিনাকে কেন্দ্র করে দিব্যর পবিত্র পিতৃত্ব ও মিনার জীবন যৌবন স্বভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের হারানোর অনুভূতির যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তা সাংসারিক মানুষের অসহায়তার আন্তর অভিজ্ঞতাকেই স্পষ্ট করে। তাই মেয়েকে দেখে পিতা দিব্যর স্বগত ভাষণ—'মরলি, মারলিও। কেন, কেন, কেন। একটা তুই মরে অন্য তুই হচ্ছিস, হবি। কিন্তু আমরা? সহজভাব খুইয়ে ফেললে আর কিছু কি হতে পারব?' এও সেই সংসারী মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ানোর প্রয়াস লেখকের মানসিকতার পরিণত রূপের দিক থেকে।

তিন তরঙ্গের বাইরেও কয়েকটি গল্প আছে যা তাঁর ভাবনার ও মননের অন্য বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে। তিনি এদেশের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিয়ে একাধিক গল্প লিখেছেন, তাদের সমস্যা, যন্ত্রণা এসব গল্পে স্পষ্ট, যেমন 'জোড় বিজোড়' 'মিলনান্ত' 'ছাপ' গল্প। রাজনীতি

নিয়ে লেখক কোনও গল্প লেখেননি। কিছুটা রাজনীতির আন্দোলন নিয়ে 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসে ভাবনা আছে, আর অংশত আছে 'সময়, আমার সময়' উপন্যাসে। কিন্তু একালের রাজনীতি পরিবেশ বা প্রেক্ষিত হয়েছে তাঁর 'নিহতের নাম' গল্পে যেমন, তেমনি রাজনীতি স্পষ্টভাবে নায়িকার প্রেমভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত থেকেছে 'রজ্জু' গল্পের নায়িকা হৈমন্তীর মধ্যে। সন্তোষকুমার ঘোষ একসময়ে রাজনীতি সম্পর্কে বলেন, "শেষ কথা সেই মানবিকতা সেই হৃদয়বৃত্তি। 'পলিটিক্যাল' কথাটা শুধু লেবেল যা খসে পড়ে।...ঘটনা মিলায়, মানুষ থাকে। থাকে সার আর বস্তু। সেই 'রিয়ালিটি' 'সুপিরিয়ার টু সুপারফিসিয়াল পলিটিকস্' আর অন্তিম অনুভবে বোঝা যায় ফ্যাক্ট ইজ স্ট্রেন্‌জার দ্যান ফ্রিকশান।" (উপন্যাস ও রাজনীতি ঃ তিন লেখকের বক্তব্য। আনন্দবাজার পত্রিকা) এই বক্তব্যের পক্ষেই থাকে 'রজ্জু' গল্পের লক্ষ্য। সেখানে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা সদানন্দ ও হৈমন্তী এবং হৈমন্তীর সঙ্গে জগদীশের যে সম্পর্ক, তার মূলে নিশ্চয়ই রাজনীতির কৌশল, কিন্তু তা তুচ্ছ হয়ে যায় হৈমন্তীর মানসিক অবস্থার অত্যদ্ভুত উন্মোচনে। সন্তোষকুমার ঘোষ এই গল্পের শেষটি যে গভীরতম ব্যঞ্জনায় এঁকেছেন, তা তাঁর অন্যান্য সমস্ত গল্পের টেকনিকের অভিনবত্বের সমান।

"ইঞ্জিনে সিটি বাজল। চলন্ত চাকার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে গেল জগদীশ, ক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'আছে, কিন্তু আমার গলার ফাঁসি হৈমন্তী?'

গাড়ির গতি বেড়ে গেছে। ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়োয় প্ল্যাটফর্ম কানা। কী জবাব দিল হৈমন্তী, জগদীশ শুনতে পেল না। আদৌ দিল কিনা, তাও না।"

কয়েকটি সার্থক প্রতীকী গল্পও সন্তোষকুমার ঘোষের লেখনী থেকে মেলে যেমন 'সেই মৃত লোকটি', 'শবানুগমন', 'স্থান কাল পাত্র' ইত্যাদি। এইসব গল্প লেখকের ছোটগল্পের আঙ্গিক সচেতনতার প্রমাণ। সন্তোষকুমার ঘোষ কখনও, আগেও বলেছি, প্রেমের গল্প লেখেননি, আমাদের মনে হয় প্রেম সম্পর্কে লেখকের একধরনের সিনিক ভাবনাই এর মূলে সক্রিয়। এমন সিনিসিজম-এর কারণেই তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে বিদ্রূপ অবিশ্বাস। আবার লেখকের মনের 'ম্যাচুওরিটি'-ও বাধা দেয় সহজ সরল প্রেমের বক্তব্য নিয়ে গল্প লেখায়। লেখকের সমস্ত গল্পেই সময় ভাবনা সক্রিয়। তাঁর গল্পে আর একটা জিনিস লক্ষ করার, তিনি গ্রামজীবন নিয়ে তেমন লেখেননি। আগেই বলেছি শহর তাঁকে বেশি টানে। তবে গ্রাম প্রত্যক্ষভাবে বাদ গেলেও স্বপ্নে বা প্রতিভাসে নানাভাবে চরিত্রদের মধ্যে ফিরে এসেছে ; 'মোমের পুতুলে' আছে, আছে ফ্ল্যাশব্যাকে 'মুখের রেখায়'। 'ভেবেছিলাম' গল্পে গ্রাম সেইভাবে ক্রিয়া করেছে শিল্পের প্রয়োজনে।

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের ধারায় এমন তিন তরঙ্গের বিবর্তন বিস্ময়কর শিল্পভাবনার প্রমাণ। 'ঠাকুমার ঝুলি' গল্পেই লেখক বদলাচ্ছেন, এমন কথা আমরা আগেও একবার বলেছি, 'ঠাকুমার ঝুলি' গল্পে ঠাকুমা নিরুপমা ছেলেমেয়ে নাতিনাতনির

সংসারের স্বামী সত্যেনের সম্পর্কে স্মৃতিচারণে—'যৌবনকেই একদা জীবন বলে ভুল করেছিলেন, এখন জেনেছেন জীবন যৌবনকে ছাড়িয়েও।' এমন শেষ ভাবনার মধ্যেই লেখকের মনের স্পষ্ট পরিবর্তনের দিক ধরা পড়ে। জীবন অনেক বড় বেগবান, নিরবধি কাল নিরাসক্ত, নির্মম হতে পারে। কিন্তু জীবন সমস্ত মোহ নিয়েও নির্মুক্ত হতে জানে। সেই ধারণা ও দর্শনের অন্বেষণেই সন্তোষকুমার ঘোষের পরবর্তী স্তরের গল্পগুলিতে দুঃসাহসী পরিক্রমণ সম্ভব হয়েছে।

প্রথম পর্বে জীবন ছিল প্রত্যক্ষ সমাজ, কাল ও মানুষ, অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত। দ্বিতীয় পর্বে সে সব আবৃত, বলা ভাল অপসারিত। এই পর্বে লেখক লিখেছেন খুবই কম। এত কম লেখার, লেখকের শামুকের মত আত্মগোপন করার কারণ কী? কোন কোন প্রতিক্রিয়ায় তিনি এত নীরব, মন্থর? আমাদের মনে হয়, লেখকের নিজস্ব মতে, তাঁর মনের অত্যধিক স্পর্শকাতরতা (sensitiveness) হতে পারে, তা তাঁর ব্যক্তিগত মত, দ্বিতীয় কারণ হল ঃ ব্যক্তির মধ্যে বিষয়কে নিমজ্জিত করা। বুদ্ধির বৈদগ্ধ্যে ব্যক্তিকে একমাত্র সত্য করার কারণেই গল্পের এমন ঘাটতি ঘটে ; তৃতীয়, লেখকের দিল্লিপ্রবাস ও সাংবাদিকতায় গভীর মনোনিবেশ ; চতুর্থ, আমাদের বিশ্বাস, সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার হতাশরূপ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেশ কয়েক বছর কাটলেও সমস্ত রকমের পারিপার্শ্বিক অসহায়তা, অস্থিরতা, নৈরাশ্য তাঁকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পরোক্ষ প্ররোচনা দেয়। তৃতীয় পর্বে লেখকের নতুন করে জীবনকে গ্রহণ। এখানে লেখক যেমন লেখার বিষয়ে গভীরভাবে মানসিক, তেমনি স্পষ্ট মানবিক হয়েছেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ শেষ পর্বের সামান্য কটি গল্পে অনেক সহজ হচ্ছেন রচনার বিষয় ও গদ্য ভাবনা—উভয়তই। গল্প রচনার মধ্যপর্বে বর্তমান লেখক স্পষ্টত নানাভাবে পরীক্ষায় তৎপর ছিলেন, সাম্প্রতিক রচনায় সেই পরীক্ষা করার অবিচল মানসিকতাকে ভেঙেছেন। Realityকে, জীবনকে, মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু মনন দিয়ে যে সার্থক গল্প হয় না এই বিশ্বাসে স্থিত হয়েছেন, হতে আগ্রহী এই লেখক—এই ধারণা আমরা শেষ পর্বের মুষ্টিমেয় কিছু গল্প পাঠেই লক্ষ করি।

দীর্ঘকাল গল্প লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, মাঝে সংখ্যায় কমলেও গল্প লেখা থেকে অবসর নেননি, থামেননি কখনো। এই না থামার পিছনে কোনও জীবনদর্শন (attitude to life) কাজ করেছে কী? সন্তোষকুমার ঘোষ একমাত্র লেখক, যিনি বুদ্ধি দিয়ে জীবন, জগৎ, সংসার, মানুষ, প্রেম, যৌনতা—সব কিছুকে দেখেন, দেখতে অভ্যস্ত। তাঁর গদ্যভঙ্গি, রচনারীতির মধ্যেও সেই বুদ্ধির বিভা। বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকে তীব্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চর্চা করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, কাব্যে বিষ্ণু দে প্রমুখ। গল্পে প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঘরানার, সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁদের অনুকারী, অনুসারী নিশ্চয়ই নন, কিন্তু তাঁদের ঘরানার লেখক, অথচ একটি স্বতন্ত্র আসন

পাওযার মত যোগ্য লেখক। গল্পের ক্ষেত্রে কাহিনীকে বর্জন করে, ঘটনার আকস্মিকতা থেকে সরে এসে একমাত্র বুদ্ধির অস্ত্রে হৃদয়কে ফালাফালা করে বিচার করার চেষ্টায় সম্ভবত সন্তোষকুমার ঘোষ প্রথম পথিকৃৎ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল আবেগ-দীপ্ততার সঙ্গে বুদ্ধির মিশেল। সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে মননের বিশুদ্ধিতে পাঠকদের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। বাংলা সাহিত্যে তা একেবারে নতুন বলেই আমাদের মনে হয়। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় অন্য কোনও জীবনদর্শন সন্তোষকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কিনা, তা নিষ্ঠাবান গবেষকরা স্থির করবেন, কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের ধারায় যে নতুন সুর এনেছেন তিনি একথা আজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করার সময় এসেছে।

৯.

বাংলা ছোটগল্প রচনায় সন্তোষকুমার ঘোষের পক্ষে আর এক কৃতিত্বের দাবি থেকে যায় গল্পের টেকনিকের নিত্য নূতনত্ব সৃষ্টির মধ্যে। এই লেখক কখনোই একই টেকনিক নিয়ে গল্প লিখতে অভ্যস্থ হননি। গল্পগুলি পড়ে বোঝা যায়, তিনি সব সময়েই বলার আঙ্গিক নিয়ে অস্থিরতার মধ্যে থেকেছেন, তাঁর ভাষা ও গদ্যভঙ্গিতে, তাঁর উপমা প্রয়োগে ও বাক্যবন্ধে, তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনায় ও নর-নারীর শৃঙ্গার-সঙ্গম বর্ণনার প্রতীক প্রতিম ব্যঞ্জনায় তাঁর শিল্পীমনের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা একটা সম-এ স্থির হওয়ার অপেক্ষায় থেকেছে। সন্তোষকুমার ঘোষকে ব্যক্তিগতভাবে একটি খেদোক্তি করতে শুনি,—'কিভাবে বাঁচতে হয় শিখতে শিখতে একটা জীবন কেটে যায়। শেখার বিষয়টা আয়ত্ত হলে আর একটা জীবন তখন পাওয়া যায় না।' এমন খেদ হয়তো গল্পের আঙ্গিক নিয়ে নিরন্তর নিরলস শ্রমের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। একালের বহু তরুণতম লেখকের মত এই লেখকের তরুণকালের গল্পের আঙ্গিক সচেতনা আদৌ কৃত্রিম নয়। আঙ্গিকের জন্যই আঙ্গিক হয়নি, গল্পের আত্মার প্রয়োজনেই যে তার এমন সব পোশাক-পরা ও পোশাক-বদল ঘটেছে তা বোঝা যায়।

প্রসঙ্গত একটি উপন্যাসের কথা বলে নিই। তাঁর 'রেণু, তোমার মন' উপন্যাসের আঙ্গিক আগাগোড়া মধ্যমপুরুষের কথায়। এখানে গল্পের থেকে form হয়েছে বড়। সম্ভবত ঠিক এইভাবে উপন্যাস এর আগে কেউ লেখেননি। ঠিক এই আঙ্গিক আছে তাঁর ছোটগল্পেও। প্রথম দিকে গল্পে লেখক পুরনো ধারার সার্থক রূপ রেখেছেন। 'সমান্তর' গল্পে দেখা গেল নায়িকা নিজের কথায় আগাগোড়া গল্পটি বলে। আত্মকথন, কিছুটা আত্মস্বীকারোক্তিমূলক গল্পটি আঙ্গিকের অভিনবত্বে তা স্বতন্ত্র। 'প্রেমপত্র' নায়িকাকে লেখা চিঠির আঙ্গিকে রচিত। 'দুই কাননের পাখি' গল্পের আঙ্গিকের মধ্যে আর এক অভিনবত্ব। নায়িকার পক্ষে 'এক পক্ষ' বিচারকের কাছে উকিলের সওয়াল, 'অপর পক্ষ' অংশে নায়কের পক্ষে উকিলের বক্তব্য পেশ। এমন আঙ্গিক গল্পের

রের বক্তব্যকে স্বচ্ছ স্পষ্ট করার ব্যাপারে যথোপযুক্ত।

'পরমায়ু' গল্পটি আগাগোড়া বলেছে উত্তমপুরুষ নায়ক, তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দুটি চরিত্র সুরপতি ও সুমিতার চরিত্রের ও সম্পর্কের রহস্যময়তা সৃষ্টি গল্পের অন্তিম চমকের পক্ষে শিল্পসম্মত। 'স্ত্রৈণ', 'লেখকের চিঠি', 'কোনও কুলবধূর কথা' গল্পগুলি আঙ্গিকে নতুন। এমনকী 'কোনও অসতীর কথা' গল্পের নায়িকার মনে মনে রিকশাওয়ালা ট্যাক্সিওয়ালা ও বাস কন্ডাক্টরকে সম্বোধন করে নিজের ভিতরের কথা বলার রীতি নিশ্চয়ই বাংলা ছোটগল্পে নতুন। যেভাবে গল্প শেষ করেছেন, তাতে গল্পের আকর্ষণ পাঠকদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। 'যুবকাল' গ্রন্থের শেষ গল্প 'নিহতের নাম' গল্পের নায়ক শচীপতি যেভাবে নিজেকে নিজের আত্মার সংকটকে উন্মোচিত করেছে, তা তার চরিত্রের উপযোগী বৈশিষ্ট্যই।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রকৃতি বর্ণনার প্রতীকী ব্যঞ্জনা ও স্মার্টনেস লক্ষ করার মত ঃ

১. 'জোলো দুধের মতো ফিকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া শহরটাকে দেখাচ্ছে গগন ঠাকুরের কিউবিস্ক ছবির মতো ; মাছের আঁশের মতো ছড়ানো মেঘের নিচে দূরে হাওড়া ব্রিজটা যেন প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় কোন জন্তুর কঙ্কাল। গঙ্গার জলের ওপরে সামান্য কুয়াশা জমেছে ঃ স্বচ্ছ আয়নার ওপরকার নিঃশ্বাস পড়েছে যেন।' ('শরিক')

২. 'শুধু এক একটি বিকেলের রক্তাক্ত মৃত্যু আর সন্ধ্যার বিষণ্ণ জন্ম প্রত্যহ চেয়ে চেয়ে দেখতেন।' ('সমীকরণ')

একালের গল্প-লেখকরা নর-নারীর শৃঙ্গার ও সঙ্গম বর্ণনায় হন বেপরোয়া। যৌনতা প্রায়ই হয়ে ওঠে আদিরসের আকর। সন্তোষকুমার ঘোষের লেখনীতে তার রূপ বিপরীত। লেখক কখনোই অকারণে তা আনেননি, আঁকেননি, যেটুকু এনেছেন, তার উপস্থাপনা একজন দক্ষ, বুদ্ধিপ্রাণ ছোটগল্প শিল্পীর। তা প্রতীকে সুন্দর, মনোরম, অনেক বেশি ব্যঞ্জনাধন্য ঃ

১. 'অস্থির পায়ে বারান্দায় পায়চারি করল শুভংকর, শরীরের শিরা জ্বলছে সলতের মতো। টলতে টলতে ঢুকল নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে। খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছে ছন্দা, যেন কোন ইন্দ্রাণী। পা দোলাচ্ছে। শুভংকর এগিয়ে গেল, ধপাস করে পড়ল বিছানার উপরে। কাঁকড়ার মতো দাঁড়া বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল ওর কোমর, যদিও আলো জ্বলছে—তবু অনর্গল করতে চাইল ছন্দাকে।

'না'—সারা দেহ কঠিন করে ফেলল ছন্দা, সে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হচ্ছিল তুবড়ির মতো, শাড়ির গিঁট আর সায়ার দড়ি শক্ত করে সামলাতে সামলাতে বলছিল, বলছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে, 'না। বাইরে মদ গিলে এসে ঘরের বেসিনে বমি করতে দেব না।'

'অবুঝ বাছুরের মত ওর কোলে মুখ ঘষছিল শুভংকর, কথাটার মানে বুঝতে পারছিল না।

'লক্ষ্মী, লক্ষ্মীটি' ধরা গলায় বলছিল সে, 'সাড়া দাও। আজকের মতো শুধু। আমাকে ছুঁয়ে দ্যাখ, কী হয়ে গেছি। তুমি কি পাথরের প্রতিমা।'

'যদিও তখন ছন্দাকে দেখাচ্ছিল যেন পাথরের কোনও প্রতিমা, তবু তার চোখে হঠাৎ দুষ্টু একটি হাসি খেলে গেল। খুলে দিল খোঁপা, শুভংকরের মুখ চুলের রাশিতে ঢেকে দিল, দেহের খিল খুলে দিতে দিতে, কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বলল, 'দরজায় খিল দিয়ে আসবে না?' চোখে কি ঝিলিক দিচ্ছে ছন্দার, কোনও ফন্দি কি সে আঁটছে।

'শুভংকর দেখতে পেল না।' ('মরামাছি')

২. 'নুয়ে পড়ে সুধা হাত-ঘড়িটা খুলল, ওর পিঠের আঁচল সরে গিয়েছিল, দেখতে পেলাম অন্তর্বাস নেই, আঁচল সরে গিয়েছিল বলেই, ছোট জামাটা নেই দেখতে পেলাম, পিঠের কাছে পর পর দুটো বোতাম শুধু। পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা অঙ্কের মতো, 'তৈরী হয়েই এসেছি' সে বলল আবার চাপা গলায় হিস হিস হিস পিচ্ছিল সাপ জড়িয়ে ফেলছে আমায়, আলো নেই, আলোটা পুট করে নেবাল কে, টের পাচ্ছি। সেই গলা যেন কারও গলা নকল করে, কার গলা করে—কার বলছিল 'এই তো চেয়েছিলে তুমি, এই তো চাও?'

'কী চাই আমি, কী-নেব-কী-দেব, চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়া সব অন্ধকারে কাঠ ঠোকরানো, অন্ধ আর্তদুটি কাঠঠোকরা পাখি, শরীর মানে কি একখণ্ড কঠিন কাঠ, কঠিন সাড়াহীন, সাড়াহীন কিন্তু জ্বলছে, রচিত চিতার বিকট ফটফট যেন, তবু বারকয় তাকে ছুঁচ্ছি, যত ছুঁচ্ছি তত আমার সব কিছু ঝলসাচ্ছে। যখন আলো জ্বাললাম তখন আমার পাশে পোড়া কাঠ ছাড়া কিছু পড়ে ছিল না।' ('দুই রাত্রি')

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের কাহিনী তেমন নেই, গল্প আছে কিন্তু ঘটনা কম। লেখক স্বয়ং মনে করেন তাঁর উদ্ভাবনাশক্তিকে ঘটনা সৃষ্টির ব্যাপারে নিয়োজিত রাখতে তিনি বিমুখ। মনে করেন, গল্পে ঘটনা যতটুকু বক্তব্যের পক্ষে প্রয়োজন, ততটুকুই অপরিহার্য। এককালে তারাশংকরের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন লেখক, কিন্তু গল্পের গদ্যে কোথাও সেই পূর্বসূরিদের 'ন্যারেটিভ স্টাইল' কে গ্রহণ করেননি। তাঁর বাক্যবন্ধে যে বুদ্ধির দীপ্তি, যে মননের সচল রূপ তা তাঁর ব্যক্তিত্বজাত। সম্ভবত তাঁর গদ্যের যে অতিরিক্ত স্মার্টনেস, তা তাঁর বাঙালি হয়েও ইংরেজি ভাষার অতিরিক্ত দখলের কারণে ও প্রভাবে, এবং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সমধিক পরিচয়ের কারণে। তাঁর শব্দ সৃষ্টি ও ব্যবহার গদ্যের স্মার্ট বন্ধনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মূলত—বলা ভাল।

লেখকের রচিত গল্পগুলির নামেও আছে ব্যঞ্জনা। তিনি নাম রাখার ব্যাপারে চরিত্রের ওপরের দিকে তাকাননি। লক্ষ রেখেছেন তার ভিতরের স্বভাবে, মানসিকতায়। নামকরণে এনেছেন কেন্দ্রীয় বক্তব্যের চমৎকার ব্যঞ্জনা। প্রত্যক্ষতায় তাঁর বিশ্বাস বা ভালবাসা নেই। তাই গল্পগুলির নাম এমন—'চিনেমাটি', 'পরমায়ু', 'যাদুঘর', 'কানাকড়ি', 'স্বয়ম্বরা', 'কস্তুরীমৃগ', 'পাখির বাসা', 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ছায়াঘর', 'ভেবেছিলাম', 'চিররূপা', 'মরামাটি', 'কুসুমাদপি', 'তীর্থের কাক' ইত্যাদি।

১০.

'একালের গল্পকে গল্পের কাছে ফিরতে হবে'—সামনাসামনি বসে নিজের গল্প সম্পর্কে কিছু সংবাদ দিতে গিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ এমন মন্তব্য করেন একদিন আমার এক প্রশ্নের উত্তরে। সম্ভবত এমন মন্তব্য তাঁর দীর্ঘদিনের সার্থক গল্পগুলি লেখার ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সাম্প্রতিক স্থিরনির্দিষ্ট প্রত্যয়। তাঁর গল্প প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষা—কী বিষয়ে, কী রচনায়—তাঁকে তীব্র আঙ্গিক সচেতন করেছে। এই সচেতনা যেমন আছে তাঁর গল্পের সামগ্রিক আরম্ভে-শেষে, আছে ঘটনা-বর্জনে, আছে গদ্যভঙ্গির নিরন্তর পরিবর্তন-স্বভাবে।

এবং এই দিয়েই সন্তোষকুমার ঘোষের স্ব-কাল, উত্তরকাল ও একেবারে একালের লেখকদের সঙ্গে পার্থক্যের সূত্রগুলি টেনে ধরা যায়। এই লেখকের আগে-পিছে স্ব-কালের তিন লেখক সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আমরা আগে করেছি। সামান্য ক'বছরের ব্যবধানে উত্তরকালের লেখকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিমল কর ও সমরেশ বসুর প্রসঙ্গে আর দু'একটি কথা প্রতি-তুলনায় বলা প্রয়োজন মনে করি। বিমল কর তাঁর গল্পের বিষয়কে একমাত্র প্রধান করেছেন মানুষের মনের গভীর গোপন রহস্যময় জগৎ, আর তাকে চিত্রণ করতে যে রচনারীতি গদ্যভাষা নিয়েছেন, তা শীতল, নিভৃত আবেগ-সঞ্চারী। বিমল করের গল্পের গদ্য নিজস্ব, তা তীব্র পরিবেশ সচেতন, তাই চরিত্রগুলি একান্ত গোপন মনের স্বভাব চিহ্নিত। অন্যদিকে সমরেশ বসু, তারাশংকরের মত একাধিক বিষয়ে পরিক্রমা করেছেন তাঁর গদ্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে। গদ্যে তেমন পরীক্ষা বোধ হয় করার সময় পাননি সমরেশ বসু। বিমল কর সেই তুলনায় অতি সচেতন, সতর্ক, কোনও বক্তব্যকে চিত্রস্বভাব দিতে গিয়ে কী সংলাপে কী বর্ণনায় একাধিক ডাইমেনশান রচনায় কৃতী লেখক।

সন্তোষকুমার ঘোষ এঁদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নিরাসক্তি তাঁকে ত্যাগ করেনি, কিন্তু তিনি বুদ্ধিকে তান্ত্রিক আচারের মত ব্যবহার করতে গিয়ে এই সব লেখক থেকে সরে এসে বুঝিবা শ্মশান সাধনার আর এক আসন তৈরি করেছেন। এই সতর্কতা কি তাঁর হৃদয় স্বভাবকে সরিয়ে রাখে? তাঁর বুদ্ধি, যুক্তি, মনন কিছুটা 'সিনিক' শ্লেষ, ব্যঙ্গ, আত্মজৈবনিক মানসিকতা কী গদ্যে কী বিষয়ে কবিত্বকে বর্জন করতে চায়? আমার মনে হয়, শ্রেষ্ঠ কবিত্ব বলতে যদি শিল্পীর সূক্ষ্মতম অনুভবের উচ্চ কল্পনাসুন্দর আকাশ বিশাল প্রকাশ হয়, তবে সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে সেই কবিত্ব অসাধারণ রূপে উপস্থিত। তাঁর বুদ্ধি তাঁর হৃদয়ের ভাষা ও কবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবকে আচ্ছন্ন করেনি, মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনে সাময়িক আবৃত করেছে মাত্র, এটা সহজবোধ্য হয় গল্প পাঠে। সমকালীন লেখকদের থেকে এখানেই তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

পাঁচের দশকের মাঝামাঝি ও শেষ থেকে এবং ছয়ের দশকের শুরুতে কিছু লেখক কথাসাহিত্য রচনায় হাত দিয়ে এখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা

সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ এঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁরা নিশ্চয়ই সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের সনিষ্ঠ, স্বভাবী পাঠক। এঁরা কি এই পূর্বসূরি লেখকের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত, না, মুক্ত? প্রভাবিত হতেই হবে, নিশ্চয়ই একথা আমার নয়, কিন্তু এই লেখকের রচনার ধারায় এঁদের স্বাতন্ত্র্যটুকু ধরতে পারলেই সম্ভবত গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষের মানসিকতার আর এক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা যাবে। কিন্তু সে প্রয়াস পরবর্তী আলোচকদের হাতেই থাক।

সাত ও আটের দশকের এই সময় পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্প নিয়ে কিছু ছোটখাটো আন্দোলন হয়েছে। গল্পে গল্পকে বর্জন করার মানসিকতায় একাধিক তরুণ লেখক মসিকে অসির মত ক্ষুরধার করে উর্ধ্বে তুলে প্রতিবাদী হয়েছিলেন। আজ তাঁরা আবার এক অর্থে গল্পে গল্পকে গ্রহণ করতে চলেছেন। এমন প্রয়াস কি সন্তোষকুমার ঘোষের সেই মন্তব্য 'গল্পকে গল্পের কাছে ফিরতে হবে'—এমন শিল্প-আত্মস্থিত প্রাজ্ঞ মন্তব্যের কাছেই একালের গল্পকারদের প্রতীক প্রতিম প্রণাম নয়?

বাংলা সাহিত্যে দেখা গেছে, বঙ্কিমের প্রভাব ছিল রবীন্দ্রনাথে, অচিরাৎ রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব কাটিয়ে হন একমেবাদ্বিতীয়ম্। কল্লোলের কালের লেখকের প্রভাব ছিল উত্তরকালের লেখকদের। সন্তোষকুমার ঘোষ নিজেও তা সে সময়ে এড়াতে পারেননি। কিন্তু পরে কাটিয়ে উঠে একা হয়েছেন নিজস্ব ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি বা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত লেখক কি কেউ হবেন, না আছেন? মনে হয় তাঁর বুদ্ধি দিয়ে লেখা গল্পের এমন দ্যুতি ও দীপ্তিকে, স্বাতন্ত্র্যকে গ্রহণ করার মত উত্তরসূরির পরিচয় পেতে হলে এখনো খুঁজতে হবে। তার অনুকারী-কে চাই না, সার্থক অনুসারীকে বাংলা সাহিত্যের একালের ছোটগল্পে যখনই খুঁজে পাওয়া যাবে, তখনই সন্তোষকুমার ঘোষের একটা নির্দিষ্ট স্থানের সীমাকে সানন্দে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। আপাতত সেই প্রতীক্ষায় আমরা নিশ্চুপ হই।

কিনু গোয়ালার গলি

[এক বন্ধ অন্ধ গলির বিভ্রান্ত অবক্ষয়িত জীবনের পালাগান]

একজন অতি সচেতন, সতর্ক, জীবন-সন্ধিৎসু ও আত্মানুসন্ধানী কথাকার তাঁর আবির্ভাব কালে তাঁর পরিপার্শ্বের সময়ের সঙ্গে জীবন-দেখা ও উপলব্ধির যাবতীয় স্থায়ী সমাধানহীন গরমিলের হিসেব-নিকেশ করতেই কলম ধরেন। সামনে বেগবান স্রোতমুখর সময় যা কিছু বৈপরীত্য নিয়ে আসে, লেখক তার প্রতিক্রিয়ায় অন্বেষণে তৎপর হন, হবেনই। আজীবন অন্বেষণই তাঁর লেখকজীবনের সহজাত কবচ-কুণ্ডল। সময় আর সমাজ, ঘটনা আর মানুষ, সময় ও সমাজের Immorality আর লেখকের Intuition —এসব মিলে-মিশেই লেখকের Interpretation গড়ে সমস্ত কিছু জড়ানো এক জীবনদর্শন। এই দর্শন কথাকারের পক্ষে কখনোই চাপানো নয়, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে-ওঠা।

এই হয়ে-ওঠায় একমাত্র গ্রানিট-ভিত গড়ে সমাজের বদল। সাহিত্য তাই এক 'Social Institution'। সমাজ আর মানুষ যৌথ সম্পর্কের নিবিড়তায় তার ভাষা তৈরি করে। তাও হয়ে-ওঠা, তাও সৃজন। একজন কথাকার স্রষ্টা হয়ে এই সমাজ, সময় ও ভাষার সমবায়ে যে জীবন আঁকবেন, তার মূলেই তৈরি হয়ে যায় Interpretation—নতুন রূপ—যাবতীয় বন্ধ অন্ধ প্রচলিত ধিক্কার জানিয়েই। এই শিল্প-ন্যায়েই বিশ শতকের চল্লিশের দশকের শুরুর কথাকার সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে কলম নিয়ে বসেন। কলম এক বুদ্ধিমান জা‹ শিল্পীর। পাস্কাল একসময়ে বলেন হৃদয়েরও যুক্তি আছে। কথাকাররা হৃদয়ের কথা বলেন, কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ যখন হৃদয়ের কথা লেখেন উপন্যাসে, তখন যুক্তিকে হৃদয়ের অধিগত করে বুদ্ধির হয়ে-ওঠার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। হৃদয় শুধু প্রবাহিত হয়নি নদীর মত, বার বার এখানে-ওখানে, দুই পাড়ে চর তৈরি করতে করতে হৃদয়ের এক কঠিন রূপের প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায়।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে হৃদয়ের কথা আছে, কিন্তু তা বুদ্ধির অনুপুঙ্খ দিয়ে রীতিমত যাচাই করা। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এই উপন্যাস যুদ্ধোত্তর কালের এক ভিন্ন দলিল। আপাতত উপন্যাসটির আলোচনায় প্রথমেই এমন কথা কবুল করায় কোনও দ্বিধা থাকছে না। আমরা আগেই বলেছি যে সময়ের কথা বলতে চাইছি, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ছ'টি বছরের শেষদিকের তলানির মত এক বিপন্ন বিষণ্ণ অংশ। যে সমাজের কথা বলতে চাইছি, তা-ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে

ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার ইতিহাস-খণ্ড।

দুই সেপ্টেম্বর উনিশশো পঁয়তাল্লিশের যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ ঘোষিত। তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষেরই তৈরি মন্বন্তরের গড়ে-ওঠা এক শ্মশানের ওপর তথাকথিত সন্ধি-শান্তির প্রলেপ। এক বছর পরে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে'র নামে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। তার এক বছর পরে দেশ বিভাজনে কর্কট রোগের মত ক্ষতের বিস্তার দুই বাংলায়। 'কিনু গোয়ালার গলি'-র প্রথম প্রকাশ ঘটে ধারাবাহিকভাবে সে সময় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ষোড়শ বর্ষ উনপঞ্চাশ সংখ্যা থেকে। এর গ্রন্থরূপ মেলে প্রথম এপ্রিল উনিশশো পঞ্চাশে—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পাঁচ বছর পরে। সেই একই শিল্পন্যায়ে লেখক সময়ের কেন্দ্রে রেখেছেন চোখ, মনের গভীরে খুঁজেছেন বিধ্বস্ত সমাজের সেই অন্ধ অসুস্থ উৎসমুখ—যেখানে জীবন বিপর্যস্ত উথাল-পাথাল, রোগবিধুর।

বিদেশি শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনীতি ছিল বুর্জোয়া স্বভাবে কীটদষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে তার অবক্ষয়িত স্বভাবকে পূর্ণ করে মন্বন্তর। শুধু অর্থনীতি নয়, অর্থনীতির সঙ্গে গভীর-সমন্বিত থাকে রাজনীতি, সমাজনীতি। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি—এই ত্রিমুখী স্বভাবের শোষক শ্রেণীর অব্যবস্থায় সমাজবদ্ধ মানুষ—ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্ররা হয় সময়ের পুতুল। যুদ্ধ-সমকালে বৃটিশ সৈন্যদের জন্য বিপুল পরিমাণ রসদ সংগ্রহের প্রয়াসে সমাজ ও জীবনে তীব্রতম আড়ষ্ট অস্থিত রুদ্ধশ্বাস চাপ পড়ে।

এর সুযোগ নেয় সরকারের পোষ্য ব্যবসায়ী ও উচ্চ মর্যাদার আমলারা, তারা ধনী থেকে, উচ্চবিত্ত অবস্থা থেকে আরও ধনী। যারা দরিদ্র তারা তো চরম অভাবে নির্মম শিকার হয় অসহায় অবধারিত মৃত্যুর। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী মধ্যবিত্তরা ভয়ংকর ভাঙনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এই ভাঙন কিন্তু কিছু মানুষকে পথের ভিখিরির দিকে ঠেলে দেয়। তারা নিম্নবিত্তে কোনওরকমে জীবন কাটাচ্ছিল। আর একদল শিক্ষিত আত্ম-মর্যাদা ও স্তরের কৌলীন্য রক্ষায় অহংবোধের অধিগত জীবনগ্রহণে সচেষ্ট। জীবনযাপন নয় জীবনধারণের জন্যই স্তর থেকে নেমে আসে সমস্ত নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে মিথ্যা নীতিকথার আশ্রিত হয়।

সম্পূর্ণ নীতিহীন মুনাফা সঞ্চয়ে ও অর্থের প্রতি প্রবলতম আগ্রাসী মনস্কতা থেকে ঘটে কালোবাজারি, মুনাফাখোর মজুতদারদের উদ্ভব। পাশাপাশি বিষম টালমাটাল মধ্যবিত্তরা সংসারের তথাকথিত আভিজাত্য বাঁচাতে বাড়ির মেয়েদের পাঠায় যে কোনও ধরনের চাকরি নিতে। অবশ্যই সাংসারিক নীতিবোধ থেকে তখন বাঁচার তাগিদটাও এসবের মূলে প্রধান হয়ে ওঠে। পরিবারজীবন থেকে বেরিয়ে এসে নারীরা প্রকারান্তরে ভদ্রবেশী গণিকাবৃত্তির শিকার হয়। সংসারবিচ্ছিন্ন জীবন হয় চরম উৎকেন্দ্রিক। সংসারের বাইরের ঠাট যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা করে ভিতরে ঘুণপোকার স্বভাবকে লালন করতে বাধ্য হয়।

এসব অবশ্যই শহুরে জীবনে সংক্রামকের মত প্রসারিত হয়। যুদ্ধ শেষ, দাঙ্গা, দেশ বিভাজনের অভিশাপ-দুষ্ট হয়ে মধ্যবিত্ত মানুষ শহরে বসে নীতিহীন জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকে। গ্রাম থেকেও অতিরিক্ত অর্থের আশায় শহরে আসে কেউ কেউ। চাষীরা

শহরে আসে খেয়ে-পরে বাঁচার জন্য। শহরের উপকণ্ঠে নতুন শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হতে থাকে। এসবের ভিতরে কাজ করে দুর্নীতি, অপরিমিত লোভ। অর্থহীনতার অসহায় প্রতিক্রিয়া। যাবতীয় নীতি-আদর্শের, মানবিক মূল্যবোধের, গোপন লোভের অর্থমূল্যে বিক্রয় ঘটে।

যুদ্ধ-সমকালে অপচয়িত বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকট সামাল দিতে শোষক সরকার প্রচুর উৎপাদিত খাদ্যের তুলনায় অনেক বেশি নোট ছাপে, বাজারে ছাড়ে। যুদ্ধ শেষ হলে আবার সেগুলি বাজার থেকে তুলে নেওয়ার সময় দেশীয় ছোটখাটো ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। হাহাকার ওঠে ধনী আমানতকারীদের মধ্যে যেমন, তেমনি ছোট ছোট মধ্যবিত্ত পরিবারের সামান্য জমানো অর্থ বিনাশেও। এদিকে দেশ বিভাজনে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে দেখা দেয় অবক্ষয়। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মধ্যে ভ্রষ্টাচার, সুযোগসন্ধান, নৈরাশ্য। একদিকে মন্বন্তরের মধ্য থেকে বেঁচে থাকার ভয়ংকর জ্বালায়, নীতিহীন আত্মধ্বংসের আয়োজন, আর একদিকে বীভৎস দাঙ্গার কারণে সীমান্তবর্তী ভদ্র নারীদের ইজ্জত বাঁচানোর কঠিন সংগ্রাম ও সমস্ত প্রতিবাদের নিষ্ফলত্ব—এপার বাংলার নগর জীবনের অভ্যন্তরে কর্কট রোগের জীবাণুর জন্ম দেয়, জাল বিস্তার করে। শহর জীবন হয় সমস্তরকম অবক্ষয়ের, নীতিধ্বংসের, নরনারীদের বিকৃত দেহসম্পর্কের আদ্যাপীঠ। এর স্বরূপ মেলে যুদ্ধ শেষের কালে, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আতঙ্ক তখন মানুষের মন থেকে অপসারিত, কিন্তু যুদ্ধের দূষিত রক্ত তখন বাংলাদেশের বড় বড় শহরের জীবনমূলে যেনবা আর এক বিকৃত জীবনদায়ী সমূল ধ্বংসের সঞ্জীবনী। শহরজীবনের এই অন্তর্গূঢ় স্বভাব গ্রামকে গ্রাস করতে উৎসুক।

সন্তোষকুমার ঘোষ 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের পটভূমি নিয়েছেন শহর কলকাতা। সে সময়ে কলকাতা তথা বাংলাদেশে তখনো প্রবল বামপন্থী গণবিক্ষোভ চলেছে, চলেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উতরোল আন্দোলন। সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর উপন্যাসে সেই বাইরের আবেগ, আন্দোলন, তার প্রবলতা ও গতিময়তাকে আদৌ নেননি। কারণ সেসবের বিচার তখনই করা সম্ভব ছিল না। তার ইতিহাস তার ললাট-লিখন দিয়ে বিচার করে যাবে।

এই উতরোল পরিবেশ থেকে কথাকার সন্তোষকুমার ঘোষ যেনবা এক ভয়ংকর তান্ত্রিক চোখে শিল্পীর মমতায়, উদারতায় ও নিরাসক্তি দিয়ে অর্থনীতি, সমাজ, জীবন, স্খলন, পতন এসবকে দৃষ্টির সামনে এনে বিচার করেছেন সময়ের স্বভাবে একেবারে গভীর গোপন পতনকে। তাই 'কিনু গোয়ালার গলি' পুরনো গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনার উপন্যাস হয়নি, হয়নি ঘটনার গাঁথা মালার সুখপাঠ্য শোভা, তা হয়েছে এক বিশাল আধুনিক শহরের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আঁকা এক অন্ধ বন্ধ গলির প্রতীকপ্রতিম রূপের গভীর বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত, অবক্ষয়িত জীবনের গম্ভীর আধুনিকোত্তম জীবনবেদ, সমাজের ময়নাতদন্তের নিখুঁত শিল্পরূপ। তাঁর সমকালের সমস্ত উপন্যাসের থেকে আলাদা, আধুনিক। শুধু সঙ্গী হয়েছিলেন 'বারো ঘর এক উঠোনে'র লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

২.

'কিনু গোয়ালার গলি' সচেতন বুদ্ধিপ্রাণ লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম লেখা উপন্যাস। লেখকের নিখুঁত শিল্পী-মনের এক যৌবন-দীপ্তি এর মধ্যে নিশ্চয়ই মেলে। এর কথাকার মন লালিত হয়েছে দ্বিতীয় সমকাল ধরে। তাঁর সেই লালন-করা মনোভূমি অনিকেত থাকেনি সময়ের স্বভাব নিয়ে, জীবন-অন্বেষায় আশ্রয় পেয়েছে শহরজীবনের নিখুঁত পটে। একথা তো ঠিক, একমাত্র আধুনিক শহরই হতে পারে উপন্যাসের উপাদানের যথার্থ সঞ্চয়-ক্ষেত্র। তাতেই আধুনিক উপন্যাস 'মহাকাব্য' হয় Modern Bourgeois Society-র দাবি সম্মত শিল্প-প্রতিমার প্রকরণে।

সন্তোষকুমার ঘোষ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ভাবনায় তাঁর কথাসাহিত্য—বিশেষ করে শুরু 'কিনু গোয়ালার গলি'র মত প্রথম উপন্যাস থেকেই—একেবারে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখেছেন। মাত্র ষোল-সতেরো বছর বয়সে তিনি ফরিদপুর ছেড়ে কলকাতায় আসেন। তখন তিরিশের দশকের শেষার্ধের শুরু প্রায়। আর তিরিশের দশক মানেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যাবতীয় সন্ধি-শান্তির শর্তাবলীর কবর খোঁড়ার উদ্যোগের, সমাপ্তির ইঙ্গিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সামনে আগত লগ্নেই চিহ্নিত। নতুন করে যুদ্ধ আরম্ভের সংকেতের পিছনে গভীরে কাজ করেছে সর্বতোভাবে বুদ্ধিনির্ভর যুক্তিতর্ক। তার সমাধানহীন নিষ্ফলত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে ভয়াল পরিণতির দিককে দেখাতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর বীভৎস ছ'টি বছরের ছবি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে যুবক সন্তোষকুমার ঘোষ বুঝে যান রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-পরবর্তী সময় থেকেই পূর্ব-ঐতিহ্যের সমাজের গভীরে যেমন ধরেছে পচন, পতন, তেমনি শিল্পের প্রসঙ্গে ও প্রকরণে দেখা দিয়েছে যথেচ্ছ ভূমিকম্পের মত ভাঙন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাই পূর্ববর্তী সমস্ত শিল্পধারণার মূলে এনেছে কুঠারাঘাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে শিখিয়ে দেয়—নতুন বিষয় ও প্রকরণে শিল্পকে নতুন জন্মে শিহরিত করতে হবে। এই চিন্তাভাবনা ছিল মননে, বুদ্ধি-বিচারে, কথাকারের অনুভব থেকে উপলব্ধির গভীরে।

সব আগাছা, গাছগাছড়া, আবর্জনা—যা শিল্পের গায়ে জন্মেছে এতকাল, তাদের উপড়ে ফেলে নতুন কথা বলতে হবে। এই মননসমৃদ্ধ বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ লেখেন প্রথম উপন্যাস। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসে বড় হয় মনন, বুদ্ধি, শিল্পপ্রকরণের নতুন নতুন ভাবনা। এই যুবক লেখক তখন সচেতন—যুদ্ধের ধাক্কায় কথাশিল্প আর বিলাসের আরামের বিষয় হতে পারে না, হতে হবে রূঢ় বাস্তব সৃষ্টির উপাদান। এই শিক্ষা ও মনন, অনুভব ও উপলব্ধি, বাসনা ও উত্তরণের মন ও স্বভাব নিয়েই সন্তোষকুমার তাঁর ব্যক্তিত্বে পরিপার্শ্ব ও ঐতিহ্যসম্মত কথাকারদের থেকে স্বতন্ত্র হলেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ গ্রাম থেকে সোজাসুজি এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁর নগরজীবনপ্রীতি তাঁকে শুধু নগরপ্রেমিক করেনি, করে এ বিষয়ে ব্রতধারী। আর নগরজীবন মানেই বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের রক্তরূপে তীব্র আকর্ষক। তিনি সস্তা রোমান্টিক গল্প-কাহিনী লিখতে পারলেন না, হলেন নগরজীবনের ইট-কাঠ-পাথরের স্খলন-পতনের,

যাবতীয় অবক্ষয়ের, নীতি ও নীতিধ্বংসের, অসহায় জীবনস্বভাব ও তার সফল চিত্রীর কথাকার। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের গলির মুখের ব্যায়ামের আখড়ার ঠিক পরেই প্যারিস জুয়েলারির প্রোপ্রাইটার প্রমথনাথ পোদ্দার যেনবা লেখক স্বয়ং—সেই গলির সাক্ষী, সেই যুদ্ধক্রান্ত অবক্ষয়িত কলকাতার অন্ধকার অধিতলের প্রতীকে স্বয়ং উপস্থিত কথাকারই।

প্রথম উপন্যাসেই বিষয়ের এই স্বাতন্ত্র্য সমসাময়িক বিমল কর, রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ভাবনা থেকে পৃথক করে। বিমল কর আসেন কলকাতায় যুদ্ধ শুরুর সালে, দু'বছর বাদে কলকাতায় স্থায়ী হন রমাপদ চৌধুরী। সন্তোষকুমার ঘোষের থেকে এঁদের কলকাতা সম্পর্কিত ভাবনার তফাত অনেক বেশি। বিমল করের প্রথম উপন্যাস কলকাতা নিয়েই—নাম 'দেওয়াল', বেরয় তিন খণ্ডে, উনিশশো ছাপান্ন'র প্রথম খণ্ডের প্রকাশ থেকে উনিশশো বাষট্টির মধ্যবর্তী সময়ে। রমাপদর প্রথম উপন্যাস লেখা হয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম নিয়ে--'প্রথম প্রহর' আগেই লেখা বেরয় উনিশশো সাতান্নয়। সমরেশ বসু মাত্র বারো বছর বয়সে ঢাকার গ্রাম ছেড়ে আসেন নৈহাটিতে। তাঁর নয়নপুরের মাটি, উত্তরঙ্গ, শ্রীমতী কাফে—এমন সব উপন্যাসে মেলে প্রাক্-যুদ্ধশেষের মন্বন্তর যেমন, তেমনি যুদ্ধোত্তর নানা আন্দোলন, ইতিহাস খণ্ড। প্রত্যক্ষ রাজনীতি তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎকে দিগন্তপ্রসারী এক বর্ণবহুল প্রান্তরের স্বভাব দেয়।

আমাদের কথা হল, আগে-পরে আবির্ভাবের স্বভাব থাকলেও এঁদের থেকে সন্তোষকুমার ঘোষ লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের কথাকার। বিমল কর কলকাতার নাগরিক জীবনের লেখক, কিন্তু কালের প্রেক্ষাপটের কথায় নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে গভীর-তলের আলো-অন্ধকারে চকিত মনের ছোট ছোট খণ্ডকে সামনে এনেছেন। তাতে আবেগ আছে ছোট মাপে, কিন্তু হৃদয় আছে বড় স্বভাবে। রমাপদ চৌধুরী কলকাতায় বসে প্লটের জটিলতা রেখেও কালের কথাকে বিস্তারিত করেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষের আসন সেখানে এক বুদ্ধির নানা পোশাক পরা তান্ত্রিকের—যার চোখে আছে বুদ্ধিবিদগ্ধ নিরাসক্তি, স্বভাবে আছে এক নিপুণ শিল্পীর মমত্ব। তাঁর সাহিত্য নগরজীবনের গোপনতম শরীরের, তার স্বভাবের নিপুণ পোস্টমর্টেম। তাই সন্তোষকুমার ঘোষ কালের গতিতে কথাকার সত্তায় স্ব-ভূমিতে স্ব-রাট্।

মিল আছে শুধু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে মানসিকতায় ও বিষয় গ্রহণে—অন্তত প্রথম দিকের উভয় লেখকের উপন্যাসের বিষয়গত তুলনার কথা মনে করলে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কলকাতায় আসার ঘটনা সন্তোষকুমার ঘোষের একেবারে সমসময়ে। ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতায় কলকাতার সে জীবন হয় বিবস্ত্র বাস্তবতার। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী'র প্রকাশ ঘটে সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসটি প্রকাশের এক বছর পরে। যার সঙ্গে মানসিকতায় এই দুই লেখকের মিল—সেই 'বারো ঘর এক উঠোনে'র প্রকাশ উনিশশো পঞ্চান্নয়। নাগরিক মনস্কতায় দুজনেই এক, দুজনেই মনের গভীরে ডুব দিয়ে নাগরিক মনের মূল্যবান উপলখণ্ডের সন্ধিৎসু। তবে দুজনের তফাত

অন্য মানসিকতায়। জ্যোতিরিন্দ্র যেখানে অন্ধকারের মধ্যে আরও অন্ধকারকে টেনে এনে আলোর সন্ধানী, সন্তোষকুমার ঘোষ সেখানে তীব্র বুদ্ধি-সংকটে স্থিত থেকে সমাজ, সময় ও জীবনের পোস্টমর্টেমে ব্যস্ত।

মিল মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের প্রতিচিত্রণেও। জ্যোতিরিন্দ্রর নায়ক-নায়িকা ওপরতলা থেকে নামতে নামতে এসেছে বারো ঘরের বস্তিতে, সন্তোষকুমার ঘোষের নীলারা এসেছে প্রতীকী বদ্ধ অন্ধ 'কিনু গোয়ালার গলি'তে। তবে কলকাতাকে, নগরজীবনকে দুজনে দু'রকমভাবে দেখেছেন। নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা, অনন্বয়, অনিকেত জীবন স্বভাবকে জ্যোতিরিন্দ্র নিরাসক্তি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, সন্তোষকুমার সমস্ত শূন্যতা সত্ত্বেও বাঁচার দিকে নায়ক-নায়িকাদের ঠেলে দিয়েছেন—যদিও তার মধ্যে অসহায়তা ও সামাজিক উৎকেন্দ্রিকতা এতটুকু আড়াল হয়নি।

আমাদের কথা, সন্তোষকুমার ঘোষ একমাত্র বুদ্ধিকেই প্রধান অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা দিয়ে নগরজীবনের অংশীদার করেছেন। এখানে তিনি স্বতন্ত্র মনের কথাকার। আমরা তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যেও তা-ই পাই। প্রসঙ্গত বলি, সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ—এই তিন ব্যক্তিত্বের পরিপার্শ্ব বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা জাগে। এঁরা তিনজন প্রত্যেকেই স্ব-ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, যুদ্ধ-সমকাল অতিক্রম করে এঁরা যেভাবে শিল্পীমনে পথিকৃৎ হয়েছেন তাঁদের সৃজনে, সন্তোষকুমার তা থেকেও ভিন্ন পথের যাত্রী। তিনি যেভাবে যুদ্ধজনিত ভূমিকম্পে সমস্ত পুরনো মূল্যবোধের ধ্বংস ও বিনাশকে অনুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তার রূপ ও স্বরূপ সময়েরই নিশ্চিত অঙ্গুলিনির্দেশ, হয়তো বা সমাধানও।

আর সেই চিন্তা-ভাবনায় তিনি কিনু গোয়ালায় গলির পর একে একে নানা রঙের দিন, মোমের পুতুল (সুধার শহর), মুখের রেখা, জল দাও, স্বয়ং নায়ক, সময়, আমার সময়, শেষে 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'—এসবের মধ্যে একভাবে থেকেছেন বুদ্ধিপ্রাণ। তাঁর নানাভাবে সেই স্বীকারোক্তি ও আত্মদর্শন ও সমীক্ষণ উপন্যাসে হয়েছে তাঁর জীবন দর্শনের অনুপন্থী। আর এই মননক্রিয়ায় তিনি গদ্যকে করেছেন মেদহীন, বুদ্ধি-শুদ্ধ অলংকরণে অকৃত্রিম, অভিনব, কিছুটা বা তিক্ত, কষায়।

বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক জীবন বাঞ্ছিত, সূক্ষ্মতম বুদ্ধিপ্রাণিত গদ্যের প্রাণস্বরূপ প্রবাহিত করেন। আগে বঙ্কিমচন্দ্রে এর সফল সূত্রপাত হলেও গদ্যভাষার উজ্জ্বল বর্ণময় সৌন্দর্যে তা অন্তঃশীল থেকে আর এক স্বাদ দেয়। স্বাদের স্বাতন্ত্র্যদানে একই ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দুজনেই আপনাপন ব্যক্তিত্বে আমাদের ভক্তের স্থাণুত্ব দেন। আসেন প্রমথ চৌধুরী। এর পর কল্লোল ধরে আসেন জগদীশ গুপ্ত, পরে ধূর্জটিপ্রসাদ, কবি জীবনানন্দ, কথাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ। সন্তোষকুমার ঘোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে লিখতে বসে এঁদের পথের সাথী হয়ে ওঠেন নিজের অজান্তেই। সন্তোষকুমার ঘোষ উপন্যাস লিখেছেন ভিতরের তাগিদে—যার প্রাণনা আসে সমাজ ও সময় থেকে, গদ্য লিখেছেন সময়ের শিক্ষায়,

গদ্যকে নতুন করে গড়ার নিগূঢ় বাসনায়।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সন্তোষকুমার ঘোষ নিজে ছিলেন অসম্ভব রবীন্দ্রভক্ত, কিন্তু তিনি নিজেই একসময় বলেন, রবীন্দ্রভক্ত হলেও রবীন্দ্র-প্রভাবিত নয়, লেখায় নিশ্চিত অ-রাবীন্দ্রিক। কল্লোলের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে সন্তোষকুমার ঘোষ প্রথম রবীন্দ্রবিরোধী নন,, অ-রাবীন্দ্রিক কথাকার। এর মূলে কাজ করেছে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও চল্লিশের দশকের সব কিছু ভেঙে চুরমার করার শক্তির প্রচণ্ড আঘাত। যাঁরা কোনও কারণে কারোর ভক্ত হন জীবনের শেষ পর্যন্ত, তাঁদের দু'টি ভাগ ধরা পড়ে মনের গঠনে—একদল আবেগতাড়িত ভক্ত থেকেই শেষ করেন জীবন পরিক্রমা, আর একদল বিবেকশীলিত মনে ভক্তির শেষ ঘটান চরম নিরাসক্তিতে। সন্তোষকুমার ঘোষ এই দ্বিতীয় দলের রবীন্দ্রভক্ত—অনেকটা চৈতন্য-ভক্ত গোবিন্দদাসের মত কবিরই কথায় 'গোবিন্দদাস বহু দূর'। সন্তোষকুমার ঘোষ কথাকারের ভূমিকায় নেমে তাঁর সব উপন্যাসেই বিবেকী গদ্যের পরীক্ষা করে গেছেন। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস সেই গদ্যের প্রথম উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। জীবনানন্দের গদ্য গঠনে আছে কবির কলম, জগদীশ গুপ্তের গদ্যে মেলে রুক্ষ আলস্যহীন রক্তিম নিরাসক্ততা, ধূর্জটিপ্রসাদের গদ্যে মেলে বিদেশি বুদ্ধির অনুসরণ। সন্তোষকুমার ঘোষ এঁদের ধারায় আর এক 'মাইলস্টোন'। অন্নদাশংকরের গদ্যের পিছনে কাজ করেছে তত্ত্ব, যুক্তিতর্ক। সেখানে আগে মেলে শিক্ষিত মনের খেলা, শেষে সংযত আবেগের বিস্ময়। সন্তোষকুমার ঘোষের গদ্যের সঙ্গে মেলে মানিকবাবুর গদ্য। মনে হয়, সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর শিল্প-শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে মানিকবাবুকে পরোক্ষে গুরু করেছিলেন। মানিকবাবু সংক্রান্ত যাবতীয় মন্তব্য (প্রাসঙ্গিক ত্রৈমাসিক 'অন্বিষ্ট' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যায় একটি লেখা) আমাদের মন্তব্যের সমর্থক।

৩.

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস পাঠে বোঝা যায়, উপন্যাসটি কোনওক্রমেই কোনও বিশেষ নায়ক বা নায়িকা চরিত্রের ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরতর প্রশ্নকে সামনে আনে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, কল্লোলেরও আগে রবীন্দ্র-ভাবনায় প্রবল পরিবেশে যে শরৎচন্দ্রীয় বিবেক-বিচারবুদ্ধিহীন আবেগ ঝড়ের বেগ আনে পাঠক মহলে, তার থেকে নতুন আস্বাদ দেয় এই উপন্যাস। কল্লোলীয়রা—প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য এঁদের সূত্রে, এবং এঁদের ভিন্ন পথে বিভূতিভূষণ-তারাশংকর প্রমুখ যেভাবে শরৎচন্দ্রীয় আবেগ থেকে সরে এসে কথাসাহিত্যে বিচরণ করেন, স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের পরে সন্তোষকুমার ঘোষ সে সূত্রের পাশে রাখেন ভিন্ন স্বাদ। মানিকবাবু জানতেন বাস্তবতা বস্তুর detail নয়, মনের জটিলতম অনুসন্ধানই। মনই একমাত্র বাস্তব। তাই যুদ্ধের কালে মানিকবাবুর মনের ঘটে বদল। পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুল নাচের ইতিকথায় যা ছিল 'থিওরি' থেকে জাত, যুদ্ধ সমকালে ও পরে মানিকবাবু তাকে যথাযথ বাস্তবতা শিক্ষার শিরোপা দেন। সন্তোষকুমার

ঘোষ সেই সূত্রে সোজা কাহিনী বর্জন করে, 'থিম'কে একমাত্র লক্ষ্যে রেখে, প্লটের জটিলতায় নগরজীবনের পটকে নিবিড় যোগে আর এক নতুন কথা শোনান। অবশ্যই 'থিম'কে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিকোত্তম উপন্যাসের গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

তাই 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে নেই নিটোল কাহিনীবৃত্তে জড়ানো প্লট, ঘটনা ও চরিত্রের মোটা দাগের মাখামাখি, আছে থিম-এর নিপুণ নির্দেশে প্লটের ঘটনা-বিবিক্তি, চরিত্র-মন দিয়ে নিখুঁত বুননে তৈরি হওয়া এক ভিন্নস্বাদী শিল্প-মনন। এর কাহিনী অংশ একেবারেই সামান্য। 'কিনু গোয়ালার গলি'-র পুরনো সামন্ততান্ত্রিক জীবনস্বভাব বিনষ্ট। তার আবাসিক বসাকবাবুদের সেই সমস্ত অবশিষ্ট গৌরব কবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাদের পরিত্যক্ত বাড়িতে আসে নীলা—ওর মা-বাবা, দাদা-বৌদি—শিবতোষবাবু-নিভাননী, দেবব্রত-অমিতা নতুন ভাড়াটে হয়ে। ওরা ছিল আধুনিক সভ্যতার জ্বলজ্বলে জায়গা পপলার পার্কের বাসিন্দা—আর্থিক সচ্ছলতায় ও মুক্ত আভিজাত্যের গৌরবে বিস্ময়কর ছিল ওদের সংসারজীবন ও পরিপার্শ্ব। ওরা এবার আর্থিক কৌলীন্যে নিচে নামতে থাকে। এটা যুদ্ধোত্তর নিয়তি। আগে আসে মধ্যবিত্তদের অঞ্চলবিশেষ ভবানীপুরে, পরে সেখান থেকে বৌবাজারে। শেষে এই 'কিনু গোয়ালার গলি' অন্ধ, বন্ধগলির অন্ধকার শ্বাসরুদ্ধ জীবনে।

একে একে এই গলিতে সময়ের দাবিমত অবতরণিকের স্বভাবে এসে ভাড়া নেয় শান্তি-মণীন্দ্র সান্যালরা। আসে ইন্দ্রজিৎ—কলেজ জীবনের ছাত্র, স্বভাবে তরুণ কবি। এই বাড়ির পাশাপাশি ভাড়া নেয় নার্স শকুন্তলা ও তার 'সেবাসত্রে' আশ্রিত কয়েকজন নার্স। নীলা সেই পপলার পার্কের বন্ধুদের—মনন, সৌম্য, মণীশদের থেকে, তাদের অভিজাত জীবন-স্বভাব থেকে অনেক দূরে এসেছে। জড়িয়ে পড়েছে অন্ধ এই গলির জীবন পরিবেশে। বাঁচার তাগিদ এখানে এক উৎকট স্বভাবে নীলাকে অক্টোপাসের মত জড়ায় ধীরে, অতি ধীরে।

বিবাহিত শান্তির সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ জড়িয়ে যায়, কখন যেন সরীসৃপের স্বভাবে। কলেজে পড়া নীলা ইন্দ্রজিতের একেবারে কাছে চলে আসে। শকুন্তলার 'সেবাসত্রে'র সমস্ত ইউটোপিয়ার বিনাশ ঘটে শকুন্তলার পূর্ব স্বামী বনমালী সরকারের ঠাণ্ডা মাথায় সেবাসত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়। দাদা দেবব্রত ও বৌদি অমিতার যৌথ প্রয়াসে নীলার কাছাকাছি এসে যায় বিপত্নীক, অমিতার কাকা ধনী মধ্যবয়সী অবিনাশবাবু। অদ্ভুত এক আকর্ষণ এ গলির—নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে, উচ্চাভিলাষী স্বার্থপর মানুষদের কাছে, অসহায় যুবক-যুবতীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের পক্ষে। এই গলি এক অমোঘ চুম্বক, এক নিয়তির নির্মম নির্দেশ। ইন্দ্রজিৎ শান্তিবৌদি ও নীলার মধ্যে যেনবা দাবার ঘুঁটি। বেকার ইন্দ্রজিৎ কাজ পায় প্রেসে। নীলাকে নিয়ে সংসার করার কথা যখন ভাবে, তখন নীলা অন্তঃসত্ত্বা। আর্থিক সচ্ছলতার পর শান্তিবৌদি গলি থেকে বেরিয়ে গিয়েও ইন্দ্রজিৎকে ভুলতে পারেনি। নাটকে স্বামীর অর্থসাচ্ছল্য বিপুল হলেও শান্তিবৌদির ইন্দ্রজিৎ-আকর্ষণ, ইন্দ্রজিতের এড়িয়ে না থাকতে পারার অবোধ অসহায়তা নীলাকে

নির্মম করে। ভেঙে যাওয়া সেবাসত্রের সঙ্গে যুক্ত সে হয়ে যায় শেষমেশ শকুন্তলার সঙ্গে ব্যবস্থাপনায়--রাতের অন্ধকারে পালিয়ে। অমিতার মধ্যবয়সী অবিনাশকাকুর বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায় অন্তঃসত্ত্বা নীলাকে গ্রহণ করার সুযোগ এলেও। সবশেষে লেখক কাহিনীর পরিণামী খবর শোনান, গলিটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের হাতে চলে যাবে, তার সরব তোড়জোড় হবে--এমন ঘটনায় শুরু জানিয়ে।

এই সমস্ত কিছুর একমাত্র সব সময়ের সাক্ষী প্যারিস জুয়েলারির প্রোপ্রাইটার শ্রীপ্রমথনাথ পোদ্দার। উপন্যাসে সামান্য আখ্যানের যে রেশটুকু মেলে তার শেষ চিত্র এই রকম :

'প্রমথ একটা হাই তুলল, তুড়ি দিয়ে সব ক্লান্তি যেন উড়িয়ে দিতে চাইল। যাক, যাবেই তো। শাবল আর গাঁইতির মুখে আরশোলা, ইঁদুর আর পোকা-মাকড় দিগ্বিদিকে পালাবে ; কিন্তু আরও ঢের আগে পালাতে শুরু করেছে মানুষ। আর কদিনে সব সাফ হয়ে যাবে। একটি প্রাণীও থাকবে না এই কিনু গোয়ালার গলিতে।

ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে বিচিত্র একটা হাসিতে প্রমথর মুখ ভরে গেল। প্রমথ যাবে না। আজ দুপুরে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অফিসে গিয়ে প্ল্যান দেখে এসেছে প্রমথ।

জরিপের কী একটা আশ্চর্য কৌশলে তার ছোট্ট এই দোকানখানি বেঁচে গেছে।

কিন্তু প্রমথর হাসি শুধু সেজন্যেই নয়। এ-গলির বেশির ভাগ বাড়ির দলিলই যে বন্ধকীসূত্রে তার সিন্দুকে বন্দি, বসাকবাবুরা ছাড়া এ খবর কেউ রাখে না। নদী তলে তলে অনেক দূর খেয়ে গেছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে, দোকানে তালার ওপর তালা লাগাল প্রমথ।'

মোট বাইশটি পরিচ্ছেদে ভাগ-করা 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের মূল কাঠামো। 'কাঠামো' যদি 'কঙ্কাল'-এর উপমেয় হয়, তবে কথাকার এই কঙ্কালের সারা অবয়বে একে একে মেদ, মজ্জা, মাংস যোগ করেছেন যথাযথ, রক্ত সরবরাহ করেছেন আপন বিশুদ্ধ শিল্প-ভাবনায়, প্রাণ ও স্বভাবের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন নগরজীবনের প্রেক্ষিত ও অবক্ষয়িত সময়, সমাজ ও জীবনসমস্যার বিপুল বিচিত্র উপকরণের তাৎপর্যময় ব্যঞ্জনার সৃজনে। যে-কোনও উপন্যাসের প্লট-বৃত্ত তৈরি হতে পারে বৃক্ষের স্বভাবে। মূল প্লটের প্রধান কাঠামো হল এক গাছের মোটা কঠিন গুঁড়ির মত। তার শাখা-প্রশাখা হল প্লটের ছোট-বড় আখ্যান। শাখা-প্রশাখার গা বেয়ে যে পত্রপুষ্পের সমাহার, ফলের ভার, সবই উপন্যাসে চরিত্র। গাছের শীর্ষদেশ প্লটের চরমবিন্দু--যেখানে প্লটের চমক সমগ্র উপন্যাসের মূলকে নির্দিষ্ট করে, নির্মাণের নির্দিষ্ট পরিণতিকে বোঝায়। গাছের বুক ভরে পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে বাতাসের খেলা, পাখিদের ডাক, ঘরসংসার--সবই কথাকারের জীবন দেখার সর্বাবয়ব ঐশ্বর্যের দিক। প্লটের কঠিন বাঁধনের সাদৃশ্য মেলে শক্ত মূল গুঁড়ির সব কিছুকে একটি কেন্দ্রে ধরে রাখার ক্ষমতার মাপে।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে সন্তোষকুমার ঘোষ উপন্যাসের মূল 'থিম'কে

কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে স্থির রেখেছেন। তাই তাঁর এই উপন্যাসে অকারণ বানানো কাহিনীর বিস্তার নেই, নেই ঘটনার অতিনাটকীয় সংঘটন। এমনকী ঘটনাকে এড়িয়ে গিয়ে মনের গভীরে ডুব দিয়ে যুদ্ধোত্তর নগরজীবনের ক্ষয়রোগের স্বরূপ সন্ধানই লেখকের অন্বিষ্ট থেকেছে। তাই 'থিম' নির্ভরতা প্লট-গঠন প্রসঙ্গে লেখকের সংযমকে দেখায়। এক একটি অধ্যায়ে একাধিক প্রসঙ্গ আছে ছোট ছোট ছবির স্বভাবে, কিন্তু তারা শুধু ছবি বা নকশা হয়নি। পরবর্তী অধ্যায়ে সেসবেরই সূত্র ধরে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার সাবলীল শিল্পপ্রয়াস মেলে। এইভাবে উপন্যাসটিতে লেখক এক একটি জীবনপ্রসঙ্গকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। নীলা-ইন্দ্রজিৎ-শান্তিবৌদি, আলাদাভাবে নীলা-ইন্দ্রজিৎ, শান্তিবৌদি-ইন্দ্রজিৎ, শান্তিবৌদি-স্বামী মণি সান্যাল, শকুন্তলা-স্বামী বনমালী সরকার, দেবব্রত-অমিতা-নীলার মা, দেবব্রত-নীলা-অবিনাশকাকু—এমন মুখ্য-গৌণ সম্পর্ক-খণ্ডগুলি গভীর তাৎপর্য পেয়েছে নিছক তাদের আচার-আচরণের কাহিনী-স্বভাবে নয়, মূল 'থিমে'র দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত মর্যাদায়।

উপন্যাসে নার্স শকুন্তলার 'সেবাসত্র' প্রসঙ্গ এসেছে সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথমে। তার আগে প্রথম থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎকে গলির মধ্যে ছোটমাপের ভাড়াটে করে এনে শান্তিবৌদি-ইন্দ্রজিৎ-নীলা, শান্তিবৌদি-মণীন্দ্র, নীলার দাদা দেবব্রত ও অমিতা-অবিনাশকাকুর প্রসঙ্গ—এসব দিয়ে এক নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘুণধরা জীবন-স্বভাব আঁকার চমৎকার আয়োজন পর্বের উপক্রমণিকা করেছেন লেখক। আসলে 'সেবাসত্র' ও শকুন্তলার স্বামী বনমালী সরকার, নীলা-ইন্দ্রজিৎ-শান্তিবৌদি-মণীন্দ্র সান্যাল—এদের যাবতীয় তৎপরতা ছোটখাটো সম্পর্কসূত্রহীন নকশা হয়নি। প্রসঙ্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পটির কথা এখানে রাখা যায়। এই গল্পে মানিকবাবু একাধিক মানুষ ও পরিবারের মধ্যেকার মন্বন্তর-পরবর্তী সুবিধাবাদী মানুষের সৃষ্টি বস্ত্র-সংকটের ছবি এঁকেছেন সম্পূর্ণ নকশার রীতিতে। প্রতিটি ছবির সঙ্গে সেই যোগ নেই যা একটি ছোট পূর্ণ আখ্যান হতে পারে। এর প্লটে একটি 'থিম', তার প্রতিষ্ঠায় এসেছে একাধিক নকশা। 'কিনু গোয়ালার গলি'-র ছোট ছোট প্রসঙ্গ কখনোই নকশা হয়নি, প্রতি খণ্ডের সঙ্গে যোগ আছে সূক্ষ্মসূত্রের আর সব মিলিয়ে সেই লক্ষ্য—যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত নগরজীবন, তার মধ্যবিত্ত মানুষের বিষজর্জর মনোভঙ্গি, নীতিহীনতা ও ভেঙে যাওয়ার অসহায় অবয়ব। এটাই জীবন, সমাজ, সভ্যতার নিয়মে, নীতি নির্দেশে উপন্যাস শিল্পের 'থিম'।

অর্থাৎ 'কিনু গোয়ালার গলি'র প্লট গঠন এনেছে রুদ্ধশ্বাস শীতল আকর্ষণ পাঠকদের মনে-মননে। প্লটে মোট পাঁচটি প্রসঙ্গ জট পাকায় কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রমথনাথ পোদ্দারের ছবি ধরে : (১) নীলা-ইন্দ্রজিৎ প্রসঙ্গ ও সম্পর্ক, (২) শান্তিবৌদি-ইন্দ্রজিৎ-মণীন্দ্র সান্যাল কথাসূত্র, (৩) অবিনাশকাকু-দেবব্রত-অমিতাদের স্বার্থসবস্ব তৎপরতা, (৪) শকুন্তলা-বনমালী সরকার উভয়ের ও বনমালীর ব্যক্তিমনের সম্পর্ক, (৫) শান্তিবৌদি-ইন্দ্রজিৎ-নীলার ত্রিমুখী সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতম ঠাসবুনন। প্রমথনাথ পোদ্দার যেনবা লেখকেরই প্রতিনিধি—আবার কালের বিবর্তনের নির্মম সাক্ষীও।

অত্যন্ত সহজভাবে প্লটে এসেছে শকুন্তলার 'সেবাসত্র' প্রসঙ্গ। এই সেবাসত্রই যে নায়িকা নীলার শেষতম একক বাঁচার উপায় ও আশ্রয় হবে, অভিনব দক্ষতায় লেখক তার নিখুঁত বুনন এনেছেন। মেদহীন প্লটগঠনে কথাকারের দক্ষতা অতুলনীয়। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয় সচেতন সতর্ক স্বভাবী পাঠকরাই কখন যেন প্লটের নিখুঁত হয়ে-ওঠার সঙ্গী হয়ে ওঠে। প্রমথনাথ পোদ্দারকে সামনে রেখে এভাবে প্লটের দৃঢ় কঠিন সূত্র রচনায় সন্তোষকুমার ঘোষই স্বাধীনতা-উত্তরকালে উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম পথিকৃৎ।

৪.

'কিনু গোয়ালার গলি' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের নগরদর্পণ। এই নগর অবশ্যই কলকাতা। কলকাতার চলমান জীবনছবির কোলাহলমুখর বাইরের রূপের উতরোল স্বভাব এতে নেই। আছে যুদ্ধের প্রবলতম অভিঘাতে বিনষ্ট নগরজীবনের গোপনতম জীবন-স্বভাবের, পরিবর্তিত ভাঙা মানুষদের মনোলোকের চিত্র—যা রূপ নয়, নগর-সভ্যতার স্ব-রূপকে, সত্তার লক্ষণীয় বদলকে সামনে আনে। যে-কোনও আধুনিক যুদ্ধ সভ্যতার মহা বিনষ্টি আনে। তা বাইরের রূপে আঘাত হেনে নাগরিকদের অস্থির, চঞ্চল করে ঠিকই, কিন্তু ভিতরের স্বভাবে নিঃশব্দ ঘুণপোকার জন্ম ঘটায়।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর উপন্যাসে সেই অন্তর্বর্তী ঘুণপোকার সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। তাই উপন্যাসে লেখকের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত কলকাতার ভিতরের অন্ধকারের ছবি। যুদ্ধ সমকালে কলকাতায় রাতগুলিতে ছিল আলোয় ঠুলি-পরানো পরিবেশে রহস্যময় আলো-ছায়ার আড়াল, সন্তোষকুমার ঘোষ যেনবা সেই আলো-ছায়ার স্বভাবে যুদ্ধ-ক্লান্ত শহরের অভ্যন্তরে অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় বক্তব্য তৈরি হয়েছে তাঁর আঁকা মানুষগুলির স্বভাব, প্রতিক্রিয়া ধরে।

যে-কোনও সভ্যতা আগে শহরের বুকে প্রতিষ্ঠা পায়, পরে তার গ্রামের বুকে প্রসার ঘটে। শহরই সভ্যতার প্রধান আধার। সন্তোষকুমার ঘোষ মনে করেন, যুদ্ধ যে সভ্যতার মূলে আঘাত করে, তা শহরেরই সভ্যতা, সেই সভ্যতার বদলই লেখকের লক্ষ্য এ উপন্যাসে। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নীলার প্রেমসম্পর্ক, শান্তিবৌদি ও ইন্দ্রজিতের গোপনতম আচরণ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, নীলার দাদা-বৌদির অবিনাশকাকুকে লক্ষ্যে রেখে যাবতীয় স্বার্থচিন্তা, শকুন্তলার পূর্বস্বামী বনমালী সরকারের ডাকসাইটে সাংবাদিকের ভূমিকায় থেকে স্থূল স্বার্থ চরিতার্থ করার কুৎসিত প্রয়াস ও সেবাসত্রের একজন সদস্যা গীতার সঙ্গে অবৈধ সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া—এসব দিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্যকে এক কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ করেছেন। এরা সকলেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শহরের পোড়-খাওয়া ভাঙা মানুষ—ভিতরে ভিতরে ক্রমশ হয়ে-ওঠা নষ্ট মানুষ। এইসব নষ্ট মানুষ যে নগরজীবনের ভিত গড়ে যায় নিজেদের স্বার্থে, জীবনাচরণে, অথচ অলক্ষ্যে অন্তরীণ স্বভাবে—তারাই 'কিনু গোয়ালার গলি'

উপন্যাসে নির্মাণ করেছে লেখকের নগরদর্শনের স্বতঃস্ফূর্ত 'মিশন'।

অর্থনীতির সম-বণ্টন ব্যবস্থায় শহর-সভ্যতা সুস্থ থাকে। আমাদের ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতি। তারই আওতায় বুর্জোয়া শহর-মানুষ, পরিবার, জীবনকে অনিকেত স্বভাব দেয়। এই স্বভাবেই মানুষ, তার জীবন হয় বিকারগ্রস্ত। পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে ফেলে প্রগতিশীল নতুন মূল্যের উদ্ভব ঘটে না, সমস্ত নীতি-বিধ্বংসী অবতরণ ঘটে মানবস্বভাবের। তা হয় অমানবিক। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে নীলা-ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে মেলে তারই পরিচয়। যুবক ইন্দ্রজিৎ ও যুবতী নীলার প্রেমসম্পর্কে কোনও অস্বাভাবিকতা, বিকৃতি থাকত না যদি তা স্বাধীন হত। নীলা এগিয়েছে ইন্দ্রজিতের দিকে শান্তিবৌদির সঙ্গে ঈর্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এই ঈর্ষা নীলাকে আত্মধ্বংসে প্রাণিত করেছে। নীলা আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বে মেতে হয়েছে অবৈধ অন্তঃসত্ত্বা। তার বিকারগ্রস্ত নিঃশেষ রূপ অর্থাভাবে প্রকট। ভালবাসার যে সমস্ত মানবিক গুণ—সেগুলি নীলাকে যৌবন-দীপ্ত করেনি, দেহসম্ভোগে ও তার অবৈধ বাসনার প্রান্তবর্তী করেছে।

অন্যদিকে শান্তিবৌদির স্বামী থাকা সত্ত্বেও লেখক-স্বামী মণি সান্যালের অর্থনৈতিক অসহায়তার যেনবা চ্যালেঞ্জে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে খেলায় মেতেছে। এ এক ভয়ংকর খেলা। সুস্থ সভ্যতার পরিপন্থী এই প্রতিক্রিয়া। এক রুগ্‌ণ পচনশীল রূপ শান্তিবৌদির মানসিকতায় অন্তঃশীল থাকে। সুযোগসন্ধান, সুবিধাবাদ সুস্থতার বিপরীত। শকুন্তলার 'সেবাসত্র' নিয়ে সুস্থ জীবনের যাত্রী হওয়ার বাসনা অসুস্থ নয়। কিন্তু স্বামী বনমালী সরকারের সমস্ত রকম সক্রিয়তা সেই জীবনকে কীটদষ্ট করে। সাহিত্য করার থেকে শেষমেশ সস্তা নাটককে প্রশ্রয় দিয়ে মণি সান্যাল মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে খ্যাতির লোভে যে বিপুল অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেয়, সেখানেও সেই আত্মধ্বংসের বাজার গড়ে ওঠে, কেনা-বেচায় শান্তি-মণির জীবনের অর্থনৈতিক অভ্যুত্থানের চেহারা সুস্থ শিল্পবোধের পরিপন্থী হয়। মধ্যবয়সী অবিনাশকাকুর নারীলোভী বাসনার বেগে আবার সেই নতুন এক পপলার পার্কে নীলাকে নিয়ে যাওয়ার, তার সঙ্গে সংসার করার বাসনা! নীলা অন্যের সন্তানের অন্তঃসত্ত্বা জেনেও অবিনাশকাকুর তথাকথিত কৃপা দেখানোর সেই মূল্যবোধহীন জীবন সামনে আসে। আসে দেবব্রত-অমিতার মধ্যবিত্ত পরিবার ভেঙে আলাদা হয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক উচ্চ স্ট্যাটাস তৈরির কুৎসিত স্বার্থপরতার চিত্র—এসবই যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের সমস্ত আদর্শকে চুরমার করে দেয়।

যুদ্ধ-পরবর্তী কাল মানুষের ওপর বিশ্বাস হারায়। মানুষে-মানুষে মানবিক সম্পর্কে আনে ছেদ, ভাঙন। এসবই শহর-সভ্যতার অভিশাপ। সন্তোষকুমার ঘোষ কোনও নীতিকথা শোনাননি, নীতি প্রতিষ্ঠাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। শিল্পীর নিরাসক্তি দিয়ে সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার পথে এমন সব ঘুণধরা সমাজের, জীবনের, মানুষের জীবন্ত বিশ্বাস্য ছবি দেখিয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধ যেখানে অন্ধকার খাদের প্রান্তবর্তী, যেখানে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে সভ্যতা আক্রান্ত, বিধ্বস্ত অর্থনীতির কঠিন শৃঙ্খলে শহরে মানুষজন বিভ্রান্ত সর্বনাশী সত্তায় ক্লান্ত, ক্রমশ পতনোন্মুখ সমস্ত বন্ধন হয়ে উঠেছে শিথিল, সেখানে

লেখকের শিল্প-প্রয়াস সন্তর্পণে, অতি ধীরে আমাদের অস্তিত্বের সংকটের বিষণ্ণ বর্ণের প্রলেপ দেয়। নীলা, শকুন্তলা, ইন্দ্রজিৎ, অর্থ-উপায়ে ওপরে ওঠা মণি সান্যাল-শান্তিবৌদির সম্পর্ক, শিবতোষবাবু-নিভাননীর পরিবারের সমস্ত মানবিক বন্ধনের অসহায় ছেদ—এসবের সর্বাবয়ব পরিণতিতেই লেখকের কেন্দ্রীয় ভাবনার স্বরূপ উঠে আসে। লেখক তাঁর উপন্যাসে আধুনিক শহরজীবনের পালাকারের ভূমিকায় থেকে রচনা করেছেন সচিত্র জীবনের 'নান্দী'।

৫.

একজন কথাকার তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে চিনে-নেওয়া চরিত্রকেই তাঁর শিল্পের ক্ষেত্রে একমাত্র মূলধন করেন। প্রেক্ষিত সেইসব চরিত্রকে নানান 'ডাইমেনশান' দেয়। যুদ্ধোত্তর শহরজীবনকে প্রেক্ষিত করে সন্তোষকুমার ঘোষ 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে তাঁর বলার কথাকে করেছেন বর্ণময়। কোনও চরিত্রই অকারণ আসে না, প্রেক্ষাপট, কথাকারের মূল লক্ষ্য, সময়, সমাজ, জীবনের অর্থ-সন্ধিৎসা—এসব দিয়ে কথাকার নিরাসক্তচিত্ততায় সেসবের জীবন্ত রূপাবয়ব রচনা করেন। কিন্তু সব কথাকার এক নন। একদল কাহিনী-ঘটনায় চরিত্রদের ভাসিয়ে দিয়ে জনপ্রিয়তা লুঠ করেন লেখার মধ্য দিয়ে, আর একদল অতি ধীরে একেবারে চরিত্রের গভীরে ডুব দিয়ে জটিলতম মনের কত যে উজ্জ্বল অজানা উপলখণ্ড তুলে আনেন, তার ইয়ত্তা থাকে না।

অর্থাৎ রহস্যময় জীবনের মানে খোঁজা, অস্তিত্বের সংকটের বিচার ও স্বরূপ সন্ধানই এই জাতীয় কথাকারের প্রধান কাজ। সন্তোষকুমার ঘোষ 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে সেই কথা মনে রেখেই অদ্ভুত সব মানুষজনকে জড়ো করেছেন। তারা কেউ গ্রাম থেকে আসা মানুষ নয়, শহরেরই উপজাত যেনবা। সে শহর আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত। এমন পটভূমির অন্বেষা যুদ্ধের বাইরের রূপ নয়, যুদ্ধের শামুক স্বভাবের অন্তর্জগতের আলো-আঁধারি স্বভাবের উন্মোচন। সংকট এখানে মানবিক আত্মা-নীতির, আত্মিক, সভ্যতার বিবর্তনের পথের অনুগ।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে তাই চরিত্রগুলি এমন বিষয়েরই উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। এর মানুষজনের মধ্যে প্রধান যারা, তারা হল—নীলা, ইন্দ্রজিৎ, শান্তিবৌদি, মণি সান্যাল, শকুন্তলা, বনমালী সরকার, অবিনাশকাকু আর গলির মুখের প্যারিস জুয়েলারির প্রোপ্রাইটার প্রমথনাথ পোদ্দার। অবশ্যই বাছাই করলে আরও নির্দিষ্ট করা যায় নীলা, ইন্দ্রজিৎ, শান্তিবৌদি—এই ত্রিভুজ মূর্তিতে হয়ে-ওঠা তিনজনকে। এদের ভাল-মন্দের সহায়ক হয়েছে বাকি মানুষগুলি। অবশ্যই শকুন্তলা ও প্রতীকী স্বভাবে প্রমথ এদের মধ্যে উপন্যাসের চরিত্র বিবর্তনে অন্যতম কেন্দ্রীয় উপকরণ।

নীলা চরিত্র পরিকল্পনায় আছে লক্ষণীয় বিবর্তন। তার বৈশিষ্ট্যে নীলা হয় উপন্যাসটির নায়িকা। নায়ক হয়ে উঠেছে ইন্দ্রজিৎ। প্রতিনায়িকা বলতে আপত্তি নেই শান্তিবৌদিকে। নীলার যে বিবর্তনধর্ম তা হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত, লেখকের বানানো নয়। তার

স্বভাববৈশিষ্ট্যই, তার অন্তঃশীল মনোধর্মই তাকে ক্রমশ করেছে জটিল। তার ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য তার নিষ্পাপ সরলতা থেকে ক্রমশ জটিল জীবনধর্মের মধ্যে নিয়ে গেছে। এর মূলে সক্রিয় হয়েছে প্রধানত শান্তিবৌদির সচলতা, সাহচর্য ও তার স্বামী এবং ইন্দ্রজিৎ দু'য়ের মধ্যেকার জটিলতম সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া। ইন্দ্রজিতের যুবক বয়সের আকর্ষণ ও জীবনগতির বিভ্রান্তি নীলার বিবর্তনে জোগায় বেগ। অবিনাশকাকু, দাদা দেবব্রত, বৌদি অমিতা, নার্স শকুন্তলা—এরা সবাই মিলে কেউ প্রত্যক্ষে কেউবা পরোক্ষে নীলার বিবর্তনের মূলে জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপকরণ যোগ করেছে। বিশেষ করে অবিনাশকাকুর একাধিক সক্রিয়তা নীলার মধ্যে এনেছে আর এক ডাইমেনশান। নীলার সবশেষের সুস্থ কাঙ্ক্ষিত জীবন-পরিবেশ-ভাবনা থেকে পলায়নে অবিনাশকাকুর দায়িত্ব কম নয়।

উপন্যাসের প্রথম থেকেই নীলার উপস্থিতি। তার বাবা-মা, দাদা-বৌদির একেবারে নিম্নবিত্ত অসহায় স্তরে নেমে-আসার পরিবারচিত্র দিয়ে উপন্যাসের শুরু, শুরুর আয়োজন নীলার নিজস্ব চরিত্র-ভাগ্যেরও। শামুকস্বভাবে নীলার অবতরণ। নীলা যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে, সচেতন নিজস্ব পরিপার্শ্ব সম্পর্কে। তার মধ্যে সস্তা আবেগ-মনস্কতা ছিল না। যেনবা শান্তিবৌদি তার কৌতূহলে, সারল্যে, ব্যক্তিত্বে, নিজস্ব তৈরি করা যুক্তির মধ্যে সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ভয়ংকর ফলটি খাওয়ায়। উপন্যাসের প্রথমে প্রমথ পোদ্দার সম্পর্কে ভাবনায় নীলার সুস্থ রুচি ও শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। বাবার কাছে এত বড় মেয়েকে বাড়িতে রেখে দেওয়া প্রসঙ্গে প্রমথর অশিক্ষিত উক্তি নীলাকে অন্য ব্যক্তিত্বে বাজিয়ে দেয় : 'কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল নীলার, এই শিক্ষাহীন রুচিহীন লোকটার সঙ্গে বাবা কি এত কথা বলছেন!'

পপলার পার্কে নীলাদের ছিল অভিজাত সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন জীবনযাপন, আশাবাদে নীলার ছিল স্বপ্ন। অবশ্যই সে স্বপ্ন ওর মা নিভাননীর বাসনা থেকে গড়ে ওঠা, নীলারও মনোরম কাঙ্ক্ষিত। পপলার পার্কে নীলার জীবন ছিল পরাধীন—মায়ের অধীন। আর সব বাড়িতে যুবতী মেয়ে থাকা মায়েরা যেমন হয়, নীলার মা ছিল তা-ই। মার্কিন-ফেরত নীলাদের তাক লাগানো বাড়ি-গাড়ির মনন, ডেনভারের একটা অটোমোবাইল কোম্পানির এজেন্ট মনন হয়ে উঠেছিল মায়ের পছন্দে ও সমর্থনে নীলার স্বপ্নের আদর্শ :

'মননই একদিন কথাটা পাড়ল।

'আসা-যাওয়া আমিও কমিয়ে দেব ভাবছি।'

'কেন?'

'রোজ রোজ আসবার কি মানে হয়?'

'তাতে কী? আপনি তো আত্মীয়। মার মামার—'

হেসে উঠেছিল মনন। 'থাক, হিসেব কোরো না, কূল পাবে না। বড় দূরের সম্পর্ক। আচ্ছা নীলা' গলাটাকে অকস্মাৎ খুব নিচু, গাঢ় করে মনন বলেছিল, 'এটাকে খুব কাছের করেও তো নেওয়া যায়।'

হয়ত সম্পর্কটা খুব কাছেরই হয়ে যেত এতদিনে, যদি না নীলার ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হত। তারপরে এলো দুর্দৈব।

পপলার পার্ক থেকে চলে আসার দিন....মননকে তো মা আসবার সময়ে চোখের জল এনে বলেছিলেন, 'তুমি কিন্তু যেয়ো বাবা, বিপদের উপর বিপদ। নইলে দু'হাত কবেই তো এক হাত হয়ে যেত। থাক, সে যতই অসুবিধে হোক, যেভাবে পারি, এ অঘ্রাণেই আমি বিয়ের বন্দোবস্ত করব। তুমি যেয়ো।'

মনন ভিজে, নিচু গলায় বলেছিল, 'যাব বৈকি, মাসিমা।'

বলা বাহুল্য, মনন আসেনি।'

এই যে মননির্ভর নীলার চরিত্রখণ্ড, তা অবশ্যই পরাধীন, মায়ের একমাত্র মায়েরই কথায় গণ্ডী দেওয়া। কিন্তু গোয়ালার গলিতে এসে নীলার আর আদৌ মায়ের অধীন নয়, মনের গঠন ও বিকাশে একেবারে স্বাধীন। আমাদের মতে এই স্বাধীন সত্তার কারণেই সরল, নিষ্পাপ, ব্যক্তিত্ব-উজ্জ্বল নীলাকে ক্রমশ জটিল করে তোলার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শান্তিবৌদি। এই গলিতে আসার পর থেকে নীলা অন্য মাত্রা পেতে থাকে।

শান্তিবৌদির স্বামী মণীন্দ্র সান্যাল নাম-করা সাহিত্যিক। তার কাছে আসে কবি ইন্দ্রজিৎ রায় ও অন্যান্যরা। এই ইন্দ্রজিৎ-এর লেখা কবিতার প্রতি কোনও আবেগসর্বস্ব কৌতূহল নেই, কবিতা বোঝেও না নীলা। তবু শান্তিবৌদির ঘরে ইন্দ্রজিতের উপস্থিতি নীলাকে এক অমোঘ আকর্ষণে ধরতে চায়, ধরেও রাখে। ক্রমশ নীলার অভিজ্ঞতা দানা বাঁধে ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে এমন ভয় নিঃসঙ্গতা বিস্ময়ে : 'শান্তিকে ইন্দ্রজিৎ যে ভয় করে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সে-ভয়টুকুও বিচিত্র। অন্ধকারে কালো বেড়াল দেখে চমকে ওঠা ঘর্মক্লান্ত ভয় নয়, গভীর রাত্রে নদীর পাড়ে একলা বসে থাকার ভয়। ছমছমে গায়ে কাঁটা দেয়, আবার ভালোও লাগে। অর্থাৎ শুধু ভয় নয়, বিস্ময়ও।'

প্রেমের সঙ্গে নিঃসঙ্গতার যোগ নিবিড়। সেই অজানা নিঃসঙ্গতার একাকীত্বের ছমছমে ভয়ের ব্যঞ্জনা এখানে। এখানেই নীলার অবচেতন মনের ধীরস্থির রহস্যময় প্রস্তুতি। বৃষ্টির গভীর রাতে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে স্বামী ছেড়ে শান্তিবৌদির বেড়িয়ে আসার কারণহীন ভাবনায় কৌতূহল, বিস্ময়ের মিলমিশে প্রচ্ছন্ন এক প্রতিদ্বন্দ্বী মন। ক্রমশ তা হয়ে ওঠে ঈর্ষাদিগ্ধ, ক্রমশ গড়ে উঠেছে নীলার আত্মক্ষয়ী বেপরোয়া অবচেতন মন। দারিদ্র্যে নীলার জীবনপ্রকাশ যেন বন্ধ গলিতে আটকে যাওয়া। একধরনের খেলার বাসনা তাকে অবিনাশকাকুর দিকে ঠেলে দেয় :

'নীলা মনে মনে নিজের সঙ্গে একটা আপোষ করে নিল।

এই নখদন্তহীন স্তিমিতপৌরুষ ধনীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে লাভ কী? কোন ক্ষতি তো করতে পারবে না, দু'একখানা গান শুনবে, সিনেমায় নিয়ে আসতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যাবে। শরীর খারাপের ছুতো করে মাঝে মাঝে এসে আদা-মেশানো চা খেতে চাইবে। তার বেশি কী।...

...আগে নীলা চটে যেত, শুনিয়ে দিতো ঝাঁঝালো দুচার কথা। কিন্তু ওর মেজাজ ভালো আছে। যেন মজার খেলা পেয়ে গেছে একটা।...নীলা নিজের মনেই হাসল। দেখাই যাক না।'

এখানে চোখে পড়ার মত নীলার গভীর রহস্যময় অবচেতন মনের স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়া। আগেই নীলা অনুভব করেছে স্বামী ছেড়ে শান্তিবৌদির ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে রাত পর্যন্ত অভিসারের রহস্য-ব্যঞ্জনা। যেন তারই বিপরীতে নীলার নিজস্ব প্রতিস্পর্ধী প্রস্তুতি খেলার ছলে। কিন্তু এই খেলা বড় নির্মম, কঠিন, সর্ববিনাশি। নীলা যায় অবিনাশকাকুর সঙ্গে সিনেমায়। শান্তিবৌদিকে তা ঈর্ষায় জ্বালাময় করে, শুরু হয় প্রকাশ্য উন্মত্তবৎ প্রতিযোগিতা।

নীলার—শান্তিবৌদি সম্পর্কে প্রতিবেশী সেবাসত্রের শকুন্তলার একাধিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিতে —'এমন খটকা লাগল মনে দিনকতক শান্তির সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারল না, চাইতে পারল না চোখে চোখে। শান্তির একটা লজ্জার কথা নীলা জেনে ফেলেছে, সেও যেন একটা লজ্জা।' স্থায়ীভাবে বাস করার ব্যবস্থায় ইন্দ্রজিৎকে পেয়িং গেস্ট করার প্রয়াসে শান্তিবৌদির তৎপরতা, ইন্দ্রজিতের অন্ধকার ঘরে শান্তিবৌদিকে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখা, লেখক দরিদ্র স্বামী মণীন্দ্রকে শান্তি দেওয়ার বিষয়েই এমন কাজ—এই অপরাধের স্বীকৃতি—এসব থেকেই নীলা ভাবে একসময়ে—'এ এক অসম প্রতিযোগিতায় নেমেছে।' আর এসবের মধ্যেই নীলা ক্রমশ একেবারে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে ইন্দ্রজিতের। তাও গোপনে। তবে ইন্দ্রজিতের কল্যাণ কামনায় অবশ্যই। নীলা ক্রমশ হয়ে ওঠে এক চরিত্র। তার আদর্শ সরে যায়, আসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে জীবন-ভাবনার নানা দিক।

শান্তির নেশা থেকে ইন্দ্রজিৎকে বাঁচাতে চায় নীলা। ওকে সন্তুষ্ট করতে চরম অভাবের মধ্যেও কলেজের বই কেনার টাকায় ও কবিতার বই কেনে, কবিতা পড়ে। অবিনাশকাকুর উপহার দেওয়া দামী আংটি বাঁধা রেখে ইন্দ্রজিতের জন্য সঞ্জীবনী টনিক কেনে। ইন্দ্রজিৎ-কে পার্কের আকাশ-বাতাস-কোলাহলে মুক্তির ব্যবস্থা করে। 'শান্তির হাত থেকে ইন্দ্রজিৎ-কে উদ্ধার করতে চাইছে নীলা। কিন্তু শান্তির মতো সর্বনাশ দিয়ে নয়, কল্যাণ দিয়ে।' এই ভাবনায় 'নীলা যথার্থ অর্থে প্রেমিকা, শুভংকরী (Benevolent) ; সেই প্রেমেই অন্ধকার ঘরে নীলা-ইন্দ্রজিৎ দেহের বন্ধনে নিবিড় মিলনে অগোচরে প্রেমের দলিল রচনা করে যায়। নীলা হয় অন্তঃসত্ত্বা। ইন্দ্রজিৎ চাকরি খোঁজে, একটা চাকরি পায়, নীলাকে নিয়ে সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে, কথা দেয় অন্তঃসত্ত্বা জানার পরও।

কিন্তু সমস্ত কিছু নষ্ট হয় শান্তিবৌদির রহস্যময় আচরণে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে এসে নীলা যখন স্থিত হতে চাইছে, তখনি শান্তির প্রসঙ্গ ধরে এক অসীম সমাধানহীন নারী মনের, প্রেমিকা মনের ঈর্ষায়, সন্দেহে, ভয়ে সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নীলা প্রবলতম অন্তর-সংঘর্ষে মাতে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে, দুজনের মধ্যে নতুন সংকট ঘনিয়ে আসে। নীলা হয় একা। সব কিছু থেকে এবার পালাতে চায় সে। এবার আশ্রয় তার

সেবাসত্রের ছত্রচ্ছায়ায়, রাতের সঙ্গী শকুন্তলার সঙ্গে নিঃসঙ্গ পলায়নে। এই অন্তিম-পরিণতির বীজাভাস মেলে গলি ছেড়ে শান্তিবৌদি-মণীন্দ্রদের চলে যাওয়ার পর নীলা-ইন্দ্রজিতের গোপন মানসসম্পর্কের নিশ্চুপ টানাপোড়েনে।

উপন্যাসের উনিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শান্তিবৌদি কিনু গোয়ালার গলির ভাড়াটে থাকে। ওরা স্বামী-স্ত্রী প্রচুর অর্থের বিলাসে প্রয়োজনহীন অনেক ঘরের বিলাসী জীবনযাপনের প্রত্যাশা নিয়ে একসময় গলি ছেড়েছে। এবার শুধু ইন্দ্রজিৎ-নীলার সম্পর্কের জটিলতা নীলার পরিণামী শূন্যতার পালা রচনা করে। উনিশ পরিচ্ছেদ থেকে ইন্দ্র-নীলার সম্পর্কচিত্র কত সাহসী, অন্তরঙ্গ, সংসার ও জীবন-গড়ায় দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতার চুক্তিপত্র এইরকম :

'স্বল্পালোক ঘরে, রাত্রির দ্বিপ্রহর স্তব্ধতায় কী মহীয়সী মনে হচ্ছে নীলাকে ইন্দ্রজিতের।...সব কিছু শূন্য পাত্রের মতো নিঃশেষ মনে হয়েছিল...সেই মুহূর্তেই যে সঞ্জীবনী এনে ধরেছে ওষ্ঠপুটে, তার কাছে ইন্দ্রজিৎ জীবনের ঋণে বিকিয়ে আছে।' ইন্দ্রজিতের দিক থেকে নীলার দেওয়া প্রাণশক্তি যখন নতুন সংসার গড়ার খড়কুটো সঞ্চয়ে প্রেরণা-প্রাণ দেয়, 'তখন নীলার মুখে ম্লান ছায়া', নীলার স্বরে উদাস নিরাসক্তি, কোথাও বুঝি এক সর্বনাশা অনীহা চেপে বসে। নীলার অদ্ভুত বদল ইন্দ্রজিতের দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব তোলার পর :

'নীলা খুশি হল না, চমকে উঠল না, সরে বসলো না একবারো।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাই তুলল একবার। ইন্দ্রজিতের প্রস্তাবে কোন রোমাঞ্চ নেই, নেই কোন অভাবনীয়ের প্রতিশ্রুতি। লেন-দেন যা হবার আগেই হয়ে গেছে, শুধু চুক্তিপত্রে সই বাকি--কিন্তু তা নিয়ে বেশি হৈ চৈ করার অর্থ হয় না। ঠোঁট দু'টিতে হাসির চিহ্নমাত্র ফুটিয়ে বলল, 'একটা দুর্ভাবনা গেল।...'

এই চিত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিবারকেন্দ্রিক জীবনের উপযুক্ত নায়িকারই। যে সময়ে এই উপন্যাস রচিত, তখন বিশ্বযুদ্ধের অন্তরীণ অন্তর্ঘাতে নারী-চরিত্র, বিবাহ-সম্পর্ক, দেহগত মিলনসম্পর্কের, যাবতীয় মানবিক সম্পর্কের পিছনে যে নীতি, আদর্শ ছিল, তাতে অবিশ্বাস, অস্বীকার, অবক্ষয়, অসুস্থতা ডেকে আনছে ধীরে। স্বামী-স্ত্রীর, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক তখন হয়ে উঠেছে 'শুধু চুক্তিপত্রে সই'। বিবাহের যে মূল লক্ষ্য, সেখানে পচন, ক্ষয় ধরেছে। নীলা, নীলা-ইন্দ্রজিতের সম্পর্ক তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের এক নতুন তমসুক।

নীলা এই পর্বে যখন frustrated মনে ক্লান্ত, তখনই এসেছে (১) অবিনাশকাকুর প্রসঙ্গ (২) ইন্দ্র-নীলার বাসা খুঁজতে বেরোবার মধ্যে ইন্দ্রর সঙ্গে শান্তিবৌদির সাক্ষাৎ ঘটনা। নিষিদ্ধ ফলের অমোঘ আকর্ষণের মত ইন্দ্রজিতের শান্তিবৌদির প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকর্ষণ ও অনেক রাতে ইন্দ্রর বাসায় ফেরা। এই প্রসঙ্গে নীলার অসহায় পরাজয়ের দিক : 'ইন্দ্রজিৎকে শান্তির মোহ থেকে উদ্ধারের নেশায় সর্বস্ব নিবেদন ক'রে বসে আছে নীলা, উদ্ধার করছে, কিন্তু মোহ ঘোচাতে পারে নি।' ইন্দ্রর দিক থেকে তার

প্রতি দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, ভালবাসার নামে কর্তব্যবোধ ও করুণার নীরস কৃত্রিম অপমান নীলার অসহ্য। তাই frustrated নীলা চরম tolerenceকে আধার করে। সন্তান গর্ভে থাকার দুস্তর লজ্জাকে মেনে নিয়েও 'প্রণয়হীন দাম্পত্য-জীবনের নিরন্তর বিড়ম্বনা' থেকে অনুতাপহীন মনস্তাপে জর্জর মুমুক্ষু হয়ে ওঠে নীলা। তার মধ্যে থাকে শমীবহ্নি, এই নীলা হয় 'সিনিক'। এই 'সিনিসিজম্' যুদ্ধোত্তর সময়ের নিয়তি। ইন্দ্রজিৎকে ছেড়ে যে নীলা অবিনাশকাকুর কাছে এলে তাতে যতই নতুন এক পপলার পার্কের স্বপ্নের বাস্তব প্রতিশ্রুতি থাক, তা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভরতা অন্য জীবন দিতে চাইলেও নীলা সমস্ত কিছু অবহেলায়, উপেক্ষায়, ঘৃণায় সরিয়ে শকুন্তলার সহযাত্রিণী হয়েছে। এখানে সে যেমন সিনিক, তেমনি তার শেষতম অবধারিত নবব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞানও। নীলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম অবক্ষয়িত সমাজ ও সময়ের এক জারজ কন্যা। লেখকের কল্পনায় নগরজীবন থেকে উঠে-আসা এক মানসকন্যা। নীলার সুস্থ সবল প্রেম-ব্যক্তিত্বের বিবর্তনে চারটি স্তর মেলে। প্রথম স্তরে নীলা সহজাত স্বাধীন ব্যক্তিত্বের গৌরবে আবেগহীন রোমান্টিক, দ্বিতীয় স্তরে ঈর্ষায় 'নিকষিত হেম' হয়ে-ওঠার মত যুক্তি-নিষ্ঠ প্রেম-সত্তার অধিকারিণী, তৃতীয় স্তরে দেহ-মনের সফল-সুস্থ কামনায় সম্পূর্ণ 'Realist', শেষ স্তরে নীলা সুস্থ সংসার-সম্পর্কহীন উৎকেন্দ্রিক জীবন-ভাবনায় ও স্বভাবে যে-কোনওরকম আপসহীন নিঃসঙ্গ 'সিনিক'। এই চরম মানসিকতার পক্ষে নীলার নিজের শেষতম পলায়নী মনোভঙ্গিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ :

'এখনই, এই মুহূর্তে তো এখান থেকে পালাতে পারে নীলা, পরমায়ু ফুরিয়ে আসা এই গলির ক্লেদস্পর্শ থেকে বাঁচতে পারে। পপলার পার্কের দিকে নয়, সেই দিকে একটি স্থূল প্রৌঢ় মানুষ রোমশ দু'টি বাহু বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে।'

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে সংকীর্ণ গলিটির অধিবাসী মানুষ-জনদের ওপর গলির অন্তর্লীন অবক্ষয়ের, নীতিহীনতার প্রভাব আদৌ অবহেলার নয়। চরিত্রগুলিই এই গলির অবক্ষয়ের রোগে রোগগ্রস্ত, অসুস্থ হতে থাকে ক্রমশ। প্রধান নায়িকা নীলা চরিত্রটির গভীরে দৃষ্টি দিলেই তার প্রামাণিকতার দিক মেলে।

(১) নীলা ইন্দ্রজিতের যে সন্তান গর্ভে নেয়, তা সে সময়ের মঙ্গলজনক, ঐতিহ্যসম্মত বিবাহ আদর্শের পরিপন্থী। অর্থাৎ স্বাভাবিক সমাজ-আদর্শে তার জন্ম নয়। বিবাহিত জীবনের জাতকের মর্যাদা এই গোপন সন্তানটি পেতেই পারে না, যতই নীলার কল্যাণকামী মন এর মূলে সক্রিয় থাকুক। এটা বিবাহ আদর্শের স্খলন, এতে নিগূঢ় প্রেমের আদর্শ যেভাবেই ঘোষিত হোক না কেন। গলির ক্ষয়িত জীবনের সঙ্গে নীলার এখানেই যোগ।

(২) নীলা গলির বাইরে ছিল সুস্থ, আদর্শবাদী, রোমান্টিক। গলিতে আসার পর ক্ষয়িষ্ণু মনের জন্ম হয় পরিবার ও লোকচক্ষুর অন্তরালে, বস্তুত সকলকে লুকিয়েই। সুযোগ এলে নীচে নামার বাসনা সে ছাড়ে না, ছাড়তে পারেও না--যতই তার বাসনায় প্রেমের কল্যাণাত্মিক রূপ থাক না কেন। এই যে গোপন সম্পর্ক তার মূল তো গলির

অন্ধকার জীবনের সুযোগসন্ধানী সরীসৃপ স্বভাবেই! এক সমালোচক বলেছেন, 'নীলা...ঠিক ক্ষয়িষ্ণু মানুষের উদাহরণ নয়, সুস্থ প্রাণশক্তিরই প্রতীক।' এই ব্যাখ্যায় আমাদের কিছু বিপরীত ধারণা জাগে। দারিদ্র্যের দীর্ঘশ্বাসেই নীলা গলিতে এসে হয়েছে ভিতরে ভিতরে চরম ক্ষয়িষ্ণু—তা প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় নয়, নিয়তির পরোক্ষ শ্বাসে!

(৩) নীলা তার গলির জীবনে যে অবৈধ সন্তানের জন্ম দেওয়ার সুযোগ নেয় শরীরে, তার পরিচয় কী হবে অদূর ভবিষ্যতে? তার সুস্থ সমাজ-পরিচিতি কোথায় দাঁড়াবে? এখনকার মত 'লিভিং টুগেদার'-এর ভালবাসা ও যৌথ জীবন তখন ছিল না। নীলা কি পৌরাণিক কুন্তীর লজ্জায় আলো থেকে মুখ লুকোবে না? গলির অবক্ষয়িত অন্ধকার এভাবেই নীলাকে গ্রাস করে থাকবে।

আমাদের মতে, সমালোচক কথিত চরিত্রটির 'অস্বাভাবিক আচরণে গলির বিকৃত প্রভাব' আছে। গলি সমস্ত ন্যায়-নীতির ঘন আড়াল রচনা করে। অন্যান্য মানুষগুলির মত নীলাও উজ্জ্বল ' victim'। একাধিক সাপের এক খাঁচার স্বভাবে গলির 'morbidity' শূন্যতার গভীর মুখগহ্বর দেখায়। যুদ্ধোত্তর বিকৃতি যেনবা প্রাগ্রসর সভ্যতার মুখে বিষাক্ত লালা। সমুদ্রের জলের গভীরে ফেনা লুকিয়ে থাকে, পাড়ে আছড়ে পড়ার পর তার প্রকাশ, সভ্যতার চলার পথে তার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থই হল বিশেষ কালের মানবতা বিরোধী সমস্তরকম উপজাত (by product) উপকরণ। নীলা কিনু গোয়ালার গলিরই অসহায় নিয়তি তাড়িত নির্দেশ।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে শান্তিবৌদি প্রতিনায়িকা, লেখকের আর এক উজ্জ্বলতম সৃষ্টি। নীলার সঙ্গে এর ব্যক্তিত্বের মূলগত দূরত্ব—মানসিকতার দিক থেকে। বিবাহিতা হওয়ায় শান্তির যেমন মুক্ত চলাফেরার কিছু সুযোগ-সুবিধে আছে, অবিবাহিতা নীলার তা নেই। নীলাদের পরিবার আর শান্তি-মণীন্দ্রর সংসার দুর্দৈব সময়ের আঘাতে একই বাড়ির ভাড়াটে হয়ে এসেছে। নীলা ও শান্তি—একই যুবক একক আর এক ভাড়াটে ইন্দ্রজিতের আকর্ষণে জটিলতম মনস্তত্ত্বের লীলায় সক্রিয় থেকেছে। এই হিসেবে নীলার নিজের পছন্দের মানুষ হয়েছে একজন—অবিনাশকাকু বার বার তার কাছে এসে যুগপৎ লোভ ও বিরক্তির সঞ্চার ঘটালেও, শান্তিবৌদির পক্ষে তা নয়। তার কাছে মনের গভীর-জটিল অন্ধকারে তার স্বামী মণীন্দ্র যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি পরকীয় স্বভাবে আর এক পুরুষ ইন্দ্রজিৎও—শান্তিবৌদি যতই উদাসীন উপেক্ষার মানসিকতায় ইন্দ্রকে অস্বীকার করার কথা বলুক না কেন।

অর্থাৎ আমাদের মতে, নীলার থেকে শান্তিবৌদি অনেক বেশি জটিল তার মনের একাধিক 'ডাইমেনশানে'। এক অদ্ভুত খেলায় শান্তিবৌদির মানসস্বভাবের ঔজ্জ্বল্য—আর এই বৈশিষ্ট্যেই যেন নীলাকে যেমন পরোক্ষে ইন্দ্রজিতের কাছে আসার সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনি সবশেষে নীলার ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে পলায়নের, তার স্বপ্ন-কল্পনার সংসার ভাঙায় সাহায্য করেছে। সবই সম্ভব হয়েছে কথাকারের যুদ্ধোত্তর চরিত্র-আঁকার বিস্ময়কর ক্ষমতায়। কথাশিল্পী, শিল্পে-আদর্শবাদী স্বামী মণীন্দ্রর বিলাসী দারিদ্র্যের

বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েই শান্তির এমন সর্বনাশা রূপ, নীলাকে, যদিও সে নিম্নবিত্ত, তা করতে হয়নি। তার প্রেমাকর্ষণ যুবতী মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, শান্তি শুধু তাতে ঈর্ষা নামক একটি ছোট দেশলাইকাঠির আগুনটুকু ছুঁইয়ে দিয়েছে। সে আগুন বার বার জ্বলে ওঠায় একধরনের খেলা আছে—মনোরম নিজের সুখ-দুঃখের, অলস বিলাসের খেলা—যার স্বভাবে আছে অক্টোপাসের মত যুদ্ধোত্তর যাবতীয় নীতিহীন ভ্রষ্টাচার, বিকার।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকে শান্তিবৌদির সঙ্গে নীলার অন্তরঙ্গতা খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। শান্তিবৌদির বলা নীলার প্রশ্ন ও উত্তরও : 'আপনি আশ্চর্য হিসেবি তো শান্তিদি?' এর সমর্থনে শান্তি স্বামীর 'অনিশ্চিত গল্প লেখার টাকায় সংসার' চালানোর অসহায়তার দোহাই জানিয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শান্তি হিসেবি, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে আচরণে ও ঘনিষ্ঠতায় রীতিমত হিসেবি। শান্তির সূত্রেই তরুণ কবি ইন্দ্রজিৎ রায়ের সঙ্গে নীলার পূর্বরাগের অতি সূক্ষ্ম রঙ-লাগানো পরিচয়। সে দৃশ্যে শান্তির ইন্দ্রজিতের ওপর অমোঘ প্রভাব বিস্তারের ছবি নীলার দৃষ্টি এড়ায় না। শান্তির লোভনীয় সঙ্গ ইন্দ্রজিতের ভয় আকর্ষণ করে! এই ভয়ে আছে ছমছমে গায়ে কাঁটা দেওয়ার রোমাঞ্চ যেমন, তেমনি ভাল লাগাও—ভয়ের সঙ্গে বিস্ময়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নীলার সামনে ইন্দ্রজিতের এই যে গোপনতম স্ব-রূপ—তাতেই শান্তির চরিত্রগত জটিলতা রীতিমত রহস্য জাগায়। বৃষ্টির মধ্যে স্বামী-ছাড়া ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে অনেক রাতে ফেরে শান্তি। শান্তির এই বেপরোয়া স্বভাব সেই রহস্যকে গভীর, গভীরতর করে তোলে ক্রমশ।

নীলার মধ্যবয়সী অবিনাশকাকুর সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার খবরে শান্তির সেই বেপরোয়া স্বভাব নতুন মাত্রা নেয়। শান্তির কঠিন জিদে বেকার ইন্দ্রজিৎ হাতের আংটি বাঁধা রেখে সে রাতেই সিনেমা দেখে ফেরে। বয়সে বড় শান্তি। তার ইন্দ্রজিতের ওপর অধিকার ও আধিপত্যের স্বরূপ দেখে। ইন্দ্রজিতের অন্ধকার ঘরে শান্তিকে অস্বাভাবিক অবস্থায় নীলার দেখার মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতায় শান্তির এক নতুন ডাইমেনশান ধরা পড়ে। আত্মরতিরত আর্টিস্ট স্বামী মণীন্দ্রের প্রতি, তার আত্মপ্রতারণা ও রচিত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আর এক জটিল মন—অন্ধকার সুযোগসন্ধানী মন যে সক্রিয়, শান্তির আচরণে তার সুষ্ঠু পরিচয়। নীলার এক কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে শান্তির উক্তি :

'...জীবনের আর কোন সাধ নেই, আর কোন সুখ নেই। নইলে বেঁচে থাকার জন্যে,—শুধুই বেঁচে থাকার জন্যে যাকে ভালবাসার অভিনয় করতে হয়, সে বেঁচে থাকাকে ভালবাসব কি করতে বলতে পারো?'

'শুধুই অভিনয়?'

'অভিনয়, অভিনয়, অভিনয়। নইলে', শান্তি এতক্ষণ কঠিন হয়ে কথা বলছিল, হঠাৎ যেন স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে পড়ল নীলার পাশে, 'নইলে তুমি কি মনে করো ওই অপদার্থ ছড়া-মেলানো ছোঁড়াকে আমি—'

হাত বাড়িয়ে একটা বালিশ কোলের কাছে টেনে নিয়েছিল শান্তি ; সেটাতে মুখ

গুঁজে যেন হাসির তোড় সামলে নিলে।'

শান্তি স্বামীর ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে যে খেলায়, অভিনয়ে মাতে, তাতে কখন যে ইন্দ্রজিৎ ওর অধিকারের স্থাবর সম্পত্তি হয়ে যায় শান্তি ভাবেইনি। ভাবলেও মন্দ লাগেনি। এ এক এমন অভিনয়, যা আগুন নিয়ে খেলার শিহরণ উত্তেজনা আনে। নীলাকে গোপন করে শান্তি তার অবৈধ সম্পর্ককে উত্তাল চাপা হাসি দিয়ে সমর্থন জানাতে এতটুকু ইতস্তত করে না।

এদিকে শান্তির প্রতি প্রবলতম ঈর্ষায়—শান্তির কাছে যা নিষ্ঠুর খেলার উপকরণ মাত্র, সেই ইন্দ্রজিতের দিকে নীলার এগিয়ে-যাওয়া ঘটে নবম পরিচ্ছেদে, নিয়তির মত। এতে নীলার প্রসঙ্গে যেনবা চতুর শান্তির সহাস্য স্বগতভাষণ শুনি পরিচ্ছেদের একেবারে শেষে—যা অভিজ্ঞ প্রেমিকা শান্তিরও বুঝিবা প্রেমদর্শন : 'বেশ লাগে এই কাঁচা মেয়েদের হঠাৎ রাঙিয়ে ওঠা এই ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা। বয়স বেশ হয়েছে শান্তির, এ বয়সে প্রেমে বিশ্বাস নেই তার। কিন্তু প্রেম করায় আছে। এদের বয়স কম, তাই প্রেমে এখনো পড়ছে, দু'টোকে এক করে দেখছে।' এই ভাবনায় বিশ্বাস দৃঢ় হয় শান্তির সঙ্গে ইন্দ্রজিতের অ-সম বয়সের প্রেমনির্ভর ক্রীড়াসুখের গভীর অনুভবের দিক।

একদিকে শান্তির অস্তিত্ব সাহায্য করেছে নীলাকে ইন্দ্রজিতের দিকে এগিয়ে যেতে, আর একদিকে নিজের স্বামীকে সামাল দিয়েছে তার সাহিত্য রচনায়, স্বামীকে সে চিনতে পেরেছে। মণীন্দ্রকে ধাক্কা দেওয়ার জন্যেই সে ইন্দ্রজিৎ-কে নিয়ে খেলা করার ভান করে স্বামীকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। কিন্তু মণীন্দ্রর নাটক স্টেজে দেখে আসার পর ওর অভিজ্ঞতা হয়, স্বামীর নাটক আসলে ওর আর স্বামীর রূঢ় বাস্তব সংসার জীবনেরই, ওদের পরস্পরের সম্পর্কের জীবন্ত ছবি। বুঝে যায় শান্তি 'রিয়েলিস্ট আর্টিস্ট মণীন্দ্র, মনহীন মননশিল্পী ; শান্তি তার রসসৃষ্টি রসায়নে গিনিপিগ ছাড়া কিছু নয়।' মণীন্দ্র যে যথেচ্ছারের স্বাধীনতা ওকে দিয়েছিল তা আসলে মণীন্দ্ররই ভান—বাস্তব শিল্পের কল্পনাময় ফাঁকগুলো বোজাবার উপকরণই হল স্ত্রী শান্তির খেলা। তাই শান্তির উপলব্ধি : 'শান্তির হাতের খেলনা ইন্দ্রজিৎ ; মণীন্দ্রের হাতের খেলনা শান্তি। চক্রাকার খেলার ছক।' কিন্তু এই বোধোদয়ের পরেও যখন মণীন্দ্র-শান্তির সংসারে বিপুল আর্থিক সাচ্ছল্য আসে, ওরা কিনু গোয়ালার গলি ছাড়ে, তার পরেও শান্তি ইন্দ্রজিৎকে ওর নতুন বাড়ি নিয়ে গিয়ে গভীর রাতে ছাড়ে। শান্তির সমস্ত খেলায় সেই একটি শাশ্বত সত্য : 'বয়স বেশ হয়েছে শান্তির, এ বয়সে প্রেমে বিশ্বাস নেই তার কিন্তু প্রেম করায় আছে।' এই জটিলতম মনস্তত্ত্বসম্মত রহস্যকে লেখক শান্তি চরিত্রে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে আঁকতে পেরেছেন। নীলা চরিত্রের সিনিক পরিণতি দানে সর্বশেষ ইন্দ্রজিৎ-শান্তির সাক্ষাৎ জটিল প্লট-বৃত্তের সিদ্ধি ও চরিত্র দু'টির ঋদ্ধি পরম গুরুত্ব পেয়েছে।

উপন্যাসের সতেরো পরিচ্ছেদের শেষে আছে শান্তি-মণীন্দ্রর সুস্থ জীবন গ্রহণের জন্য আর্তি। স্বামীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, একধরনের জিদে শান্তি সিনেমার অভিনেত্রী, নায়িকা হতে চেয়েছিল। এক শেষ রাতের কাছাকাছি সময়ে ওরা দুজন গলির মধ্যে সামনা-

সামনি চলে আসে দু'দিক থেকে। মণীন্দ্রর সে সময়ে শান্তিকে বলা গভীর অনুশোচনার কথা :

'এ গলি আমাদের শেষ করে ফেলেছে শান্তি। এখানে আকাশ নেই, এখানে সহজ হয়ে বাঁচবার উপায় নেই। এই আবহাওয়ায় আমাদের চিন্তা, কাজ সব কিছু অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বাঁচতে হলে এ গলি ছাড়তে হবে। হাওয়া বদল ছাড়া এ ক্ষয়রোগের চিকিৎসা নেই।'

শান্তি মণীন্দ্র আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে গলি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু শান্তি আবার ইন্দ্রজিতের কাছে আসে, তাকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। তারপর ইন্দ্রজিৎ সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। শান্তির এই ভিতরের আকাঙক্ষা কিসের ইঙ্গিত করে? উত্তর এক : শান্তিও যুদ্ধোত্তর সময়ের অসুখে অবক্ষয়িত এক বিবাহিত রমণী।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের মাকড়সার জালের মত প্লট রচনায় শান্তিবৌদির ভূমিকা আদৌ কম গুরুত্ব পায়নি। গলির প্রথম ভাড়াটে নীলারা, তার পরেই এসেছে শান্তি ওর স্বামীর সঙ্গে। আরও পরিচয় হয় আগে শান্তির সঙ্গে ইন্দ্রজিতের, পরে শান্তির সূত্রে নীলার সঙ্গেও। আর প্লটের জটে জড়াবার প্রথম গিঁট পড়ে নীলার চোখে শান্তিকে দেখার দৃষ্টি ধরেই : 'কৃশ লম্বাটে ধরণের এক মুখ, পরণে সাধারণ রঙিন একটি শাড়ি, পরবার ভঙ্গিতে অসামান্য রুচি।...রঙ? চট-টাঙানো রান্নাঘরের কুপির আলোয় সেটা ঠিক বোঝা গেল না।' লেখকের এই চরিত্রদ্যোতক অনবদ্য চিত্ররচনায় শান্তির মত রহস্যময়ী রমণীর রূপ ও স্বরূপ গোটা প্লটের অবয়বে এক বিস্ময় তৈরি করে। সেই বিস্ময়ে বিড়ালের শব্দহীন পায়ের চলা-ফেরার মত শান্তির অস্তিত্বকে শেষ পর্যন্ত ধূসর এক প্রশ্নেই অসীমতা দেয়।

শান্তির সূক্ষ্ম কৌতুকরসবোধ, স্বভাবের সংযত চাপল্য, ইন্দ্রজিৎকে ফণিনীর মত বশীভূত করার শান্তির ভিতরের গোপন জাদুদণ্ড, চাপা ঈর্ষার উপযোগী দ্ব্যর্থক সংলাপ প্রয়োগের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বেপরোয়া জেদি স্বভাব—এসব যেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের লবঙ্গলতাকে কখনো কখনো মনে করায়। শান্তি তার স্বামী মণীন্দ্রকে গলি থেকে বের করে এনে, অপর্যাপ্ত সাচ্ছল্যের মধ্যে এনেও কোনও গোপন বাসনার সোনার হরিণ মনের মধ্যে পুষে আবার ইন্দ্রজিতের কাছে আসে। শান্তি স্বামী মণীন্দ্রের সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতায় জীবনযাপনের সন্ধি করেছে। তা তার স্বভাবের এক দিক। কিন্তু অন্যদিকে ইন্দ্রর সঙ্গে যে তার সন্ধি বিচ্ছেদে সে বিমুখ, উপন্যাসে ইন্দ্রজিৎ-শান্তির সেই শেষ সাক্ষাতেই তার প্রমাণ মেলে।

একুশ পরিচ্ছেদে নীলাকে নিয়ে বাসা দেখতে যাবে বলে রাস্তার নির্দিষ্ট স্টপে অপেক্ষা করতে করতে ইন্দ্রজিৎ যেনবা কুটিল ভাগ্যের নির্দেশেই, যেনবা চরিত্রের দুর্বলতম ভ্রান্তির বশেই শান্তির কাছে চলে আসে। সে ভাগ্য নিয়তির নিয়মে খড়ির গণ্ডি-দেওয়া। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ গণ্ডি পেরোয়। যে শান্তিকে ঘৃণা করার মত স্বগতোক্তির স্বভাবে স্পর্ধা শোনায় আমাদের, সে আবার তারই চুম্বক আকর্ষণে এত দুর্বল :

'ইন্দ্রজিৎ এক দু'পা করে এগিয়ে যেতে শুরু করল। শান্তিও পাশাপাশি চলেছে। বলল, 'বিশেষ কিছু কাজ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। চলো না গাড়িতে গিয়ে একটু বসি।...চলো না আমাদের ওখানে। একটু ঘুরে আসবে। আমাদের নতুন বাসায় তুমি তো একবারও যাওনি ইন্দ্রজিৎ।' শেষের কথা কটা আবদারের মত শোনাল।

ইন্দ্রজিৎ হাঁ-না কী বলল নিজেরও খেয়াল নেই, খেয়াল হ'ল গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে।'

যেনবা শান্তি লখিন্দরের লোহার বাসরঘরের সেই সূক্ষ্ম সুতোর মত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ঢুকে ইন্দ্রজিৎকে এক মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেল। সমস্ত জীবনমুখীন বাসনা-কামনার কবর তৈরি করে শান্তি প্লটের মধ্যে তার শেষতম বাসনা-দুরন্ত অবদমিত বেগে-প্রতিবেগে। এভাবেই এক নারীর অবক্ষয়ে ঘা হয়ে ওঠা মনের বিকলনে, উপন্যাসের জীবনমুখীন সর্বশান্তির পরিণামকে প্রতিনায়িকা বিধ্বংসী ভয়ংকরী রূপ দেয়। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের প্লটবৃত্ত শান্তির তৎপরতাতেই এক মাকড়সার জাল হয়ে ওঠে, জালের কেন্দ্রে স্থির স্বয়ং শান্তি, মূর্তিময়ী আত্মনিয়তির সৃষ্টি ও স্রষ্টা।

শান্তি এমন এক রমণী যে বিবাহিতা, স্বামীর সান্নিধ্যেই চলে তার দারিদ্র্যের জীবন। কিন্তু তার আদর্শ-ভ্রষ্টতাই তো গলির অবক্ষয় জীবনের যথার্থ প্রতিবিম্বন! ১. একজন সাংসারিক বধূ সেকালে ঘরের মধ্যে প্রতিস্পর্ধিত স্বভাবে জুয়া খেলে যায়। এই মানসিকতাই তো অবক্ষয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ! ২. স্বামীর পাশে গোপনে অন্যপুরুষে—ইন্দ্রজিতের অবৈধ সম্পর্কের লীলায় বিভোর হয়। অথচ মনে করে তার স্বামী তা জানে না। অর্থাৎ সচেতনভাবে স্বামীর দিকে পিছন ফিরে এইভাবে অন্যপুরুষের সান্নিধ্য বাসনা, আর্থিক ও মানসিক-নৈতিক প্রয়োজন মেটানো গলির দারিদ্র্যের জীবন থেকে জাত অবক্ষয়-স্বভাবী জীবনচর্যা নয়? ইন্দ্রজিৎ-কে নিয়ে নীলার পাশে শান্তির যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তো গলির জীবনের সুযোগ নিয়ে সব নৈতিকতাকে বিনাশ ঘটিয়ে স্বার্থসিদ্ধির চমৎকার সুযোগ গ্রহণ। বস্তুত শান্তির মধ্য দিয়েই লেখক সে সময়ের শহর-জীবনের ঘুণধরা ফাঁকা ফাঁপা জীবনকে কিনু গোয়ালার গলির অন্তঃশীল স্বভাবে জড়িয়ে অনন্ত ব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন লেখক।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের নায়ক নিশ্চয়ই তরুণ কবি ইন্দ্রজিৎ রায়। ইন্দ্রজিৎকে কেন্দ্র করেই নীলা ও শান্তিবৌদি--যথাক্রমে দুই নায়িকা ও প্রতিনায়িকার জটিলতম সম্পর্কের শীতল স্বভাবে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে উপন্যাসের প্লটগঠনে যেমন প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তেমনি তিনটি চরিত্রই পারস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডির মধ্যে নিজের মতন করে বিবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত তারা কেউ কারোর সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কে আসতে পারেনি। অথচ এই তিন চরিত্রেরই পরিণামী ব্যঞ্জনা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা। এরই মধ্যে ধরা পড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত জীবন-স্বভাবে উৎকেন্দ্রিকতা। নায়ক ইন্দ্রজিৎ প্রথম দিকে দুই নারী অপেক্ষা ঈষৎ গৌণ হয়ে থেকেছে, কিন্তু এটাই তার চরিত্র-ন্যায়। ক্রমশ সে পাঠকের সামনে

এসেছে দুই নারীর হার-জিতের সূত্র ধরে। প্রতিনায়িকার ভূমিকা শেষ করে শান্তিবৌদি নীলা ইন্দ্রজিতের সম্পর্কের মধ্যে চিরন্তন খাদ তৈরি করেছে। নীলা ইন্দ্রজিতের সম্পর্ককে মাটির কলসির মত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ইন্দ্রজিৎ চিরকালীন আত্মধিক্কারে সেই সমস্ত রকম মীমাংসাহীন স্বভাব-দুর্বলতায় ধ্বংসকেই ভবিতব্য করে : 'নীলার কী দোষ। সে নিজে যদি একটু শক্ত হত যদি মুখের ওপর না বলতে পারত শান্তিকে—আঃ যদি বলতে পারত! নীলার প্রায় পায়ের কাছে বসে পড়ল ইন্দ্রজিৎ।'

এমন স্বভাব-ভীরুতাই প্রেমার্ত ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের অন্তর্নিহিত ট্রাজেডি তৈরি হওয়ার রন্ধ্রপথ। একজন প্রেমিক ও প্রেমার্ত যুবকের একদিকে এক নারীর মোহের আকর্ষণে শর্তহীন অনুগত হওয়া, আর একদিকে আর এক খাঁটি প্রেমের স্বীকৃতিতে নিষ্ফল দোলাচলচিত্ততা নায়ককে আসন্ন সংসারজীবন থেকে নিঃসীম শূন্য জীবনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। ইন্দ্রজিতের এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশের বীজ-স্বভাব আগে উপন্যাসের প্রথম দিকে ওর প্রতি শান্তির আধিপত্য বিস্তারে। প্রথম প্রথম আড়ষ্ট নীলার চোখে ইন্দ্রজিৎ হল 'এক রত্তি মানুষ এখনো মুখে বয়সের পরিণতির আভাসমাত্রও আসেনি—আবার চেয়েও আছে হাঁ করে। কিন্তু এমন অপাপ শিশু চোখে, রাগ করা চলে না।' প্রথম দিকের দর্শনে নীলার চোখের নিচে মনে, হয়ত বা তারও গভীরে গোপনে পূর্বরাগের রেশ মেলে। আর শান্তিবৌদির কাছে—যে ইন্দ্রজিতের থেকে বয়সে বেশ বড় —নীলার নীরব উপলব্ধি সামান্য উপস্থিতিতেই 'সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশান্ত হয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ।...ফণা মাটিতে নেতিয়ে পড়েছে।'

একদিকে শান্তিবৌদির রহস্যময় আধিপত্য স্থাপন, আর একদিকে নীলার সান্নিধ্যের সূত্রপাত—এই দুই চাপের মধ্যে নীলার ইন্দ্রজিৎকে বুঝে নেওয়া এমন :

'শান্তি ইন্দ্রজিৎকে যা ভয় করে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু সে ভয়টুকুও বিচিত্র। অন্ধকারে কালো বেড়াল দেখে চমকে ওঠা ঘর্মক্লেদাক্ত ভয় নয়, গভীর রাত্রে নদীর পাড়ে একলা বসে থাকার ভয়। ছমছমে গায়ে কাঁটা দেয়, আবার ভালোও লাগে। শুধু ভয় নয় বিস্ময়ও।'

অর্থাৎ ইন্দ্রজিতের যুবক বয়সের শুরু থেকেই জাগে শান্তির কাছ থেকে ভীত-বশীভূত হওয়ার এক নিঃসঙ্গ বিস্ময়বোধ, আর এক দিকে তরুণী নীলার কাছ থেকে নতুন প্রেমবোধের আকর্ষণ। এই সত্তার দুটি দিক ধরেই শান্তি ও নীলা—দুজনে ঈর্ষার খেলায় ইন্দ্রজিৎকে মাতায়। আসলে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে যেটা অভিজ্ঞ শান্তির মনোরম খেলা, সেটাই আবার নীলার কাছে গোপনতম রোমান্টিক আকর্ষণের সূত্র ধরে ঈর্ষার প্রতিদ্বন্দ্বের লীলা। সন্ধেয় স্বামীকে রেখে একা শান্তিবৌদি ইন্দ্রজিতের সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে, ইন্দ্রজিতের আংটি বাঁধা দেওয়া পয়সায় রাতের শোতে দুজনে সিনেমা দেখে, শান্তিবৌদি ইন্দ্রজিতের অন্ধকার ঘরে অস্বাভাবিক অবস্থায় কিছু সময় কাটায়। আর ইন্দ্রজিতের দিনযাপনের এইসব জটিল গ্রন্থিগুলোয় নীলাও ঈর্ষায় আস্তে আস্তে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। স্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার কারণ বলেই শান্তির খেলার

অন্য মাত্রা—যা তার একান্ত রমণীমনের নিজস্ব, নীলার জড়িয়ে যাওয়া এক নব যুবতীর হৃদয়ধর্মের নিশ্চিত দাবিসনদ।

এইভাবেই দুই রমণীর মধ্যে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের সূক্ষ্ম বিবর্তন চলে, নায়ক হয় অভিজ্ঞ। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা যে তার স্বভাব-দুর্বলতা ও ভীরুতাকে সরায় না, অভিজ্ঞ ইন্দ্রজিতের ব্যবহার তার প্রমাণ দেয়। একতলার ঘরের উল্টো দিকে সামনে শান্তিবৌদি ইন্দ্রজিৎকে সেবা দেয়, আর এই সূত্রেই তার সান্নিধ্যের উত্তাপ, উষ্ণতা শরীরে মনে মাখে অগোচরে, নীলাও ক্রমশ এক রুগ্‌ণ ইন্দ্রজিৎকে বাঁচাতে ওর কাছে চলে আসে। নীলা ইন্দ্রজিৎকে শান্তির মোহ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। উপন্যাসের তেরো পরিচ্ছেদের শেষে পার্ক থেকে ঘুরিয়ে এনে নীলা ইন্দ্রজিৎকে যে সান্নিধ্য দেয়, যেভাবে নায়কের বাঁচার বাসনাকে উদ্দীপিত করতে প্রয়াসী হয়, তাতে ওদের অলক্ষ্যে শান্তির বিদ্রূপ-আঁকা ঠোঁটের খাপ খুলে শাণিত হাসি নিষ্কাষিত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রজিতের অন্ধকার ঘরে নীলা-ইন্দ্রজিতের গোপন সুখময় সান্নিধ্যকে চরম ধাক্কা দেয় শান্তি একধরনের প্রতিশোধ স্পৃহায়। শান্তি ওদের সামনে এসে দাঁড়ায় :

'তারপর ছুটে পালিয়ে এসেছে নীলা। দু'হাতে মুখ ঢেকে, যে মুখে তখনো আর্দ্র স্পর্শের সরলতা, প্রশ্বাস তীব্রবহ।

লজ্জা? সে তো ছিলই। শান্তি দেখে ফেলেছে, সে তো শোধবোধ। কিন্তু শান্তিকে দেখেই ইন্দ্রজিৎ অত তাড়াতাড়ি যেখান থেকে একটু আগেই একটা একটা করে কাঁটা তুলে খোঁপা খুলে দিয়েছিল, সেই মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দিল কেন? নীলা তো চেয়েছিল শান্তি দেখুক, কিছুই প্রায় দেখানো গেল না—সাহসই হল না ইন্দ্রজিতের—সেও কি কম লজ্জা।'

নীলার এমন চিন্তা-ভাবনায় ইন্দ্রজিতের যে আচরণ—তার মধ্যে সেই দ্বিধা আনে বিস্ময়কর এক দুর্বলতা—দুর্বলতা শান্তিবৌদি সম্পর্কেই। এই দুর্বলতা ভয়মিশ্রিত, এও বুঝি শান্তিবৌদির প্রতি এক জটিল আকর্ষণের অভিজ্ঞান।

উপন্যাসের আঠারো পরিচ্ছেদে ইন্দ্রজিতের আর এক অভিজ্ঞ মনের পরিচয় মেলে। এক নিষ্ঠুর বৈপরীত্য ইন্দ্রজিতের মধ্যে বার বার নানা খেলায় ওকে নাড়া দেয়। কখনো নীলা কাছে থাকলে, কখনো শান্তির সান্নিধ্যে—উভয় প্রসঙ্গেই। ইন্দ্রর কাছে শান্তি এক দুর্নির্বার মোহই। আঠারো পরিচ্ছেদে সন্ধেয় নীলা ওকে ছেড়ে চলে গেলে শান্তির ওর ঘরে ঢোকা ও উপস্থিতি তা-ই প্রমাণ করে :

'প্রথম সূর্যোদয়ের রঙ কপালের গাঢ় টিপটিতে, ফিকে নীল শাড়ির ছোট ঘোমটাটুকু আকাশের মত আনত ; চোখের মণি দু'টিতে দ্রুত বিলীয়মান রাত্রির শেষ কালোর রেশ। ইন্দ্রজিৎ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে একটা সাড়া জেগেছে, অসংখ্য রক্তকণিকায় স্পর্শ-তৃষ্ণা, ভয় ভালোবাসা অভিমান সব প্রথম বর্ষার জোয়ারের মতো। মনের আনাচে কানাচে, আঙিনায়, দেহের কানায় কানায় ভরে গেছে।'

শান্তির এই উপস্থিতির ব্যঞ্জনার সঙ্গে একটু আগের নীলার সান্নিধ্যের তুলনা অনুভব করে ইন্দ্রজিৎ। এখানে ওর নতুন অভিজ্ঞতা। '....তখন তো সত্তাময় এমন আলোড়ন ওঠেনি ; নম্র শান্ত সজল একটা অনুভূতিতে দেহমন আচ্ছন্ন হয়েছিল।' ইন্দ্রজিতের কাছে নীলা এক কল্যাণী প্রেমময়ী সত্তা—যা ভাঙে না, গড়ে। ইন্দ্রজিতের কাছে নীলা গরমের দিনের পরমতম তৃষ্ণা নিবারণের মঙ্গলময় পানীয়, আর শান্তিবৌদি নিঃসঙ্গ হৃদয়ের গভীরের মদের আগুনের জ্বালা। তাই শান্তির উপস্থিতির মধ্যে 'শুকনো তৃণগুচ্ছ যেন হঠাৎ আগুনে জ্বলে উঠল ; ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে চেতনা, মাথা তুলে চাইবার ফুরসৎ নেই ; এই ঢেউ নেমে যাবে যখন, রেখে যাবে একটা লবণাক্ত স্বাদ ; রোমাঞ্চের স্বাদ।' ইন্দ্রজিৎ জানে এই রোমাঞ্চ অস্থায়ী, মোহের মায়া, জলপানের পরমতম তৃষ্ণা নিবারণের মঙ্গলময়তা এতে নেই।

দুই নারীকে দু'দিক থেকে পেয়ে ইন্দ্রজিৎ এবার অভিজ্ঞ হয়েছে ভিতরে। 'শান্তি ওকে নিষ্ঠুরভাবে রস-নিঃশেষে পাত্রের মতো ফেলে দিয়েছে।' তাই অভিজ্ঞের মতই শান্তির ওদের সঙ্গে গলি ছাড়ার ও সচ্ছল ধনী শান্তিদের আস্তানায় আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাবকে যুক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ইন্দ্রজিৎ বিষিয়ে যাওয়া মনে ভেবে যায়—'কী অহংকারী ; কী অন্তঃসারশূন্য' শান্তি, ও ইন্দ্রজিতের কাছে তীব্র ঘৃণার পাত্রী। ওর চলা-বসা কথা বলা সব কিছুর একটা ব্যঙ্গ-বিকৃত-রূপ যেন চোখের সমুখে ভাসতে লাগল —কী স্থূল, কী নিরুচি। এই টাকার সাচ্ছল্যের স্বপ্নবিভোর মেয়েটা তাকে শুধু ঠকিয়ে গেছে।' ইন্দ্রজিতের জন্যে যার মনে এককণা করুণা নেই। সে নীলার আশ্রয়ে গভীর শান্তির শপথ নেয় যেন। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সব ভাবনার এক সিদ্ধান্তে স্থিত থাকতে পারে না। শান্তির অস্তিত্বের অনুভব তাকে কুরে কুরে খায়। সচেতন মন ও অবচেতন মন অদ্ভুত ক্রিয়া করে। যখন শান্তির সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনাটুকু তাকে ম্রিয়মাণ করে, তখন এক আত্মসম্মোহিত মনে ভাবে, 'শান্তিকে সে এখনো ভালোবাসে। কাউকে পছন্দ না করেও ভালোবাসা যায়।' আর এই জটিল ভাবনার মূলই উপন্যাসের শেষে নীলার কাছ থেকে ওকে পরোক্ষে সরিয়ে দেয়, ট্রাজেডীর জটিল রন্ধ্রপথকে দেখিয়ে দেয়। এই চিন্তা-ভাবনার দোলাচল স্বভাবে নায়ক অবশ্যই ট্রাজেডীর এক মহত্তম 'ভিক্‌টিম্'।'

প্রেসে প্রুফরিডারের চাকরি পাওয়ার পর, ক্রমশ তাতে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলে ইন্দ্রজিতের নীলাকে নিয়ে সংসার-বাসনা জীবনমুখী ও স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেও নায়কের বিধিনির্দিষ্ট ভ্রান্তি বড় হয়ে ওঠে, জীবনবিধ্বংসী রূপ নেয়। নীলার অগোচরে, সে দেখতে পাবে না ভেবেই শান্তির গাড়িতে শান্তির সহযাত্রী হয়। সেই মোহ তার ওপর কর্তৃত্ব করে, আসলে এই মোহ মানেই শান্তি ও তার সঙ্গবাসনা। এ বিষয়ে নীলার ভাবনাই যেনবা তার শেষ সিদ্ধান্তের বীজরূপ :

'কি করে বলবে যে শান্তিকে ইন্দ্রজিৎ ভুলতে পারবে, এমন আশা করাটাই হয়েছিল ভুল। ইন্দ্রজিতকে শান্তির মোহ থেকে উদ্ধারের নেশায় সর্বস্ব নিবেদন করে বসে আছে নীলা, উদ্ধার করছে, কিন্তু মোহ ঘোচাতে পারে নি।'

দুজনের সম্পর্কে মিথ্যাচার, গভীর অবিশ্বাস সৃষ্টি করে ইন্দ্রজিৎ-ই। নীলা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রজিৎকে দেখেছে শান্তিবৌদির সঙ্গে গাড়িতে যেতে—এই ঘটনাই ইন্দ্রজিৎকে চরমতম অসহায়তার দিকে ঠেলে দেয়। আত্মধিক্কারে ইন্দ্রজিতের তাৎক্ষণিক ভাবনা : 'নীলার কী দোষ। সে নিজে যদি একটু শক্ত হত, যদি মুখের ওপর না বলতে পারত শান্তিকে,—আঃ যদি বলতে পারত।' এর পর নীলার সত্যভাষণের কাছে ইন্দ্রজিতের আত্মপক্ষ সমর্থনে সমস্ত যুক্তি হয়ে যায় নিষ্ফল, নিজের পক্ষে অপমানকর এবং একে একে এক করুণ ট্রাজেডি-নায়কের পক্ষে পতন ঘটতে থাকে। ক্ষমা-ভিক্ষার্থী হয়ে 'নীলার পায়ের কাছে বসে পড়ে ইন্দ্রজিৎ।' নীলার প্রতি দায়িত্ব আর কৃতজ্ঞতার প্রসঙ্গ তোলে। করুণা, কৃতজ্ঞতা, দায়িত্বপালন--এসব শব্দ প্রেমের কাছে কৃত্রিম নিষ্ফল, তুচ্ছ। হতবুদ্ধি ইন্দ্রজিৎ হয়ে ওঠে বুদ্ধিদীপ্ত, প্রেমিকা, সহমর্মী এক নায়িকার কাছে গুলিবিদ্ধ পুরুষ, এক নিহত নায়ক।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে ইন্দ্রজিৎ মূল জটিলতম প্লটের অন্যতম স্রষ্টা। তার বিবর্তন আছে, কিন্তু তা পতনের দিকে তাকে নিয়ে যায়। আর তার কারণেই অন্তঃসত্ত্বা নীলার জীবনে নেমে আসে উৎকেন্দ্রিক জীবনের অনপনেয় অভিশাপ। ইন্দ্রজিৎ শান্তিবৌদির ক্রীড়াসুখের অংশীদার হয়েছে। শান্তিবৌদির জীবনস্বভাবের বৈচিত্র্যে সে বড়মাপের ইন্ধন। আর নীলার জীবনে সে মূর্তিমান ভ্রান্তি হয়েই থেকেছে। সে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনি। তার দুর্নিবার মোহময় বাসনা ও ভালবাসার বেগের আবেগ—দুই দিক এক আধারে আশ্রয় পায়নি। সে কবি, কিন্তু কবিতার অমিল জীবনের মিলের গভীরে রেখে হিসেবনিকেশ করতে গিয়েই অঙ্কে ভুল করেছে। নিজেকে বুঝতে পারেনি বলেই সে-ও হয়েছে কিনু গোয়ালার গলি থেকে ফেরার, নিজের জীবনবৃত্তেই এক আসামি। প্লটের বৃত্তে তার চলাচল শান্তিবৌদি ও নীলার তুলনায় হঠাৎ-হঠাৎ গৌণ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে সে প্লট-বৃক্ষের প্রধান গুঁড়ি, যার ঊর্ধ্বমুখে দু'টি বড় কাণ্ডের স্বভাবে শাখা—শান্তিবৌদি ও নীলা।

এক সমালোচকের বিচার, লেখকের দিক থেকে ইন্দ্রজিৎ ও প্রমথ—দুজনকে বাদ দিলে উপন্যাসটির 'অন্য কোথাও গলির সঙ্গে মানবজীবনের নাড়ীর যোগ দেখান হয় নাই।' আমরা এই মতের বিপরীত ভাবনায় বিশ্বাসী। আগেই বলেছি নীলা ও শান্তি গলির শিকার। কারণ নীলার আগের জীবন থেকে যে ক্রমিক নিষ্ঠুর পতন, দারিদ্র্যজনিত যে আত্মিক সংকট সৃজন, তার মূলে কাজ করেছে গলিরই বিকট হাঁ-মুখের অমোঘ আকর্ষণ। শান্তিবৌদিও সেই দারিদ্র্যের নিশ্চিত শিকার। কিন্তু কিনু গোয়ালার গলি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সময়ের ও সভ্যতারই উৎপাদিত উপকরণ। শান্তিবৌদি সেই নিয়তির ক্রীড়নক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে শকুন্তলা ও তার সেবাসত্রের মধ্যে যে অবৈধ জীবন-স্বভাব গড়ে ওঠে, তা গলির প্রভাব নয়, গলির বাইরের। কিন্তু অভিনিবেশে লক্ষ করলেই বোঝা যায়, শকুন্তলা ব্যক্তিগতভাবে গলিতে আসার আগেই স্বামী-সংসার জীবনের 'victim' ছিল, গলিতে আসার পর সমবেত স্বভাবে সেবাসত্রের জীবনে তার

সংবাদপত্রসেবী, স্বার্থপর স্বামী বনমালী সরকারের দ্বারা চরম বিনাশকে, নৈতিক পতনকে বিষপানের স্বভাবে মানতে হয়েছে। গলির ঐতিহ্যে ছিল বসাক বাবুদের অতীত-বিনাশি জীবন। সেবাসত্রের যে অবৈধ জীবনের উত্তাপ, তা সেই ঐতিহ্যের অনুক্রমিক অভিশাপই! এই প্রভাব গলির বাইরের জগতের নয় গলিরই জীবনচর্যার অন্তর্লীন স্বভাবের বুর্জোয়া নীতি ও অর্থনীতিরই নিশ্চিত প্রভাব। শকুন্তলার সূত্রে গলিতে এসে এ জীবন গলির প্রভাবে হয়েছে গলির অনুগ, ওতপ্রোত। শকুন্তলাও ক্ষয়িষ্ণু মানুষ পরোক্ষে, নীলার মত প্রত্যক্ষ প্রভাব তার মধ্যে নেই। কিন্তু স্বামীর গোপন চাতুর্যে, লোভে, স্বার্থসেবায় তার সেবাসত্র ভেঙেছে. অবৈধ সম্পর্ক দিয়ে বৈধতার ভানে তার সদস্যরা সভ্যতার চিহ্ন গ্রহণ করেছে। অবক্ষয়কে বৈধ করা বস্তুত কালো টাকাকে সাদা করার চমৎকার প্রয়াস মাত্র। স্বামী বনমালী সরকার নার্স গীতার মত কি নতুন নারী নিয়ে সংসার করে কোনও বড় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবে বলে বিশ্বাস জাগায়? গলির অবক্ষয়ের অভিশাপ রক্তকে বিষাক্ত করেছে, তা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সক্রিয়তা সত্ত্বেও বীজাণুর স্বভাবে মাটিতে থেকে যায়, যাবে--প্রতীকী ভাবনায় তার সমর্থন উপেক্ষার নয় বলেই আমরা মনে করি।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে অন্যতম গৌণ চরিত্র অবিনাশকাকু হলেও জটিল প্লটের মধ্যে নড়া-চড়া একটু বেশিই ধরা পড়ে। অবিনাশকাকু নীলার বৌদি অমিতার কাকা। বিপত্নীক, মধ্যবয়সী, রীতিমত ধনী এবং যুবতী নারীপ্রীতি তার বেশ কিছুটা বেশি। পপলার পার্ক থেকে নেমে-আসা নীলাদের পরিবার। তাদের অবতরণ এই অন্ধ বন্ধ কিনু গোয়ালার গলিতে। আর এইসব পরিবার--যেখানে যুবতী শিক্ষিতা মেয়ে আছে --অবিনাশকাকুর মত মানুষের কাছে প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অবিনাশকাকুর লক্ষ্য নীলা, কিন্তু সেই সূত্রে সে শকুন্তলাকে ছাড়ে না, ছাড়ে না শান্তিকেও। মেয়েদের সান্নিধ্যে অবিনাশকাকু পায় সূক্ষ্ম উত্তেজিত অনুভূতি। মেয়েরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে, বানানো সম্পর্কের খেলায় মাতে, নখদন্তহীন স্তিমিতপৌরুষ মানুষটি হয়ে ওঠে প্রহসনের চরিত্র। চরম দারিদ্র্যের সীমায় চলে-আসা নীলাও এক সময়ে আপস করে কাকুর সঙ্গে।

আবার নীলাকেও লুকিয়ে লজ্জাহীন, ধনগর্বে গর্বিত অবিনাশকাকু আসে শকুন্তলাদের সেবাসত্রের দরাজ খরচের, চাঁদার সাহায্যে দানের সূত্রে। শান্তিবৌদির ঘরেও ঢোকে। মেয়েদের ব্যঙ্গ, শ্লেষ, কৌতুক গায়ে মাখে না। শকুন্তলার কথায় অবিনাশকাকুর স্বগতোক্তি : 'ছুঁড়ি আবার বলে আমাদের চেনেন না, জানেন না, এতগুলো টাকা হঠাৎ দিয়ে বসলেন? আরে, না-চেনা না-জানা জায়গায় অবিনাশ জীবনে এই প্রথম টাকা ঢালছে নাকি। বিজনেস রিস্ক আছেই।...এও এক নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে অবিনাশের।' এই হল অবিনাশের আসল স্বরূপ। যুবতী বা মধ্যবয়সী মেয়েদের নিয়েই তার 'বিজনেস'। এরা যথার্থই যুদ্ধোত্তর কালের অবক্ষয়ের 'প্রোডাক্ট'। লেখকের কথায়--'শরীর মরেছে, মন মরেনি--এ বড়ো মর্মান্তিক ট্রাজেডী। মৃতদেহে একটা সজীব, সবুজ ক্ষুধাতুর মন বহন করছে অবিনাশ।' চাপা যৌন বিকৃতির আনন্দ-সন্ধানে এই পুরুষটি

বেপরোয়া।

উপন্যাসের প্লটে অবিনাশকাকুর ভূমিকার গুরুত্ব কম নয়। ১. সে নীলার দাদা-বৌদির সামাজিক স্ট্যাটাস বদলের অন্যতম উপায়। ২. নীলাদের সংসারকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে পরোক্ষে দেবব্রত-অমিতাকে আশ্রয় দেওয়ার সূত্রে। ৩. অর্থ সাহায্য করে, নীলার সাময়িক 'মুড'-এ অবিনাশকাকুর সঙ্গে আপস করার মানসিকতায় সিনেমা হলে যাওয়ার সঙ্গী হয়ে শান্তিবৌদির প্রবল ঈর্ষার জাগরণে সহায়তা করে। ৪. যৌন-অবদমনে অবিনাশকাকু যুদ্ধোত্তর কালের ভস্মরাশি থেকে জন্ম নেওয়া অবক্ষয়ের এক বিশেষ দিকের প্রতীকী চরিত্র। ৫. পপলার পার্ক-এর সোসাইটির আভিজাত্য নির্ভর করত শেয়ারের দাম ওঠায় ও ব্যাঙ্কের সফল ব্যবসায়। সেসবের যুদ্ধোত্তর অবনমনে পপলার পার্ক আভিজাত্য হারায়। অবিনাশকাকুরা সে জায়গায় উঠতি, ফাটকা স্বভাবের ধনীদের শ্রেণীবৈশিষ্ট্যে নতুন বিকৃত ধনীর সমাজ গড়তে তৎপর। ক্যাপিটালিজমের বিকৃত রূপের পোষক হল এরাই। কিন্তু গোয়ালার গলির সম্পূর্ণ অর্থ ও নীতি-আদর্শে ভেঙে-পড়া বাসিন্দাদের আশ্রয়েই এদের বিবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা।

শান্তির স্বামী মণীন্দ্র সান্যাল লেখকের কল্পনায় সে সময়ের এক প্রতিষ্ঠিত কথাকার-ব্যক্তিত্ব। শিল্পের বাস্তবতা তার উপন্যাসের অন্যতম অন্বিষ্ট বিষয়। উপন্যাস রচনায় এই কথাশিল্পী তার স্তর থেকে নিচে নামতে একান্ত অনীহ। কিন্তু দারিদ্র্য আর স্ত্রীর চাপ তাকে আদর্শভ্রষ্ট করে। মণীন্দ্র সান্যাল উপন্যাসের নাট্যরূপ দেয় প্রবল আপত্তিতে। আবার তার নাটকেরও একাধিক দৃশ্যের বদল ঘটায় দর্শক জনগণের সস্তা চাহিদার কারণে নাট্যমঞ্চের কর্তা সুহাসের যুক্তিতে নৃপনাথ। নাটকের একাধিক দৃশ্যের বদল কিছু অবাস্তব, কিছু অতিবাস্তব, কিছু আকস্মিকতা মিশিয়ে। এমন মোটা দাগের সস্তা প্রয়োগ মণীন্দ্রর শিল্পীসত্তার গভীরে চরম আঘাত করে। তবু আর্থিক সচ্ছলতা আসে। শান্তির বিপুল অর্থ-লালসার কাছে মণীন্দ্র সুস্থ আর্টের মায়া ছেড়ে দেয়। রাতে বিছানায় শুয়ে একই বালিশে মাথা-রাখা স্ত্রী শান্তির পুলকবিস্মিত কথার উত্তরে অন্তর্যন্ত্রণায় কাতর মণীন্দ্র জানায় : 'কল্পনা করো শান্তি তুমি মা হয়েছ, কিন্তু সেই সন্তান আমার নয়। তোমার কোলে ফুটফুটে ছেলে সবাই প্রশংসা করছে।...আমার সঙ্গে তুলনা করে বলছে "ঠিক ওর বাবার মত হয়েছে—"আমি স্মিত, অপ্রতিভ লজ্জিত মুখে সব শুনছি, মেনে নিচ্ছি বিনা বাক্যে। আমার তখনকর চেহারাটা কল্পনা করতে পারো—'। আদর্শবাদী সচেতন লেখক মণীন্দ্রের এই চাপা ক্ষোভ যন্ত্রণা দিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ সে সময়ের শিল্প সাহিত্য নাটক ইত্যাদির মর্যাদা, শিল্পের সম্মান থেকে লেখকদের বেদনাহত বিচ্যুতির দিক দেখাতে চেয়েছেন।

এটা কথাকার মণীন্দ্রের এক দিক। আর এক দিক হল মণীন্দ্রের সুস্থভাবে বাঁচার বাসনা, গভীরতম আর্তি চরিত্রটির অন্য মাত্রা দেয়। যেখানে মঞ্চের অভিনেত্রী চামেলীর বাড়ি থেকে মাতাল হয়েও শান্তির ফটো হাতে নেশা সরিয়ে ফিরে আসে কিনু গোয়ালার গলির মুখে, সেখানে দেখে এত রাতে শান্তিকেও। দুজনেই আকস্মিক দেখা

হওয়ার ধাক্কা সামলে বাসার দিকে ফেরে। এই দৃশ্যের শান্তিকে বলা শেষ কথা মণীন্দ্রের সুস্থ জীবনার্তির সম্পূর্ণ অনুগ :

'চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। বরাবর তো আমরা এ রকম ছিলাম না? ধরো এখানে আসবার আগে? অভাব আগেও ছিল, কিন্তু এভাবে দুজনকে আলাদা করে দু'পথে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে একই পথে দাঁড় করিয়ে দেয়নি। এই গলি আমাদের শেষ করে ফেলেছে শান্তি। এখানে আকাশ নেই, এখানে সহজ হয়ে বাঁচবার উপায় নেই। এই আবহাওয়ায় আমাদের চিন্তা, সব কাজ কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বাঁচতে হলে এ আমাদের ছাড়তে হবে। হাওয়া বদল ছাড়া এ ক্ষয়রোগের চিকিৎসা নেই।'

বস্তুত 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে কথাকার মণীন্দ্র সান্যালই একমাত্র মানুষ যার মধ্যে মাথা উঁচু করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাঁচার শেষ বাসনাটুকু একটুও ম্লান হয়নি।

কিন্তু মণীন্দ্র শান্তিকে অবাধ স্বাধীনতার ভানে মুক্তি দিয়ে যেভাবে তাকে তার উপন্যাসে ও নাটকে কাজে লাগিয়েছে, সেখানেই উপন্যাসের প্লট-গঠনে মণীন্দ্রর দায়দায়িত্ব মান্য হয়। দারিদ্র্যে শান্তির যে ক্ষোভ, অন্তঃশীল প্রতিবাদী ভূমিকা, তাকে কাজে লাগায় শিল্পে। উপন্যাসের ছকে শান্তির যে গোপন সক্রিয়তা তা প্লটে জটিল মাকড়সার জাল রচনার বড় মাপের উপায়। মণীন্দ্রর চোখে দেখা সেই মাঝরাতের শান্তির মুখের যে ব্যাখ্যা, তা প্লটের ভিতরের জটিলতা আরও জটিল করে তোলায় শান্তির ভূমিকায় বাস্তব সত্য বড় ব্যঞ্জনা পায় :

'লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, অভিমান, ক্ষোভ—সব কিছুর এমন বিমিশ্র অভিব্যক্তি একখানা মাত্র মুখে ফোটাতে চামেলীর মতো স্টেজ অ্যাকট্রেসের সাত জন্ম লেগে যাবে। কিন্তু তুমি সিনেমা তারকা হবার জন্যে উমেদারি করতে গিয়েছিলে কেন, শান্তি?'

এই উমেদারির বিস্তৃত পরিচয় জানে মণীন্দ্র, কিন্তু ইন্দ্রজিতের সঙ্গে তার সম্পর্কের যে ভিতরের মনস্তত্ত্ব, যে ভিতরের গোপন নীতির ক্ষয়, তার কোনও খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখানেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বড় মাপের ফাঁক, 'ফ্যালাসি'। মণীন্দ্র-চামেলী সংলাপ-বিনিময় প্রসঙ্গটি সন্তোষকুমার ঘোষ কিছুটা বিস্তারিত করেছেন। চামেলীর অভিনেত্রী জীবনের উচ্চাশার স্বরূপ সেকালের সমস্ত অভিনেত্রীদেরই স্বাভাবিক খ্যাতির মোহের প্রতিনিধিত্ব করে। মণীন্দ্রর আর্থিক সচ্ছলতার ও সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভের সমস্ত দিক শিল্পী মণীন্দ্রর জীবনের অবধারিত নিয়তি-নির্দেশক। দরিদ্র শিল্পী মণীন্দ্রের এমনভাবে সস্তা চটকদার শিল্পের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সই করা শিল্পের আদর্শহীনতা ও শিল্পীর জীবনের নৈতিক মৃত্যুর পরাকাষ্ঠাই।

আবার শকুন্তলার 'সেবাসত্রে'র সূত্রে তার স্বামী ঝানু সাংবাদিক বনমালী সরকারের যাবতীয় তৎপরতা, সেবাসত্রের অন্যান্য পাঁচ সদস্যের একাধিক ক্রিয়াকলাপ, শকুন্তলার 'সেবাসত্র' বাঁচিয়ে রাখার কঠিন শ্রম ও প্রত্যয়নিষ্ঠ প্রয়াস 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের রহস্যময় জাল বিছানো কায়ারূপকে আরও কিছু দিকে নতুন ডাইমেনশান দেয়। সপ্তম পরিচ্ছেদেই প্রথম গোষ্ঠীগতভাবে শকুন্তলাদের 'সেবাসত্র'টিকে কিনু

গোয়ালার গলিতে ভাড়া নিয়ে ভিড় জমাতে দেখি। নীলাদের বাড়ির ঠিক বিপরীতেই বসাকবাবুদের পরিত্যক্ত বাড়িতে ওরা আসে। প্রতিবেশী হিসেবে নীলাই প্রথম শোনে শকুন্তলার কাছে ওর স্বচক্ষে দেখা ভোর রাত পর্যন্ত স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে শান্তিবৌদির জুয়া খেলার কথা। ধীরে ধীরে শকুন্তলা মূল প্লটের মধ্যে প্রবেশের অধিকার পায়। নীলার নির্বোধ বিস্ময়, বিশ্বাস আস্তে আস্তে বাস্তব অভিজ্ঞতায় যাচাই হওয়ার ব্যাপারে শকুন্তলার কৌতূহল ও নিখুঁত সত্যদর্শন প্লটকে ঘন করে।

লেখক 'সেবাসত্রের' একেবারে বাস্তব ছবি এঁকেছেন। সদস্যদের বাঁধা কাজের বাইরে নিজেদের সেবাসত্রের স্বাধীন জীবনচিত্র উপহার দিয়েছেন তাদের আগামী জীবনের কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ার আশা-নিরাশার শপথদীপ্ত স্বভাবচিত্রের মধ্য দিয়ে। বাদ সাধে দীর্ঘদিন আগে ছেড়ে আসা দুরারোগ্য ব্যাধি-আক্রান্ত, কীটদষ্ট দেহের স্বামী বনমালী সরকার। আসে সেবাসত্রে, আবার শকুন্তলাকে ওর সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ ওর শরীরে আর সে অসুখ নেই। শকুন্তলাকে ছেড়ে চলে আসার পর আবার বিয়ে করে, সুস্থ সন্তান হয়, সেই স্ত্রী মারা যাওয়ায় এখন শকুন্তলাকে কাছে চায়। শকুন্তলা তার তীব্র বিরোধী। ঝানু সাংবাদিক বনমালী সরকার কাগজে কুৎসা রটায় বানানো গল্প বলে। জেদি শকুন্তলার সেবাসত্রের ভাঙন ধরায়। একজন সদস্যা গীতার সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক করে সেবাসত্র থেকে তুলে নিয়ে জীবন গড়ে নতুন করে। এর আগে 'সেবাসত্রে'র প্রশংসা করে শকুন্তলার মন জয় করার কৌশল নিলেও বনমালীকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি শকুন্তলা। একে একে শকুন্তলা শুধু অণিমাকে নিয়ে, আর সবকে হারিয়ে একা নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। শেষে কিন্তু গোয়ালার গলি ছাড়তে চায়।

এই অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা নীলা তার নির্মম একাকীত্ব ঘোচাতে শকুন্তলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। রাতে নীলা ওদের সঙ্গে এক নতুন অজানা জীবনের দিকে পাড়ি দেয়। এইভাবে উপন্যাসের মূল কাঠামোয় বড় আর এক শক্ত কাঠামো হয় সেবাসত্র, শকুন্তলা। নীলার শেষতম আশ্রয় হল শকুন্তলা ও তার সেবাসত্র। উপন্যাসে শকুন্তলা ও তার সেবাসত্র কয়েকটি বড় শিল্প-দায় মেটায়। ১. সেকালে ঝানু সাংবাদিক ও তাদের সাংবাদিকতা যে কত স্বার্থসর্বস্ব, নিচুস্তরের কুশলী, মানবিক সম্পর্কের সর্ববিধ্বংসী ছিল, বনমালী সরকার তারই প্রামাণ্য প্রতিনিধি। ২. সুস্থ হয়ে জীবনসংগ্রামে মেতে থেকে সেবায়, মানব্যে একটা গোষ্ঠীজীবন যে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, যুদ্ধোত্তর কালে তার পরিবেশ ও সে সময়ের মানুষ তাকে অবলীলায় বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। ৩. নায়িকা নীলার মনের ক্রমবিকাশে, শান্তিবৌদির ঈর্ষার স্বরূপ-চিত্র উপহারে শকুন্তলার কিছু তৎপরতা বিশেষ অর্থবহ হয়। ৪. উপন্যাসের শেষে নীলার সিনিক মনের পক্ষে একটি আশ্রয় খুবই জরুরি ছিল। অন্তঃসত্ত্বা নীলার পক্ষে অবিনাশকাকুর কাঙ্ক্ষিত পপলার পার্কের জীবন-সদৃশ আশ্রয় গ্রহণ অসম্ভব ছিল, অসম্ভব ছিল যেমন ইন্দ্রজিতের কাছে ফিরে যাওয়া। অসুস্থ বাবা-মায়ের সংসার তার পক্ষে একা দেখাশুনা অর্থনীতির নিষ্ফলত্বে অসম্ভব ছিল—যেখানে দাদা-বৌদির পরিবারের সঙ্গে অনন্বয় ছিল ভয়ংকর

স্বভাবে। শকুন্তলাদের কাছে আশ্রয়ের জন্যই নীলার পক্ষে 'সেবাসত্র' এক নিশ্চিত মুক্তির বাতাস। নীলা ও শকুন্তলার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব কোথাও যেন গোপনতম সূত্রে সদৃশ, কঠিন স্বভাবে চুম্বক-আকৃষ্ট।

উপন্যাসের অন্যান্য গৌণ চরিত্রের ভিড়ে নীলার দাদা দেবব্রত ও বৌদি অমিতা এক ভেঙে-পড়া পরিবারের উপযোগী স্বার্থসর্বস্ব, নিম্নশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী উচ্চাকাঙ্ক্ষী দম্পতি। নীলার বাবা শিবতোষবাবু উদাসীন পুরুষ, নিভাননী বাড়িতে অবিবাহিতা তরুণী কন্যার বিবাহভাবনা ও যুবক চাকুরে পুত্রের অর্থসাহায্য প্রত্যাশায় হতাশ এক বাঙালি মা, স্নেহ-দুর্বল। নীলার পপলার পার্কের সেই সব সঙ্গী-বন্ধু সৌম্যদা, মনন এক বিশেষ আভিজাত্যের প্রতীকী অতীত, এক নস্ট্যালজিয়া। ললিতা, স্টেলা, গীতা আপনাপন জীবন গঠনে জীবনপ্রেমী। এরা সকলেই উপন্যাসের পরিবেশ ও প্রধান প্রধান প্রসঙ্গকে শিল্পমূল্যে প্রতিষ্ঠা দিতেই প্লটে জড়িয়ে গেছে।

আব এই সমস্ত মুখ্য ও গৌণ চরিত্রদের ছাড়িয়ে প্লটে আর একজনের উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে যেমন ব্যক্তি, তেমনি প্রতীকীও। সে যেনবা সভ্যতার ইতিহাসের এক মাইল-স্টোন। সে হল প্রমথনাথ পোদ্দার—কিনু গোয়ালার গলির প্যারিস জুয়েলারির একক এবং একমাত্র প্রোপাইটার। উপন্যাসের প্লটে সে কেন্দ্রীয় পুরুষ। সে যেমন লেখকের সৃষ্টি, তেমনি সে নিজে যেন কিনু গোয়ালার গলির একজন নিপুণ দর্শক, আবার তার মধ্যে আছে গলির মানুষদের ভাগ্য বিবর্তনের মূল যন্ত্র ও যন্ত্রীর যৌথ গোপনতম সক্রিয়তা। ওর কাছেই ইন্দ্রজিৎ তার দামী আংটি বিক্রি করে অসহায় অস্থিরতার মধ্যে, গোপনে। সেই আংটি আসে অবিনাশকাকুর হাতে মোটা দাম প্রমথকে দিয়ে। আংটি হয় উদ্দেশ্যপূর্ণ উপহার নীলার কাছে, আবার সেই আংটি গোপনে নীলার হাত থেকে চলে যায় সেই প্রমথরই দোকানে। প্লটবৃত্তের সচল পরিণামমুখীন স্বভাবে প্রতীকী আংটি প্রমথর হাত দিয়েই ভিতরের একে একে অন্য মাত্রা পেতে থাকে। ইন্দ্রজিৎ-শান্তি-নীলা, ইন্দ্রজিৎ, অবিনাশকাকু—এসবের মধ্যে অদ্ভুত এক চক্র ঘুরতে থাকে।

প্রমথ পোদ্দার যেনবা আধুনিক সভ্যতার পাশে আদিমতম মানুষটির স্বভাবে এক সচল সাক্ষী। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই নায়িকা নীলার চোখে তার রূপ ও স্বভাব এইরকম :

'নিরালোক ঘুরঘুট্টি ঘরে শিকে ঘেরা দরজার আড়ালে টিমটিম একটা আলো জ্বালিয়ে প্রমথ পোদ্দার কাজ করছে, দৃশ্যটা প্রথম কেমন অদ্ভুত লাগত।...ঘাম ঝরছে, রোমাকীর্ণ নয় বুক, গরাদের ওপরে রাখা কুতকুতে দু'টি চোখ, চ্যাপ্টা নাকটা সামান্য পেরিয়ে এসেছে বাইরে, শুধু জিভটা লক লক করলেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।'

লেখকের আঁকা নায়িকার চোখ দিয়ে দেখা এই মানুষটা যেনবা এক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ব্যঞ্জনা আনে। তার উপস্থিতির আদিমতা অবশ্যই প্রাচীনত্ব ও সন্তর্পণে সক্রিয়তায় গলির বাসিন্দাদের আসা-যাওয়া দেখে তার হাসির আড়ালে শ্লেষ-ব্যঙ্গের শব্দহীন প্রকাশ

মানুষটিকে বাস্তবিকই কালের সাক্ষীর রূপক-স্বভাব দেয়। গলির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সে জানে, সময় ও কালের অঙ্কে হিসেব করে। বসাকবাবুদের নিজেদের মধ্যে শরিকানা বিবাদ, গলি ছেড়ে চলে যাওয়া থেকে শুরু করে নতুন করে জীর্ণ বাড়িতেই নিম্নবিত্তদের ভাড়াটে হিসেবে আনা, নতুন ভাড়াটেদের নাড়ি-নক্ষত্রের হিসেব, আবার তাদের চলে যাওয়া, শেষমেশ ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের গলি ভাঙার কর্মসূচি—এসবের সাক্ষী থেকেই গেল প্রমথ পোদ্দার।

উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ এই মানুষটি প্লটের এক একটি গ্রন্থির রচয়িতা, আবার গ্রন্থিমোচনের সহায়ক, সেই সঙ্গে পরবর্তী গ্রন্থিরচনার পরোক্ষ উদ্বোধকও। সে একাধিক ছোট ছোট ঘটনার নিয়তি-স্বভাবের নিশ্চিত নির্দেশক। 'নীলা জেনেছিল, প্রমথ আরো কত খবর রাখে। শিকে ঘেরা ঘরখানিতে বসে সোনা চাঁদি ওজন করছে বটে, কিন্তু বাইরের সব খবর জানছে ঠিক। সেই যে কে একজন গণৎকার মেঝেয় খড়ি পেতে ভূ-ভারতের সব কিছু বলে দিতে পারত, প্রমথও যেন তেমনি, রৌদ্র গন্ধ শব্দময় পৃথিবীর সব ছায়া ওর ঘরের আয়নায় পড়েছে ঠিক।' প্রমথ চরিত্রের মূল ধুয়া (Refrain)—'অনেক দেখেছে প্রমথ, অনেক দেখবে।' উপন্যাসের শেষে সে দেখেছে ঃ 'এই গলির ওপর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নজর পড়েছে। নতুন সৃষ্টি হবে, কিন্তু তারও আগে নির্মম আঘাত নেমে আসবে এই গলির ওপর, জীর্ণ অন্ধকূপ কুঠরিগুলো অধোবদন হয়ে ধুলোয় মুখ ঢাকবে।...আশি ফুট চওড়া রাস্তা, পাকা পেভমেন্ট। মাঝে মাঝে পার্ক, ক্ষয়গ্রস্ত শহরের শ্বাসযন্ত্র, ফুসফুস।'

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে ওকে যতবার দেখি, ওর মুখে এক অদ্ভুত ছবি ভেসে ওঠে। একেবারে নীলাকে প্রথম দেখা, প্রমথর ছবিটা বাদ দিলে ইন্দ্রজিতের আংটি বিক্রির পর এক মনোরম অথচ শ্লেষাত্মক হাসি : 'আংটিটা নাড়াচাড়া করল বার কয়েক। হাসল মনে মনে। ইন্দ্রজিৎকে সে চিনতে পেরেছে। চাঁপার মতো একটি আঙুলকে সোনার ঘড়ি পরাবেন কল্পনা করেই অবিনাশ প্রমথর কাছ থেকে সেই আংটিটাই কোনও দরদস্তুর না করেই কিনে নেয়।' আর এখানেও 'অদৃশ্য হাসি খেলে গেল প্রমথর মুখে।'...তার গভীর সন্তর্পিত চিন্তা : 'আংটি কেউ কিনবে বলেই না আরেকজন আংটিটা সেদিন এসে বেচতে দিয়েছিল। কেনাবেচা, বাঁচামরা। সংসার-তটিনীর দুই তীর। কথক ঠাকুরের কাছে গিয়ে তত্ত্বকথাটা ভালো করে বুঝে আসতে হবে।' বসাকবাবুদের ফরাস পাতার বিলাসী জীবনের কথা ভেবে প্রমথর সিদ্ধান্ত : 'কিনু গোয়ালার গলির শুকনো চোয়ালে আবার একটু একটু করে প্রাণের ছোপ লাগছে যেন...আবার সেই দিন আসছে। তার স্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে প্রমথ।' বারো পরিচ্ছেদের শেষে নীলা যখন প্রমথকে গোপনে সেই আংটিই বিক্রি করে, তখনো প্রমথর মধ্যে গোপন হাসির খেলা : 'আংটিটা সাবধানে লুকোতে লাগল। হাসল আপন মনেই, এটা আবারো ফিরে এসেছে তার কাছে। বারে বারেই যায়, বারে বারেই ফেরে, অনুচ্চারিত কিন্তু অর্থপূর্ণ ভাষায় অনেক গোপন কাহিনী বলে পোদ্দারের কানে কানে।

কিনু গোয়ালার গলির পালাগান জমেছে মন্দ না।' এই ভাবেই আংটির বার বার হাত বদলের মূল মাধ্যম প্রমথর চতুর হাসি শ্লেষ-ব্যঙ্গে-কৌতুকে প্লটের অন্তর্নিহিত বিষয়কে একটা ক্রমের মধ্যে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে। অর্থাৎ উপন্যাসের মূল সূত্রটি প্রতীকী তাৎপর্যে প্রমথর হাতে ধরা, ধরা হাতেই অদ্ভুত বিস্ময়কর খেলা হয়ে ওঠে। এই খেলা ভাঙা-গড়ার খেলা, ধরা-ছেড়ে দেওয়ার খেলা জীবনের রূঢ় স্বভাবের স্বরূপে।

কিন্তু উপন্যাসের সর্বশেষ বাইশ পরিচ্ছেদে প্রমথ পোদ্দারের হাসি একেবারে অন্য তাৎপর্যে মানুষটিকে কালের রূপক করে তোলে। গলি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে গোপনে শকুন্তলা-অণিমা-নীলারা আর এক মুক্তির সন্ধানে বাসার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। গলি থেকে অবিরত পালাচ্ছে মানুষ। আর এই দৃশ্য চোখে নিয়ে 'ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে বিচিত্র একটি হাসিতে প্রমথর মুখ ভরে গেল।' এই হাসি প্রমথকে গলির অন্ধকার থেকে বাইরে আর এক দিগন্তে স্থাপন করেছে। সেখানে প্রমথ পোদ্দার গলির কথক নয়, সময়ের কথক, সময়ের সাক্ষী, ব্যাখ্যাকার, সময়ের নিয়ন্ত্রক :

'প্রমথ যাবে না। আজ দুপুরে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অফিসে গিয়ে প্ল্যান দেখে এসেছে প্রমথ।

জরিপের কী এক আশ্চর্য কৌশলে তার ছোট্ট এই দোকানখানি বেঁচে গেছে।

কিন্তু প্রমথর হাসি সেজন্যেই নয়। এ গলির বেশির ভাগ বাড়ির দলিলই বন্ধকী সূত্রে তার সিন্দুকে বন্দী, বসাকবাবুরা ছাড়া এ খবর কেউ রাখে না। নদী তলে তলে অনেক দূর খেয়ে গেছে।'

এই প্রমথ লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের হাতে তৈরি করা আধুনিক নগরসভ্যতার স্রষ্টা ক্যাপিট্যালিস্টদের যোগ্য প্রতিনিধি। লেখক বুঝেছিলেন, একটি আধুনিক গড়ে-ওঠা শহর তথা দেশ নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতায় ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর মূলে ছিল দুই প্রবল ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীরই প্রবলতম দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি, অহংকার ও ঔদ্ধত্য। ধনতন্ত্রের ভিতরে এ এক 'flaw'। যুদ্ধশেষে মধ্যবিত্ত মানুষ ও সমাজের যে শোচনীয় অবতরণ, তা আর্থিক কৌলীন্য হারানোর মাধ্যমে মধ্যবিত্তদের বিনাশকে বোঝায়। আর তাকে সামাল দিতে ধনতন্ত্রের গৌরব ঘোষণাই বড় উপায়। প্রমথ পোদ্দারের যে চাপা উল্লাসজনিত বিচিত্র হাসি, তা ধনতন্ত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কারণেই। প্রমথর কারবারে যে সমস্ত লেন-দেন, তা ক্ষয়রোগগ্রস্ত, বিধ্বস্ত শহরজীবনের বুকে ধনী ব্যবসায়ীদের যাবতীয় তৎপরতার, সফলতারই অভিজ্ঞান। প্রমথর এই হাসি তাই লেখকের জীবন, সমাজ, সভ্যতা ও নগরদর্শনে চকিত এক জটিল জীবন-ব্যাখ্যা। সভ্যতার কালাতিশায়ী অভিগমনে এই জাতীয় চালকদের হস্তান্তর-স্বভাব অমোঘ নিয়তিই। প্রমথ পোদ্দার তাই উপন্যাসের পালাগানের দ্রষ্টার পদ থেকে সবশেষে হয়ে উঠেছে শ্রেণীবিভেদে ভয়াবহ বুর্জোয়া-সমাজরূপের রূপকার। প্রমথর সমস্ত বিবর্তনই বড় শিল্পের মর্যাদায় এক জটিল শহরজীবন ব্যাখ্যার সফল

প্রতীক। আমাদের মতে সন্তোষকুমার ঘোষের প্রমথ পোদ্দার নামের এই চরিত্রটি বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসের ঘড়িবাবু চরিত্রের পূর্বসূরি। একই প্রতীক স্বভাবে হলেও ঘড়িবাবুর থেকে প্রমথ পোদ্দার সচেতন পাঠকদের অনেক সুদূর দিগন্ত দেখায়।

৬.

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসটি অবশ্যই গভীর-জটিল মনস্তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। সেই সঙ্গে এর প্রেক্ষাপটে মেলে কলকাতা শহরের অন্তঃশীল মন্থর শামুক-স্বভাবে যুদ্ধোত্তর জীবনের ও সমাজের প্রলম্বিত বিষাদময় ছায়া। অর্থাৎ লেখক শহরের বাইরের জীবন চিত্রণে নয়, বাইরের জীবনকে পাশে রেখে অন্তর-জীবনের ক্ষতের, ভ্রষ্টতার অবক্ষয়ের সন্ধিৎসু হয়েছেন। আর জীবন তো কখনোই সমাজ-বিবিক্ত কোনও বিষয় নয়, সমাজের, তার কালের অভিঘাতেই জীবনের রূপ ও স্বরূপের বিস্তার। আবার সমাজের কাল-ঔচিত্যই সমাজ-নিহিত মানুষ ও জীবনকে পথ দেখায়। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে আধুনিক কথাকার মানুষ ও জীবনের গভীরে ডুব দিতে গিয়ে মনস্তত্ত্বের বাস্তবতাকে বড় মূল্য দিয়েছেন।

বস্তুত মনস্তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস বলেই এর প্রকরণ বৈশিষ্ট্য—প্রকাশ রীতি, গদ্যভঙ্গি অলংকরণ, ভাষা প্রয়োগ, কবিত্ব—এসবের মিলমিশ মনের অবচেতনেই পূর্ণাবয়ব পেয়েছে। প্রথমেই স্মরণে রাখা ভাল, যেহেতু মনস্তত্ত্বই লেখকের মূল লক্ষ্য, তাই লেখককে তীব্র বুদ্ধিপ্রাণ মনোভঙ্গিটি এই লক্ষ্যের বিবর্তনে প্রথম বুদ্ধিকে আশ্রয় করেছে। সন্তোষকুমার ঘোষ নিরাবেগ বুদ্ধিপ্রাণ কথাকার। আর যেখানে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ নির্দেশ সেখানে যুক্তি-চিন্তা-মনন থাকে তার কর্তৃত্বের আসনে। এমন কর্তৃত্বের কারণেই লেখকের নিরাসক্তি যেনবা প্রকাশভঙ্গির মূল্যবান অলংকার হয়ে ওঠে।

মানুষের মনই সবচেয়ে Real, Reality মানুষের স্বভাবে ও জীবনে, অন্যত্র থাকে না। এই মন-রূপ বাস্তব উপকরণেই কথাকার তাঁর ভাবনাকে যেমন শ্লথগতি, নিরাড়ম্বর করেছেন, তেমনি প্রকাশের গতিকে সংযমে-শাসনে সংক্ষিপ্তির কেন্দ্রীয় লক্ষ্যভেদী শক্তি দিয়েছেন। সমসাময়িক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর—অন্তত গল্পের আবেগহীনতার সঙ্গে বর্তমান কথাকারের কিছু আত্মীয়তা ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে বিমল করের উপন্যাস-গল্পের স্থির মন্থর গতিময়তা ও মনের অমোঘ সংক্রমণকে মনে করায়। বিমল কর তাঁর উপন্যাসের গদ্যে যে মন্থরতা সেই সঙ্গে বিস্ময়কর অমোঘতা দেন, তা তাঁর মৃত্যু নিঃসঙ্গতা একাকীত্বের বিষয়ের শীতল স্বভাবেরই দাবিসম্মত। সন্তোষকুমার ঘোষ এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—দুজনের মধ্যে বুদ্ধিগত প্রকাশভঙ্গির যে কিছু সদৃশতা, তা সময়ের চাপের কারণেই সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেভাবে যাবতীয় আবেগধর্ম, আদর্শবাদ, সুস্থ বিশ্বাস, মানবিক নীতি-নিষ্ঠাকে নষ্ট করে, তাতে গদ্য কোনওক্রমেই আবেগতাড়িত হতে পারে না। তা থেকে সরে এসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মনের অবচেতনে আরও অন্ধকারের সন্ধিৎসু

হয়েছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ হয়েছেন আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধোত্তর সময়ের ক্ষয়, ক্ষত ও অবক্ষয়ের বিনাশি অস্তিত্বে কালের নিয়তির কঠিন আঘাতের সফল চিত্রী। বুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোক আর হৃদয়বৃত্তির জটিল অন্ধকার নিশ্চিত অবক্ষয়কে চলচ্চিত্রের পর্দায় শিল্পের মায়া আনে।

এত সব কথা প্রসঙ্গত আসে 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের প্রকরণ সমস্যা ও প্রকাশরীতির মূল্যায়নে। উপন্যাসের প্রকাশভঙ্গি, ভাষা বৈশিষ্ট্য, গদ্যের অলংকরণ-সৌন্দর্য বুদ্ধির চমৎকৃত প্রয়োগ, মান, মনের একাধিক অজানা রহস্যময় মণিখণ্ডের সন্ধান দান— এসবই উপন্যাসটিকে বড় বিশিষ্টতা দিয়েছে। গদ্য যখনই সচেতন সতর্ক বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে এগোয়, তখনই তা বড় বড় বাক্যের মাপে আর থাকে না, ছোট ছোট চকমকি পাথরের দ্যুতিতে পাঠকমন ধাঁধায়, গ্রন্থের চরিত্রদের ভিতরটাকে সত্যস্বরূপে নগ্ন করে।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক ছোট ছোট বাক্যে এঁকেছেন নায়িকা নীলার মনোলোকের বিচিত্র চিন্তার কয়েকটি নুড়ি : 'প্রথম প্রথম গা জ্বলে যেত। ইচ্ছে হত এদের কাউকে ডেকে আচ্ছা করে ধমকে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে উঠতে পারেনি। ক্রমশ জ্বলুনি কমল। কৌতুক বোধ এল। আহা শিস দিয়ে যদি সুখ পায়, পাক। গায়ে তো কিছু ফোস্কা পড়বে না।' লক্ষ করার বিষয়, এমন সব ছোট ছোট বাক্যের বিচারণায় মন্থর স্বভাবে নীলার মনের একজাতীয় খেলা, কৌতুক, উদাস ক্ষমাশীল মন, আত্মসন্তোষের ভালমানুষি ভাব যেভাবে সচিত্র হয়েছে তাতে কথাকারের চিন্তাশীল সতর্কতা দৃষ্টি এড়ায় না। লেখক তাৎক্ষণিক পরিবেশের বর্ণনায় নায়িকা নীলার সঙ্গে যেন সমান সংযত ; সন্তর্পিত : 'একতলার ঘর অন্ধকার। পা ফেললে হিম হয়ে যায়। পাতা অবধি ভিজে যায়। ফাটা মেঝের ভিতর থেকে মৃত্তিকার অদৃশ্য হাত অসুস্থ সিক্ত স্নেহে জড়িয়ে ধরে। প্রাণীতত্ত্বে অনুল্লিখিত কোন সরীসৃপের লালাসিক্ত রসনার লেহন।' (নবম পরিচ্ছেদ)। ইন্দ্রজিতের অন্ধকার ঘরে ঢোকার আগে নীলার সঙ্গে অজানা সরীসৃপের অনুষঙ্গ দিয়ে এই যে বর্ণনাচিত্র ছোট ছোট বাক্যে আঁকার চেষ্টা—তা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জটিল মন-এর নিশ্চিত অনুগ প্রয়াস। ইন্দ্রজিৎ-নীলার গোপন মিলনদৃশ্য বর্ণনায় লেখক যেমন সংযত, তেমনি চিত্রের ব্যঞ্জনায় মেলে এক সন্তর্পিত, চুম্বকের মত অমোঘ-আকর্ষণের বুদ্ধি-শুদ্ধ আবেগ : 'অনেক রাতে আরেকবার দরজাটা সন্তর্পণে কে খুলল। ইন্দ্রজিৎ জানে কে। এ এসেই হারিকেনের আলো উসকে দেয় না। এর না আছে আঁচলে চাবির রিং, না আছে কৃশ হাত দু'টিতে বাজবার মতো চুড়ি। নিঃশব্দ পায়ে আসে। অনুভব,—শুধু অনুভব দিয়েই বিছানাটা কোথায় টের পায় ; একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। ইন্দ্রজিৎ জানে কে।'

'দু'হাতের কৃতজ্ঞতা দিয়ে তাকে বেষ্টন করে ইন্দ্রজিৎ কাছে টেনে আনল (আঠারো পরিচ্ছেদ)'। এমন গোপন মিলনের অন্ধকারকে কথাকার নায়কের চিন্তার নিশ্চিন্তিতে ধরে যেভাবে মিলনের মধুর ভূমিকা রচনা করেছেন তার ভাষাচিত্র কোথাও এতটুকু অতিরিক্ততার সীমা ছাড়াতে পারেনি। পরিশীলিত ব্যঞ্জনায় এর সংযম নন্দিত নিশ্চয়ই।

উপন্যাসের বর্ণনা, সংলাপ ও সিচুয়েশান সৃষ্টিতে সন্তোষকুমার ঘোষের প্রচ্ছন্ন তাৎক্ষণিক কৌতুকরস পরিবেশন, সংলাপে ও বাক্যবন্ধে দ্ব্যর্থক ব্যঞ্জনা প্রয়োগ, বৈপরীত্যের মধ্যে চাপা শ্লেষ রচনা—এসবের মধ্যে শিল্পক্ষমতার বিস্ময়কর পরিচয় মেলে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শান্তিদের ভাড়াটে হয়ে আসার পর নিজের ঘরটুকু সাজানোর সময় 'দরজায় জানালায় পুরনো রঙিন শাড়ির পর্দা' টাঙানোর মধ্যে পুরনো শাড়ি বাছায় তার রঙিন স্বভাবটির কথা ভোলেনি শান্তি। জীর্ণ বাড়িতে নতুন পর্দা বেমানান, তাছাড়া নতুন পর্দা কেনার আর্থিক সাচ্ছল্যটুকু নেই, কিন্তু 'রঙিন' পর্দা টাঙানোয় মেলে শান্তির স্বাভাবিক রঙিন জীবনবাসনার প্রতীকী তাৎপর্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদেই শান্তির ঘরে বসে নীলার সঙ্গে শান্তির সংলাপ বিনিময়ে মেলে অন্তঃশীল কৌতুকরস—যা শান্তির ব্যক্তিত্বকে অন্য মাত্রা দেয়। শান্তি তুলনায় কিছু বেশি বয়সের হলেও ওর মধ্যে যে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটেছে তা চিত্রময় হয় :

'আপনার বাসায় বাইরের লোক এসেছে মনে হচ্ছে।'

'বাইরের লোক? কই না তো। ও পাশে তো উনি একা।'

'গুনগুন আলাপ শুনছি যেন।'

শান্তি এবার হেসে ফেলল। 'ও-পাশে উনি অরুন্ধতীকে নিয়ে আছেন, জানো না?'

'অরুন্ধতী কে?'

শান্তি আরো গলা নামিয়ে বলল, 'ওঁর মনের মেয়েমানুষ। আজকাল ওকে নিয়েই আছেন।'

তারপর হেঁয়ালি ঘুচিয়ে নিজেই বললে, 'ও যে ওঁর নূতন গল্পের নায়িকা!'

তরুণ কবি ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সম্পর্কে বয়সে বেশি শান্তিবৌদির মধ্যে অবচেতন বা সচেতন মনেই যথাক্রমে ছাগল-বাঘের খেলার মত্ততা মাঝে মাঝে দেখা দেয়। অবিনাশকাকুর সঙ্গে সিনেমা দেখে ফিরে আসার পর ইন্দ্রর সঙ্গে দাবাখেলার মধ্যেই শান্তির সপ্রশ্ন কথায় নীলার সন্ধিৎসু মনের সরল প্রকাশে অদ্ভুত এক রূপক-ব্যঞ্জনা বিদ্রূপের স্বভাবে চিত্রময় হয় লেখকের কলমে :

'...শান্তি উঠে দাঁড়াল। 'আমরাও যাব ছবিটা দেখতে।'

'খেলাটা শেষ হোক।' ইন্দ্রজিৎ আপত্তি করল।

একটানে ঘুঁটিগুলো এলোমেলো করে দিয়ে শান্তি বললে, 'আর খেলে না। আপনি তো হেরে গেছেন। আমাকে আর বন্দী করতে পারলেন কই।'

'ইন্দ্রজিৎবাবু বুঝি ছাগল হয়েছিলেন?'

'আবার কী হবে ও।' শান্তি হাসতে হাসতে বললে।

'আর আপনি বাঘ?'

'বাঘ নয়, বাঘিনী বলো।'

সংলাপে এমন দুই অর্থের তাৎপর্য এনে, কৌতুকের ছলে লেখক অনবদ্য লেখনীতে শান্তির নীলার প্রতি ঈর্ষা, ইন্দ্রজিতের প্রতি সূক্ষ্ম অন্য সম্পর্ককে অবলীলায় এমন

সিচুয়েশনে বিদ্রূপের তর্জনী শাণিত করেছেন। লেখকের হাতে শহরজীবনের জটিলতম মনস্তত্ত্ব হয়েছে আলো-ছায়াময়।

উপন্যাসটির কোনও কোনও বর্ণনায় লেখক নায়িকার বিশেষ কোনও মনোভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে analogy-র উপযুক্ত বড় বড় অংশের অনুচ্ছেদের অবলম্বন নিয়েছেন :

'এতদিন কেটে গেল এ-গলিতে, তবু নীলার এখনো মাঝে মাঝে নিজেকে এখানে প্রবাসী মনে হয়। এমন কি হতে পারে না, এর সবটাই স্বপ্ন? এমন তো কত গল্পে পড়েছে, কত নায়ক-নায়িকার অদৃষ্টে ঘটেছে বিচিত্র এই অভিজ্ঞতা। বছরের পর বছর কেটেছে বনের গহনে, পর্বত-গুহায় কি ধু ধু মরুভূমিতে ; তারপর কোনো আচমকা ঘুম ভেঙে দেখেছে সব ফাঁকি, সব মিথ্যে, কিছু ঘটেনি, বছর দূরে থাক, ঘণ্টা খানেকের বেশি ঘুমোয়নি।

নীলারও তো তেমন হতে পারে।...কিন্তু কিনু গোয়ালার গলি তো স্বপ্ন নয়, আসলে পপলার পার্কটাই স্বপ্ন তবু কখনো কখনো ফিরে আসে ঘুমে, কিন্তু পপলার পার্ক নীলার এ-জীবনে আর আসবে না।' (আঠারো পরিচ্ছেদ)

নায়িকার মনের গভীরে বিষাদময় এক অনুভূতি স্বপ্ন ও বাস্তব--দু'টোর মায়াময় স্বভাব নিয়ে এক চিরন্তন আশাহত জীবনকেই হতাশায় মেলে ধরে। গলির জীবনের এত দিনের চিন্তার শেষে নায়িকার অসহায়তা, শূন্যতা, হতাশা বোঝাতেই এমন প্রয়োগের যথার্থতা।

কোনও কোনও বর্ণনায় নায়ক ইন্দ্রজিতের নিঃসঙ্গ মনের অসহায়তা সুন্দর চিত্র হয়ে ওঠে : 'অন্ধকার। সমস্ত সম্পর্কের নিবিড়তা সমস্ত পরিচয়ের গভীরতার ওই শেষ। যে ঘরখানা এত প্রিয় ছিল ইন্দ্রজিতের, যাবার সময় শান্তি সেটাকে অন্ধকারে বোঝাই করে রেখে গেছে, শেকলে টেনে ঝুলিয়ে দিয়েছে তালা ; কঠিন লোহার অক্ষরে, কাঠের ফলকে লেখা এপিটাফ।' এমন বর্ণময় বর্ণনাচিত্র সংক্ষিপ্ত, Introvert, বিষণ্ণতায় বিধুর। আবার কোনও কোনও বাক্যের সংক্ষিপ্ত গঠনে, উপমা-স্বভাবে মেলে বিস্ময়কর সপ্রতিভ স্বভাব :

১. 'শান্তির হাতের খেলনা ইন্দ্রজিৎ ; মণীন্দ্রের হাতের খেলা শান্তি। চক্রাকারে খেলার ছক।' (দশম পরিচ্ছেদ)

২. 'কে জানে, মেয়েদের বোকামিই সুখ কিনা, সুখই সৌন্দর্য কিনা।' (ষোলো পরিচ্ছেদ)

৩. 'শান্তিকে সে এখনো ভালোবাসে। কাউকে পছন্দ না করেও ভালোবাসা যায়', (আঠারো পরিচ্ছেদ)

৪. 'সেকালে দ্রৌপদী পণ হয়েছিলেন, একালে দ্রৌপদী না হয় নিজেই পাশা খেলতে নেমেছেন। তফাৎ কতটুকু বলুন।' (সাত পরিচ্ছেদ)

৫. 'শরীর মরেছে, মন মরেনি—এ বড়ো মর্মান্তিক ট্রাজেডি।' (নয় পরিচ্ছেদ)

৬. 'বিয়ে হলে মন না বাঁচুক, শরীরটা তো বাঁচবে।' (বারো পরিচ্ছেদ)

৭. 'ওকে যখন ভালোবেসেছে ইন্দ্রজিৎ, ভালোবেসেছে শান্তিকেই। মৃন্ময়ীর ভিতর

দিয়ে চিন্ময়ীকেই।' (বাইশ পরিচ্ছেদ)

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের গদ্যের ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, উপমাদি অলংকার প্রয়োগের দিকে চোখ রাখলে ধরা পড়ে, প্রথম দিকে লেখক যত বেশি উপমা ইত্যাদি অলংকার ব্যবহার করেছেন, শেষ পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে তার প্রবণতা কমে গেছে অনেক। কারণ নীলা চরিত্র হয়েছে অনেক বাস্তব মনোভঙ্গির নায়িকা। সেখানে অলংকৃত ভাষণ মনে হয়েছে অপ্রয়োজনীয়। বাইশ পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে নীলার মনের গভীর তলদেশে নেমে লেখক যে বিশেষ উপমাটুকু ব্যবহার করেছেন, তার বাস্তব নিস্পৃহতা, রুক্ষতা যেমন ঋজু হয় পাঠক মনে, তেমনি মনস্তত্ত্বের জটিল স্বভাবটুকু মুছতে পারেননি এই লেখকই :

'...আজ সব শেষ হয়ে গেল, শেষ করে দিল। ঘায়েল ঘোড়াকে নিজের হাতে গুলি করে মারার মতো। নির্মম, কিন্তু নিরুপায়। শেষ যে হয়েছে সে জন্যে অনুতাপ নেই, কিন্তু মনস্তাপও যদি সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যেত।'

নীলার এই ভাবনা-খণ্ডের শেষ বাক্যটিতে অবশ্যই লেখকের বাক-বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে মিশেছে মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের মনন-খণ্ড।

গ্রন্থের গদ্যের অলংকৃত বাক্যগুলির শিল্প-মর্যাদা বিস্ময়কর। লেখকের সচেতনতা ও আবেগহীন দীপ্ত বুদ্ধি অলংকরণকে নাগরিকতায় (urbanity) অন্য তাৎপর্য দেয়। প্রমথ পোদ্দারের রূপ ও স্বরূপ বোঝাতে 'চিড়িয়াখানায় দেখা মানবেতর কোন প্রাণীর চিত্র' পপলার পার্কের ঝাপসা দিনগুলো 'মাঠ শেষের হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়া আকাশের মতো', সামান্য একটা চাকরি 'প্রয়োজনের তুলনায় সেটা যেন কৌপীন কিংবা কটিবাস', 'শরীরটাকে মনে হয় স্নিগ্ধ, তকতকে ধোয়া মেজের মতো চকচকে, খোলস ছেড়ে যেন বেরিয়ে এসেছে সাপিনী', 'এই স্ফীতি স্বাস্থ্য নয়, নিরপচয় যৌবন এখন সুদ দিচ্ছে মেদে', 'হাল্কা, ঝরঝরে হাসি, কোঁচড়ে তেঁতুল বীচি নিয়ে আস্তে আস্তে ঝাঁকানোর মতো', 'একটু একটু করে মাদুর গোটানোর মত রোদ', 'ঘৃণার কলসী যেন উপচে পড়ল মনে'—এমন সব বাক্যাংশের মহামূল্য বর্ণনাখণ্ডের সৌন্দর্য, সুষমা উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্র-ন্যায়েই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে লেখকের কলমে। লেখক ব্যবহৃত এই অলংকারগুলি তাঁর আঁকা নগরজীবনের প্রেক্ষিত মত যথোচিত ব্যবহৃত।

৭.

'কিনু গোয়ালার গলি' এমন গ্রন্থনামে প্রথমেই এবং প্রধানভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বাঁশি' কবিতাটি মনে পড়ে। এই গদ্যকবিতার প্রথম চরণটিই হল 'কিনু গোয়ালার গলি'। কবিতাটির রচনাকাল ২৫ আষাঢ় ১৩৩৯। অর্থাৎ তিরিশের দশকের প্রথম দু'বছরের মধ্যসময়। রবীন্দ্রনাথের একজন একনিষ্ঠ বোদ্ধা পাঠক হিসেবে সন্তোষকুমার ঘোষ এই কবিতার আবহকে গভীরতম উপলব্ধির মধ্যে এনে কথাকার-মনস্কতায় উপন্যাসের প্রেক্ষিতে ছায়া-স্বভাবে কল্পনা করেছেন। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস মূলত দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের রচনা এবং এই সময়ের অবক্ষয়িত কলকাতার জীবনকে বক্তব্যে শরীরের ত্বক-মাংস-মজ্জাভেদকারী রক্ত ও প্রাণের স্বভাবে গ্রহণ করেছেন।

লক্ষণীয়, কবিতার মধ্যে কবিরচিত যে আবহ, কথাকার তাকে নিতে ভোলেননি। 'দোতলা বাড়ির / লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর / পথের ধারেই / নোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি / মাঝে মাঝে স্যাঁতা পড়া দাগ।' রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা উপন্যাসে নানাভাবে আমাদের তটস্থ করে। হয়তো বা ইন্দ্রজিতের পঁচিশ টাকা প্রুফরিডারের কাজের সঙ্গে 'বেতন পঁচিশ টাকা', 'সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি'-র মিল অবাক করে দেয়। গলির এমন হতশ্রী পরিবেশে, হত-দরিদ্র অবস্থার মধ্যেও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা পরস্পরের হৃদয়ের গভীর অনির্দেশ্য আকর্ষণে সমস্ত স্তরের প্রেমিকাদের আত্মীয়তায় জড়িয়ে যায়। 'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।'

এইভাবেই 'বাঁশি' কবিতা কবিতা নয়, সম্পূর্ণ গদ্যের অবয়বে এক সচেতন বুদ্ধিপ্রাণ কথাকারের সৃষ্টির পটভূমি ও প্রাণে সংসক্ত থেকে যায়। উপন্যাসে 'কিনু গোয়ালার গলি' এক নগরজীবনের, অসুস্থ অবক্ষয়িত জীবনের প্রতীক। এই গলির জীবন মানুষকে করে উৎকেন্দ্রিক, মানবতাকে নষ্ট পচা ফলের মত ত্যাগ করে। উপন্যাসের অন্যতম লেখক-চরিত্র মণীন্দ্রের বিচারে : 'এই গলি আমাদের শেষ করে ফেলেছে শান্তি। এখানে আকাশ নেই, এখানে সহজভাবে বাঁচবার উপায় নেই। এই আবহাওয়ায় আমাদের চিন্তা, কাজ সব কিছু অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বাঁচতে হলে এ গলি ছাড়তে হবে ; হাওয়া বদল ছাড়া এ ক্ষয়রোগের চিকিৎসা নেই।'

সন্তোষকুমার ঘোষ এই যুদ্ধোত্তর কালের সমস্ত কিছুর মানবিক সম্পর্কের অবনমনের স্বরূপ বোঝাতেই এমন গলির পটভূমি নিয়েছেন। কিনু গোয়ালার নামে গলি। এই গোয়ালা সে সময়ে নিশ্চয়ই নিম্নবিত্তের স্বভাবে ব্যবসায়ী ছিল, ছিল তার খাটাল। তার নামে গলিতেই এসেছে সব ভেঙেপড়া মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মানুষ। এদের অদ্ভুত বিচিত্র জীবনধারণ ও যাপনের দিক কিনু গোয়ালার গলির পরিবেশ ও স্বভাবে প্রতীকী হয়ে ওঠে। নীলা যখন অবিনাশকাকুর উপহারের মাধ্যমে ইন্দ্রজিতের আংটিটা পায়, তখনো সে জানে না, তা ইন্দ্রজিতের। কিন্তু আংটিটা প্রমথ পোদ্দারের কাছে রেখে কিছু টাকা চায়, তখনকার প্রমথর ভাবনা উপন্যাসের নামের গভীরতম তাৎপর্য চমৎকার তুলে ধরে : ...'এটা আবারো ফিরে এসেছে তার কাছে। বারে বারেই যায়, বারে বারেই ফেরে, অনুচ্চারিত কিন্তু অর্থপূর্ণ ভাষায় অনেক গোপন কাহিনী বলে পোদ্দারের কানে কানে। কিনু গোয়ালার গলির পালাগান জমেছে মন্দ না।'

উপন্যাসের গলি আর প্রমথ—দুইই প্রতীক। গলি ভেঙে নতুন বাড়ি হবে, সকলকেই চলে যেতে হবে। এটাই কালের, শহরের, সময়ের নিয়তি, প্রমথ তার সাক্ষী। এই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় গলি ও প্রমথ—দুইই উপন্যাসের নামকে সার্থক শিল্পসম্মত মর্যাদা দেয়। গলি সভ্যতার ক্ষয়রোগের আবাসভূমি, উপন্যাসে আছে তারই সার্থক প্রতিচিত্রণ।

'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে'

[মৃত্যুচিন্তা ও পাপবোধ, শোচনা ও সংকট-মোচনের চালচিত্র]

১.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গোবিন্দলাল হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লক্ষণীয় প্রতিনিধি, রোহিণীর প্রেম তৃষিত ও আর্ত হলেও সে হয় গোবিন্দলালের অধিকৃত ভোগ্য সম্পত্তি। বিশ শতকের একেবারে শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে সর্বপ্রথম যাবতীয় কাহিনী ও ঘটনার দিকগুলি পাশে সরিয়ে রেখে চরিত্র-ব্যক্তিত্বের দিকে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করেন। উদাহরণ, চোখের বালির বিধবা বিনোদিনী। উপন্যাসের জন্ম থেকেই কথাকারগণ উপন্যাস লিখতে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট 'স্কিম' ভেবে নিতেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে তা ছিল এই শিল্পধারার অবয়বগত নিয়তির আনুগত্য। বঙ্কিমচন্দ্রে তার সিদ্ধি এবং শিল্পসাধনার সফল অনুগ। তা যেমন conventional হয় এই সময়েই, বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ সেই শিল্প-প্রচলনের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিতে প্রয়াসী হন। চোখের বালি তার প্রথম ও আধুনিক উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে দিয়েই, যদিও অন্যান্য সূত্রেও সাক্ষ্য মেলে, ব্যক্তি এবং তার মানস সংকটকে কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর উৎসে অন্তর্নিহিত করেন। সেখান থেকেই বিনোদিনীর সংকট প্রশ্ন তোলে বিনোদিনীর মূল ভাবনায় 'নিজের মনও সবাই জানে?' এই ব্যক্তির আত্ম-অনুসন্ধানের গোপন আর্তিই আশা-মহেন্দ্রর বিবাহিত জীবনে বিনোদিনীর বৈধব্য--কোন সংস্কার নয়—ব্যক্তির উন্মোচনের গায়ে গায়ে নানান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। চোখের বালির সেখানেই উপন্যাসের পথবদলের দৃঢ় সূচনা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-বক্তব্য ও চরিত্রের উপস্থাপনায় বুদ্ধির প্রয়োগ, মানসক্রিয়া, প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের সূত্র ধরে তাঁর গল্পে ও প্রবন্ধে আলোময় বুদ্ধির চর্চা, রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, চার অধ্যায় ধরে সেই বিবেকবান স্বাতন্ত্র্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কল্লোলের সময়কাল পার হয়ে বুদ্ধিজাত নিরাসক্ত-চিত্ততাকেই সম্মান দিতে থাকে। তা সময় ও উপন্যাস শিল্পধারার ছিল নিশ্চিত প্রবাহ।

কল্লোল ধরে এলেন জগদীশ গুপ্ত। কল্লোলের কালেও সবকিছুর প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ছিল আদর্শ, মঙ্গলবোধ, এক নীতির সম্ভাষণ। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত নিরাসক্তি দিয়েই মানুষজনদের বোধন করলেন এবং সেইসূত্রে নতুন করে ব্যক্তিত্বের

সংকটের স্বরূপ লেখা হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তিরিশের দশকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এলেন, এলেন অন্নদাশংকর রায়, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের অস্থিরচিত্ততার যে সংকট সবই 'Metanarrative'-এর বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়তে থাকে স্বভাবী পাঠকদের কাছে। এই বৈশিষ্ট্যে যে ইতিহাস সমাজ-মানুষের সূত্র ধরে গড়ে ওঠে, তার প্রধান অবলম্বন অতীতের (Past) বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে গভীর-নিবিড় সম্পর্কের ব্যাখ্যাতেই।

এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—দীর্ঘ একটানা ছ'টি বছরের—১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর সময়-বরাবর। এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ১৯৪১-এ। এই সময়কাল পুরনো সময়ের উপন্যাস-শিল্পস্রোতের মধ্যে গজিয়ে ওঠা যেমন সব গাছ-গাছড়াকে উপড়ে ফেলে দেয়, সেই সঙ্গে সবকিছুই নতুন মূল্যায়নে বিচার্য হওয়ার দাবিসনদ পায়। যেটুকু নীতিবোধ, আদর্শভাবনা, মঙ্গল ও মানবিক শুভাশুভবোধ ছিল, সবই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায় মানুষ, সমাজ, জীবন—এসবের নিরন্তর দাবির কাছে। অবক্ষয়, যাবতীয় মূল্যবোধের বিচ্যুতি ও বিনাশ মানবভাবনার অপমান, নীতিহীনতা যেমন ভিতরে ঘুণ ধরায়, তেমনি ধীরে ধীরে ব্যক্তির মধ্যে সংকটের অসহায়তার সূত্রে জন্ম দেয় নিঃসঙ্গতাবোধের কালো কালপুরুষের ছায়া, সৃষ্টি করে বিশাল বিস্তীর্ণ শীতের ধূসর মাঠের মত শূন্যতা। এই শূন্যতা ধীরে ধীরেই বাংলা উপন্যাসের আধেয়-র মধ্যে রক্তের স্বভাব পায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসুর মধ্যে শুরু হতে থাকে তাঁদের শিল্পভাবনার সূত্রে। সন্তোষকুমার ঘোষ—এঁদেরই সগোত্র একক অন্যতম ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর ভূমিকার স্বরূপের সূত্রে যে বিনাশ ও দুরারোগ্য বিভ্রান্তি, অসহায়তা—সে সবই সমরেশ বসুকে প্রাণিত করে 'প্রজাপতি' 'বিবর' লিখতে। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখেছেন 'বারো ঘর এক উঠোন', সন্তোষকুমার ঘোষ 'কিনু গোয়ালার গলি'। অর্থাৎ ভাঙনের মূল থেকে উঠে আসে যে সময়ের সংকট, সেই সূত্রে ব্যক্তির শূন্যতাবোধ, বিচ্ছিন্নতার বেদনা, হতাশা, তারই অভিজ্ঞান হয় এই উপন্যাসকারদের নায়ক-নায়িকা, যাবতীয় চিন্তাভাবনা, উপন্যাসে ব্যক্তির জটিল চাওয়া-পাওয়ার সকরুণ নিষ্ফলত্ব। আমাদের কথা হল, বাংলা উপন্যাসে সেই রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, স্রোত বদলাতে বদলাতে তৈরি হয় ব্যক্তিরই রাজাসন, সময়ের প্রেক্ষিতে সেই নায়কদেরই আত্মিক সংকটের অপরিণামী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েন।

বিশ শতকের ষাটের দশকের পুরোটাই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়ভাবনায় এক অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দেখায়। তা হল মানুষে-মানুষে বিচ্ছিন্নতাবোধ। 'বাঘিনী'র নায়ক চিরঞ্জীবে যার সূচনা, 'বিবরে'র বীরেশ-নীতার সম্পর্কের ভাবনায় তার স্বীকৃতি। ঘুণপোকার শ্যাম-এর আত্মকেন্দ্রিকতা দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা'র নায়ক আদিত্যের মধ্যে শূন্যতাবোধের জ্বালা, প্রতিবাদ, অসহায়তা—এসবই ব্যক্তিত্বের আন্তর সংকটের রক্তহীন প্রতিবিম্বন। সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' সেই ধারাবাহিকতায় আর এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার

গলি' বেরোয় ১৯৫০-এ, 'নানা রঙের দিন' ১৯৫১-য়, 'মুখের রেখা' ১৯৫৯, 'জল দাও' ১৯৬৭, 'স্বয়ং নায়ক' ১৯৬৯। ঠিক এরপরেই ১৯৭১-এ পাই 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'। এই উপন্যাসগুলি ধরেই নায়ক ব্যক্তিত্বের বিবর্তন সহজবোধ্য হয়।

উদ্ধৃত প্রথম দুটি উপন্যাসে গল্প আছে, আছে অবক্ষয়িত সমাজ ও পরিবারের ছায়া, 'মুখের রেখা'য় কাহিনী কিছুটা সরিয়ে রেখে মননের বৈশিষ্ট্যে নায়ককে আঁকার প্রয়াস। 'নানা রঙের দিন' ও 'মুখের রেখা'য় প্রেক্ষিত ছিল গ্রাম। 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' গ্রন্থে মেলে অবক্ষয়িত শহর কলকাতার মূল্যবোধের পটে ব্যক্তির আত্মোক্তির কাঠামো। 'মোমের পুতুলে' শহরের মধ্যবিত্ত জীবন, আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে সেই ভেঙে-পড়া মধ্যবিত্ত জীবন প্রেক্ষিত হলেও পারিবারিক ও ব্যক্তিক সম্পর্কের সূত্রে মা ও ছেলের মধ্যেকার পাপ ও পাপমুক্তির বাসনার শূন্যবোধের নায়কের অভিমানী স্বীকারোক্তি। মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার নয়, সংস্কার জটিল সম্পর্কের। ব্যক্তির শূন্যতাবোধ হয়েছে হৃদয় রক্তক্ষরণে গৈরিক শূন্যের ভার, বড় মাপের যাবতীয় মানবিক নীতিগুলি জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে টীকা-ভাষ্য।

বিমল করের 'অপরাহ্ন' উপন্যাসে আছে দুই ভাই-বোন কল্যাণ ও অরুণা প্রত্যেকে নিজের মত করে মা কমলাকে বিচার করছে, অবিনাশ-কমলার সম্পর্কের প্রতিবাদী হয়ে মায়ের কাছ থকে বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে উঠেছে। এই বিচ্ছিন্নতা ভিন্ন ডাইমেনশানে সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'র মধ্যে পাই। আমরা ইতিপূর্বে 'মুখের রেখা'র কথা বলেছি, বলেছি এ উপন্যাসে লেখক মননে লেখনী চর্চা করেছেন। কিন্তু এখানেই মেলে বিশ শতকের সত্তরের দশকের শুরুর রচনা 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'র আঙ্গিক ভাবনার বীজাভাস। আমার একটি পূর্ববর্তী আলোচনায় এভাবে মন্তব্য রেখেছি : সন্তোষকুমার ঘোষের 'মুখের রেখা'য় মননের দীপ্তি যত বেশি, কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করার প্রয়াসও তত স্পষ্ট।' লেখক স্বয়ং উপন্যাসটির মুখবন্ধে বলেছেন ঃ 'এই উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান নয়, ভাবনাপ্রধান। নায়ক বিচার করে দেখতে চেয়েছে, কোন অভিজ্ঞতা তাকে কী দিল। কে তাকে কোথায় পৌঁছে দিল। জীবন কেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই তার মনে উঠেছে এবং উত্তরও সে খুঁজেছে। এই জিজ্ঞাসা দিয়ে উপন্যাসের শুরু, সন্ধানে তার ব্যাপ্তি এবং সমাধানে সমাপ্তি।' লেখকের উক্তির মধ্যে উপন্যাসের সম্ভাব্য আঙ্গিকের ব্যঞ্জনা মেলে। স্মৃতি আছে, ভিতরে ডায়েরির ব্যবহার আছে, নায়ক কিশোরকালের 'টুলু' থেকে 'সৌর' হয়ে 'সৌরেশে' এসে নিজের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ রূপ দিয়েছে। নায়কের স্বীকারোক্তিতে আছে জীবনের কথার বদলে জীবন-জিজ্ঞাসার কথা।

এই জীবন-জিজ্ঞাসাই হয়েছে মা ও ছেলের সম্পর্কের মধ্যেকার নানান পাপ-পুণ্য, অভিমান, ঘৃণা, ভালবাসা, আকুল স্নেহার্তি, পিপাসা ও আত্মমুক্তির, ক্ষমা প্রার্থনার, মৃত্যুর দ্বান্দ্বিক বোধের নির্ভর 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসের পটে, নায়ক ভাবনায় ও আঙ্গিকে। নায়কের দ্বিধাজর্জর আত্মস্খালনের স্বরূপ বেদনাবহ। উপন্যাসে

স্মৃতিচারণ, বর্ণনায় ডায়েরির স্বভাব, নায়কের নির্জনে নিমজ্জিত মুখ থেকে সমস্ত কিছুর বিপর্যয়ের ঊর্ধ্বে আত্মপক্ষের সকরুণ স্বীকৃতি—সবই হঠাৎ এই গ্রন্থে আসেনি। এসেছে লেখকের অন্তর-চেতনার স্রোতে নিশ্চিত ভাসমান খড়কুটোর মত। প্রবাহমান জীবন-নদীর ওপরের স্রোতে যা-ই থাক, ভেসে যাক, ভিতরে সমস্ত উচ্ছল স্রোতের যে ঘনীভবনের ভার, 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'র মধ্যে তারই রুদ্ধশ্বাস রূপাবয়ব।

সন্তোষকুমার ঘোষের নিজস্ব উপন্যাস ধারায় শুধু নয়, বাংলা উপন্যাসের বিশ শতকের দুটি দশকের শেষ সীমা অতিক্রম করে সত্তরের দশকের শুরুতে যে 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' গ্রন্থের পরিকল্পনা ও শিল্পরূপ, নায়কের আত্মকথন ও অকপট বুদ্ধিপ্রাধান্যে হৃদয় উন্মোচন, তা বাংলা উপন্যাস ধারারই এক ব্যতিক্রমী 'মাইলস্টোন'। এর মূল কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মহতী বিনাশের শেষ স্মারক যে বিচ্ছিন্নতা থেকে নিঃসঙ্গতা, শূন্যতাবোধ অতিক্রম করে মহানীল অনিকেত যাত্রাপথে জীবন ও মহাজীবনের চলমানতার গাঢ় উপলব্ধি, তার মুক্ত-মানসিক প্রতিচিত্রণ। তা সমস্ত রকম অবয়বের ঊর্ধ্বে জীবনশক্তি ছাড়িয়ে জীবনের সৃষ্টশক্তির কাছে এক দাবিহীন আত্মসমর্পণ।

অর্থাৎ, প্রসঙ্গত একটি বিষয় তো নিশ্চিত পরিষ্কার, যখন সমকালে সমাজ ও পরিবারের এক সদস্য গভীরভাবে সকলের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে ক্রমশ মূল্যবোধের অবধারিত বিনাশের প্রতিক্রিয়ার Victim হয়, তখনি আসে নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। তারই নাম অনন্বয়, বিচ্ছিন্নতা-আক্রান্ত ব্যক্তিত্ব। আঁরি বারবুসের 'হেল' (Hell / ১৯০৮) উপন্যাসের নায়কের দিকে তাকালে বোঝা যায়, তার মধ্যে সমস্ত মানুষজনকে নিয়ে বাঁচার ভাবনায় সে হয়ে উঠেছে জড়, নির্জীব, লেখক সেখানে নায়কের কোন নামই রাখেননি। 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসে উত্তমপুরুষ কথকের নাম কোথায়? অথচ সে তার সমস্ত সূক্ষ্ম, স্থূল attachment-গুলোর প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে প্রকাশ করে গেছে। এই যে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতার রোগে উপন্যাসের নায়কের অসুস্থ হয়ে ওঠা—তা যুদ্ধ-জাত অবক্ষয়েরই চরমতম রূপ, নিয়তি। বর্তমান উপন্যাসের নায়ক তাতেই আক্রান্ত হয়ে যেনবা শেষ বাঁচার জন্য চেষ্টা করে গেছে।

এই দিক থেকে দেখলে সন্তোষকুমার ঘোষের নায়কের মধ্যে রক্তের স্রোতে এসেছে সমাধানহীন অস্তিত্ব-সংকটের অভিশাপ। মানুষ নির্বাসন চায় না, কিন্তু নির্বাসিত হচ্ছে। মা, বাবা, বন্ধু-বান্ধবী, দূর আত্মীয়, সাধারণ পরিচিত—সকলের কাছে যে নায়ক আত্মবিচারে সহজ জায়গায় ফিরে আসতে চায়, সেখানে সে সম্পূর্ণ সহায়সম্বলহীন এক অস্তিত্ব। তাই উত্তমপুরুষে সন্তোষকুমার ঘোষের নায়ক যখন চিঠি লেখে মাকে, যখন মাকে নিজেকে দিয়ে, নিজের মধ্য দিয়ে চিনতে চেষ্টা করে—নিজের মত ও মায়ের মত —দুই স্বভাবের বেণীবন্ধনে, তখনই আলগা হয়ে যায় যাবতীয় বিশ্বাস, শূন্যে ঝুলতে থাকে প্রতীকী স্বভাবে দেবতা-অভিশপ্ত নশ্বরের মত বাঁচা-মরার মানুষের মধ্যবর্তী সমস্ত চেতন-অচেতন-অবচেতন লোকের উপকরণসমূহ। সবই অলৌকিক, কিন্তু জীবন-সংবেদী। আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'র পরবর্তী

আলোচনায় নায়কের সুত্রে সমস্ত মানুষজনের স্বরূপ ও উপস্থিতির সেই দিকে তাকিয়েই বিচার করব। এই বিচারেই প্রমাণ হবে, উপন্যাসটি লেখকের ও বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী সৃজন।

২.

'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসে লেখক তাঁর সৃষ্ট নায়কের জীবনের এক একটি স্তর ধরে স্মৃতিসূত্রে তার বিবর্তন চিত্র উপহার দিয়েছেন। সে চিত্রে আছে মূলত নায়কের পাপবোধ, মৃত্যুচেতনা, আত্মস্খলন ও অকপট স্বীকারোক্তির বেদনাদীর্ণ, বিষাদঘন হৃদয়রূপ। সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে নিজের মাকে একান্তভাবে মনে রেখে। মধ্যবয়সী এই নায়ক একজন লেখকও। স্মৃতি তার একমাত্র অবলম্বন। সাকার অতীত আর নিরাকার ভবিষ্যতের মাঝখানে বসে লেখক বর্তমানের আত্মশুদ্ধিকরণে বিব্রত। তার অন্যান্য অবলম্বন হল তার বাবা, সুধীরমামা, ভামতী, বুলা, বাঁশি, রজনী এমন সব মানুষজন। কাহিনীর স্তর-পরম্পরা মালার সুতোয় ফুলের মত একে একে এসেছে গ্রাম্য সংসার জীবন, দারিদ্র্যে গ্রামজীবন ত্যাগ করে শহরজীবনে প্রবেশ, শহরেই আরও একাধিক আশ্রয়বদল ইত্যাদির ঘটনা।

আবার আর একটি দিক উপন্যাসের প্লট-কেন্দ্রে লক্ষ করার মত। তা হল নায়ক মধ্যবয়সে এসে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধে গভীর আক্রান্ত। উপন্যাসে তাই কোনও গোষ্ঠীজীবনের কোলাহল নেই, আছে ব্যক্তির একাকীত্বের ধূসর গৈরিক স্বভাব, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির আত্মিক সংকটেই নায়কের নতুন রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী নায়কের এটাই নিয়তি। নায়কের কোনও নাম নেই—নাম আছে তার আত্মোক্তির উপযোগী আগত মানুষজনের। এই নায়ক প্রচলিত নায়কের ধারণাকে ত্যাগ করেছে। এই নায়ক Post-modernism-এর শিকার। 'The Post-modernism is different from modernism, even a reaction against it'। নায়ক দর্শক, এবং সেইসঙ্গে অন্যদের থেকে দূরে থেকেও নায়কের মানসবিচারের ও সংকট তৈরির উপকরণ হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। অন্যান্য চরিত্ররা তাদের প্রয়োজনে আসেনি, এসেছে নাটকের নিজস্ব দাবি মত। আত্মার যে সংকট, তার সমস্যা ও সত্য সন্ধিৎসু হল এই নায়ক। নায়কের চরিত্রগত বাস্তবতা নায়কের ভিতর থেকেই নির্মিত হয়ে উঠে আসে, কথাকারের ছকের মুখাপেক্ষী নয়।

অর্থাৎ, এমন গভীর বিষাদঘন আত্ম-সমালোচনায়, কনফেশান-এর উপন্যাসে নায়ক স্বাধীন। তার মানসক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপ পেয়েছে অন্যান্য মানুষদের নির্ভর করে, যাদের প্রবেশ নায়কেরই নিজস্ব মর্জিমত। এমন এক বিষণ্ণ, সচেতন নায়ককে আঁকতে গিয়ে কথাকার প্লট নির্মাণ করেছেন প্রধানত অতীত স্মৃতি-রোমন্থনের নানান প্রসঙ্গকে নির্ভর করে। একজন সমালোচক বলেছেন, 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসে নায়কের কথা বলার রীতিতে মেলে 'পাংশু ব্যক্তিচর্চার নিবিষ্টতা', তাঁর আশা—লেখকের

দিক থেকে 'বস্তুগত আধার নির্মাণে আরও যত্ন'।

আমাদের মতে, উপন্যাসে ব্যক্তিচর্চার দিকটি তো নায়কের বিষণ্ণতা ও শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গতার সঙ্গে গভীর জড়িত। উপন্যাসের শেষে যে নায়কের মাকে অসীম আর্ত অন্বেষণ, তার মধ্যে সেই শূন্যতা দীর্ণ হয়ে ওঠে মা-হারানোর শোকে, মাকে ভুল বোঝার অসহায়তাতেই। যাই হোক সে বিষয়ে আলোচনা পরে হবে। বস্তুত নায়কের তীব্রতম মানসক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই তৈরি হয়েছে যে 'থিম', তার হয়ে-ওঠার দিকটি 'Post-modern' নায়কেরই ভবিতব্য। জার্মানি শব্দ চয়নে জার্মান সমালোচকদেরই কথায় ব্যবহৃত হয় 'বিল্ডাংসরোমান' (Bildungroman) অর্থাৎ 'it refers to a novel which is an account of the youthful development of a hero or heroine (usefully the former). It describes the process by which maturity is achieved through the various ups and downs of life.' অর্থাৎ উপযুক্ত দৃষ্টান্ত যোগে অর্থ দাঁড়ায় নায়কের বিবর্তন হল বয়ঃসন্ধি শেষে জীবন পরিণতির দিক (from adolescence to maturity–the interrugnum)। আসলে লেখক উপন্যাসের শেষে নায়কের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন—নায়ক স্বয়ং লেখকই--অর্থাৎ প্রধান প্লটেই আছে নায়ক ও কথাকারের একাত্মতা। তা-ই উপন্যাসের 'Narrative' অংশ, তার পাশে 'Metanarrative' অংশ হল--অতীত গভীর-নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত বর্তমান ও ভবিষ্যতের তাৎপর্য। (past related to present and future)। আমরা সমগ্র উপন্যাসে তা-ই দেখেছি। আধুনিকোত্তম স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে একা, নিঃসঙ্গ, শূন্যতায় আক্রান্ত বিষণ্ণ নায়ক এভাবেই নতুন হয়ে ওঠে। গৌণ মানুষজন তার চারপাশে ভিড় করলেও তারা নায়কের জন্যেই গুরুত্ব পায়। কাজ হয়ে গেলে তারা সরে যায়, নায়কের বেদনা, হতাশা, আশাহীনতা, অসহায়তা এক অ-লৌকিক মাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এটাই সাধারণভাবে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব নিহিত আত্মিক সংকটের স্বরূপ। 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' গ্রন্থে সেই নায়কের মনোভূমি ধরেই মূল বিষয় ও লক্ষ্যের, কেন্দ্রীয় বক্তব্যের জটিল বিন্যাস।

আলোচ্য উপন্যাসের নামহীন উত্তমপুরুষ কথক-নায়ক যেভাবে আদ্যন্ত চিঠির মাধ্যমে, স্বীকারোক্তির অন্তরঙ্গতায় উপন্যাসটির রূপাবয়ব রচনা করেছে, সেখানে Post-modernism বিশিষ্টতা নিয়ে নায়ক ও সমগ্র উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'non-traditional and against authority and signification.'। উপন্যাসের বিবর্তন-ছবির মধ্যে মাঝে মাঝেই মেলে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে কথক-নায়কের কিছু কিছু নিজস্ব কথা, যেগুলি সবসময়ে তার মাকে শোনানো নয়, নিজের কাছে নিজেকে স্বচ্ছ করে তোলার গোপনতম প্রয়াস—তার মধ্যে মেলে টীকা-ভাষ্য। কখনো বা নিজের জীবনভাবনার কোনও দর্শন (Philosophy) অথবা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার জট খোলার সূত্রসমূহ। উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রথম পরিচ্ছেদেই মেলে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে কিছু যুক্তি—

যেগুলির মধ্যে উপন্যাসের প্লট-রচনার, মূল চরিত্রভাবনার, উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। 'তার প্রথম চিঠি "শ্রীচরণেষু মা"—এই শুরুর বাক্যে 'তার' বলতে লেখক তাঁর বিবেককে, সৃষ্ট নায়কের 'বিবেক'কেই বুঝিয়েছেন। এই বিবেকের সঙ্গে নায়কের আছে আপাত-নিরাসক্ততা। এই দূরত্ব বজায় রেখে নায়ক তার মায়ের প্রতি 'ঋণ'শোধ নয়, সর্বাবয়বে গভীরতা আত্মিক সংকটজাত এক 'পাপবোধ'কে মূর্তি দিয়েছে। এমন পাপবোধকে জড়াতে গিয়ে নায়ক পক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলকে নিপুণ কুশলতায় ঘুরে-ফিরে পর্যবেক্ষণ করেছে। এই যে 'total observation', তা-ই হল, লেখকের ভাষায় আমার শেষ টেস্টামেন্ট, আখেরি বোঝাপড়া। আসলে বোঝাপড়া এই পৃথিবীর সঙ্গে, পরিচিত মানব-মানবীর—একটু আগে যাদের দেব-দেবী বলেছি সমষ্টি যে-পৃথিবী।' উপন্যাসের উদ্দেশ্যও লেখক একেবারে প্রথম শুরুতেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন 'ইহজন্মের কোনও জের তাই রেখে যেতে চাই না।' বন্ধনীচিহ্নের শেষ কথা 'এইবার শুরু'। কাহিনী ও প্লট সারা উপন্যাসে বিবেক-এর সঙ্গে জড়িয়ে থেকেই যে আকার রচনা করেছে উপন্যাসে—সেখানে কাহিনী ও প্লটের ছক গতানুগতিক কথাশিল্পের প্রথাকে করেছে বর্জন।

পরবর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যেকার কথা—তা প্রচ্ছন্ন প্রয়োজনীয় কাহিনী-আভাস যেমন দেয়, তেমনি মায়ের প্রসঙ্গ, নায়কের শৈশবস্মৃতি ও বাল্যের দীর্ঘকাল জুড়ে-থাকা হঠাৎ-হঠাৎ অনুভূতি জড়ো করে নায়কের বাবার ছবি আঁকে। মাকে শুনিয়ে বাবার উদ্দেশে কিছু বলার শিল্পকৌশল এখানে মেলে, প্লটের দাবিতেই আসে সুধীরমামার গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রসঙ্গ। চতুর্থ পরিচ্ছেদেই দেখা যায় চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ে লেখক নায়কের চিন্তার মধ্যে বিচিত্র সব অনুভূতির তরঙ্গ তুলেছেন 'আনু, তোমার এই ছেলেকে আমি মানুষের মত মানুষ করে দেব'—'আমার ছেলে?'—'না, না, এক হিসেবে তো আমারও, ওকে সেইমতই দেখি, এই নিয়েই তো আছি'। চরিত্রদের এমন সব সংলাপ বিনিময় পরবর্তী একাধিক situation-এ এইভাবে স্বগতোক্তির স্বভাবে রেখে বৈচিত্র্য ও গতি সৃষ্টিতে কথাকার প্লটের মধ্যে অভিনবত্ব ও আকর্ষণ এনেছেন। বন্ধনীর কোনও কোনও মন্তব্য মাকে তার স্বভাবে নানাভাবে দেখার প্রয়াসও হয়। অষ্টম পরিচ্ছেদে তো বক্তার নিজের মন ও দার্শনিক মনের অবয়ব ভেসে উঠতে দেখা যায়।

ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ থেকে লেখক প্লট সম্পর্কে যে সতর্ক, সুধীরমামার পক্ষে নতুন করে প্রসঙ্গ শোনানোয় তা মেলে। উদ্দেশ্য, কাহিনীর ছলে মাকে প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করা। আটাশ পরিচ্ছেদে বাঁশি চরিত্র বোঝাতে মায়ের কাছে বন্ধনীতে বাঁধা কথা, লীলা মাসির কথায় প্লটের বৈচিত্র্য Introvert স্বভাবে মেলে। বত্রিশ পরিচ্ছেদে মেলে জনান্তিকে কথা বলার অভ্যাসে মায়ের সঙ্গে ছেলের রাগ-অভিমানের টানাপোড়েনে মায়ের মন বোঝার পালা—'রাগ মানে তো রোদ, রোগ থাকবে কি-করে? তুমি কিছু বোঝ না'। সম্পর্কের বিচারণায় মাকে নানাভাবে দেখার দিক।

উপন্যাসের শেষদিকে তেত্রিশ পরিচ্ছেদে বন্ধনীচিহ্নের এক দীর্ঘ মন্তব্য পাঠকদের

নিবিষ্ট করে রাখে। রজনীর কথক-নায়কের প্রতি গভীর প্রেমের গাঢ়তা ও নায়কের মানসিকতায় তার নিবিড়তা সমর্থন মাকে শোনাতে এমন প্রলম্বিত অবতারণা—'বিশুষ্ক-বয়সী প্রৌঢ় পুরুষ, আমি কোথা থেকে যোগাব ওদের স্তন্য? "রোজ দেখতে ইচ্ছে করে" সেই শ্রুত কথাটিই তাই বার বার পাঠ করি চীৎকার করে। ওদের কথা ওদেরই ফিরিয়ে দিয়ে বলি "আজ আমারও ইচছা করে।"...কিন্তু এত আসক্তি বুকে চেপে রেখে আমিই বা মুক্ত হব কী প্রকারে? মা, দরজা-জানালা সব খুলে দাও। হাঃ হাঃ স্বরে উড়ে আসুক আমার অতীত, আমাকে উড়িয়ে সব বাঁধন খুলে ফেলে দিক কোনও নিস্তৃণ প্রান্তরে কিংবা কঠিন কোনও শৈলচূড়ায়। রজনীর যে ভয় ছিল, আজও সেই ভয় আমারও। চোখের সামনে থেকে সব রূপ মুছে যাচ্ছে। আমি কি অন্ধ হয়ে যাব? অথবা অচিরে পঙ্গু, অসাড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত? এই ভয়।' মধ্যবয়সী অবিবাহিত এক পুরুষের প্রেমহীন-আসক্ত জীবনের হাহাকার, সন্দেহ, ভয় এতে মেলে, লেখক-মনস্তত্ত্ব হয়েছে তীব্র—যা টানা প্লটের পরিবেশনে শিল্পের অভাববোধ কাজ করত। এক দার্শনিক অপরাহ্ণ দীপ্তি এখানে বিষাদময়তা আনে।

একইভাবে পরবর্তী চৌত্রিশ পরিচ্ছেদের বন্ধনীচিহ্নভুক্ত লেখক-ভাবনায় মেলে বুলার সঙ্গে নায়কের প্রেম সম্পর্ক-জটিলতার নাগরিক ভাবনা ও মনন। এই পরিচ্ছেদে উত্তমপুরুষ কথক-নায়ক মা-এর প্রসঙ্গ অতি-সংক্ষিপ্ত করে বিস্তারিত করেছে বুলা, বাঁশি-রজনী প্রসঙ্গ নিজের সঙ্গে জড়িয়ে। বুলা কী রকম? 'নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী বুলার, তবু প্রথম চুরুট টানার সেই বিকট গন্ধ, উত্তেজনা, কষ্ট, বুক ধড়ফড়, জীবনে পরে, তীব্রতর নেশার ঘোরেও ফিরে আসেনি। প্রথম যা, তা সবদিক থেকেই প্রথম।' নায়ক মাকে সোজা এসব কথা বলেনি, ভেবেছে—দেখেছে বন্ধনীর মধ্যেই নিজের মত করে। বন্ধনীর মন্তব্যগুলো কাহিনী ও প্লটের হাত ধরে নায়ককে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের কাছে, মায়ের গোচরে। এসবও প্লটের অভিনবত্ব ও গতিসৃষ্টির কৌশল, সেইসঙ্গে বিশেষ বিশেষ চরিত্র-দ্যোতক এবং নায়ক সম্পর্কিত ভাবনাদির অনুগ।

সর্বশেষ, উপন্যাসের সাঁইত্রিশ পরিচ্ছেদে বন্ধনীর চিহ্নযুক্ত অংশটি অবশ্যই উপন্যাসের উপসংহার—উত্তমপুরুষে লেখা উপন্যাসের আর এক টেকনিক। এই টেকনিকেই উপন্যাসের একেবারে প্রথম ও শেষ এক পূর্ণরূপের যোজক স্বরূপ পায়। অংশটা 'লেখকের উক্তি' হিসেবে নির্দিষ্ট। এখানে লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ ও সেই বিবেকি আর এক সত্তা লেখকের—দু'য়ের একাত্মতা ঘটে। উপন্যাস শেষে লেখক লিখছেন, 'এই কাহিনী উত্তম-পুরুষে যার জবানী, তাকে আমি আর দেখিনি।...সে মিলিয়ে গেছে অথবা মিশে আছে আমারই মধ্যে।'

যেটা মূল লক্ষ করার বিষয়, সন্তোষকুমারের যে অন্তিম এবং অনন্ত Quest তা সবশেষে উপন্যাসেরই অংশ হয়ে আছে। টলস্টয়ের নায়ক নেখ্লুদভ নায়িকা মাসলোভার মাধ্যমে নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে মাসলোভাকে ছেড়ে মুক্তি পেয়েছে একদিন বাইবেলে, ঘোষের নামহীন উত্তমপুরুষ নায়ক হারানো মায়ের অনুসন্ধানেই ক্রমশ

জীবনের মূল থেকে মূলের ও মূলাধারের একমাত্র সত্যসন্ধানী হয়েছেন। তাতে তার চলার পথে কৌতূহল বজায় রেখেছে প্লটের স্বভাব, বুনন, চমৎকারিত্ব।

৩.

'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসে তার প্রেক্ষিত হিসেবে প্রধান হয়েছে এক দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পরিবার জীবন। এবং ক্রমশ তার বিস্তার রূপ পেয়েছে গ্রাম ও কলকাতাকে ব্যাপ্ত করে এক জটিলতম মনোবিকাশের ব্যথাদীর্ণ চিত্রের মধ্যে। এই মন এমন এক নায়কের—যে তার মা-বাবার উত্তর প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। আসলে পরিবার জীবন পরিবেশ এবং তার সঙ্গে নিবিড় জড়িত নায়ক মনের যে নিঃসঙ্গ, শূন্য কোণটির স্বভাবধর্ম, তা একান্ত ব্যক্তিক—সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পাপবোধ, অনুশোচনা, মৃত্যুভয়, অভিমান—এসব থেকে বেদনাদীর্ণ উত্তরণ। সংকটের স্বরূপে উপন্যাসের বিষয় হয়েছে নায়কেরই অন্তর্জগতের আলো-আঁধারি রূপ। একাধিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রবলতম মন্থনে উঠে-আসা শূন্য কলসীর হাহাকার-মথিত জীবন-রূপ, এরও অন্তিমে জীবন-স্রষ্টারই অনন্ত সন্ধান--মহাকালের স্বভাবে পরিচয়হীন। 'যিনি মূল, যিনি ধাত্রী, তাকে এনেছিলেন, ধরেছিলেন। প্রাণের ঋণ, ধারণের ঋণ। রক্তের, স্তন্যের ; স্নেহের, নীড়ের। ঘিরে থাকার ঢেকে রাখার দৃষ্টি দিয়ে পিছনে ছোটার--মমতায়, উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে। অহর্নিশ "ভালো হোক"—ভাবনায়।' নায়কের এই অনুচিন্তায় উপন্যাসের শুরু। আর উপন্যাসের শেষে মাকেও ছাড়িয়ে সেই নায়কেরই গভীরতম জীবন-উপলব্ধি ঃ 'জীবন থেকে মায়েরা হারিয়ে যায়, তাই নিয়ম, জানি, তবু সমস্ত জীবন সেইজন্যেই কি মা-র জন্য এত শূন্যতা, একটা শোচনা, সতত একটা প্রয়োজনবোধ চেতনাকে আঘাত করে, এমন কি অবচেতনকে?

জিজ্ঞাসায় কাজ কী? বরং খুঁজে চলি। তোমাকেই কি? হয়ত না, একমাত্র তোমাকে না, তোমার সঙ্গে এক করে—তাঁকে। জীবনের যিনি মূল, আর মূলাধার যিনি, একসঙ্গে উভয়কে। সবস্তর পার হয়ে সবশেষে ওই একটা খোঁজাই বুঝি বাকি থাকে। মা, তাই না?' সমস্ত উপন্যাস শেষ করার পর মাকে নায়কের শেষ মহাপ্রশ্ন, এবং শেষ মহাউত্তরও এরই মধ্যে গভীর, গভীরতর ও-তম স্বভাবে। রহস্যকে কোনও ন্যায়েই ধরা যাবে না। এক চিরন্তন অতৃপ্তি রহস্যের মধ্যেই নিহিত থাকছে।

এখন দুই প্রান্তিক স্বভাবের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে মোড়া এই উপন্যাসটির সামগ্রিক রূপ। মা-কে কেন্দ্র করেই লেখকের যাবতীয় প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ও বিস্তার। 'চোখের বালির' বিনোদিনী সম্পর্কে বিহারীর ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ একটা প্রসঙ্গ বলেছেন, 'প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন। অবস্থা বিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া ওঠে সংসারের কাছে সেটাই সত্য।' সন্তোষকুমারের বর্তমান নায়ক এই ভাবনা থেকে লক্ষণীয় দূরত্বে আরও এগিয়ে। এই নায়ক মা, বাবা, সুধীরমামা, ভামতী, বুলা, বংশী, রজনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিজের মনকে গভীরভাবে জেনেই সত্যসন্ধানে

একান্ত উৎসুক। জীবনের মানে খোঁজায় জীবনাতীতের সান্নিধ্যে যেতে আগ্রহী।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে নবম পরিচ্ছেদের মধ্যবর্তী অংশে আছে কৈশোরের শুরু কাটাতে কাটাতে মধ্যবয়সী নায়কের স্মৃতির তরঙ্গিত রূপ। একে একে উদাসী, প্রায় সংসারবিমুখ, জেল ফেরত দেশব্রতী, পালাগান রচনায় প্রায়-পাগল বাবা, সুধীরমামা, ভামতী, দাদার অকালমৃত্যু—এসবের স্মৃতিসূত্রে নানান অভিজ্ঞতা, অনুভব ছবি হতে থাকে। এই পর্বেই নায়কের স্বীকারোক্তি : 'বাবাকে তখন ঘৃণা করলাম। আজ স্বীকার করছি, পরবর্তী অনেক বছরে উপরে যতই আস্তর পড়ুক। ওঁর প্রতি আমার অনুভূতির তলায় বিরাগ কিংবা ঘৃণাই ছিল মূল উপাদান।' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

দশম পরিচ্ছেদ থেকে কলকাতা আসার প্রস্তুতি, বাবার বাড়ি-ভাড়া ও চাকরি করা নিয়ে তিনজনের দারিদ্র্যের জীবন অতিবাহন কিশোর ও তরুণ নায়কের মনে দুরারোগ্য জটিলতা মাকড়সার জাল বুনতে থাকে। জালের কেন্দ্রে মা, তাকে ঘিরে নানা অনুষঙ্গের সুতো ঘোরানো! দশম পরিচ্ছেদেই আছে লেখা চিঠির মধ্যে মায়ের 'অবিগতবয়সী' হিসেবের হিসেব-ভাবনার শেষে এমন মন্তব্য : 'মার্জনা কোরো, যদি অসহ্য লাগে এই স্বীকারোক্তি।' মধ্যবয়সী নায়কের কৈশোর-শুরুর কালে গ্রাম ছাড়ার সময়-স্মৃতি স্বীকারোক্তি ও মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষার আর এক দায়ভাগ তুলে ধরে : 'আগের বারে, যখন যাওয়া হল না তখন কত কেঁদেছিলাম। আর এবারে, সত্যি-সত্যি যখন বিদায় নিলাম, তখন আশ্চর্য, চোখে একফোঁটা জল এলো না।...' মায়ের মৃত্যুর পরেও নায়কের প্রতিক্রিয়াহীন মানসিকতা তাকে অপরাধী করে। 'জানি না মা, তুমি ওপার থেকে সেটা দেখতে পেয়েছ কিনা। ক্ষমা করেছ? যদি না করে থাকো, তবে দোহাই, আমাকে নয়, দায়ী কোরো, আমার পরের বয়সকে, যখন আঙুলের গিঁটে গিঁটে কড়া পড়ে।...পরিণত কাল বয়সের পক্ষেই নিঃসঙ্গ, নিস্তৃণ, শূন্য, কিন্তু পুরুষদের পক্ষে আরও বেশি, একটা নিরস্ত্র অস্তিত্ব। তাই মা, আমার প্রগাঢ় যৌবনে তোমার মৃত্যু হল, কিন্তু তেমন করে কাঁদতে পারলাম না।' এই নায়ক বয়সের ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে নিজের অপরাধবোধের শোচনাকে কিছুটা লাঘব করতে প্রয়াসী।

একসময়ে কলকাতা—নগরজীবন নায়ককে গ্রাস করে। বাবার নাটক দলে নিজের পালা কোনওদিন অভিনয় হবে—এই আশায় যোগ দেওয়া, সেইসূত্রে বাবার সঙ্গে মায়ের কথাকাটাকাটি, মায়ের রাগে বাঁদির ভূমিকা গ্রহণের কথা ছেলের সামনেই বলে ফেলার ফলে নায়কের মধ্যে দেখা দেয় ঘৃণা, পরে অভিমান, আবার অভিমানে দূরে সরে গিয়েও কাছে আসায় মায়ের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি : 'বলতে নেই, লিখতেও নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে, তোমার ওপর ঠিক সেই সময়টা ঘৃণা হচ্ছিল বলে নিজের উপরই ঘৃণা—তখন তোমাকে সত্যি সত্যি কিন্তু তেমনি দেখাচ্ছিল, যে-শব্দটা তুমি উচ্চারণ করেছিলে।' (বারো পরিচ্ছেদ)

একদিকে মায়ের প্রতি গভীর স্নেহার্তির আকর্ষণ, অভিমান, আর একদিকে বুলার, রজনীর সম্পর্ক ধরে ছেলের প্রতি মায়ের সন্দেহ, বিরূপ মনোভঙ্গি—দুই মিলে নায়কের

দ্বিধাই ওর মধ্যে প্রায়শ জন্ম দিয়েছে একাধিক বিরূপ, বিদ্রোহাত্মক প্রতিক্রিয়া। আঠারো পরিচ্ছেদের এক জায়গায় মা-বাবা দু'জনের কাছেই ক্ষমা চেয়ে নায়ক বলেছে নলিনীর কথা মাকে গোপন করার প্রসঙ্গ মনে রেখে : 'মনে মনে ওই নলিনীর প্রতিও শ্রদ্ধা-অনুরাগ-কৃতজ্ঞতা মিলিয়ে একটা আকর্ষণবোধ করেছিলাম যে। বারবার মমতাময়ী একটা প্রতিমার রূপ আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল। মা, আমার দুঃখিনী মা, তোমার প্রচণ্ড সংশয়-সন্দেহ, মনোকষ্ট যন্ত্রণার সেই মুহূর্তেও আমি তোমার সঙ্গী হতে পারিনি। বরাবরই একা তুমি, তখনও একা রয়ে গিয়েছ। আমি, নির্বিবেক, সেদিন একই সঙ্গে তোমাদের দু'জনকেই ঠকিয়েছি।' এমন স্বীকারোক্তির মধ্যে মা-বাবার প্রতি নায়কের দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ, শ্রদ্ধা ও একাকীত্বের অসহায়তা, নিজেকে সামলে নেওয়ার অক্ষমতার পরিচয়ও মেলে।

এর পরেই নায়কের কথা : 'এর পরে, এর পরে মা, এই চিঠির খেই ধরব কোথায়, কালানুক্রমিক আর কত ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে যাব। ঘটনার বর্ণনা বা ঘনঘটা তো এ লেখার লক্ষ্য ছিল না, এ-তো চেয়েছিলাম, হোক শুধু উন্মোচন আর বিশ্লেষণ ; বদলে-যাওয়ার বিবরণ, কয়েকটি সম্পর্কের, অনেকগুলি মূল্যের ; বোধের, বিশ্বাসের, ধারণার। এ তো নিজেকে বিকাশ করা শুধু, বলে বলে আত্মশোধন।' বস্তুত এরপর থেকেই নায়কের বয়স ও নতুন নতুন মানুষজনের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মায়ের প্রতি ছেলের আঘাত-সংঘাত আরও প্রকট হতে থাকে। বাবার অসুস্থ হওয়া, লিলিমাসি-বুলাদের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া, বাবার সুস্থ হয়েও উদাসীন, বৈরাগ্যময় রূপ, মৃত্যু, বংশী-রজনীদের সঙ্গে এবং নতুন করে বুলা ও লিলিমাসিদের সঙ্গে যোগাযোগ, সুধীরমামার পুনরাবির্ভাব—সবই নায়কের আত্মউন্মোচনের, বিশ্লেষণের, যাবতীয় মূল্যবোধহীনতার, বোধ ও বিশ্বাসের ভূমিতে, পাপবোধ-মৃত্যুবোধের নিয়ন্ত্রণে গভীর গাঢ় মাত্রা দেয়। আসে মৃত্যু-চেতনা। এই মৃত্যুচেতনাই উপন্যাসের শেষে ঈশ্বর-ভাবনার বিষয়কে জীবনদর্শনে ধরে রাখার সহায়ক হয়।

লক্ষণীয়, উপন্যাসের শেষদিকে কিছু শারীরিক ও মানসিক ঘটনা মায়ের প্রতি নায়কের চরমতম আঘাতদানের ভূমি রচনা করে। চৌত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত অংশে সেই উর্বর ভূমির শিল্পরূপ। লেখক মধ্যবয়সী নায়কের ভাবনায় মায়ের কাছে জিজ্ঞাসায় বলেছেন : 'মাঝে মাঝে যাকে বলে গল্প বলা তার ধাঁচ এসে গেছে, এই কি আমার অপরাধ?...রঙ যদিও বা কিছু লাগিয়েও থাকি, তা শুধু বাইরে, মর্মবস্তুও কি স্পর্শ করেছি? না।' (পঁয়ত্রিশ) এই পর্বে নায়ক বুঝেছে, জীবন একটা প্রবহমান নদী—তার অনেক মোহানা, 'বহু সম্পর্কের, অভ্যাসের, পাপের উপনদী' মিশেলে নায়কের জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে শুরু করে বুলা, লিলিমাসি, বংশী, রজনী, নতুন করে সুধীরমামার সান্নিধ্য—সব মিলিয়ে এক নাটকের শেষ অঙ্কের কুশীলবরা। এসময়ে নায়ক পূর্ণযৌবনে ভাস্বর। এখানে বুলার গল্প, রজনীর গল্প, বংশীর গল্প। একই সঙ্গে বুলা ও তার মায়ের প্রৌঢ়বয়স্ক বিকৃত মানসিকতার পুরুষ অরিন্দম ও লিলিমাসি—এদের কথায় জটিল মনস্তত্ত্বের চূড়ান্ত চিত্র এঁকেছেন লেখক।

নায়কের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, গর্ভে অন্যের সন্তান নিয়ে নায়ককে বিবাহ করার বাসনা, রজনী প্রসঙ্গে উৎকট ঈর্ষা—এমন সব বিষাক্ত মদ বাইরের মদে মিশিয়ে বুলাকে করে তোলে বিকারগ্রস্ত, হিংস্র অথচ অসহায় এক প্রাণী : "জানিস তুই সব জানিস—এ বিদ্যে তোদের ফ্যামিলিতে আছে। তোর মা নষ্ট করেছিল একটাকে, তুই নিজেই বলেছিস একদিন। বলিসনি?"..."তোর বাবা সন্দেহ করত, তোর মা তাই ওটাকে নষ্ট করেছিল। আমি জানি--" এমন নায়কের সামনে তার মা সম্পর্কে মন্তব্যই উপন্যাসের প্লটের চরম মুহূর্তের ভূমিকা করে। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় মাকে শোনানো নায়কের কথা : "বাকিটা ওকে আমি আর শেষ করতে দিইনি, শরীরে যত শক্তি ছিল সব সংহত করে আমি প্রচণ্ড একটা চড় মারলাম। লাট্টুর মতো ঘুরে ঘুরে বুলা পড়ে গেল, সেদিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "বেশ্যা! হারামজাদী!" এই ঘটনা জানিয়ে মধ্যবয়সী নায়কের স্বীকারোক্তি : হ্যাঁ মা, আমি পুরুষ হয়েও একটি মেয়েকে মারলাম...অনায়াসে "হারামজাদী" কথাটা উচ্চারণ করতে পারলাম। পায়ের কাছে পড়ে থাকা সাপিনীটাকে পা দিয়ে থেঁতলে দিতেও বুঝি তখন আমার আটকাত না।'

কিন্তু এই নায়কই তাকে পা দিয়ে আর না থেঁতলে যখন ফিরে আসে মদ্যপ অবস্থায় বংশীর সঙ্গে, মায়ের সামনে 'সেই সন্ধ্যার নাটকটা তখনও শেষ হয়নি, আরও একটু বাকি আছে।' সেই বাকিটাই হল উপন্যাসের শেষতম চরম সংকট। মা নায়ককে নিজের সন্দেহ ধরে রজনীর কথা বলে শাসনের স্বরে, বলে মুখে ভরপুর মদের গন্ধের কথা, নায়ক মনে করিয়ে দেয় বাবার মুখেও সেই গন্ধের স্মৃতি নলিনীর কাছ থেকে ফিরে আসার পরের স্মৃতিতে, সেখানে মায়ের এক এক করে ভেঙে পড়ার স্তর তৈরি হতে থাকে :

"যে চলে গেছে, তোকে আশীর্বাদ করতে করতে, তাকে তুই এত বড় আঘাত করলি?....বাকী রেখেছিস কী?"

"অনেকখানি। এখনো বলিনি যে, বাবাকে আমি আঘাত দিয়েছি, বড় গলায় একথা বলা তোমার মুখে মানায় না। আঘাত আমি আর কতটুকু দিয়েছি। তুমি দাওনি? আরও বেশি দিয়েছ, তুমি আর উনি দুজনে মিলে—"

আঙুল তুলে সুধীরমামাকে দেখিয়ে দিলাম।

ফ্যাকাশে গলায় বলেছ "আমরা দুজনে?"

"নয়?" যতটুকু বিষ ছিল তার সব ঢেলে দিয়ে তখনও বলছি, না হলে উনি এখনও এখানে আছেন কেন? ছি, মা, ছি, ওঁকে চলে যেতে বলো। এত রাত্রে ভালো দেখায় না।"

"....জবাব দিলেন সুধীরমামা। শান্ত-গলায় বললেন, "যাচ্ছি। তুমি যতক্ষণ আসোনি, আমি ভেবে ভেবে সারা, তাই অপেক্ষা করছিলাম।"

"আর ভাবতে হবে না। এবার যান।"

লাঠিটা পড়ে রইল, দু'হাত বাড়িয়ে আর্ত, আহত, কোনও বৃদ্ধ পাখির মতো যেন

ডানা মেলে হাওয়া হাতড়ে হাতড়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, এখনও দেখতে পাই।

কুয়াশার আস্তরের মধ্যে তাঁর দীর্ঘ শরীরটা মিলিয়ে যেতে তোমার দিকে ফিরে বললাম, "আর কেন। এবার যেতে দাও। মানে মানে তুমিও যাও।"

মাথা নীচু করে, স্তিমিত, ধীর, নীচু তুমি বললে "হ্যাঁ, এইবার যাব।"

এই ঈষৎ দীর্ঘচিত্রে উপন্যাসের চরমক্ষণটি ভাঙতে ভাঙতে যখন নিথর হল, তখনি প্লটের গুরুত্বপূর্ণ শেষতম অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও প্রস্থানের শেষ। এরপর নায়কের রাবণের চিতার মত অনন্তের জ্বালা, পাপবোধ নায়কের আর্তিতে। বাবার স্বেচ্ছামৃত্যু আর মায়ের পলায়নে রহস্যময় অজানা আত্মহননে পুত্রের মধ্যে শোচনা। তার মধ্যে সুধীরমামার শান্তিবারি : 'ভার বয়ে যেতে হবে, স্বীকারোক্তিতে আর প্রায়শ্চিত্তে।' আত্ম-উন্মোচন আর আত্মগ্লানির মধ্যে নায়কের শেষ স্বীকারোক্তি ও আত্মস্খালন নায়কেরই নিজস্ব : 'বরং খুঁজে চলি।...একমাত্র তোমাকে না, তোমার সঙ্গে এক করে—তাঁকে। জীবনের যিনি মূল, আর মূলাধার যিনি, একসঙ্গে উভয়কে। সব স্তর পার হয়ে সবশেষে ওই একটা খোঁজাই বুঝি বাকি থাকে।' অনুশোচনার, পাপবোধের যন্ত্রণার, স্বীকারোক্তির সততার আলোময় আকাশ-বিস্তারে জীবনস্রষ্টার শান্তিবারি-সিক্ত বোধন। উপন্যাসের বিষয়ের বাস্তবতা, লেখকের চেতন-অচেতন-অবচেতন মনের গভীর থেকে পরিশীলিত হয়ে এভাবেই হয়েছে জীবন-সন্ধানী শাশ্বত দর্শন—তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক। প্লট ধরে বিষয় জন্ম নেয়নি, বিষয় ধরেই প্লটের বাঁধুনি হয়েছে শক্ত। প্লট ও বিষয় একাত্ম। সবশেষে প্লট ও ব্যবহারিক জীবনের বিষয় পরিত্যক্ত হয়ে যে দর্শন প্রতীকী মর্যাদা পায়, তা-ই এখানে মূল লক্ষ্য, বৈদিক পরমপুরুষের মত শিল্পের পরমার্থ।

অকপট স্বীকারোক্তি, সুনিপুণ আত্মবিশ্লেষণ, নেপথ্যভাষণের মত নায়কের একোক্তি —এসব মিলে উপন্যাসের ভাষা হয়েছে হৃদয় ও বুদ্ধির সুনিপুণ মিশেলের অমৃতভাষণ— তা শিল্পের স্বভাবেই। গদ্যের ভাষায় আছে গতি, প্রবহমানতা, অলংকৃত সৌন্দর্য। চিঠির ভাষা, কিন্তু এ চিঠি একজন আত্মসচেতন লেখক-শিল্পীর ভাষা। উত্তমপুরুষ নায়ক নিজেই একজন লেখক—মধ্যবয়সে উপনীত বিবেকি চিন্তায় ঐশ্বর্যবান। লক্ষণীয়, উপন্যাসের শেষদিকে--যেখানে চরিত্ররা প্রধান হয়ে উঠেছে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত ঘটনা ঘটাতে তৎপর, সেখানে কিন্তু গদ্যভাষা প্রথম দিকের মত এতটা ভারবাহী নয়। চরিত্রদের সংঘাতেই ভাষা হয়েছে কিছুটা মেদহীন। কারণ নায়ক এই শেষপর্বে অনেক বেশি পরিণত, যৌবনের কথা বলতে গিয়ে মধ্যবয়সের ভারকে বোঝা না করে অনেক স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে।

মনের প্রবাহে শৈশব ও কৈশোরে নায়কের আবেগবান শিল্পীমন ত্বরিত গতিসম্পন্ন, উল্লাস সেখানে বেশি। শেষদিকে আবেগবান শিল্পীর মধ্যে বিবেকবান মেধা যুক্ত হওয়ায় যৌবনের নায়ক মা-বাবাকে যেভাবে বিবস্ত্র করেছে, সুধীরমামাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে, তার

মধ্যে নানা ভুলবোঝার তাড়িত স্বভাব সক্রিয় থেকেছে। বুলা তাকে বিকৃত ভোগে টেনেছে, রজনী তাকে প্রেমের অসহায়তায় দুর্বল করেছে, স্বভাবতই উপন্যাসের শেষের গদ্য তাই স্থিরগতি, বাক্যগঠনে সংক্ষিপ্তি ও ব্যঞ্জনা ও অর্থের ভার। প্রথমদিকের গদ্যে সে সুযোগ নেই। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র গদ্য আর 'অপরাজিত'র গদ্য এক নয়। সন্তোষকুমার ঘোষের এই উপন্যাসের গদ্যভাষাও তাই এক থাকেনি প্রথম ও শেষ অংশ ধরে।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক সংক্ষিপ্ত বাক্যে উপমার প্রয়োগ করেছেন এমনভাবে : 'তার সব অতৃপ্তিতে এইভাবে পূর্ণাহুতি। বিষয়ী মানুষের শেষ সই যেমন তার উইল।' জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহুতিতে যে শেষকথা, উইলের শেষেও সারা জীবনের সেই শেষকথা। 'যেমন' শব্দ ব্যবহার করে লেখক উপমার ব্যঞ্জনা প্রসারিত করেছেন। বাক্যগঠনে অলংকার পাঠকের উপলব্ধির অনুগত লাবণ্য আনে। চিঠিতে নায়ক মায়ের ছোটবেলার স্মৃতিতে মাকে ভেবেছে 'কাঁপা-কাঁপা স্নায়ুর পুঁট্‌লি'। এতে আছে তুলনা নয়, বিষয়ের অভেদ। আবার লেখক নিজের বয়সের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে যুবতী মেয়েদের কথা বলেছেন। সেখানকার উপমায় সহজতা, সারল্য লেখকের বাকভঙ্গিমার কৃতিত্ব দেখায় : 'আজ তাদের বয়স দিয়ে আমার বয়সটাকে মাপি, কুন্‌কো দিয়ে চাল মাপার মতো।' ছোটবেলার স্মৃতিসূত্রে এমন উপমা প্রয়োগ। মধ্যবয়সে বসে ছোটবেলার নানান অনুষঙ্গে নিজেকে বোঝানো বয়স মাপা আর কুন্‌কো দিয়ে চাল মাপার মধ্যে মায়েদের চালমাপার অনুষঙ্গ সহজভাবেই উঠে এসেছে।

আপাতত কিছু ছোট ছোট বাক্যের অলংকৃত ভাষণ ধরে দৃষ্টান্ত রাখা যাক :

১. 'তখন আমার বয়স কত আর, বারো-তেরো, একটু একটু মনে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার মত।' (১ম পরিচ্ছেদ)
২. 'সুধীরমামা। অনেকদিন নামটা মনে ছিল না. আজ তোমাকে এই চিঠিটা লিখতে বসে অবশ্যম্ভাবী ফিরে এল। পুরনো একটা পানাপুকুরে নাড়াচাড়া দিচ্ছি কিনা, তাই একের পর এক মরা মাছ ভেসে উঠছে।' (ঐ)
৩. 'সুধীরমামা, একটি নোঙর সুধীরমামা। আমাদের উত্তরের ভিটের ঘরটার পাশে একটা মস্ত নারকোলগাছ, ঠিক সেইরকম ঠায় দাঁড়িয়ে।' (২য় পরিচ্ছেদ)
৪. 'জহ্লাদ যখন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়, তখন কি তার হাতের খাঁড়া কাঁপে?' (১৯)
৫. 'জামাটা...কুঁচকেই থাকত, আমার কুণ্ঠিত-অস্বচ্ছন্দ মনের মত।' (১৮)
৬. 'সকালের রোদ্দুর দেখতে দেখতে রাগী হয়ে যায়' (৪)
৭. 'ভরাট গলায় মেয়েদের অংশ বলতে গিয়ে যখন স্বরটা সরু করতে চাইতেন, যেন ভোঁতা পেনসিলটা চেঁছে ছুঁচলো করা হচ্ছে' (৩)
৮. 'ভালো লাগা আর খারাপ লাগা একটা কাটারির মত আমাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে লাগল', (ঐ)
৯. 'তোমার মুখে যেটুকু রোদ ছিল, সব মুছে আষাঢ়ের বর্ষা নামল' (ঐ)

১০. 'ভার বয়ে যেতে হবে, স্বীকারোক্তিতে আর প্রায়শ্চিত্তে, রোজ শরীরকে রগড়ে রগড়ে সাফ করার মতো।' (৩৭)
১১. 'প্রত্যেকটা স্বপ্ন আক্ষরিক অর্থে এক-একটা মানস সরোবর'। (৩৬)
১২. 'তার ঘুঁটেকুড়ুনি মায়ের দুঃখ একটা ছেলে ঘোচাল সে পুরনো রূপকথা।' (৩০)
১৩. 'নিয়তিকে কেউ মাকড়সা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পেরেছে কিনা জানি না,' (২৯)
১৪. 'সকলেরই ভিতরে একটা করে বেদনার চিত্র আছে।'

এমন সব বাক্য ও বাক্যাংশ মেলে লেখকের গদ্যভাষার চমৎকারিত্বে। প্রথম উদাহরণে আছে মধ্যবয়সে আসা এক পুরুষের সদ্য-কৈশোরকালের স্মৃতিরোমন্থনের রোমান্টিক স্বভাবচিত্র। দ্বিতীয় উদাহরণে সেই স্মৃতিতে ধরা সুধীরমামার পরিচয়ের খণ্ড খণ্ড অংশের ভেসে-ওঠার স্বভাব, স্বাভাবিক চিত্র। তৃতীয় উদাহরণে সুধীরমামার ব্যক্তিত্বের উপযোগিতা, চতুর্থ উদাহরণে সম্পূর্ণ আলাদা বাক্যে মনোভঙ্গি বোঝানোর প্রয়াস। মনের স্বভাবের বর্ণনায় বাস্তব ব্যবহৃত পোশাক অনুষঙ্গ (সপ্তম সংখ্যক) স্বাভাবিক চিত্রধর্ম। প্রকৃতিকে তার পরিবর্তিত স্বভাব ধরে জীবন্ত আঁকার প্রয়াসে সার্থকতা মানতেই হয় ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে। বাকি উপমা ও অন্যান্য ব্যবহৃত অলংকার স্বভাবে গদ্যের লাবণ্য ও সৌন্দর্য এবং বাস্তবতার স্বভাব ধরে রাখার দিক বক্তব্যানুসারী। পেনসিল চেঁছে ছুঁচালো করা, কাটারির কুপিয়ে কাটার সঙ্গে মনের দ্বন্দ্ববর্ণনা, রোদ ঢেকে বর্ষা নেমে আসা মুখের অবয়ব, ভারবহনের মধ্যেকার কঠিন কৃচ্ছ্রতা, স্বপ্নের মধ্যেকার আশার স্বভাব—এসবই বাকি উদ্ধৃত গদ্যের পরিচ্ছন্ন পোষাকই। কোথাও কোথাও গদ্যে রূপকথার কোনও কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত চিত্রে প্রয়োগ করে নতুন গদ্য-বানানোর গৌরব এনেছেন। লেখক যখন লেখেন 'বেদনার বিশ্ব', তখন তাঁর কবিপ্রাণতা স্পষ্ট হয়। নিয়তির ধীর নিশ্চিত নিপুণ জাল বিছানোর সঙ্গে মাকড়সার প্রতিতুলনায় নিঃসন্দেহে বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যের প্রমাণ মেলে।

উপন্যাসের গদ্যের বহু জায়গায় মেলে বিপরীত চিন্তার সহাবস্থান ঘটিয়ে গদ্যকে দীপ্তিদানের প্রয়াস। চলতিগদ্যের গঠনে মেলে একেবারে কথ্য, কক্‌নি শব্দের সাবলীল প্রয়োগ। নায়কের বাবার চিঠিতে লেখক পরিচ্ছন্ন সাধুগদ্য ব্যবহার করেছেন। যেখানে চিন্তাভাবনায় দর্শন গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে নায়কের ব্যক্তিগত চিন্তার সূত্রে বা বর্ণনায়, সেখানে ভার শব্দে ও গঠনে দুঃসহ হয়নি। অনুশোচনার গদ্য, স্বীকারোক্তির গদ্যে মেলে নায়ক-মনের প্রসারতা, অকুণ্ঠ মনোভঙ্গির অন্তরঙ্গ স্বভাব। একাধিক বাক্যে জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহার করে মাকে বুঝতে চেয়েছে নায়ক, আবার নিজেকেও প্রশ্ন করেছে। উপন্যাসে বিবরণের ভাষা, সংলাপের ভাষা, নায়কের আত্মোক্তির ভাষায় লক্ষণীয় প্রভেদের সীমা ধরা পড়ে।

গল্পের নায়ক অষ্টম অধ্যায়ে একসময়ে তার মাকে বলছে, 'দ্যাখো মা, ধারা বিবরণীকে খানিকক্ষণ "তিষ্ঠ" বলে তোমাকে অকপটে সাফ সাফ কয়েকটা কথা এখনই

বলে ফেলি, পরে যখন জীবনের জটিলতর অধ্যায়ে প্রবেশ করব, তখন কাজটা সহজ হবে।' আমাদের মতে ধারাবিবরণীতে লেখক নায়কের ভাষায় কিছু জটিল প্রসঙ্গ বলেছেন, কিন্তু পরে জটিলতা যত বেড়েছে, ততই গদ্যের ভাষা হয়েছে উচ্চকিত ও নায়কের আত্মপ্রকাশের উপযোগী, কিছুটা কথা বলার পর আবার নায়ক লিখছে : 'এইবার খেই ধরে যা বলছিলাম, সেই বিবরণে ফিরে আসি।' গদ্যের বিবরণধর্মিতা ক্রমশ গদ্যস্বভাবের নির্মমতায় গাঢ়তা ও গূঢ়তা পেয়েছে। শেষদিকের গদ্য তারই প্রমাণ। সংলাপ-আশ্রয় আর মনস্তত্ত্ব গদ্যকে দিয়ে স্বভাব-ব্যঞ্জনা, সংক্ষিপ্তি ও আঘাত করার অমোঘ ক্ষমতা দৃষ্টি এড়ায় না।

উপন্যাসের একেবারে সব শেষের গদ্যভাষা—'শ্রীচরণেষু মাকে।। সব শেষে'—অংশে একেবারে অলংকারহীন, নিজেকে মায়ের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণের ভাষা। আসলে অকুণ্ঠ সহজ সরল আত্মসমর্পণে তো কোনও কৌশল থাকে না, কোনও বিবেকদংশনের তীব্রস্বভাব থাকেই না, তা তো শুধুই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ! ভাষায় কোনও চালাকি থাকে না। গদ্যে থাকে না যুক্তাক্ষরের বাহুল্য, শুধুই সহজ হওয়া, সহজ হয়ে-ওঠা। গল্পের নায়কের শেষ ভাষা তাই সমস্ত ভার বিবর্জিত হৃদয়-শোভা। মৃত্যু হল 'ব্যাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'। নায়ক মায়ের স্বর্গত আত্মার কথা ভেবেছে। ভাষার মধ্যে সেই ভাবনাও তাই পোশাকহীন, শুদ্ধ-শুভ্রভাস ঃ

> 'সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি। কোথায় নয়, বলো! গঙ্গার ঘাটে ঘাটে কোথাও কি কোন চিহ্ন পড়ে আছে, পরিত্যক্ত পরিধেয়-র অংশ-টংশ কিছু? খবর নিয়েছি হাসপাতালে, এমন-কি মর্গে।
>
> রেললাইনের ধারে ধারেও হেঁটেছি, যদি কোথাও রক্তের দাগ লেগে থাকে। সেই রেললাইন মা, যে-লাইন চলে গেছে আমাদের দেশে। দেশ, আমাদের ঘরদুয়ার, আমাদের বাড়ি। কলকাতায় ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, তুমি কতদিন আমাকে বলতে, "যাবি, আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবি?" নিয়ে যেতে পারিনি। তুমি কি একদিন একাই তাই সেই পথ ধরেছিলে, আঘাতে, অভিমানে আর অপমানে, কেন মা? হয়ত পৌঁছে গেছ। যদি দুর্দম কোন লৌহরথ তোমার বুকের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে থাকে অতর্কিত কোন ক্ষণে? পৌঁছে গেছ তবুও। যেখানে বাবা আছেন, দাদা আছে। সেখানে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সেখানে আমিও আছি। আর দেরী নেই, মা, দেরী নেই, ছাড়াছাড়ির পর সকলের মিলন, এক স্বদেশে। তোমাকে নিয়ে যাইনি, কিন্তু আমরা সবাই যাব, সবাই সেখানে আছি।'

মধ্যবয়সী লেখক-নায়কের এই সর্বশেষ চিন্তার গদ্যে মেলে ভাষার সেই প্রশান্তি ও প্রসাদগুণ, চিত্তের সৌন্দর্য ও শুচিতা, সমস্তরকম গ্লানির কথায় নিজের ক্ষমাভিক্ষার বিনত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার এবং সমস্ত উজাড় করে ঢেলে দিয়ে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হওয়ার পর মানসিক পরম মুক্তির আস্বাদ।

'যাত্রাভঙ্গ'

[স্বয়ং-লেখকের স্মৃতিক্ষরিত বেদনা-যন্ত্রণা মৃত্যুর-এপিটাফ]

[illegible]

১.

কথাকার সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যু হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫তে, বাংলা ১৪ ফাল্গুন ১৩৯১-এ। ওঁর লেখা গল্প 'যাত্রাভঙ্গে'র প্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫-র সংখ্যায়। লেখকের মৃত্যু হয় দুরারোগ্য কর্কটরোগে। এই রোগের কথা সন্তোষকুমার সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন মৃত্যুর বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই। প্রমাণিত হয়েই যায়, 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পটি লেখক লেখেন রোগের যন্ত্রণাজর্জর শারীরিক অস্বস্তি ও মানসিক অসহায়তার মধ্যে থেকেই। এই তথ্য-এর প্রয়োজন প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচ্য গল্প ধরেই, কারণ লেখকের এই শেষতম গল্পের আদ্যন্ত আছে কঠিন মৃত্যুর কালো ছায়া। পুরাণে আছে, কৃষ্ণের মৃত্যুর আগে কালপুরুষ তার কালো অ-শরীর ছায়াবী অবয়বে মৃত্যুর সংকেত দিয়েছিল, 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পও যেন লেখকের সেই নির্মম নিয়তির সার্থক প্রতীক।

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫-তে যদি গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় পত্রস্থ হয়, তা হলে এটা পরিষ্কার যে গল্পটি প্রকাশের নিশ্চয়ই কমপক্ষে একমাস আগেই সন্তোষকুমার লিখে ফেলেন। গল্পের বিষয় ও নায়ক যে লেখকের বিশেষ সে-সময়ের পর্যুদস্ত জীবন ও মানস স্বভাবের সঙ্গে

গভীর-নিবিড় যুক্ত, তা অস্বীকৃত হয় না। মূল গল্পটির আলোচনার আগে আমাদের আলোচনার এই অংশ তা-ই গুরুত্ব দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের সকরুণ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার নিরাসক্ত শিল্পসফল রূপ হল ছোটগল্প 'যাত্রাভঙ্গ'। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশে গল্পের মধ্যে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা একটি বিমূর্ত ছবি ছাপা হয়েছিল—তা গল্পের মূল লক্ষ্যের পক্ষে এক অনবদ্য রচনা—আজও তা মনে পড়ে।

তাঁর সময়ের এবং একালেরও এক ব্যতিক্রমী গল্পকার হিসেবে সন্তোষকুমারের লেখক-সত্তার বিস্ময়কর সিদ্ধি ও ঋদ্ধি। 'যাত্রাভঙ্গে'র প্রসঙ্গ টেনেই বলি, 'যাত্রাভঙ্গে'র আগে সন্তোষকুমার তাঁর রচিত কোনও গল্পেই এভাবে মৃত্যুকে ব্যবহার করেননি। 'যাত্রাভঙ্গ' তাই স্বয়ং-লেখকের স্মৃতিক্ষরিত বেদনা-যন্ত্রণার এপিটাফ! বাস্তব জীবন-সত্য ও শিল্পের-সত্য এ গল্পে বিস্ময়করভাবে সমন্বিত। এ গল্পের শিল্পের সত্য জীবন-বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ মান্য করেই হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। গল্পের নায়ক হিমাংশু সমস্ত জীবনপ্রেমী অথচ নিয়তির কঠিন শাসনে তটস্থ মানুষেরই নির্মম শোক ও শোচনার যোগ্য প্রতিনিধি। গল্পটি আত্মজীবনকে আড়ালে করে তারই ছায়ায় নিরপেক্ষ নিরাসক্ত পূর্ণজীবন-আর্তির বিস্বন।

আগের গল্পে একাধিক ক্ষেত্রে এই লেখক মৃত্যুকে এনেছেন নায়ক-নায়িকার আত্মিক সংকটের, সেই অর্থে আত্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। 'অমিত্রাক্ষর' গল্পের নায়িকা সীতা ও তার স্বামীর সম্পর্কচিত্রে এসেছে নায়িকার আত্মিক মৃত্যুর ব্যঞ্জনা—যেখানে সক্রিয় থেকেছে সীতার তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মা। অন্যান্য গল্পে মেলে একাধিক আত্মহননের ঘটনা। 'কিশোরীর মন' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন ছোট বোনের সামনে তার চব্বিশ বছরের দিদির মৃত্যুর ঘটনা—যা বোনের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার অন্তিম অসহায়তাবোধ বিমূঢ়, ভয়ংকর। 'কস্তুরীমৃগ' গল্পের অধ্যাপক অজয়ের ঘটে আকস্মিক মৃত্যু। এই মৃত্যু কিন্তু প্রেমভাবনার এক জটিল চিত্ররচনার শিল্প-বিভাব হয়ে ওঠে। অজয়ের গোপন প্রেমে ধন্য ছিল নীচের তলার ভাড়াটে বিধবা নির্মলা। মৃত্যুর পর অজয়ের স্ত্রী করবীর বিপরীতে নির্মলার নিঃসঙ্গতা প্রেমকেই অন্য মাত্রা দেয়। গল্পটি মৃত্যুর কথা নয়, প্রেমের জীবন ছবি। 'ছায়াঘর' গল্পের নায়িকা প্রণতি অন্ধকার ঘরে তার অন্ধ স্বামীর বিছানার পাশে ডাক্তারের স্পর্শ-সান্নিধ্য পায়। সেই পরম অনুভব স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে রহস্যময় জটিল আর এক মনের জগতে নিয়ে যায়। গল্প প্রেমেরই এবং তাতে মৃত্যু এক 'turning point'। 'জীয়নকাঠি' গল্পে লেখক মৃত্যুকে ব্যবহার করেছেন দুই তাৎপর্যে। স্বামী রতন প্রীতিলতাকে ভালবেসে স্ত্রী মণিকার প্রতি ঘৃণায় মণিকাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়। তাতে মণিকার মৃত্যু হয় না, সে হয় জীবন্মৃত ও পঙ্গু। এই অবস্থায় রতীন আসে আবার মণিকাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে। এই বিষ প্রয়োগের আগে রথীন ভাবে : 'ঘৃণার বশে আমি তোমাকে মারতে চেয়েছি, আজ ভালবেসে তোমায় বাঁচাব, তোমাকে মারব। এই জীবনমৃত্যুর নিগ্রহ থেকে তোমাকে রেহাই দেব। মণিকা ভয় পেয়ো না।' শেষে আছে মণিকার মৃত্যু-ঘটনার ব্যঞ্জনা। এ গল্পেও মৃত্যু প্রত্যক্ষভাবে আদ্যন্ত সক্রিয় হলেও লেখকের মূল লক্ষ্য জটিলতম প্রেমকথা। 'বিষ' গল্পে মৃত্যু এসেছে নায়িকা মৈত্রেয়ীর আত্মহননে।

এখানে জমিদার-বধূ মৈত্রেয়ীর মনে-প্রাণে গূঢ় বিরোধিতা ছিল শাশুড়ি মণিমালার জমিদারি অত্যাচার ও শোষক স্বভাবের আভিজাত্য ও গর্বের। যা ছিল শাশুড়ির অহংসবর্স্ব দম্ভই। মণিমালার মৃত্যুর পর মৈত্রেয়ীর মধ্যে ধীরে ধীরে শাশুড়ির ছায়া গ্রাস করতে থাকে--যা তার ব্যক্তিগত আভিজাত্যের তথা ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী বলে মনে করত। সে গোপন বোধের গ্লানিতে গল্পের শেষে অসহায় আত্মহননের পথ ধরে। স্বামী অনঙ্গের শেষ প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয়ীর ভাবনা : 'মৈত্রেয়ী আত্মহত্যা করতে চায়নি, বিষ খেয়ে শেষ করতে চেয়েছিল তাকে, নিজের মধ্যে যাকে দেখতে পেয়েছে।' এখানে মৃত্যু গল্পের ব্যঞ্জনায় ব্যক্তিত্বের সংঘাতেরই পরিণামী আঘাত। আর একটি গল্পের নাম 'শোক'। এ গল্পে মৃত্যু এসেছে এক সত্তর বছর বয়সের সংসারীর সচেতন মৃত্যুভাবনার নিঃসঙ্গতার মাধ্যমে। এই সময়েও একান্ত প্রিয় সীতেশ-ঠাকুরপোর মৃত্যুশোকের থেকে বৃদ্ধার বড় হয়েছে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের শোক : 'তা তো নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই শোকে'। 'নিহতের নাম' গল্পে নায়ক শচীপতির স্ত্রী প্রতিমার মৃত্যুতে সম্পূর্ণ শোকহীনতার যে অনুভব—তা এক অর্থে শোচনীয় অপমৃত্যুই!

সন্তোষকুমার ঘোষ এইভাবে তাঁর আগের সমস্ত গল্পে মৃত্যুকে তার স্বরূপে না এঁকে প্রেম, ব্যক্তিত্বভাবনা, নিঃসঙ্গতাবোধ ও একাধিক জটিলতম মনের স্বভাবের যুক্ত করে প্রাসঙ্গিক করেছেন। 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পে আছে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও নির্মম নির্দেশ। নায়কের ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া—যেনবা সমগ্র মানবজীবনের নিয়ত চলায় একজায়গায় রহস্যময় স্তব্ধতা। তারপর কী? সমস্ত জীবন ধরে মানুষ স্মৃতি তৈরি করতে করতে, স্মৃতির নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে বর্তমানের হিসেব কষতে কষতে একসময়ে ভবিষ্যতের অঙ্ক মেলাতে চায়, চেষ্টা করে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি মৃত্যুকে রূপ দিতে পারে? ভবিষ্যৎ যেমন অসীম অন্ধকার, মৃত্যুও তেমনি। অতীত আর বর্তমানের আলো ফেলতে ফেলতে মৃত্যুকে বোঝা যায়, কখনোই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' ধরা বা ধরে রাখা যায় না। মহাকালের তাই নির্দেশ। 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পের নায়ক হিমাংশুর যে আত্ম-অন্বেষণ, তার মধ্যে স্মৃতি আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যতের রহস্যময় অজ্ঞতার অভিশাপ, অসীম যাত্রার দায়হীন যাত্রাই সে সবের শেষ সীমা চিহ্নিত করে, আর তাকে কালো শ্লেটের ওপর খড়ির লিখনের মুছে যাবার মত স্বভাব দিয়ে হয়তো শান্তি, হয়তো দিগন্তহীন আকাশের রূপ দেয়। আগের লেখা সন্তোষকুমারের সমস্ত মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা ও গল্পে প্রয়োগের থেকে এখানেই লক্ষনীয় ব্যতিক্রম।

২.

সন্তোষকুমার ঘোষ কী উপন্যাসে, কী ছোটগল্পে—অন্তত ১৯৬০-এর পরবর্তী রচনায় কখনোই সোজা গল্প বা কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা করেননি। গল্পের যে 'চোরালণ্ঠনের আলো', তা কাহিনী বর্জন করে প্লটের দৃঢ় জটিল গঠনে বিস্ময়কর যে বক্তব্য তা চরিত্রের মনোলোক ধরে আলোর মুখে ধরা পড়ে। 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পে তাই মাত্র নায়ক

নিয়ে তিনটিই চরিত্র—হিমাংশু, নির্মলা আর অতনু। নির্মলা আর অতনু স্বভাবে দুই মেরুর মানসিকতার, ওদের পাশে হিমাংশু যেনবা কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, কেন্দ্রকে গতিদানে নির্মলা-অতনুর মধ্যেকার চাপা সংঘর্ষই একমাত্র উপায়। পঁয়ষট্টি বছরের দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ হিমাংশুকে লক্ষ্যে রেখেই তার অন্তিমযাত্রার এক নিপুণ লেখচিত্র উপহার দিয়েছেন।

গল্পে প্লটের মোড়কে জড়ানো কাহিনী-অংশ সামান্যই। বিপত্নীক ঝাড়া-হাত-পা, প্রকৃতি-প্রেমিক, উদাসীন হিমাংশু চলেছে ওর অফিসের নতুন-পুরনো সহকর্মী নারী-পুরুষদের ভিড়ে। নদী বন পাহাড় পেরিয়ে পৌছনোর লক্ষ্য হল কোম্পানির বানানো হলিডে হোম, তাদের বাংলো। অফিসে হিমাংশুর চাকরির অবস্থান : 'রিটায়ার করার নোটিস জারি করে গেছে ক-বে! হাত কচলে, মুখ কাঁচুমাচু করে এখন এক্সটেনশনের উমেদারির পাশা। সেই পাশার মেয়াদও—টেনে টেনে আর কত? সেইজন্যেই এবার যখন এই বেরিয়ে পড়ার প্ল্যান অফিসের ওরা ছকে ফেলে, মন স্থির করতে দেরি হয় না হিমাংশুর।' অফিসের অতনু আর তার প্রেমিকা, অফিসে নতুন কাজে যোগ দেওয়া, খোলামেলা, বেপরোয়া স্বভাবের, কাজে বেশ দক্ষ নির্মলারা এই দলের যাত্রী। ট্রেনের মধ্যেই হিমাংশু ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকে। নির্মলা তাকে নানাভাবে ছোট ছোট সেবার ধর্মে সাহায্য করে। ফুর্তি করতে আসা অতনুর তা আদৌ পছন্দ নয়। অসুস্থ বৃদ্ধ হিমাংশুর প্রতি একটানা নির্মলার সাহায্য ও সেবা করার বিষয় অতনুর আদৌ সমর্থন পায় না। এই নিয়ে হিমাংশুর আড়ালে নির্মলা-অতনুর মানসিক সংঘাত তীব্র হতে থাকে। অন্যদিকে হিমাংশু প্রবল জ্বরে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়। মাঝখানে গাড়ি থেমে যায় রেললাইনে বাধা পড়ায়। বাস, নদী, বন, পাহাড় এসব তো পথে পড়বে! ট্রেন যেতে অনেক দেরি, রীতিমত অনিশ্চয়তা। অতনু যখন কোনওরকমে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ট্রেন ছেড়ে বাসে যাওয়ার ব্যবস্থা করে আসে নির্মলাকে নিয়ে যেতে, তখন হিমাংশু ট্রেনের মধ্যে শেষ অবস্থার মুমূর্ষু! এ অবস্থায় হিমাংশুকে ছেড়ে যেতে রাজি নয় নির্মলা। একসময় হিমাংশু মৃত, দেহ শীতল। নির্মলার দুটি সেবার হাত মৃত হিমাংশুর ঠাণ্ডা হাতের মুঠোয় ধরা। নির্মলার এই অবস্থায় তাকে অবলীলায় উপেক্ষা করার মধ্যে অতনু ক্ষুব্ধ, অসহায়, হতাশ। নির্মলা অনড়। মৃতের প্রতি সম্মানে শ্রদ্ধায় নির্মলা হিমাংশুর তুষার-শীতল কপালে চুম্বনের স্পর্শ দেয়।

এমন ঘটনাবিহীন কাহিনী বিন্যাসে গল্পের প্লট চরিত্রের চিন্তাভাবনা, তাদের তাৎপর্যধর্মী সংলাপের বৈপরীত্যে তীব্র গতি পায়। প্লটে ট্রেনযাত্রীদের সক্রিয়তা বাস্তব রূপ পেয়েছে। প্লটের আকৃতিকে একটা ত্রিভুজে নিশ্চয়ই ধরা যায়। ত্রিভুজে থাকে তিনটি কোণ—এখানে ১. নির্মলা-অতনু—প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে, ২. হিমাংশুর স্ত্রী হৈমন্তী—স্মৃতিসূত্রে, ৩. একা হিমাংশুর স্বভাবে। এই ত্রিভুজ-প্রতিম প্লটের ক্ষেত্রফল হল নির্মলা-হিমাংশুর যৌথ সঙ্গ-মাধুর্য। হৈমন্তী এসেছে সম্পূর্ণ অতীত স্মৃতির প্রয়োজনমত রোমন্থনে, নির্মলা নারীর স্বভাবসিদ্ধ সেবাধর্মে ও গভীর দায়িত্বশীল মানব্যবোধে, অতনু

আদ্যন্ত বিপরীত বিতৃষ্ণ আচার-আচরণে।

গল্পের প্লট ঘনীভূত হয়েছে কাহিনী ও ঘটনার চমকে নয়, চরিত্র ও বক্তব্যের সুচারু প্রয়োগে। লেখকের লক্ষ্য হিমাংশুর অন্তিম পরিণতি দেখানো—একমুখীন। নির্মলা হিমাংশুর পাশে বেমানান, এক যুবতী প্রেমিকা রমণীর এইভাবে এক বৃদ্ধের কাছে সেবাধর্মে ব্যাপৃত হয়ে-যাওয়া! কিন্তু নির্মলা পরিপূরক শক্তি। সে না থাকলে গল্পের গতি হত মন্থর, হয়তো গল্পের কাঠামো নির্মাণ সম্ভব হতই না! গল্পের বড় সৌন্দর্য 'চরম ক্ষণ' রচনায়। তা রচিত হয়েছে গল্পের গতির সহজতায়। গল্পের শেষ দিকে কথাকার এভাবে মুমূর্ষু হিমাংশুর অচেতন হয়ে যাওয়ার ভাষাচিত্র এঁকেছেন : 'শেষের কথাগুলো যেন হিমাংশুর নয়। হাওয়ায় অনেকখানি শব্দ উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। আঁচলের জাল ছড়িয়ে তাদের কুড়িয়ে আনছিল নির্মলা।' এই চিত্রের ঠিক পরেই গল্পকার একটি ছোট ঘটনার স্বভাবেই অতনুর আগমন ঘোষণা করেন : 'ঠিক তখনই কামরার দরজায় ছায়ামূর্তি। চিনতে দেরি হল না। অতনু।'

বস্তুত এখান থেকেই 'চরম ক্ষণে'র প্রথম ঝোঁক স্পষ্ট হতে শুরু করে। এরপর অতনু-নির্মলার চাপা সংলাপ-সংগ্রাম। একসময়ে 'নুয়ে পড়ে সে (অতনু) দেখল নির্মলার দু'টো হাতই, হিমাংশুর সাঁড়াশির মতো আঙুলের কবলে আটকে পড়ে আছে।' এ হল বিস্তারিত climax-এর সুগভীর অন্তিম ব্যঞ্জনা রচনার আর এক স্তর। এমন ক্লাইম্যাক্সের দিকে রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় পাঠকদের আনে অতনু : 'এখন আমি কী করি কী করি? কী করে তোমাকে বাঁচাই?' এর পরে আছে নির্মলার একটু বড়মাপের সংলাপ—যা তার চরিত্র পরিণতির স্মারক হয়, তেমনি তৈরি করে সিদ্ধান্তের জমি। ক্লাইম্যাক্সের কম্পিত অবস্থা থেকে গল্পের বিষয়ের আলোকিত উত্তরণ—যা গল্পের ব্যঞ্জনাময় প্রশান্তিও : 'বিশাল কপালটা এখন যেন শুভ্র তুষার প্রান্তর। একটু নুয়ে—না এতে দোষ নেই। এতদূর এসেছে যে মানুষটা, আরও কতদূর যাবে ঠিক নেই, যাত্রাভঙ্গের মুহূর্তে তাকে তপ্ত ওষ্ঠের ছোঁয়া—সামান্য একটু পথ খরচা বৈ তো নয়!'

গল্পের গঠনে বাড়তি কোনও ঘটনা নেই, নেই কোনও অপ্রয়োজনীয় লোকজনের উপস্থিতি। একদল ট্যুরিস্ট যেখানে এমন ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে লেখক মাত্র তিনজনকেই জড়িত করেছেন, অন্য কারোর প্রসঙ্গ পর্যন্ত রাখেননি। প্লটের এমন পরিমিত অবয়ব ছোটগল্পের নিখুঁত নিটোল বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে দেয় স্বভাবী পাঠকের আকাঙ্ক্ষিত শিল্প-বাস্তবতার অনুগ এই কাঠামো।

৩.

'যাত্রাভঙ্গ' সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যু-চেতনার গল্প। গল্পের বৃদ্ধ নায়ক হিমাংশুর অসহায় মরণোন্মুখ আত্মগত ভাবনা সেই চেতনায় পেয়েছে প্রতীকী তাৎপর্য। ভাবনার রূপরচনা সম্ভব হয়েছে ক্রমশ নায়কের গভীর গোপন স্মৃতিচারণ ধরে জাগতিক সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হয়ে যাওয়ার অসহায়তার মধ্যে। গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য

যে মৃত্যুনীল একক নিঃসঙ্গ উপলব্ধি, তার স্বরূপ লেখক নির্মলার সামনেই নায়ককে ক্রমশ আত্মোক্তিসুলভ অনুচ্চ বোধ ও বোধির সমারূঢ় করেছেন। গল্পের বিষাদময়তা ও স্পৃহাহীন নিরাসক্তি গল্পটির শুরু থেকেই চতুর্দিক থেকে আবৃত করতে থাকে।

গল্প আরম্ভের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই, যেখানে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া সকলেই জীবনের উৎফুল্লতায় মদের মত্ততায় সপ্রাণ, গতিপ্রাণ, সেখানে হিমাংশু পিছিয়ে পড়ছিল, দলের সকলের সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারছিল না। জীবন বিষয়ে হিমাংশু গভীর দীর্ঘশ্বাসের স্বভাবে হতাশ। 'এখন আর সময় নেই। কার সময়? কার আবার—হিমাংশুর। নলের দেহে শনি ঢুকেছে। ঘনঘন ঘুষঘুষে স্বর। আসলে এই জ্বরের আসল নাম বয়স।' বস্তুত এমন বয়সের মধ্যেই বাস করে নিয়তি। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তার বয়সের বিস্তার, নিয়তিও তারই সঙ্গী থেকে নিজ অধিকার ধরে রাখে। এই বোধ থেকেই মৃত্যুর মধ্যে শীতল নিমজ্জনের অচেতনতার আকর্ষণের আগে তার ভুলের স্বীকৃতি অনুশোচনার রঙে জাগাতে থাকে।

ক্রমশ অচেতন হতে হতে হিমাংশুর অবচেতন মনের সক্রিয়তা সামনে আসে। সচেতনতায় নির্মলার প্রতি যেনবা ক্ষমাপ্রার্থীর কণ্ঠ নিরুচ্চার হয়। হিমাংশুর স্মৃতি তোলপাড় হয়—কখনো চেতনে, কখনো চেতনের আড়ালে আত্মোক্তির স্বভাবে। সাক্ষী নির্মলা—নির্মলার কাছে 'কন্‌ফেশান্‌'! মৃত্যুর আগে যেমন মুমূর্ষু মানুষ হঠাৎ জ্বলে ওঠে শুদ্ধ জীবনের উজ্জ্বল স্বভাবে, ঠিক তেমনি জীবনপ্রেমী স্মৃতির দাবিতে 'হঠাৎ চিরকালের মতো জোরে হিমাংশু বলে উঠল, 'গায় গায় কে?' সেই গানের অনন্ত ব্যঞ্জনায় ডুব দিয়ে মৃত্যুর মুখে বুঝিবা দাঁড়িয়ে রচয়িতা প্রিয় কবির গান ধরে প্রেমভাবনায় ও অতিরিক্ততায় নিজের জীবন মেলাতে চেয়ে যেনবা শেষ শ্বাস ফেলার দম নেন : 'তুমি এটাকে শুধু প্রেমের গান হিসেবেই ভাবতে শিখেছ। আমি যদি বলি প্রেম বটে তবে খুব বিলম্বিত তার ব্যাপ্তি আর লয়—তার সময়সীমা? যদি বলি যিনি লিখেছেন তিনি পৃথিবীতে থাকতে থাকতেই সেই পৃথিবীকেই কথাগুলো বলেছেন। কী আর কথা! এতদিন বাস করেছেন, ভাল লেগেছে, ব্যস যথেষ্ট! তার জন্যে, সেই ভালোলাগাটুকুর জন্যে কানাকড়ি দামের অপেক্ষাও নেই তাঁর, অভিলাষ, উচ্চাকাঙক্ষার তো কথাই ওঠে না। ভালো বলতে পারাই ভালোবাসার দাম।'

সন্তোষকুমার ঘোষের নায়কের মুখে জীবনকে শেষতম মুহূর্তে ভালবাসারই গভীরতম আর্তি! এই আর্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত স্বয়ং-লেখকেরই প্রবলতম অথচ অসহায় জীবনার্তিই নয়? 'আর ভেব না আমিও সঙ্গে থাকব, ছাড়ব না।....তোমরা এগোও। যতবার একটা দুটো করে পাতা ঝরে পড়বে তখন ভেবে নিও ওই পরপর শব্দে আমারই গলা। দু-একটা পাপড়ি যদি তোমার খোলা চুলে দেখতে পাও, ভেবে নিও ওটা আত্মারই হাসি। আমি আছি, আমি যাচ্ছি।' এইভাবে এক মৃত্যুপথযাত্রীর অনন্তযাত্রা—যা জীবন বরণের দাবিতে অনন্তস্বভাবী—তা-ই সত্য হয়। এ এক জীবনপ্রেমী নায়ক তথা লেখকের 'কনসোলেশান'। মৃত্যুর পরেও নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখার এক

আকুল বাসনা। এ ভাবনা যেনবা এক 'কোমা'-য় আচ্ছন্ন মুমূর্ষুর আপন কথা, গোপন বাসনা, বিশ্বব্যাপী প্রসারিত জীবনবাসনার জাগতিক মৃত্তিকাপ্রোথিত এক বীজের চক্রবৎ স্বভাবের নথি : 'ওই মন্দিরের গর্ভগৃহের পিছল সিঁড়িতে তোমাদের সঙ্গে পা ফেলা আমার হয়তো হবে না। তবু খানিকটা চৈত্য, খানিকটা মন্দির, খানিকটা গির্জার ধাঁচে কবে কোন কালে, কোন সালে যে পীঠস্থান তৈরি হয়েছে, আমি তার চূড়াটুকু তো দেখতে পাব নিশ্চয়।—যদি একটু হাওয়া বয়, ঘন বনের পাতারা আমার চোখকে একটু পথ করে দেয়, আর আকাশে অন্তত নবমী, দশমীর চাঁদটা লোডশেডিং না ঘটিয়ে বসে যদি! শেষের কথাগুলো যেন হিমাংশুর, যেন হিমাংশুর নয়। হাওয়ায় অনেকখানি উড়ে উড়ে যাচ্ছিল।' এই প্রতীকী ভাষণেই হিমাংশুর মৃত্যুচিত্র!

বস্তুত 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পের বিষয়ে মৃত্যু সত্য হয়নি, জীবনভোগও নয়, অলৌকিক এক আত্মিক ভোগের নামে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' জীবনত্যাগের চিত্র প্রতীকপ্রতিম। গল্পের নায়কের মধ্যেই মেলে লেখকের মৃত্যুদর্শন তথা জীবনদর্শন, অসীমে অনন্তে জীবনপ্রীতির বকলমে জীবনবৈরাগ্যের পরিশীলিত রূপাবয়ব—তা শ্বেতপদ্মে আরতি-ধন্য! পৃথিবীতেই সমস্ত প্রকার জীবনের সৃষ্টি, কিন্তু সেই জীবনের স্রষ্টার জন্ম কোথায়? সেই স্রষ্টার স্বরূপই বা কী? জীবন মহাকালের এক বেগের অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বে তার স্রষ্টার ভূমিকা কি? স্রষ্টা কি সেই মহাকাল—যার গর্ভে আছে অনন্ত ভ্রূণের স্বভাবে নিরন্তর জীবনকে ফিরে ফিরে সৃষ্টি করার শক্তি—সূর্যের আলোক-স্বভাবী? মানুষ জীবনে জড়িয়ে যায়, মৃত্যু তাকে মুক্ত করে মহাকালের ভ্রূণে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে ভ্রূণ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয়ে তার চলার ভারসাম্য বজায় রাখে! গাছের বীজের যে ফিরে ফিরে অসীম বিবর্তন, মহাকালের স্রষ্টা বুঝিবা জীবন-বীজ ফিরিয়ে নিতে নিতে আবার চলে, চালায়। সন্তোষকুমার ঘোষ হিমাংশুর অন্তিম বাসনার মধ্যে সেই—কোনওক্রমেই পরলোকতত্ত্বে নয়, জীবনের সৃষ্টি ও জীবনের স্রষ্টা—দুয়ের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন নায়কের শেষ বাসনার চিত্রে। 'যাত্রাভঙ্গ' মৃত্যুর গল্প, কিন্তু অনন্তযাত্রার সমুদ্রস্তনিত স্বভাবে তার তরঙ্গভঙ্গে পদচারণা!

৪.

'যাত্রাভঙ্গ' গল্পের প্রেক্ষিতে যদিও জন-বারো মিলিত ট্যুরিস্ট দলের মানুষ ভ্রমণের কারণে ভিড় জমিয়েছে, তবু মূল গল্পে মানুষ-জনের উপস্থিতিকে অসামান্য সংযমে নিয়ন্ত্রণ করেছেন গল্পকার। এই পরিমিতিবোধ ও শিল্পের প্রয়োজন-ভাবনায় গল্পকার অবশ্যই গল্পের মূল লক্ষ্যের যথার্থ একজন সন্ধিৎসু শিল্পী। এমন ভ্রমণে ট্যুরিস্টদের কারণে-অকারণে, উদাসীন উৎকেন্দ্রিক স্বভাবে মত্ততা, কোলাহলই প্রধান। গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ সে সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাত্র তিনজনকে দিয়ে এক ত্রিভুজ টানাপোড়েনে মৃত্যুর এপিটাফ রচনা করেছেন। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মেলে তিনটি মানুষ—এক অক্ষম, মৃত্যুপথের যাত্রী, অথচ প্রাণবান বৃদ্ধ হিমাংশু ; এক প্রেমময়ী

যুবতী নির্মলা ; আর এক নির্মলার প্রেমিক অতনু। আশ্চর্যজনকভাবে বাকি যারা আছে, তারা গল্পের শুরু থেকেই পাঠকদের আড়ালে চলে যায়, এই চলে যাওয়া এত সহজ, স্বাভাবিক!

গল্পের হিমাংশু নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় চরিত্র—লক্ষ্যও। তাকে ঘিরে অতনু আর নির্মলা—যারা বেনামি হনিমুনে ট্যুরিস্ট দলের সদস্য—একই অফিসের পরস্পর সহকর্মী। এদেরই বরং নায়ক-নায়িকা বলতে আপত্তি কোথায়? এদের সম্পর্কের টানাপোড়েনেই, বৈপরীত্যেই তো বৃদ্ধ হিমাংশুর বিকাশ, পরিণতির নিয়তি নির্দিষ্ট মৃত্যু-লীন আলোময় অপরূপত্ব! হিমাংশুর বড় বৈশিষ্ট্য, সে দুই যুবক-যুবতীর সম্পর্কে যুক্ত থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তাদের মধ্যে বাধার কারণ হয় না। হিমাংশুর কৌতুকরসবোধ অতনু-নির্মলার প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে যেনবা 'রিলিফ' তৈরি করে ঃ

> ১. 'চুপচাপ চোখ ঠোঁটের চেয়ে ঢের বেশি কথা বলতে পারে।' গগনে গগনে নীরবের কানাকানি—গানটা গাওনি বা শোননি? যাও, অতনু ওদিককার জানলায়! তোমাকে ইসারায় ডাকছে। যাচ্ছ না বলে চটে যাচ্ছে।'
>
> ২. '—আপনাকে বলেছে প্রেমালাপ! আমরা চপ খাচ্ছিলাম।
>
> আরে প্রেমের আর চায়ের রং মিলে যায়, ঠিকমত চুমুক দিতে পারলে। দুটোই ঈষদুষ্ণ তো। তাই রসিয়ে খেতে হয়।'

গল্পকার এভাবে লঘুরস পরিবেশন করে মুমূর্ষু হিমাংশুর ব্যক্তিত্বে এক অতিরিক্ত লক্ষণীয় মাত্রা এনেছেন।

আমরা আগেও বলেছি, হিমাংশুর মধ্যে আছে স্বয়ং গল্পকারেরই নিজের মৃত্যুভাবনার প্রতীকী যোগ। এই অর্থে এই মানুষটির যে ক্রমশ স্মৃতি, সংলাপ, মৃত্যুভাবনা, নির্মলার প্রতি সমবেদনা বোধ, অতনু-নির্মলার মধ্যে এসে পড়ার 'উটকো' স্বভাবের কারণে লজ্জা ও অস্বস্তি এবং ক্ষমা চাওয়ার অকৃত্রিম ভাবনা—এ সবই মানুষটিকে অনেক বড় জায়গায় বসায়। স্ত্রী হৈমন্তীর ও তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ. তাবে ছেড়ে একা একা পথে নামার, চলার স্বভাবে বাউলমনের নিরাসক্তি—এসব দিয়ে হিমাংশু এই মৃত্যুচেতনার গল্পে বড়মাপের আসন পেয়ে যায়। চরম দারিদ্র্যের কারণে যেভাবে স্বামী-স্ত্রীর একদা অনন্বয় ঘটে, নির্মলার কাছে মৃত্যুর পূর্বে স্বীকারোক্তির মত বলার মধ্যে হিমাংশু হয়ে ওঠে আর এক শিল্পীমনের মানুষ। প্রকৃতি, প্রেম, ঈশ্বর, মানুষজন, সংসার, নিজের বয়স, তার অসহায়তার দিক—সবকিছুকে নতুন নতুন তাৎপর্যে হিমাংশু বোঝে, নিজের জীবনে ও বোধে বোধগম্য করে। মৃত্যুর ঠিক আগে পর্যন্ত তার যাবতীয় সচেতনার অভিব্যক্তিগুলি যেনবা ঈশ্বরের, যাপিত জীবনের কাছে অকৃত্রিম 'কনফেশান' প্রতীকী স্বভাবে যেনবা নির্মলা তার অস্তিত্বের সামনে রাখা এক শুভ্রভাস 'পোট্রেট্'।

হিমাংশুর টানেই এসেছে অতনু-নির্মলা 'এপিসোড'। অতনু একালের এক সপ্রাণ যুবক—যে ব্যবহারিক জীবন দিয়েই সবকিছু মাপে। যার প্রতিবাদে একেবারে গল্পের শেষে নির্মলা মৃত হিমাংশুর সামনে বসে, তাকে একমত্র সাক্ষী রেখে বলতে বাধ্য হয় :

'বাঁচাতে হবে না অতনু, এ জগতে কে কাকে বাঁচায়? যে যার নিজের মতো করে বাঁচে, বাঁচতে চায়, চেষ্টা করে। তুমিও করে যাও, হয়তো বেঁচে যাওয়া ব্যাপারটার আসল মানে জানবে। যেমন জেনেছেন ইনি, এতগুলো বছরের ঢিপি পার হয়ে, বোধটোধকে পাটকাঠির মতো পুড়িয়ে, এতদিনে।' অতনু তার আকাঙক্ষা মত নির্মলাকে কাছে পাচ্ছে না, তাতে তার রাগ, অভিমান, মুমূর্ষু হিমাংশুর প্রতি অশিষ্ট কথা প্রয়োগ, ঈর্ষা, উপেক্ষা, স্বার্থভাবনার উৎকটতা তাকে নতুন প্রজন্মের যুবককেই প্রতিমূর্তি দেয়।

অতনুর কথা—'কাব্যিটাব্যি আসে না'। তার সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে আছে রূঢ় রসহীন বাস্তবতা, দেহভোগের তান্ত্রিক রূপ। নির্মলার শেষ রাতের চাঁদ দেখার গভীর রোমান্টিক স্বভাবের পাশে অতনুর বর্ণনা : 'উহুঁ! আমার মনে হত যেন একটা পাকা ফোঁড়া। ফেটে গিয়ে হলদে পুঁজ ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে।' নির্মলা ভোরের সূর্য ওঠা দেখার কথা বললে অতনুর প্রস্তাব : 'উহুঁ! একসঙ্গে চা-ও খাব গরম গরম।' 'বেনামী হনিমুনে' এসে অতনুর প্রেমের কাছে প্রধান দাবি : 'একলা এসেছিলাম সেবার, এবার দুজনে মিলে এক হয়ে দেখব বলেই তো ম্যানেজ করলাম। ভালো কথা, আমাদের কামরা আলাদা হবে কিন্তু।'—'সে তো হবেই।' নির্মলা তাক না করেই একটা নুড়ি টেলিগ্রাফের তারে ছুঁড়ে মারল।' লেখক এখানে চমৎকার ব্যঞ্জনাগর্ভ দ্ব্যর্থক কথায় অতনুর দাবি ও নির্মলার স্বীকৃতিটি সাজিয়েছেন।

অতনুর মধ্যে বড় মানবতাবোধের চিহ্ন নেই। একজন মৃত্যুপথযাত্রী শেষে মৃত বৃদ্ধের প্রতি তার এতটুকু সমবেদনার, মানবতাবোধের কথা নেই। ভোগী তান্ত্রিক অতনু বেড়াতে এসেছে নির্মলাকে নিয়ে প্রকৃতি দেখতে নয়, নির্মলাকে পেতে। অথচ এই নির্মলার মনের গড়নের একটি চমৎকার কথা বলেছেন লেখক তার চিন্তা-ভাবনার গভীরে :

> 'কেন সেবার অফিসেরই শর্মিলা এইরকম একটা আউটিং থেকে ফিরে এল যখন তখন আর তাকে যে চেনা যাচ্ছিল না, মুখ সাদা, চিমসে ; তখন আড়ালে তা নিয়ে মুখ টেপাটেপি চলেছে বটে, কিন্তু আমি ওসব নোংরা ব্যাপারে বড় একটা থাকিনি তো! রুচি হত না, বমি পেত। কিন্তু কী হয়েছিল, কী ঘটিয়েছিলে তুমি, এখন তার যেন খানিক আন্দাজ পাচ্ছি। তবে শর্মিলার মতো বোকা নই। ফাঁদে পা দিচ্ছি না আমি।'

এই হল নির্মলা। অতনুর বিপরীত। অতনু যেখানে কিছুটা 'টাইপ' হয়ে যাবার অবস্থায় চলে আসে, নির্মলা সেখানে অনেক বেশি 'individual', তার চিন্তা একমুখী নয়, নানা ভাবনায় তার চিত্তের প্রসারণরূপ বিচিত্র।

নির্মলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বড় মানবতার কারণে বেড়াতে এসে অসুস্থ হিমাংশুর সেবায় ব্যস্ত থেকেছে। নির্মলা এমন—'খোলামেলা ঢিলেঢালা অথচ অতি-চালাকি নেই। বেপরোয়া, কিন্তু কাজ জানে। কমাসেই দিব্যি শিখে নিয়েছে।' এমন যে মেয়ে মুমূর্ষু হিমাংশুর কাছে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবে প্রেমিককে সামাল দিয়ে থেকেছে, সেবা করেছে, তা তার স্বভাবের, প্রাণের মানব্যবোধের যথার্থ অনুগতই। নির্মলার প্রকৃতিকে

ভালবাসার শক্তি হিমাংশুকে সেবা করারই প্রতিরূপ যেন। তার সূক্ষ্ম রসবোধ, হিমাংশুর সামনে লজ্জার প্রকাশ, হিমাংশুর অসহায় অবস্থায় চিন্তা-ভাবনা—সবই তার স্বভাবের ভিতর থেকে উঠে-আসা নির্মল শুভ্রভাস ব্যক্তিত্ব ধর্ম, তার স্বভাবের অকৃত্রিম লাবণ্য। হিমাংশুর অসহায়তায় সে যেন বা শান্তির, স্বস্তির প্রলেপ। অতনুর একাধিক কুৎসিত কথার প্রতিবাদে সে নিশ্চিত এক সরব বিদ্রোহিনী। তার ব্যক্তিত্ব বাংলা ছোটগল্পে নারীব্যক্তিত্বের বিকাশে বুঝিবা আর এক 'মাইলস্টোন'! হিমাংশুকে সে শাসন করেছে, নানা ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য নিষেধ করেছে, কোথাও বা তাকে কন্যার মত, স্নেহময়ী মায়ের মত শরীর স্পর্শ করে চন্দনের শীতলতা দিতে সচেষ্ট হয়েছে। তার নারীত্বের ও যুবতীমনের সুষমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অতনুকে ভালবাসা জানানোর এতটুকু ত্রুটিও করেনি। নির্মলা হিমাংশুর কাছ থেকে গানের শিক্ষা নিয়েছে, গানের প্রেমভাবনায় আরও বড় তাৎপর্যের কথায় সরল বিশ্বাসে বিস্ময়প্রকাশ করেছে। নির্মলা মৃত হিমাংশুর কাছে অতনুর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছে ঃ 'তুমি যে ইতর কথাটা বললে উনি তা নন, হলেও ওঁকে একলা এখানে নেকড়ে, শেয়ালের পালের মধ্যে ফেলে আমি যেতাম না অতনু।' এখানে এক বড় মানব্যে নির্মলা তার ব্যক্তিত্বের সীমায় দিগন্ত ছাড়ায়। সে এ প্রজন্মের নারী নয়, সর্বজন্মের প্রতীকী নারীসত্তা। নির্মলা প্রতীক ও ব্যক্তি—দুই ধর্মে গল্পকারের সমস্ত গল্পের মধ্যেকার এক নতুনতম সৃষ্টি—এর প্রতিতুলনা মেলে না।

গল্পের সব শেষ অনুচ্ছেদে নির্মলার নিঃশব্দ আর্ত-সক্রিয়তা ও চিন্তা-ভাবনা যেমন চরিত্রের অনেক বড় দিক দেখায়, তেমনি গল্পে পরিণামী ব্যঞ্জনাকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মত অসীমতা দান করে :

> 'নতনেত্রে নির্মলা হিমাংশুর নিথর শরীরটা দেখিয়ে দিল। বিশাল কপালটা এখন যেন শুভ্র তুষার প্রান্তর। একটু নুয়ে—না এতে দোষ নেই। এতদূর এসেছে যে মানুষটা, আরও কতদূর যাবে ঠিক নেই, যাত্রাভঙ্গের মুহূর্তে তাকে তপ্ত ওষ্ঠের ছোঁয়া—সামান্য একটু পথ খরচা বৈ তো নয়।'

এখানে এভাবে এক মৃতের প্রতি সম্মান দেখানোর উপায়ের মধ্যে মেলে নির্মলার গভীরতম শ্রদ্ধা—যা প্রত্যেক মৃত্যুপথযাত্রীর বড় বাসনা। এই দৃশ্যের ঠিক আগেই যথার্থ বাঁচতে শেখার কথা বোঝাতে গিয়ে 'ঠাণ্ডা, সেই বরফ গলা জলে ধোয়া গলায় নির্মলা অতনুকে বলেছিল : 'যেমন জেনেছেন ইনি, এতগুলো বছরের ঢিপি পার হয়ে, বোধটোধকে পাটকাঠির মত পুড়িয়ে, এতদিনে।' নির্মলার সমস্ত উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, বোধবুদ্ধি এক মৃতের সান্নিধ্যেই ব্যাপকতা পায়। তার রুচি, দুঃখবোধ, তার সেবা, যাবতীয় প্রয়াস, হিমাংশুর স্মৃতিসূত্রে শোনা স্ত্রী হৈমন্তীর প্রতি সরল শ্রদ্ধাবোধ, অতনুর প্রতি অকৃত্রিম শাসন ও উপেক্ষা নির্মলা চরিত্রটিকে যেমন বাস্তবতা দিয়েছে, তেমনি দেবী নয় মানবীরূপেই শিল্পের বেদীতে বসিয়েছে।

৫.

'যাত্রাভঙ্গ' গল্পের প্রকাশ ও রচনারীতিগত বৈচিত্র্য, সামগ্রিক গদ্যভঙ্গি এবং ভাষাপ্রয়োগে গল্পকারের পরিণত মনস্কতার পরিচয় মেলে। গদ্যভঙ্গি এবং ভাষাপ্রয়োগ যেমন বক্তব্যের সু-অনুগ, তেমনি রীতি-অনুসরণ গল্পের বিষয়-উপস্থাপনা ও শিল্প-কৌশলের অভিনবত্বের দাবি রাখে। গল্পের শুরু এইরকম চিত্রধর্মী :

> 'চওড়া আর মাঝারি লাইন দুটো যেখানে একখানে, সেই জংশনেই গাড়ি বদল। হিমাংশু পিছিয়ে পড়ছিল, দলের সকলের সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারছিল না'।

এই যে সংক্ষিপ্ত দুটি বাক্যে চিত্র রচনার প্রয়াস, তার গুরুত্ব নিছক বর্ণনায় নয়, সমগ্র গল্পের লক্ষ্যবস্তুর প্রতীকধর্ম পায়। তা অবশ্যই ব্যঙ্গ্যাত্মক। হিমাংশু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, গাড়ি বদলের আগে অসুস্থ একা হিমাংশুর যে দল থেকে পিছিয়ে পড়া, এটা অবশ্যই সমগ্র গল্পের লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত। আবার চওড়া বড় লাইন এবং মাঝারি লাইন—একজায়গায় পাশাপাশি লেগে যে গাড়ি বদলের জংশন বানায়, সেখানেই হিমাংশুকে তার যাত্রাপথের গাড়ি বদলাতে হবে। তার গভীরে প্রতীকী ব্যঞ্জনা হল—হিমাংশুর এক জীবন ও মৃত্যুপরবর্তী আর এক সীমাহীন জীবন-স্বভাব—দুয়ের মধ্যবর্তী অংশই বোঝায়। গল্পের প্রথম দুটি বাক্যে গল্পকার সমগ্র গল্পের মূল লক্ষ্যের ব্যঞ্জনা রাখায় প্রতীকধর্মে তা রচনারীতির অভিনবত্ব আনে।

গল্পের মধ্যে গল্পকার ক্রুদ্ধ অতনুর সংলাপে এমন কিছু শব্দ ও বাক্যাংশ বসিয়েছেন যেগুলি একালের কথ্য শব্দের ও বর্ণনার অন্তর্গত। 'আশনাই', 'বুড়ো-হাবড়া', 'হলদে পুঁজ ফিনকি দিয়ে' 'ঘোড়াড্ডিম! বুঝলে ওই ফ্যাচাংটাকে কি জোটাতে?' 'উড়ুক্কু মন', 'তুমি বুঝি ওর দোকলা', 'কুঁজোর চিত হয়ে শুতে', 'ওই বুড়ো ভামটার সঙ্গে গুজগুজ করতে', 'বুড়োটার চামড়া তো কুঁচকে হাড়ের সঙ্গে লেপটে।' 'এই বুড়োটার সঙ্গে ঢলানিই চলবে?' 'ফস্টিনস্টি'—এসবই এই প্রজন্মের কঠিন বাস্তববোধের দেহতান্ত্রিক এক প্রেমিকের তথাকথিত প্রেম-বোধের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে। হিমাংশুর মুখেও এমন সব শব্দ বসিয়েছেন লেখক যেগুলি আগের দিনের এক বৃদ্ধের মনোভঙ্গি ও বিষয় প্রকাশের সারল্য ও আন্তরিকতা প্রমাণ করে। 'চটে যাচ্ছে', 'জোঁকের মত লেপটে থাকা', 'শরীরটা যে সময় বুঝে বিগড়ে বসবে', 'আমি একটা উটকো লোক', 'অগ্রিম হনিমুনেও তেমন চোখ টেপাটেপি নেই' 'হৈমন্তীর কোলে-কাঁখেও', 'ভীমরতি', 'একটা লাশ জ্বালাবার ফালতু দায় ঘাড়ে চাপতে যাচ্ছে'—এসব শব্দ ও শব্দগুচ্ছ বৃদ্ধের প্রবীণতার উপযুক্ত ভাষার অভিজ্ঞান হয়। নির্মলার কথায় মেলে পরিচ্ছন্ন রুচির স্নিগ্ধতা, শান্তি, সারল্য।

'যাত্রাভঙ্গ' গল্পে আছে বহু মূল্যবান বাক্য ও বাক্যাংশ—যেগুলির অলংকৃত লাবণ্য গল্পের বিষয়ে উপযোগী গদ্যকে শিল্পের মহিমা দেয় :

> ১. 'বছরের পর বছর গরুর চাকার মতো ঘুরে গেল।'
>
> ২. 'চোখে পড়ে নীল রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া আকাশ'

৩. 'লম্বা পাহারাদার, শাল সেগুনের জঙ্গল'

৪. ক'টা হরিণ পাখা ছাড়াই যেন পাখি হয়ে উড়ে ছুটে পালাচ্ছে'।

৫. 'বেলা তখন যেন কনুইয়ে মাথা রেখে একটু জিরোবার তোড়জোড় করছে।'

৬. 'দ্বিতীয়া তোদের মতো অদ্ভুত একটু হেসে'

এমন সব উপমা ছাড়াও প্রকৃতির বর্ণনা, বিশেষ বিষয়কে নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়ে বিস্তৃত করার প্রয়াস, কোনও বাক্যের দ্ব্যর্থক প্রয়োগ মনে রাখার মত। দুই চরিত্রের মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে গল্পকারের ব্যঞ্জনাগর্ভ সিচুয়েশন ও বিষয়-উপযোগী সংলাপ সৃষ্টির কৌশল অনবদ্য।

> ১. অতনু-নির্মলার প্রেম সম্পর্কের চিত্র—'আমরা দু'জন মিলে এই জ্যোৎস্না দেখব! শেষ রাত্তিরে কী দারুণ চাঁদ উঠেছে দ্যাখো। যদি ঠোঁট-মুখ বাদ দিয়ে হাসির কোন ফটো তোলা যেত। তবে বোধ হয় ঠিক এই রকম দ্যাখাত। নরম আলো গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।'
>
> —উহুঁ। আমার মনে হত যেন একটা পাকা ফোঁড়া, ফেটে গিয়ে হলদে পুঁজ ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে।'

এমন সংলাপ বিনিময়ে অসামান্য প্রকৃতি বর্ণনার অলংকৃত রূপ কথাকারের গদ্যভঙ্গি ও প্রকৃতি দেখার স্বাতন্ত্র্য বোঝায়। তাছাড়া—দুই পুরুষ-রমণীর দৃষ্টিভঙ্গির মেরুগামী পার্থক্য অবাক করে পাঠকদের। এই প্রভেদ সত্ত্বেও দুজনের প্রেম ও একসঙ্গে বেড়াতে আসার ঘটনা ঘটছে। প্রেম-সম্পর্কের নিষ্ফলত্ব লক্ষণীয় :

> অতনুর সংলাপ : 'একলা এসেছিলাম সেবার, এবার দুজনে মিলে এক হয়ে দেখব বলেই তো ম্যানেজ করলাম। ভালো কথা, আমাদের কামরা আলাদা হবে কিন্তু।'
>
> 'সে তো হবেই।' নির্মলা তাক না করেই একটা নুড়ি টেলিগ্রাফের তারে ছুঁড়ে মারল।'

লক্ষণীয়, এখানে অতনু-নির্মলার মানসিকতার দূরত্ব বোঝাতে গল্পকার দ্ব্যর্থক সংলাপ ব্যবহার করেছেন। 'আলাদা কামরা' বলতে অতনু ওদের দল থেকে দুজনের জন্যে আলাদা কামরায় কথা বলেছে। নির্মলার উত্তরে তার বিপরীত ব্যঞ্জনা সংলাপেই ধরা পড়ে। নির্মলার স্বীকৃতি আসলে যে অর্থ বোঝায়, তা হল—অতনু ও নির্মলার দুজনের আলাদা দু'টি কামরা। উদাসীন স্বভাবে একটা নুড়ি টেলিগ্রাফের তারে ছুঁড়ে ফেলার মধ্যে ভিন্ন মেজাজ তুলে ধরে :

> অতনু একসময় নির্মলাকে বলে—'ফ্রি সুখের লোভে অমন অসুখ অনেকেরই হয়। এই তো সব্বাই চলে যাচ্ছে, গাড়িটা আমরা ফ্রি পেতাম, একদম ফাঁকা, তা তুমি ওই ঘাটের মড়াটাকে জোটালে?'
>
> —'একটা মানুষের কপাল পুড়ে যাচ্ছে, হরদম, কাঁপছে ঠকঠক করে। চোখের

ওপর দেখেও সরে থাকা যায়? লম্পট কোথাকার। এই মতলবই তবে খেলছিল তোমার মনে?'

'গাছের ডাল থেকে হুড়মুড় করে নেমে-আসা আর একটা বীভৎস লোমওয়ালা জানোয়ারকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে নির্মলা। স্বয়ংক্রিয় কোনও পুতুলের মতো নিজেই হটে এসেছে কয়েক পা।'

ঠিক এর পরেই নির্মলার গোপন ভাবনা শর্মিলাকে নিয়ে—তার আগের আউটিং থেকে ফিরে আসার চিত্র-ভাবনায় : 'কিন্তু আমি ওসব নোংরা ব্যাপারে বড় একটা থাকিনি তো! রুচি হত না, বমি পেত। কিন্তু কী হয়েছিল, কী ঘটিয়েছিলে তুমি, এখন তার যেন খানিক আন্দাজ পাচ্ছি। তবে শর্মিলার মতো বোকা নই, ফাঁদে পা দিচ্ছি না আমি।'

এইসব চিন্তা ও সংলাপ-বিনিময়ে নির্মলার ব্যক্তিত্ব বোঝা যায় যে আলাদা ঘরে অতনুকে নিয়ে থাকবে না, তার চমৎকার স্বীকৃতি!' বীভৎস লোমওয়ালা জানোয়ারকে কল্পনা নির্মলার attitude স্পষ্ট করে।

গল্পকার মৃত্যুর প্রতীক করেছেন রিটার্ন টিকিট কাটার প্রসঙ্গেও। হৈমন্তীর স্মৃতি ধরে নির্মলাকে শোনানো হিমাংশুর কথা :

—'একে তো টিকিট মোটে একজনার। তাতে আবার রিটার্ন শ্লিপ নেই।

—রিটার্ন শ্লিপ নেই তো হয়েছে কী?

...আরে রিটার্ন নেই বলেই তো! নইলে অজানা দূর দেশে যেতে কার বা অসাধ! যাব, ঘুরব, দেখব, কিন্তু ফিরতে চাই!...এখানেই তো সমস্ত। যা কিছু সাধ-আহ্লাদ, তা তো এখানেই মিটিয়েছি। যেটুকু এখনো বাকি, তার ইচ্ছেটাও পড়ে আছে এখানেই! ফিরতে হবে না? রিটার্ন শ্লিপ চাই না?....রিটার্ন টিকিটের গ্যারাণ্টি নেই বলেই তো বেশিরভাগ লোক একপা এগোয় তো পিছিয়ে আসে চার পা। যেতে পা আর সরে না!'

হিমাংশুর এমন সংলাপে জন্ম-মৃত্যুর, পার্থিব-অপার্থিব লোকের প্রতীক ধরা পড়ে। সংসার, শরীর—পৃথিবীর বুকেই তো জীবনের যাবতীয় কিছু! এই সংসারযাত্রার যে টিকিট তা একটা জায়গায় নিয়ে যায়। আবার ফেরার জন্য চাই রিটার্ন টিকিট, তার গ্যারান্টি মানেই মৃত্যুকে সরিয়ে রেখে জীবনের দিকে ফিরে আসার গ্যারান্টি! এমন চিন্তা-ভাবনা মৃত্যুপথের পথিক হিমাংশুর মধ্যে দেখা দেওয়া গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনার অনুগ অবশ্যই।

অতনুর কোনও কোনও সংলাপে মেলে বিশেষ বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নির্বিশেষ প্রাবচনিক ও প্রবাদরীতির অনুপন্থী বাক্যপ্রয়োগ—যা হয়েছে গল্পের গদ্যের অলংকার :—'জবুথবুই যখন, তখন এত উড়ুক্কু মন কেন? কুঁজোর চিত হয়ে শুতে সাধ যায় কোন্ লজ্জায়?' আবার বর্ণনায় মেলে প্রকৃতির গভীরে চেতন-বস্তুর স্বভাব আরোপের চমৎকারিত্ব ঃ 'বেলা তখন যেন কনুইয়ে মাথা রেখে একটু জিরোবার তোড়জোড় করছে।'

হিমাংশুর মৃত্যুর আগের অবস্থার বর্ণনা : 'ওর অন্তর্বর্তী কোন সত্তা হাপরের মতো তোলপাড়।' 'চোখের মণিদুটো গঙ্গোত্রী।' হৈমন্তী প্রসঙ্গে হিমাংশুর আর একটি অলংকৃত ভাষণ : 'ওর দেশ দেখার পথটাকে আস্তে আস্তে তীর্থদর্শনের তেষ্টায় পরিণত করে নিল হৈমন্তী, কিংবা ঘোরাঘুরির ইচ্ছেটা হয়তো মরেই গেল ওর মনের মধ্যে—খেতে না পেয়ে পেয়ে অনেক সময় যেমন পিত্তি পড়ে খিদেটাই মরে, তেমনি।' নির্মলাকে বলা হিমাংশুর আত্মকথন—নির্মলা পাশে বসেও কতকটা টেলিগ্রাফের টরেটক্কার মতো...সাংকেতিক কোন ভাষা বোঝার চেষ্টা করছে। সেখানে হিমাংশুর যেনবা স্বীকারোক্তি : 'আমি সারসের মতো সরু ঠ্যাংওয়ালা একটা বুড়ো আর তুমি লতার মতো লিকলিকে মেয়েটি, আমরা কি হাঁটার বাজিতে ওদের হারিয়ে দিতে পারি?' বর্ণনায় মনোরম বক্রোক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা ও সংক্ষিপ্তি, চমক লেখকের গদ্যের আর এক চমৎকারিত্বের দিক : 'অতনু একা আসেনি, তার ভারী গলাকেও সঙ্গী করেছে।' বৃদ্ধের স্বীকারোক্তি, মৃত্যু, নির্মলার শেষতম জীবন-উপলব্ধির পবিত্রতা, শুচিতা, অতনুর বিকৃত ঘৃণা, আক্রোশ, ইতর শব্দপ্রয়োগের যথেচ্ছ দিক—সব মিলিয়ে 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পের রচনারীতি গদ্য ভাবনা ও ভাষাদর্শ মূল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থেকে অনবদ্য শিল্পসুষমা পেয়েছে।

'যাত্রাভঙ্গ' আসলে নতুন আর এক যাত্রার শুরুরই প্রথম স্তর। ট্রেন বদলাতে গিয়ে হিমাংশুর মৃত্যু। বদলের জংশনে এক জীবন শেষ। কিন্তু সেখানেই আবার আর এক অনন্ত যাত্রার আরম্ভ। গল্পের শুরুতে যে প্রতীক, গল্পের মধ্যে তারই প্রস্তুতি প্রসার। 'যাত্রাভঙ্গ' আসলে মানুষের পথিক জীবনের মধ্যেকার শুরু-শেষ ও আবার অলৌকিক পথে যাত্রার শুরু—এসবের বন্ধনীতে এক অপরূপ জীবন নাট্যের রহস্যময় নিকেতন।

'চলার পথে'

[এক মৃত্যুপথযাত্রীর রক্তরঞ্জিত রোজনামচা]

সময় যখন নিশ্চিত শেষ হওয়ার মুখে, তখন মানুষ তার বয়সকে কতটুকুই বা জীবন-প্রকাশে অনিঃশেষ রেখে আর্তির অসীম স্বভাবের রূপ রচনায় সক্ষম? মানুষ যেখানে একজন ব্যক্তি হলেও শিল্পী, স্রষ্টা? সময় যখন এক দুরারোগ্য কর্কট রোগের বশংবদ ভৃত্য? আর বয়স যেখানে পৃথিবীর এতদিনের পারানির কড়ি গুনতেই, হিসেব-নিকেশের যোগ-বিয়োগে মেতে থাকার মধ্যেই নিস্পৃহ, নির্বিকার? সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের রচনা এই 'চলার পথে' পড়ার পর পাঠকদের সর্বশেষের উপলব্ধিতে এমন কথা মন্দিরের শেষ ঘণ্টার বিষাদ ও বিষণ্ণতা ধ্বনিত করে। এ যেন মৃত্যুর পূর্বে মুমূর্ষুর শেষতম স্বীকারোক্তি, হয়তো সম্ভাষণও! রোজনামচার (৩০.১০.৮৪) প্রথম অংশে, গোপনে ধীর স্বভাবে জমে থাকা তাঁর শোচনার ক্ষীর-অংশ হল এই : 'সবাইকে ক্ষমা করে যাচ্ছি। বিনিময়ে সবার ক্ষমা যেন পাই। আমার জীবনভর এরই বড় অভাব ছিল।' তৃতীয় অংশে বলছেন : 'জ্বলব তো বটেই—লাশটা। কিন্তু সবাইকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে, নিজেও এত জ্বলে? সেখানেই লজ্জা। জ্বালা।'

'চলার পথে' গ্রন্থের মোট তিনটি অংশ—১. রোজনামচা বা দিনলিপি ২. পত্রগুচ্ছ. ৩. 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পের সম্পূর্ণ অংশ। এই গল্পটি যে দিনলিপি রচনার মধ্যেই লেখা হতে থাকে, লেখক নিজেই রোজনামচা অংশে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অসুখের 'Ray treatment'-এর আগেই ৩০.১০.১৯৮৪-র তারিখ থেকে রোজনামচার রচনা শুরু। এমনও দেখা গেল, রোজনামচার এক একটি তারিখে বেশ কয়েকটা চিঠিও লিখেছেন, উত্তর দিয়েছেন পত্রদাতাদের। গ্রন্থভুক্ত শেষ চিঠির রচনাকাল ১৯৮৫-র ৭ই ফেব্রুয়ারি। সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যু ঘটে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, মঙ্গলবার। অসুখের মধ্যে লেখা গল্প 'যাত্রাভঙ্গে'র সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশকাল ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। এসব ঘটনা—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি ও শিল্পীর ক্ষেত্রে সচেতন বেদনাদীর্ণ যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুর আগের প্রত্যেকটি দিনই এক একটি ঘটনার ফলক।

যেমন চাবি সিন্দুকের তালা খোলে, তেমনি চিঠি উন্মুক্ত করে পত্রলেখকের গোপন হৃদয়ের আবরণ। এমন মন্তব্য এক বিদেশি প্রাবন্ধিক-বুদ্ধিজীবী জেম্‌স বাওয়েলের। বাস্তবিকই রোজনামচা আর চিঠি তাৎপর্যের কেন্দ্রীয় স্বভাবে একই। একই কথা, অনুভূতি, উপলব্ধি চিঠিতে আসে অন্য ব্যক্তিত্বের যোগে, রোজনামচায় ধরা পড়ে

লেখকের একান্ত নিজস্ব গোপন ভাবনা-অনুভাবনায়। তফাৎ এই, 'চলার পথে' গ্রন্থে রোজনামচার টুকরোগুলো লেখা হয়েছে বেশির ভাগই আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে নয়, বেপরোয়া জীবন-শেষের তর্জনীকে উপেক্ষা করে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণায়। চিঠিগুলি লেখা হয়েছে রোগশয্যায় শায়িত এক ব্যক্তি ও শিল্পীর বাইরে থেকে পাওয়া পত্রের স্বাভাবিক প্রত্যুত্তরে। রোজনামচায় কি সে সবের কোনও কথাই নেই? থাকে না?

রোজনামচা আর চিঠি মিলিয়ে আছে সন্তোষকুমার ঘোষের কিছু জবানবন্দি, কিছু আত্মকথন, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী একাধিক উপলব্ধির চিত্রল স্বভাব। একই সময়ে লেখা 'যাত্রারম্ভ' গল্পে তারই গভীর দার্শনিক রূপাবয়ব। 'Ray treatment'-এর আগের ৩০.১০.১৯৮৪-র রোজনামচার ভাবনায় লেখক আন্তর অভিজ্ঞতায় জীবনের বেঁচে থাকাকে এইভাবে বুঝতে চেয়েছেন : 'বাঁচা ব্যাপারটা হল একটা জমিদারী যেমন, অনেক খাজনা অনাদায়ী, অনেক খাজনা মেলেও। যা পাওনা নয়, তাও। আমার মিলেছে। যত না বঞ্চিত হয়েছি, পেয়েছি তার বেশি। এখানে, এই স্টেশনে তো আসার কথা ছিল না। So I part with mixed feeling. Neither glee, nor gloom!' কথাগুলি বুঝিবা শেষ প্রান্তে এসে জীবনের হিসেব-নিকেশ করা! কিন্তু ঠিক এই ভাবনার পরেই যখন বলে ওঠেন 'কিন্তু এত যন্ত্রণা কেন? Pay off?' তখনি আসন্ন মৃত্যুর ভূমিকা রচনায় লেখকের রহস্যময় সমাধানহীন প্রশ্নের অসহায়তা ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। 'যন্ত্রণা, না শুদ্ধি? ক্রতং স্মর, কৃতং স্মর। মন্ত্র।' লেখক নিজের উত্তরেই এমন সান্ত্বনার সন্ধিৎসু?

মরা-বাঁচার দ্বন্দ্ব ছিল অসুখটা ধরা পড়ার পর থেকেই। বম্বের ব্রিচক্যান্ডি হাসপাতালে বসেই ৩০.১০.১৯৮৪-তে ভেবেছেন রোজনামচার পাতায় : 'এভাবে মরা চাইনি বটে, তবে এভাবে বাঁচারও কি কোন মানে হয়? মানুষ মাত্রেই মরণশীল। কিছু কিছু মানুষ তবুও অমর। আমিও কি না একদিন ওই অমরত্বেরই উমেদার ছিলাম।—হায় রে!' উদাসীন হতাশায় দিনলিপির রচয়িতা আত্মমগ্ন হতে চাইছেন। ৩১.১০.১৯৮৪-তে গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ একটি গল্প রচনার 'থিম'-কে তৈরি করেছেন মনের গভীরে। এরই প্রাসঙ্গিকে এসেছে বঙ্কিমের উপন্যাস, এলিয়টের এবং ব্রাউনিংয়ের কাব্যনাটক, কাব্য-কথার অংশ বিশেষের চিন্তা। 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পে বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী নায়ক হিমাংশুর স্মৃতিচারণে এসবের পরিচয় মেলে।

৩১.১০.৮৪-র রোজনামচায় লেখক যেনবা একে একে জাগতিক অহংবোধ থেকে মুক্ত হতে চাইছেন। 'মা, এই অহং মোচন করো।' এই অন্তিম বাসনার সঙ্গে লেগে থাকে জাগতিক যাবতীয় অস্থিরতা থেকে, কাজ থেকে, ভয়ংকর যন্ত্রণা থেকে বিশাল শূন্যতার কষ্টিপাথরের মুক্তির আর্তি : 'বিরাট শূন্যতা, আমার অনিশ্চয়তা আর শারীরিক যন্ত্রণা তো তুচ্ছ।' ৩১.১০.৮৪-র শেষতম উপলব্ধি যেন মুমূর্ষু জীবনকে এক প্রসারিত Compromise-এর মধ্যে স্থিত করার বাসনা :

> 'আলো দরকার, সঙ্গও চাই, কিন্তু প্রায়ই প্রয়োজন একটু ছায়ার, একটি নিভৃতির। সমুদ্রের দিকে তাকালে এই সত্যটা সহজেই ভেসে ওঠে ; নীল,

কালো, উজ্জ্বল, স্থির, উচ্ছল, অগভীর-সবুজ উচ্ছল। আকাশে কালীকৃষ্ণ মেঘের কোণে কোণে দুষ্টু বিদ্যুৎ। মৃত্যুও তাই। যন্ত্রণাও। সেটা আমার, তোমার, না কার, মূল কথাটা তা নয়। মৃত্যু + জন্ম = জীবন। সবটা মিলে সুগোল, সুডৌল। সেখানে ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা উল্লাস-উৎসাহ, চিৎকার সব মিলে শুয়ে আছে।'

১.১১.৮৪-র রোজনামচার পাতায় একটি বাক্য : 'দিনগুলো যেন এগোয় বুকে হেঁটে, কচ্ছপের মতো। অসহ্য।' গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে সমূহ ক্লান্তি, বিষাদময় অস্তিত্বের যান্ত্রিকতায় যে লেখকের অসহায় প্রতীক্ষা—এমন উপমাতেই ব্যঞ্জনাগর্ভ। মাঝে মাঝে লেখক তাঁর ব্রিচক্যান্ডি হাসপাতালের জানলা দিয়ে যখন সমুদ্রের দিকে তাকান, তখন মৃত্যুর কথা মনে পড়লে স্মরণ করেছেন স্ত্রীকে, শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথের কথা ভেবে 'বিরাট প্রাণ' ও 'বিরাট মৃত্যু'র ভাবনায় সমুদ্রকে করে তোলেন বড়মাপের উপমার উপকরণ। উপমানকে : 'সমুদ্র সামনে। সমুদ্রে দুটোই এক সঙ্গে। এই বিশালকে সাক্ষী রেখে শেষ যদি হয়ে যাই, খেদ নেই। ঢেউ, কাছে ঘোলা, দূরে নীল। মানে কি এই যে, কাছে এলেই স্বরূপ বোঝা যায়, আর তফাতে সকলই মহৎ?' এ যে প্রকৃতি প্রেমের প্রগাঢ় বোধ দিয়ে মৃত্যুর যন্ত্রণাকে, তার ক্ষুধার্ত আক্রমণকে চিরকালের জন্য বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার পরমতম বাসনাই! সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর স্বভাব নিয়ে সংশয়ও মাথাচাড়া দেয়।

কোথাও বা মৃত্যুর দিকে এগোতে এগোতে ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণের অশান্তিতে বলে ওঠেন—'আমার যা বিধিলিপি!' রোজনামচার কোনও কোনও পাতায় মেলে নিজের অতীত জীবনের একাধিক সচলা, সক্রিয়তার জীবন-আচরণ! আবার সেই নিজের মধ্যে জাগে সংকোচ—পরিপার্শ্বকে নিজেকে দিয়ে বিপর্যস্ত করার ভদ্রতাবোধ—অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার মতই : 'সুস্থ—কেউ কি বিশ্বাস করবে, আর বাঁচতে (বাকি দিনগুলোকে পুরনো দিনেরই ক্রম-মলিন ধূসর জেরক্স কপি বানাতে) আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আমার লজ্জা সবাইকে এত জ্বালানো।' 'আর শারীরিক কষ্টটাকেও ভোলা কঠিন। কেউ কি পারে? ঠাকুরও কখনও কখনও বিচলিত হয়েছেন।' (৬.১১.৮৪) কোনও রোজনামচা যেনবা আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে লেখকের অলিখিত Compromise হয়ে গেছে! তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক, কখনো বা কৃত্রিম নিদ্রার আসা-যাওয়া ঘটে বটে, কিন্তু লেখকের কথায় 'কবে ইস্তফা দেবে কে জানে। দিন তো বয়ে গেল। এ তো খুচরো নিদ্রা। বড় ঘুমটা তো পড়েই আছে, তাকে ঠেকায় কে।' (৭.১১.৮৪)

এর পরেই লেখক লিখছেন : 'জন্মান্তরেও বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। সমুদ্রকে দেখে দেখে।...জীবনের পরেও জীবন। অনন্ত জীবন, দ্রৌপদীর শাড়ির মতো। শরতের পর শরত। তবে কিনা, এটা বিশ্বাস মাত্র। এই জীবনটা তো আর কোথাও আছে বলে জানা নেই!' এই কথার প্রতিধ্বনি মেলে 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পের নির্মলার সঙ্গে হিমাংশুর সংলাপ বিনিময়ের মধ্যেই। নির্মলা বলছে, আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন? হিমাংশুর কথাতে সেখানেও পরজন্মের কোনও সমর্থন মেলেনি। রোজনামচার পাতায় কখনো কখনো লেখক একেবারে বাস্তব

জীবনপ্রীতি ও আশঙ্কার কথা বলেছেন অকপটে : 'দুদিন bed-rest-এ আছি বলে আরও বেশি দুর্ভোগ। খালি কলকাতার কথা শুনতে ইচ্ছে করে।' এই বাসনা যেন বা যন্ত্রণা থেকে যেনবা 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে'ই ভালবাসার আর এক অভিব্যক্তি!

রোজনামচার মধ্যেই ৭.১১.৮৪ তারিখে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি পত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন যা চিঠিপত্র অংশে থাকা উচিত ছিল। পত্রের শেষে বলছেন : 'জীবনে উপভোগের কোটা শেষ। এবার ভোগের পালা বা দুঃসহ দুর্ভোগের। এইটে নিয়েই আমার জ্বালা, নিজে তো জ্বলবই, কিন্তু এতজনকে জ্বালাব কেন?' সেই সৌজন্যবোধ, সংকোচ, ঋণ না করার, না রাখার আন্তর আর্তি জানানো! সেই সঙ্গে তাঁর বেঁচে থাকার থেকে আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সহমর্মিতায় যাওয়ার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়। আয়ুকে বাঁচিয়ে রাখার থেকে তা থেকে মুক্তিটাই কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। তাই ৯.১০.৮৪-তে সেই উপলব্ধির উজ্জ্বল প্রকাশ : 'একটা বয়সে আয়ুই পাপ।' এ যেন এক মৃত্যুযন্ত্রণার অভিজ্ঞতার ঋদ্ধ শিল্পীর 'ভার্‌ডিক্‌ট, সারমন্‌', বাণীই : 'একটা বয়সে আয়ুই পাপ।' এবার এমন আত্মউন্মোচনের শেষতম অধ্যায়ের প্রথম পরিশীলিত উচ্চারণ :

> 'সব এপারে রেখে যেতে হয়। স্নান যখন করতেই হবে তখন নগ্ন দেহেই শ্রেয়।'

বাস্তবিকই সমস্ত মানুষই যখন মৃতুর পর আগুন আর মাটির সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিলীন হয়, তখন তো তার মাতৃগর্ভ থেকে জন্মের অবয়বের প্রতীকে ও সত্যেই ঘটে সর্বদিকের অবিনশ্বরতা, প্রয়াণ—সেই বিশুদ্ধ নগ্নতা, সেই সব কিছু বর্জনের পরিশীলন!

১০.১১.৮৪ তারিখের রোজনামচার প্রথমেই লিখছেন, 'অন্যান্য উপসর্গ কম, কলকাতার চিঠি পেয়ে মন-মেজাজও শীতল, কিন্তু কাশির প্রকোপ ক্রমে বাড়ছে। কণ্ঠনালী পুড়ে যায়।' একদিকে শারীরিক দুরবস্থার চরমতম যন্ত্রণা, আর একদিকে মানসিক অবস্থার শান্ততা—দুয়ের মধ্যে লেখকের লিখে চলার যে বিরাম নেই, সেই স্বভাব-শক্তির বিস্ময়করতা পাঠকদের অভিভূত করবেই। উপমার পর উপমা সাজিয়ে রোজনামচার বিষয়কে অনেক বেশি সহনশীল করার স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প-প্রয়াস লক্ষ করার মত। এই তারিখেরই শেষতম স্বীকৃতি—যা অনুভবে ও উপলব্ধিতে সর্বশেষ মৃত্যুর শান্তিকামনার বাঙ্ময় রূপ—তা এমন সিদ্ধান্তবাক্যেই মেলে : '...বুঝতে পারি, আমার ভোগান্তি অনেক বাকি। নরক যন্ত্রণাটা বোধহয় ইহলোকেই সেরে যেতে হবে। হচ্ছে। যাক...যতটা এগিয়ে থাকা যায়, ততই ভালো।' বুঝে গেছেন লেখক, চলার পথের এবার শেষতম যাত্রীদের মধ্যে তিনি নিশ্চিত একজন।

মৃত্যুকে গ্রহণ করতে, নিয়তির নির্দেশ মানা করতে তিনি এতটা স্থিত-মনস্ক হয়েছেন যে মৃত্যুর মুখ থেকে কোনওক্রমে ফিরে আসার ভাবনা তাঁকে আর এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে। এই ভাবনায় তীব্র শ্লেষ আছে নিজেকে নিয়ে। এর মধ্যেই রূপ পেয়ে যায় মৃত্যু সম্পর্কে এক গভীর দার্শনিক বোধ : 'ফাঁসির হুকুম হয়তো রদ ; কিন্তু তার বদলে জেলে ঘানি টানো বিশ বচ্ছর। এইভাবে প্রাণ যদি ফিরেও পায় কোনও কয়েদি, সে কি আহ্লাদে দু'হাত তুলে নৃত্য

করে? আমার কেসটা ক্রমশ সেই দিকে মোড় নিচ্ছে মনে হচ্ছে। লোকসমাজে এর পর মুখ দেখানোই দায় হবে।' এইভাবে ফাঁসির আসামির রূপকে যেন বা মৃত্যুর কাছেই নিজ জীবনের নিরঙ্কুশ সন্ধিপত্র জমা রাখার স্থায়ী দলিল রচনা করতে চাইছেন।

রোজনামচার শেষতম অংশের রচনাকাল ১৬.১২.৮৪। একাধিক উপমার অভিনবত্বের মধ্যে লেখক তাঁর অবস্থার Crude realityটার কথা আবার বলেছেন : 'কলকাতায় প্যারোলে যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে তত। আজ ভোর থেকেও এ দানিক তো আধ লিটার অন্তত। তবু যেই জানালা খুলি, অমনি সমুদ্র ; নীল কলেবর—শুধু রোদ্দুর যখন পড়ে তখন পীতবসনের যা একটু ইশারা।' 'পীতবসন' তো ধূসরতম বৈরাগ্যের, অনন্ত শূন্যবোধের দেবতার পোশাক, রোজনামচার শেষে এমন প্রতীকী সম্ভাষণ লেখককে কোন্ শান্তির ইঙ্গিত দেয়?

শেষ উপলব্ধি হল জীবন-মৃত্যুর মধ্যেকার দুই মেরুগামী অবস্থার সমন্বয়ে পূর্ণস্বরূপের রূপ-উন্মোচন! এ এক জীবন-মৃত্যু—দু'য়ের অভিজ্ঞতালব্ধ এক দর্শন—যা নীরস তত্ত্বে নয়, সরস রসাবরণে আত্মদর্শন :

> 'নিজেকে নিজের মধ্যে পেতে হবে, কথাটা যতটা ঠিক, ছড়িয়ে যেতে হবে—এই কথাটাও ততটাই। সমুদ্দুর টইটুম্বুর হয়ে আছে, তবু কী এক ফুসলানিতে অজানা পাড়ে আছড়ে পড়ছে, আঁচড়ে নখে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে বেলাভূমি। টেনে নিচ্ছে নদীদের বুকের ভিতরে। অতএব একা নয়, তারও সঙ্গী চাই।
>
> সঙ্গী দরকার হয়েছিল না স্বয়ং বিধাতার? একা ছিলেন, বহু হলেন। আসলে চাই দুয়ের সমন্বয়। শান্ত, সংযত, সংবৃত স্থিতি একদিকে, আবার ছড়িয়ে উড়িয়ে নিজেকে নিঃশেষ করা অন্যদিকে। এই রহস্যটা ভোগী দেবতাদের বুঝি জানা ছিল না। থাকলে "কিমিব যক্ষমিতি" জিজ্ঞাসাটার দরকারই হত না।'

জন্ম-মৃত্যুর এমন যৌথ প্রতীকী বোধ ও বোধির মধ্যেই সন্তোষকুমার ঘোষের রোজনামচার অন্তর্নিহিত দর্শন ভাবনার ঋদ্ধি।

'পত্রাবলী' বিভাগে যে চিঠিগুলি আছে, সবই তাঁর অসুস্থতার খবরে ও অসহায়তার কথা ভেবে আত্মীয়-সহৃদয় পরিচিত জনের পাঠানো পত্রাদির উত্তর। এত কষ্টের মধ্যেও যেমন প্রায় মুক্ত মনে রোজনামচা লিখেছেন, তেমনি একই তারিখে ছোট-বড় একাধিক উত্তরও দিয়েছেন শুভানুধ্যায়ীদের। প্রথম চিঠিটি ৪.১১.৮৪-তে লেখা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিংবদন্তী গায়িকা সুচিত্রা মিত্রকে। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি প্রীতি তাঁর শরীরের রক্তের প্রবাহের মত। চিঠিতে নিজের কষ্টের কথা জানিয়েছেন : 'দু'এক ফোঁটা ছাড়া liquid foodও কিচ্ছু না, চিৎ হয়ে শুতেও কষ্ট, ঢোঁক গিলতেও'—এর সঙ্গে জানিয়েছেন সুচিত্রা মিত্রের গানের জন্য তীব্র আর্তি—তাঁর 'সব গানই আজ আমার সান্ত্বনা। সমুখে বারান্দার বাইরে আক্ষরিক অর্থেই "শান্তি পারাবার"। চাই কেবল শেষ পারানির কড়ি। শুধু কেউ যদি শোনাত। ...শুধু I wanted to ride to my death. I am crawling instead.

তবে জীবন-মরণের সীমানা পারাইনি, এখনও চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি।' এমন চিঠিতে মেলে এক নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীর শান্তি বাসনা—রবীন্দ্রসঙ্গীতে মুক্তির অসীম স্বাদ!

সুকুমার সেনকে লেখা চিঠিতে (৯.১১.৮৪) তিনি লিখেছেন একই ভাবের কথা—'মন দিব্যি আছে। তবে শরীরটায় বড় যন্ত্রণা। এরা চিকিৎসার নামে একেবারে নিঃস্বর করে দিয়েছে, সেও এক জ্বালা।' জগন্নাথ চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে (১৯.১১.৮৪) মেলে ছোট সাহিত্য আলোচনা, নিজেকে নিয়ে শ্লেষ, কৌতুক। একাধিক বাক্যে মেলে প্রতীকী শব্দ প্রয়োগে কৌতুক—বাচনভঙ্গির স্বভাবসিদ্ধ তির্যকতা—'মেলট্রেনটা এসে মালগাড়ির মতো—সাইডিং-এ।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতীকে লেখা চিঠিতে (৪.১১.৮৪) আছে লেখকের অফুরন্ত স্নেহপ্রীতির রস-মাধুর্য : ১. তোমার চিঠিটা প্রলেপ—এই প্রবাসের ক্ষতে।' ২. 'চিঠি পেতে যত ভাল লাগে, চিঠি দিতে তত নয়। ক্লান্তি। তাছাড়া একটা রোজনামচা রাখছি যে।' ৩. প্রাণ ঢালা (প্রাণের যেটুকু আছে সবটুকু ঢেলে) স্নেহ, আশীর্বাদ।'

নবনীতা দেবসেনকে লেখা একটা চিঠির (৪.১১.৮৪) মধ্যে মেলে অসুস্থ সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যু সম্পর্কে বিশেষ ভাবনা-চিন্তার ছোট একটি অংশ যা গুরুত্বপূর্ণ : 'এই মৃত্যু অকালমৃত্যু না।...আসলে আমি বাঁচতেই চাই না। শুধু মৃত্যুর এই ভীষণ রৌরব যন্ত্রণাদগ্ধ processটা সম্পর্কেই যা প্রতিবাদ।' সময়চেতনা এই চিঠিতে অকপটে ব্যক্ত। আসন্ন মৃত্যুভাবনার সঙ্গে তাঁর বিগত জীবনের অনেক ভাবনা পায়ে পায়ে শ্যাওলা জড়িয়ে থাকার মত একাধিক চিঠিতে দেখা যায়। এখানে সেরকম এক স্বীকৃতি : 'জীবনের শেষ দিকে সম্পর্কগুলো মরছিল। মরণের মুখে এসে তারা আবার তাজা হয়ে উঠছে, এইটেই তাজ্জব। মানুষকে নতুন চেহারায় দেখতে / চিনতে পারছি। কিছু মানুষকে।' এসব কথা তো রোজনামচায় নয়, চিঠিতেই অকপট শোনায়, অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার নির্ভুল অভিজ্ঞান হয়।

চিঠিপত্র অংশে সন্তোষকুমার ঘোষের প্রতিটি চিঠিই প্রত্যুত্তরে আন্তরিক। বুদ্ধদেব গুহকে লিখছেন, 'একটা চিঠি পাওয়াও জীবনের একটা অর্জন—সঞ্চয়। হাত ক্রমশ কাঁপছে—ক্লান্তিতে। তবে শুধু হাতই নয়, মনও। আবেগে।' (১৩.১১.৮৪) তৃপ্তি মিত্রের চিঠির উত্তরে (১৩.১১.৮৪)—'টগবগিয়ে চিতায় চড়া হচ্ছে না, এই যা দুঃখ।...আপনি খোঁজখবর নিচ্ছেন, শুনলাম। কৃতজ্ঞ। পরে, ওপরে গিয়ে শোধ দেব।' এক গভীর দুঃখ-কথা থেকে জাত বিষাদ এমন সব মন্তব্যে সঠিক মেলে। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে (৯.১১.৮৪) চিঠির প্রত্যুত্তরে লেখেন 'যদি সেরেও উঠি, সে বাঁচা কি বাঁচা? জীবনের কাছ থেকে 'পেনশন' নেওয়ার মতন। ভিখিরিপনা—আয়ু যেন সিকি, পাঁচ-কি-দশ পয়সা হাত পেতে নেওয়া।' আমরা যেটা বার বার গভীরভাবে উপলব্ধি করি রোজনামচা ও পত্রাবলি পড়ে, সন্তোষকুমারের স্নেহার্থী প্রদীপকে লেখা পত্রে (১৭.১১.৮৪) তার সমর্থন মেলে : 'ক্রমশ দুর্বল। আত্মিক শক্তি আছে কিনা জানি না, তবে সোজা কথায় যাকে মনের জোর বলে, তা এখনও প্রচুর। বিশেষ করে রোজ এত "দূর" নিকট হচ্ছে, এত আকুল উদ্বিগ্ন চিঠি শেষের প্রহর পূর্ণ করে দিচ্ছে যে অবাক মানতে হয়। হয়তো অনেক কিছু

পাইনি, কিন্তু যা পেয়েছি তার দামও কি কম?'

পুত্র টিটোকে সন্তোষকুমার ঘোষ বলছেন (১৩.১১.৮৪) 'অহেতুক অত্যুক্তি আমার স্বভাবে নেই। অভিভূত সত্তাই রুগ্‌ণ শরীরকে দিয়ে লিখিয়ে নিল।' বস্তুত তাঁর লেখা চিঠিগুলি তাই এত সংহত, অন্তরঙ্গতার লাবণ্যে ও সুষমায় অদ্ভুত এক স্বাদ দেয়। চিঠির একাধিক প্রসঙ্গে সন্তোষকুমারের জীবন ধর্মের আশা-আকাঙক্ষার বাসনার পরিচয় মেলে স্ত্রী নীহারিকা দেবীকে লিখছেন (২০.১১.৮৪) : 'আশাতিরিক্ত তাড়াতাড়ি সেরে উঠছি।...আশা করছি এ যাত্রা উদ্ধার পেলাম।' রোজনামচার মধ্যে যে নিরন্তর কষ্টের কথা প্রতীকে-প্রকাশে লিপিকৃত, চিঠিতে তা যেন সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন। সুবীর মিত্রকে লেখা চিঠির (৪.১১.৮৪) মধ্যে বাস্তবত অসুখের রূপ এঁকেছেন এই ভাষায় : 'চরম চিকিৎসা সত্ত্বেও রোজ চরম নিয়তির দিকে এগোচ্ছি। বড় যন্ত্রণা—গলায় বুকে। শুধু মনেই নয়। সেখানে মুক্তি।' এত যন্ত্রণার মধ্যে এই জাত-কথাকার তথা শিল্পীর বড় Consolation, আকাশের মত নির্মল প্রসারিত মুক্তির জায়গা হল তাঁর এত সব শারীরিক অব্যবস্থার মধ্যেও লেখার মধ্যে কিছু সময় ডুবে থাকা। ১০.১০.৮৪-র চিঠিটি লেখা স্ত্রী নীহারিকা দেবীকে। 'সব খারাপের মধ্যে একটা ভালো এই যে, ফাঁক পেলেই ফের কিছু না কিছু লিখছি।'

আশা-নিরাশায় দ্বন্দ্বের ছবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে মেলে : 'এ যাত্রায় যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ল, আশা করছি, চিকিৎসা ব্যবস্থার দাক্ষিণ্যে।' ছোট মেয়ে মিলিকে জানাচ্ছেন তাঁর স্থির আত্মবিশ্বাসের কথা (১০.১১.৮৪) : 'সারাদিন অনেক লিখি—...মন মজবুত। যেমন বরাবর।' চিঠিগুলিতে রোগের কথা, বর্ণনা কম, মনের কথা বেশি, বেশি মেজাজের কথাও। বুদ্ধদেব গুহ ও টিটোকে লেখা চিঠিতে সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর রোজনামচা লেখার কথায় বলেছেন : 'একটা ডায়েরি রাখছি, দৈনন্দিন অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির।'

কথার মধ্যে শব্দগুলির আপেক্ষিক ভার ও গুরুত্ব লক্ষ করার মত। প্রতিদিনের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি—অবশ্যই একজন লেখকের পক্ষে বড় সংগ্রহ, বড় উপকরণ। রোজনামচায় তাকে একেবারে অকুণ্ঠ স্বভাবে, ভাবনায় ও যন্ত্রণায় এঁকেছেন। সেখানে বেদনা রূপ পেয়েছে দর্শনে। চিঠিতে লেখক একেবারে সরলপ্রাণ, শ্বেতপত্রের মত সাংসারিক, আত্মীয় ও বন্ধু-ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাবনায় ভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ, রোজনামচা যদি মুক্তির—মানস ও আত্মিক মুক্তির রক্তরঞ্জিত দলিল হয়, তবে চিঠিগুলি সেই হৃদয়ের ডালা খুলে, আবরণ উন্মোচন করে এক বুভুক্ষু সংসারী জীবনপ্রেমী মানুষের মূল্যবান সংগৃহীত মণিরত্ন। চিঠিতে অসুখের কথা বলে চিঠির প্রাপকদের ব্যতিব্যস্ত করেননি, করতে চাননি। অনেক কাছের হয়েছেন। রোজনামচা যদি জীবন-মৃত্যুর দার্শনিক দলিল হয়, চিঠিপত্র হল মনের, হৃদয়ের মণিকোঠায় জমে থাকা হাসি-অশ্রুর চলমান চালচিত্র। চিঠিগুলি হল রোগগ্রস্ত সন্তোষকুমারের নতুন চলার পথের ভূমিকা, রোজনামচা চলার বন্ধুর পথের ব্যাখ্যা, গন্তব্যের স্বরূপ ভাবনার সৃজন-স্বভাবী তমসুক, ইহলোক-পরলোকের মধ্যস্বত্বভোগী অসীম রহস্য!



সপরিবারে স্ত্রী নীহারিকা ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ,
একমাত্র পুত্র সায়ন্তন (টিটো), কনিষ্ঠা কন্যা কাকলি (মিলু)

দ্বিতীয় ভাগ

ক্রোড়পত্র

১. ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব

২. ব্যতিক্রমী কথাকার

৩. পথিকৃৎ সাংবাদিক

প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ পরলোকে

(আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদন)

স্টাফ রিপোর্টার : খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় উল্টোডাঙ্গায় তাঁর নিজের বাড়িতে মারা গিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫। এদিন রাতে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন তাঁর আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুবর্গ ছাড়াও আরও অসংখ্য অনুরাগী। সন্তোষকুমার ঘোষের স্ত্রী, তিন মেয়ে, এক ছেলে ও নাতিনাতনীরা বর্তমান।

গত কয়েকমাস ধরেই সন্তোষবাবু ক্যান্সারে ভুগছিলেন। প্রথমে কলকাতায়, তারপর বোম্বাইয়ে এবং তারপর ফিরে আবার এই শহরেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ডাক্তারদের পরামর্শমতো তাঁকে কয়েকদিন আগে নিজের বাড়িতে এনে রাখা হয়। খুব সম্প্রতিই সেই বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হয়েছিল। আত্মীয়-পরিবৃত হয়ে সেখানেই তিনি মারা গেলেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ রবীন্দ্র-উত্তর এবং বিশেষত কল্লোল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের এক পুরোধা পুরুষ ছিলেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা, সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তাঁর প্রতিভার যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথে ছিল তাঁর অশেষ আগ্রহ, তীব্র সংরাগ। সন্তোষকুমারের সাহিত্যবোধ শেষপর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে যায়নি, শেষপর্বের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও দিনলিপিতে যার পরিচয় ছত্রে ছত্রে।

সাহিত্যে যদি তিনি মহীরুহ, সাংবাদিকতায় তিনি প্রবাদপুরুষ। আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা সাংবাদিকতায় নব্যযুগের প্রবর্তক তিনিই, সংবাদ-পরিবেশনের সর্বক্ষেত্রে তিনিই আধুনিকতার জনক। আজকের সংবাদপত্র জগতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাঁরা নেতৃপদে রয়েছেন, সকলেই তাঁর ছাত্র, শিক্ষানবীশ। কি বাণিজ্যিক সাফল্যে, কি উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে, সবেতেই সন্তোষকুমার ছিলেন অগ্রণী। বাংলা বানানের সংস্কারকল্পে তাঁর যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছিল, তাও আজ সর্বজন বিদিত। সন্তোষকুমার ঘোষ মৃত্যুকে নিশ্চিত আসতে দেখেছিলেন।

তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন, বুদ্ধদেব বসুর একটি লেখা পড়ার পরে তাঁর মনে ধারণা হয়েছিল, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হবেন। বিস্তর সিগারেট এবং পান খেতেন। শেষের দিকে সিগারেট ছেড়েছিলেন, পান ছিল। তারপর একদিন হঠাৎ গলায় কাঁটা ফোটার ব্যথা, ডাক্তারি পরীক্ষা এবং ব্যাধিনির্ণয়।

মৃত্যু ও দ্বন্দ্বের অনুভব সন্তোষকুমার ঘোষের মনে সর্বদাই ওতপ্রোত জড়িত ছিল, কিন্তু মুদ্রার উল্টোপিঠে তিনি প্রচণ্ড জীবনবিলাসী ছিলেন। তাঁর সেই বাকচাতুর্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শেষ মুহূর্তেও অপহৃত হয়নি। কথা বলতে অসুবিধা ছিল রোগের কারণে, কিন্তু খাতায় লিখে লিখেই কথোপকথন চালিয়েছেন তাঁর বন্ধু ও অনুজপ্রতিম সাহিত্যিকদের সঙ্গে। খবরের কাগজ পড়াও ছাড়েননি, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর দিনে তাঁর সংবাদবোধ দেখে বম্বের ব্রিচক্যাণ্ডি হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা বিস্মিত হয়েছিলেন।

সোমবার রাতে সন্তোষবাবু হঠাৎ খুব অসুস্থ বোধ করেন। বিছানার পাশে ঘণ্টা ছিল, বারবার বাজিয়েছেন। সকালে অবস্থা খারাপ হয়, পৌনে এগারোটার সামান্য পরই সব শেষ। ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে ঠোঁটচাপা সেই মুখ তখনও অম্লান।

খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র লোকজন আসতে শুরু করেন। অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, তৃপ্তি মিত্র, শাঁওলী মিত্র, মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্রসচিব রথীন সেনগুপ্ত আসেন, আসেন রমাপদ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, অনিল ভট্টাচার্য প্রমুখ। যে বিধানচন্দ্র কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির মধ্যে সন্তোষবাবু বাড়ি কিনেছিলেন তার উদ্বোধনের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পতাকা তোলা হয়েছিল, মৃত্যুর খবরে তা অর্ধনমিত হয়। বিকেলে মৃতদেহ নিয়ে বেরোনো হয়। মালায় ও পুষ্পস্তবকে ঢেকে দেওয়া হয় শরীর, পাশে তাঁর প্রিয় গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি খণ্ড, একটি 'দেশ' পত্রিকা। আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের একটি লরিতে করে শোকযাত্রা বেরোয়। আমহার্স্ট স্ট্রিট হয়ে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া, তারপর সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ফি জমা দিতে না পারায় যেখান থেকে তাঁর এম এ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লরি ঢোকেনি, পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে সেই আনন্দবাজার অফিস, তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশটাই যেখানে অতিবাহিত। অফিসে এবং তার আগে আনন্দ পাবলিশার্সের সামনে লরি থামে, শ্রদ্ধা জানান অনুরাগীরা।

তারপর আর এন মুখার্জি রোড, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, রেড রোড, হরিশ মুখার্জি রোড, কালীঘাট রোড হয়ে কেওড়াতলা। পথে পথে অসংখ্য গুণগ্রাহী পথচারী, শ্মশানেও লোকারণ্য। বাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ছাড়াও এসেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ সেনগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, বাণী ঠাকুর, সিদ্ধেশ্বর সেন, প্রদীপ ঘোষ প্রভৃতি। রাজ্য সরকারের তরফে মালা দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ডিরেক্টর প্রীতীন ভট্টাচার্য। সন্তোষকুমার ঘোষ রবীন্দ্রসংগীত বড় ভালবাসতেন, কেওড়াতলায় তাঁকে ঘিরে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়। বাড়িতেও রবীন্দ্রসংগীত হয়েছে সারাদিন। সন্তোষকুমার ঘোষ বিস্তর দেশ ঘুরেছেন, দেশের মধ্যেও এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত তাঁর দেখা ছিল। কাজ করেছেন – আনন্দবাজারের আগে–বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, অসংখ্য মানুষ দেখেছেন। নিজের সম্বন্ধে নিজেই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, চারপাশের এই মানুষজনই তাঁর লেখায় ভিড় করে এসেছে। কিনু গোয়ালার গলি, নানা রঙের দিন, এবং

তাঁর বিবিধ গল্পগ্রন্থে এই মানুষরাই জমায়েত। আবার, সন্তোষকুমার নিজেই লিখছেন, শেষপর্বে অন্য বাঁক এসেছে। শুধুই স্বীকারোক্তি, আত্মব্যবচ্ছেদ। এই পর্বেই আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে, এই পর্বেই জল দাও। দ্বিতীয় এক জীবন যে আর মিলবে না, সেই যন্ত্রণার উপলব্ধি এই পর্বেই।

স্মৃতি, শ্রদ্ধা : সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যুর খবর পেয়ে সত্যজিৎ রায় বলেন, আমি সন্তোষবাবুর লেখা পড়েছি, তাঁর লেখা ছোটগল্প আমার খুব ভাল লাগে। তাঁর সঙ্গে মৌখিক পরিচয়ের সুযোগ বেশি হয়নি, লেখার মধ্য দিয়েই পরিচয়। খুবই আক্ষেপ, তিনি চলে গেলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, এটা আমার ভ্রাতৃশোক। এই আশি বছর বয়সেও এই শোক আমাকে পেতে হল। পঞ্চাশ বছর ধরে সন্তোষকে আমি জানি। ও একটা খাঁটি মানুষ ছিল। অর্কেস্ট্রার নানান সুর মেলানো ছিল ওর জীবন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, সন্তোষ আমার খুব বন্ধু ছিল। ৩৬-৩৭ সালে স্কুল ছেড়ে বেরোবার পর ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমরা একসঙ্গে সাহিত্যচর্চা করেছি। ভবানীপুরে কল্যাণসংঘ তৈরি করে সাহিত্যসভা করেছি। সন্তোষ সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং এক অসাধারণ রবীন্দ্রবিদ। প্রাণবন্ত লোক, ওর আকস্মিক মৃত্যুতে বিরাট ক্ষতি হল, আমরা এক বড় মাপের মানুষকে হারালাম।

শম্ভু মিত্র বলেন, সন্তোষবাবুর মৃত্যু আমার পক্ষে এক ব্যক্তিগত ক্ষতি। উনি যখন দিল্লিতে হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড কাগজে, তখন থেকে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওঁকে খুব জটিল চরিত্রের লোক বলে মনে হত। উনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু আমাদের সম্পর্কের একটা ভিত্তি ছিল রসিকতা। আজ সেসব ভেবে দুঃখ হচ্ছে।

সাগরময় ঘোষ বলেন, সন্তোষ ঘোষ আমার দীর্ঘকালের বন্ধু, আমাদের সম্পর্ক ছিল আত্মীয়ের চেয়েও বেশি। উনি বড় মাপের সাহিত্যিক, বড় মাপের হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। এরকম মানুষ আমার জীবনে বিশেষ দেখিনি।

সুচিত্রা মিত্র টেলিফোন ধরে কিছু বলতেই পারেননি। শেষে ধরা গলায় বলেন, সন্তোষ চলে যাবে জানতাম। কিন্তু এভাবে এত তাড়াতাড়ি যাবে বুঝিনি। আজ আর কিছু বলতে পারছি না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, সন্তোষ বঙ্গবাসী কলেজে আমার প্রথম বছরের ছাত্র। সে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ত। তখন থেকেই তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সহৃদয় সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি। তার মতো প্রতিভাধর ছাত্র পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

মন্মথ রায় বলেন, অতি ক্ষুদ্র সংবাদপত্র থেকে অতিবৃহৎ সংবাদপত্রের সংগঠন ও সম্পাদকীয় দায়দায়িত্বে অংশগ্রহণে বিস্ময়কর উত্তরণই সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের পরিচয়। সন্তোষবাবুর রচনাভঙ্গি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল।

শ্রদ্ধাঞ্জলি : আনন্দবাজার অফিসের সামনে শোকযাত্রা এসে পৌঁছলে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক অভীককুমার সরকারের পক্ষে মালা দেওয়া হয়। মালা দেন আনন্দবাজার পত্রিকা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাণ্ড দেশ এমপ্লয়িজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, আনন্দবাজার ড্রামাটিক পারফরমেন্স কমিটি, আনন্দবাজার সাংবাদিক অসাংবাদিক যুক্ত কমিটি, আনন্দবাজার গ্রুপ অব পাবলিকেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, আনন্দবাজার গ্রুপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, নিউজপেপার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (পঃ বঃ), পি টি এস বিভাগ, আনন্দবাজার সংস্থা, আনন্দলোক, আনন্দবাজার পত্রিকা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ জার্নালিস্টস ইউনিয়ন, আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাব, বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, আনন্দবাজার পত্রিকা (সার্কুলেশন বিভাগ), আনন্দবাজার পত্রিকা (সানডে বিভাগ), আনন্দবাজার পত্রিকা (সিকিউরিটি বিভাগ), দেশ সাপ্তাহিক, আনন্দবাজার পত্রিকা (স্টোর বিভাগ), ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস, আই জে এ আনন্দবাজার গ্রুপ ইউনিটি কমিটি, আনন্দবাজার (লাইব্রেরি), ইত্যাদি প্রকাশনী, বর্তমান, চতুরঙ্গ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রেস ক্লাব, ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাব, ভেটারেন জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অব ইণ্ডিয়া, ফটোগ্রাফার্স ইউনিয়ন, কিশোর কল্যাণ পরিষদ, পর্বত অভিযাত্রী সংঘ, এস এ অ্যাডভার্টাইজিং এবং বিধানচন্দ্র কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি। আনন্দবাজার পত্রিকার দিল্লি অফিসে এক শোকসভা পালিত হয়, বক্তব্য রাখেন রণজিৎ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমরেশ মজুমদার।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
১৪ ফাল্গুন ১৩৯১

সন্তোষকুমার ঘোষ

১৯২০-১৯৮৫

গতকাল বেলা চারটে নাগাদ খবর এল ক্রিকেটে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছে ভারত। কিন্তু বুঝিবা সামান্য কয়েক ঘণ্টার মতো দেরি হয়ে গেল। তাঁর রোগশয্যায়ও এ ধরনের উত্তেজনায় খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন যে সন্তোষকুমার ঘোষ তিনি বেলা এগারোটার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাহিত্য থেকে সঙ্গীত, রাজনীতি থেকে রাজ কাপুর, রবীন্দ্রনাথ থেকে রবি শাস্ত্রী হেন বিষয় কিংবা ব্যক্তিত্ব নেই যা সন্তোষকুমারের কৌতূহল কি আগ্রহ এড়িয়ে যেতে পারত। বড় মাপের লেখক এবং বাংলা সাংবাদিকতার এক পুরোধা পুরুষ সন্তোষকুমার তাঁর রোগশয্যায় বালিশে হেলান দিয়ে বসেও গল্প লিখেছেন, সংবাদপত্রের প্রবন্ধের তারিফে পত্র রচনা করেছেন। জীবনের শেষ দিন অবধি থেকে যেতে পেরেছেন তাঁর এই প্রিয় দুই শাস্ত্রের প্রতি সমান অনুগত। বাংলা সাহিত্যে যিনি একটা আধুনিক লিখন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিরই উদ্ভাবন করলেন, বাংলা সংবাদপত্র ধর্মকে এক নতুন খাতে বইয়ে দিলেন সেই মানুষটি কিন্তু উঠে এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ফরিদপুর জেলার এক স্বল্পখ্যাত গ্রাম রাজবাড়ি থেকে। ১৯২০ সনের ৯ সেপ্টেম্বর বাইরি নামের ওই ছোট্ট গ্রামটিতে সন্তোষকুমারের জন্ম। সেই গ্রামেরই গোয়ালন্দ হাই স্কুল থেকে তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ১৯৩৬-এ। এর পরে পরেই কলকাতায় পাড়ি। ১৯৪০ সনে রিপন কলেজ থেকে ডিস্টিঙ্কসন নিয়ে বি এ পাশ করলেন এবং তার পরের বছর ২২শে শ্রাবণে শহরের রাস্তার ভিড়ে দাঁড়িয়ে অন্যের কাঁধের ওপর থেকে ঝুঁকে পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি উচ্চতার সন্তোষকুমার দেখলেন রবীন্দ্রনাথের শবযাত্রা। এই তাঁর কবিকে প্রথম এবং শেষ দেখা। কিন্তু এরপর বাকি তেতাল্লিশ বছর ধরে তাঁকে নানাভাবে ও ভঙ্গিতে, দুঃখ ও সুখে, লেখায় রেখায় সঙ্গীতে অনুসরণ করে গেছেন সন্তোষকুমার, তাই নিয়ে অকাতরে, প্রাণের প্রেরণায়, অক্লান্ত লিখে গেছেন, এবং এক সময় গর্ব ও স্ফূর্তির সঙ্গে নিজেকে রবীন্দ্রভক্ত হিসেবে ঘোষণা করতেন।

সন্তোষকুমারের সাহিত্যকর্মের সূত্রপাত ছাত্রাবস্থায় এবং তাঁর প্রথম গল্পটি যখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছেপে বেরুলো, তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল। এর কিছুকাল পর তাঁর ও সমবয়সী বন্ধু জগৎ দাসের সম্মিলিত গল্পগ্রন্থ 'ভগ্নাংশ' প্রকাশিত হল। সন্তোষকুমারের আরও দুটি স্মরণীয়, চিরস্থায়ী বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে থাকল যা আর আজ

বাঙালি পাঠকসমাজে কোনও নতুন খবর নয়। সন্তোষকুমারের এই এক বন্ধু গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অপরজন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সন্তোষকুমারের খ্যাতির সূত্রপাত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নানা রঙের দিন' থেকে। এই লেখায় শুধু একজন নতুন লেখকই নন একটা নতুন রচনাশৈলীই অবতীর্ণ হল বাংলা সাহিত্যে। উপন্যাসের প্রথা থেকে আরও বহু কদম সরে গিয়ে এরপর সন্তোষকুমার লিখলেন 'কিনু গোয়ালার গলি'। এর নামটুকুই শুধু রবীন্দ্রনাথ থেকে নেওয়া, এর বিষয় চরিত্র ও চারিত্র্য সবই তাঁর নিজের জীবন খুঁড়ে পাওয়া। আলাদা হতে হতে ক্রমশ একক ও স্বতন্ত্র ছিলেন সন্তোষকুমার এবং সাহিত্য বিচারকরা কোনও দিন স্থির করবেন, হয়তো কখনও, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনন্যও হতে পেরেছিলেন সন্তোষকুমার। খুবই তরুণ বয়সে লেখা 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ'-এ। কয়েক দশক ধরে একেবারে নিজস্ব ঢং-এ অসাধারণ সব ছোট গল্প লিখে গেছেন সন্তোষকুমার। গল্পের ক্ষেত্রে অন্তত কয়েক প্রজন্মের লেখকের কাছে সন্তোষকুমার ছিলেন সমসাময়িক লেখক। শুধু অত্যাধুনিক গল্প লিখেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি, যাবতীয় নতুন লেখা গোগ্রাসে পড়ে তৎক্ষণাৎ যেনতেন প্রকারেণ সংশ্লিষ্ট লেখকটিকে যোগাযোগ করে নিজের মত বা উচ্ছ্বাস জানিয়ে দিয়েছেন। মুদ্রিত হরফ সন্তোষকুমারকে সম্মোহিত করত। বই পড়াকে প্রায় একটা প্রাত্যহিক আচারে উন্নীত করেছিলেন এই বহুপঠিত লেখকটি। জটিল, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের লেখক সন্তোষকুমার সারাটা জীবন শুধু নিজেকে বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ করে লিখে গেছেন। নিজেকে ভালবাসা আর নিজেকে তিরস্কার করা দুই-ই ছিল তাঁর রীতি। আত্মজীবনীমূলক লিখতে লিখতে অবশেষে ষাটের দশকের অন্তে তিনি হাত দিলেন একটি স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে—'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যখন 'শেষ নমস্কার' তখনই অনেকের ধারণা হয়েছিল যে এই রচনা তাঁর জীবনের এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ১৯৭৩-এ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেল বইটি। সন্তোষকুমারের আর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জল দাও' এবং 'সময়, আমার সময়'। তাঁর লেখা একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত।

সন্তোষকুমারের একটা ক্ষোভই ছিল যে সাংবাদিক হিসেবে তাঁর প্রকাণ্ড খ্যাতি তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়কে কিছুটা বিব্রত, কিছুটা ম্লান করেছে। আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়। পাঠকসমাজ বরাবরই বিস্ময়ের সঙ্গেই অনুসরণ করেছে এই সব্যসাচী প্রতিভার কীর্তিকলাপ। ১৯৫৮ সনে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হিসেবে বাংলা সাংবাদিকতায় নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন সন্তোষকুমার। তিনি সংবাদপত্রের চেহারা বদলে ছিলেন, ছাঁচ বদলে ছিলেন, ভাষা বদলে ছিলেন, সংবাদ পরিবেশনের প্রকার ও প্রকৃতি বদলে ছিলেন, এবং এই ব্যাপক বিপ্লবের মাধ্যমে পাঠকরুচিকেও বদলে ফেলেছিলেন অনেকখানি। এই সজাগ, রূপান্তরিত পাঠকরুচির প্রতিফলন ঘটল আনন্দবাজার পত্রিকার নবলব্ধ, উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তায়। সংবাদপত্র মহলে অন্তত এক ধরনের

'কালট্' হয়ে উঠলেন সন্তোষকুমার ঘোষ।

সন্তোষকুমারের সাংবাদিক জীবনের শুরু ১৯৪২-এ 'যুগান্তর' পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে। এরপর বাংলা ও ইংরেজি আধ ডজন পত্রিকায় কাজ করেছেন তিনি। যার মধ্যে আছে 'স্টেটসম্যান', 'মর্নিং নিউজ', 'দ্য নেশন', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক।

সংবাদ সৃষ্টির পাশাপাশি বহু সাংবাদিকও সৃষ্টি করেছিলেন সন্তোষকুমার। বড় বড় ঘটনা ঘটলে মধ্যরাত অবধি পরিশ্রম করে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিতেন আপিস ঘরের ইজিচেয়ারে। ইজিচেয়ারের এহেন জীবনটি যে খুব 'ইজি' নয় তা সাংবাদিক মাত্রেই জানেন। অথচ সংবাদের নেশায় সংবাদপত্রকে তাঁর ঘর বানিয়েছিলেন সন্তোষকুমার। তাঁর সহকর্মীদের স্মৃতি আছে বাকি রাত কীভাবে অনর্গল কথা বলে (আর কী অসাধারণ কথাই না বলতে পারতেন মানুষটি ; যাকে বলা চলে সিনটিলেটিং কনভার্সেশন) কাটিয়ে দিতেন তিনি। তাঁর সহকর্মী, অনুরাগী, বন্ধু ও পরিচিতজনের কাছে সন্তোষকুমারের স্মৃতি মানেই একরাশ স্বতঃস্ফূর্ত, রসময়, বুদ্ধিদীপ্ত, অবিস্মরণীয় কথা। সময় সময় সন্তোষকুমার লিখিত বাক্যের মতন নিটোল, কৌশলী গদ্য বলে যেতেন একনাগাড়ে। কোনও বৈঠকে বা আসরে সন্তোষকুমার উপস্থিত থাকলে বাকিরা স্বেচ্ছায় হয়ে পড়তেন শ্রোতা। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তাঁর কণ্ঠনালীর অপারেশন হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলায় মেতে উঠতেন তিনি, নৈঃশব্দকে সেভাবে কখনও মেনে নেননি।

তবে শব্দেরও আরেকটি স্তরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন সন্তোষকুমার, সে স্তর সঙ্গীতের স্তর। রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি প্রেমিকার মতন আঁকড়ে ধরেছিলেন বরাবর। কয়েকশো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঞ্চারী অবধি গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। গানের ক্ষেত্রেও সুর নয় কবির কথাই তাঁকে মুগ্ধ করত বেশি। হেমন্ত, কণিকা, সুচিত্রা, সুবিনয়, নীলিমা, ঋতু, পূর্বা, গীতা, অর্ঘ্য সবারই প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ অনুরাগ। শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের প্রতিও যাঁর গান বিষয়ে এক বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি এক দশক পূর্বে। কিন্তু দেবব্রতর মতন সন্তোষকুমারও ছিলেন সমস্ত বিতর্কের ওপরে, এক অমলিন সরলতা ও মালিন্যহীন মানুষ। কতই তো তর্ক ও বিরোধে নেমেছেন সন্তোষকুমার মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা, ভালবাসা, অনুরাগের কোনও সম্পর্কেই কিন্তু চিড় ধরেনি কখনও। সন্তোষকুমারকে জানলে তাঁকে ভাল না বেসে উপায় ছিল না।

কাজের সূত্রে দেশে ও বিদেশে বহু ঘুরেছিলেন সন্তোষকুমার। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, বর্মা সবই তাঁর ঘোরা। কিন্তু সব চেয়ে আরাম পেতেন শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ কিংবা একেবারে আধুনিক কোনও লেখকের বই হাতে নিয়ে একই সঙ্গে বইয়ের ও বাস্তবের পরিবেশে

ডুবে যেতে। বিদেশী লেখকদের মধ্যে কামু, হাক্সলি, সলঝেনিৎসিন এবং একেবারে শেষ দিকে ক্রিস্টোফার ঈশারউড হয়েছিলেন তাঁর প্রিয়। ঈশারউডের 'দা গুরু অ্যাণ্ড আই' বইটি পড়ে মুগ্ধ সন্তোষকুমার সেটির একটি রাজসিক সমালোচনা লিখেছিলেন ক'বছর আগে। শেষ জীবনে ক্রমাগত তিনি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা এবং স্বামীজির। বিশেষত শ্রীমায়ের। স্বভাবত অভিমানী মানুষটি সব অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রীমা সংক্রান্ত লেখা পড়তেন এবং আলোচনা করতেন। এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে একবার ডেকে বলেছিলেন, দেখো, আমি পাঁকে শুয়ে আছি ঠিকই পঙ্কজের মতন, কিন্তু আমার নজর ঊর্ধ্বে সূর্যের দিকে।

এই সূর্যমুখী মানুষটির বিদায়ে আজ অসংখ্য, অগণিত মানুষ অশ্রুপাত করেছেন। তিনি রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী নীহারকণা, এক পুত্র, তিন কন্যা এবং তিন জামাতাকে।

[২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে গৃহীত]

মায়ের চোখে বাবা

কাকলি (ঘোষ) চক্রবর্তী

[প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষের সহধর্মিণী শ্রীমতী নীহারিকা ঘোষকে পক্ষিরাজ পত্রিকার পক্ষ থেকে ইন্টারভিউ করা হয়। উনি কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাননি, তাই প্রশ্নগুলো ওঁর ছোট মেয়েই করেছেন।]

প্রঃ—মা—তোমাদের কীভাবে বিয়ে হয়েছিল? সম্বন্ধ করে বিয়ে, না পছন্দ করে?

উঃ—আমাদের সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছিল। তবে তোর বাবাই প্রথমে আমাকে দেখে পছন্দ করেন, তারপর সম্বন্ধ হয়। আমি সে-সময় কলকাতায় আমার মামার বাড়িতে ছিলাম। সেখানে আমার এক মাসিকে পৌঁছুতে উনি এসেছিলেন। আমি তখন স্নান করে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরে ঢুকি। আমাকে দেখে ওঁর পছন্দ হয়। বাড়ি গিয়ে মাকে বলেন ও বাড়িতে মেয়ে আছে সম্বন্ধ করতে পার।

তারপর আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে দেখানো হয়। সেখানে আমিও ওঁকে দেখি। সেদিন উনি আমার হাত থেকে একটা সন্দেশ ভেঙে খেয়েছিলেন। তারপর ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি (২৪ মাঘ) আমাদের বিয়ে হয়।

প্রঃ—তখন বাবা কোথায় কাজ করতেন? বিখ্যাত হয়েছিলেন কি? তুমি কি তার আগে বাবার নাম শুনেছিলে?

উঃ—তখন উনি মর্নিং নিউজ-এ কাজ করতেন। কিন্তু আমার বিয়ের দশদিন পরেই জয়হিন্দ পত্রিকায় আর একটা কাজ পেয়েছিলেন। দু'টোতেই একসঙ্গে কাজ করতেন। তখন থেকেই বিখ্যাত হতে শুরু করেছিলেন। আমরা বিহারে থাকতাম। তাও কলকাতায় এসে ওঁর নাম শুনেছি। গল্পও পড়েছিলাম।

প্রঃ—শিল্পী হিসাবে তো তাঁকে আগেই জানতে, কিন্তু বিয়ের পর মানুষ হিসেবে বাবাকে কেমন মনে হল?

উঃ—ওরকম মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি। তখন আমাদের অভাবের সংসার ছিল। উনি সংসারের বাজার করা ইত্যাদি অনেক কাজ করতেন। তোরা যেমন দেখেছিস তেমন নয়। তার মধ্যেই বুঝতে পারতাম ওঁর মনটা খুব বড়। দোকানে কিছু কিনতে গেলে নিজের সাধ্যের কথাটা মনে রাখতে পারতেন না। আমার বাবার মৃত্যুর পর, অনেক ভাইবোন নিয়ে মা আর্থিক দিক থেকে খুব অসহায় হয়ে পড়েন। উনি ওঁর স্বল্প আয়ের একটা বড় অংশ আমার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। 'ওদের সাহায্য করো'

—এটা আমাকে মুখ ফুটে কখনও বলতে হয়নি। বছরের পর বছর এমনই চলেছিল।

প্রঃ—গৃহকর্তা হিসেবে, তোমার ছেলেমেয়েদের বাবা হিসেবে বাবাকে কেমন লাগত?

উঃ—এমনিতে উনি সংসারে বিশেষ মন দিতে পারতেন না। ছেলেমেয়েরা কে কোন ক্লাসে পড়ে তাও ঠিকমত জানতেন না। এসব আমাকেই সামলাতে হত। কিন্তু তার জন্য আমার কোনও রাগ হত না। কারণ উনি অত কাজের মধ্যেও হঠাৎ-হঠাৎ আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। কোথায় যাচ্ছি আমরা জানতে পারতাম না। উনি একা আনন্দ করতে ভালবাসতেন না। বিদেশে একা যেতে হত বলে বহুবার সময় সংক্ষেপ করে ফিরে এসেছেন।

প্রঃ—বাবা এতবার বিদেশে গেছেন, কিন্তু তোমার একবারও যাওয়া হয়নি। এজন্য তোমার কি কোনও দুঃখ আছে?

উঃ—না, সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। প্রথম দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার মত জমানো টাকা আমাদের ছিল না। কিন্তু শেষবার উনি যখন আমেরিকা যান, গিয়ে দেখেন ওখানে আমার জন্যও ব্যবস্থা আছে, অথচ বোঝার ভুলে এখান থেকে সেকথা ওঁকে জানানো হয়নি। ওখানে পৌঁছে এজন্য উনি খুব দুঃখ করে চিঠি লিখেছিলেন।

প্রঃ—তুমি কীভাবে এখন দিন কাটাও?

উঃ—আমার আর দিন কাটানোর কী আছে—আমার জীবনে আর তো কিছু কখনও ঘটবে না। এখন শুধু ভাবনা ছাড়া আমার আর কী করার আছে? শুধু ভাবি এতদিন উনি কখন বাড়ি ফিরবেন বলে অপেক্ষা করে থাকতাম, আর এখন অপেক্ষা করে আছি কবে আমি তাঁর কাছে যাব। আমার জীবনটা এখন শুধুই অপেক্ষার।

শতাব্দীর চরিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সন্তোষকুমার ঘোষ অর্থাৎ সন্তোষ আমার ছোটভাইয়ের মত। ওর সম্পর্কে বলা বা লেখার তো অনেক আছে। কিন্তু কী বলি, কী লিখি?

আসলে, আজকের এই যে বিংশ শতাব্দী, এই শতাব্দীর যে চরিত্র, যে মেজাজ—সবটাই যেন ওতে ধরা পড়েছে। যেন পার্সোনিফায়েড টুয়েন্টিয় সেঞ্চুরি। বিংশ শতাব্দী যদি একটি চরিত্র হয়, তাহলে তার যে প্রচণ্ড জীবন পিপাসা আর অতল অক্লান্ত জীবন জিজ্ঞাসা—নির্ভীক জীবন জিজ্ঞাসা, সেই জীবন জিজ্ঞাসার সমস্ত আকৃতি ওর চরিত্রে ও যেভাবে জীবনকে জানতে চেয়েছে তার তুলনা কই।

সন্তোষ-এর কোনও দেশকাল ছিল না। ও যে বাংলাদেশে জন্মেছে আমি তা কখনো ভাবিনি। যখন ওর কথা ভাবি তখন শুধু এইটেই আমার মনের মধ্যে খেলা করে যে আজকে এই বাংলাদেশে শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীতে এরই টাইপের মানুষ, তা সে যুবকই হোক আর ওর মত পরিণতই হোক—সব জায়গায় আজকের সময়ের সঙ্গে ঝুলছে, এই সময়কে বুঝবার চেষ্টা করছে। এই যে বিংশ শতাব্দীর প্রতিভাবান মানুষ সব, এদের অনেক পড়াশুনো, অনেক অনেক লেখা, অনেক তাদের ভিতরের গভীর উপলব্ধি। তবু এইসব সামর্থ্য নিয়েও তাঁদের ভিতরে গভীর অতৃপ্তি আর অস্থিরতা (অনেকটা যেন পরমাণু বোমার যেমন শক্তি তেমনি বিধ্বংসী ও সংগঠক) নিয়ে এরা দিনপাত করছে। সন্তোষও তাই করেছে।

এখনকার যাঁরা মানুষ, সন্তোষের মত মানুষ, তাঁরা কিছু খুঁজছে—যে খোঁজার মধ্যে হতাশা আছে, ব্যর্থতা আছে, তবু সেই খোঁজার শেষ নেই। নির্ভীক সেই সন্ধান। এই নির্ভীক সন্ধানও সন্তোষের সমস্ত সত্তায়। এই যে আশ্চর্য বিংশ শতাব্দী যেটা ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে—এই শতাব্দীর বাকি সময়টুকু সন্তোষের শেষ করে যাবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ করতে পারল না। তার ক'বছর আগেই চলে গেল। পনেরোটা বছর ওর কাছে কিছুই ছিল না। এখন তো ৬৫ আর পনেরো হলেই আশি হত।

ওকে দেখতে হয় একটু অন্যভাবে। অনেকের অনেক রকম ক্ষমতা থাকে। ও ভাল লেখে ও খারাপ লেখে, ওর গদ্য ভাল কিংবা ও কবিতা লেখে—এ সমস্তই আমরা সাহিত্যিকদের বলি, কিন্তু ওকে এমনভাবে বলা যায় না। ও যেন এই যুগে একটা অসম্ভব প্রাণস্ফুলিঙ্গ। না, ঠিক ভাষায় বলা যাচ্ছে না। আসলে ও যে সবদিকেই কাজ করেছে।

ও সাংবাদিকতা করেছে আবার সাহিত্যও রচনা করেছে। সাংবাদিকতা আর সাহিত্য দু'টো দিক—দু'টোকেই সাধারণ মানুষ আলাদা আলাদা করে দেখে। আবার একধরনের সাহিত্য আর সাংবাদিকতা আছে যাকে কোনওভাবেই ভাগ করা যায় না। সাংবাদিকতা মানেই সমস্ত বিশ্বের। গল্প লেখার সময় গল্পকার মানুষ নিয়ে, সমাজ নিয়ে লিখছে। আর সাংবাদিক সংবাদ লিখছে সমস্ত বিশ্বকে নিয়ে। ওর মধ্যে সাংবাদিকতার চূড়ান্ত সিদ্ধি যেমন ছিল তেমনি ছিল সাহিত্যিক গুণ। ওর সাংবাদিকতা আর সাহিত্য একই সঙ্গে মেশানো। মনের ভিতরে বিশ্বকে খোঁজা—যাকে আমি সন্ধানই বলব। সেই সন্ধানেরই প্রকাশ ছিল ওঁর সাংবাদিকতা। একটা কথা আমাকে বলতেই হবে, ও সাংবাদিকতা না করলেও ওকে বিশ্বের অন্তর্নিহিত বস্তুকে জানতেই হত। এজন্যে বলি, আমি নিজে যেমন। আমি লিখি বটে কিন্তু আমি সব জানার চেষ্টা করি। সন্তোষও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেটাই করেছে। আবার আমি বলি, ওর কোনও দেশ ছিল না। ওর বেলায় দেশের গণ্ডি খাটত না। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বদেশের।

আজকের দিনে ওইরকম জাগ্রত একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—না, আণবিক বিস্ফোরণের বেগ বুকের মধ্যে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে যাঁরা সন্ধান করেন—ও তাদেরই একজন।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমার কাছে ও প্রথম লেখা নিয়ে আসে। ওর লেখা পড়ি। চমকে উঠি। ওর ছোটগল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বিন্দুতে সিন্ধু ব্যবহার করি। ওর লেখায় বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ। ছোটগল্প—ছোট পরিসরে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত থাকবে। কারণ বিন্দুতে সিন্ধুর মধ্যেই সত্য ফুটে ওঠে। চেখভের গল্প, মোপাসার খানিকটা কিংবা তাবড় তাবড় লেখকদের মজা হচ্ছে তাঁরা যেটুকু লেখেন তারই মধ্যে ধরে দেন নিখিল বিশ্বের সত্য। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু না থাকলে সেটা হয় না। সত্যকার ছোটগল্প যে লেখে তার লেখার একটা দু'টো চরিত্র, কি একটা ঘটনা এমন থাকে যার মধ্য দিয়ে বিশ্বভুবন ঝলসে ওঠে, জগতের প্রতিচ্ছবি পড়ে। সন্তোষের লেখার মধ্যে এই বিশ্বভুবনের প্রতিচ্ছবি। গল্পের জীবনসত্য—গল্প লেখক যেন জীবনকে স্পর্শ করছে—তা ওর লেখায় ছিল। ও যে গল্প শেষ পর্যন্ত উতরোয়নি সে গল্পেও অনুভব করা যায়, ও জীবনটাকে ছুঁয়েছিল। জীবন বলতে—অনাদি রহস্য যে অশেষ সেই জীবনের রহস্যের স্পন্দন সব লেখকের থাকে না। ওর ছিল। বেশ বেশি রকম ছিল।

গল্প লেখা নিয়ে শুরু। তারপর শুধু ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে উত্তরোত্তর। ও তখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড আর আমি অল ইন্ডিয়া রেডিওর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড অফিসের উপরে ছিল অল ইন্ডিয়া রেডিওর গেস্ট হাউস। ওখানে গিয়ে আমি থাকতুম। তখন থেকে পরিচয়ের পরিধি বাড়তে থাকে। ওর বাড়ির সঙ্গে আলাপ হয়। তারপর ওর সঙ্গে একান্ত আপনার জনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারিবারিক সম্পর্ক। ওর ছেলেমেয়ের অসুখে-বিসুখে-পড়াশুনোয় আমার পরিবার ওর খুব কাছাকাছি হয়ে যায়। একটা ঘটনার কথা মনে হচ্ছে। ওর ছেলে টিটোর ডিপথেরিয়া হল—ওই যে ডিপথেরিয়ার হাসপাতাল সেখানে কে যাবে? না আমার স্ত্রী। এইরকমই আর কী!

মাঝে একটা সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। তারপর যেন প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য সবসময় আমার কথা বলত।

আমি দেখেছি ওর মধ্যে একটা অন্যরকম শক্তি। এমনি যে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড শক্তি থাকে—তার থেকে অন্যরকম। একধরনের সাংঘাতিক শক্তি। সেই অদম্য প্রাণশক্তি ওকে সবসময় তাড়না করে ফিরেছে। ও যা করেছে তার জন্য কখনো সন্তুষ্ট হয়নি। তৃপ্ত হয়নি। ওর লেখাতেও এই অতৃপ্তি। ওর সব লেখা হয়তো মেনে নিই না। তবু তাও অন্যদের থেকে ভিন্ন ধরনের।

সাংবাদিকতা ছিল সন্তোষের জীবনের অঙ্গ। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে এসে আমার কাছেই থাকত। দিল্লির কাজ যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন একটা অস্বস্তিও ছিল ওর মধ্যে। তবু আমার কাছেই আসত। ও আমারই ছিল।

আমার এক ছোটভাই মারা গেছে। আর এক ভাই মারা গেল। সন্তোষ। সন্তোষ আমার ভায়ের চেয়েও বেশি ছিল। ওর অভিমানও ছিল তেমনি।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিক ছাড়াও আর একটা দিক ছিল ওর। খুবই ভাল দিক। রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রকাব্য—সমস্ত উপলব্ধি এবং তারই সঙ্গে তাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা—সেটা ছিল আশ্চর্য করার মত। খুব কথাও বলতে ভালবাসত। শেষকালে ওর কথা বলাই বন্ধ হয়েছিল।

দিনলিপির পাতা—যা আনন্দবাজারে বেরিয়েছে তা পড়লেও দেখি, ওর ভাবনায়, ভাষার একটা আলাদা ধারা ছিল।

দোষগুণ মানুষের অনেকরকম থাকে—এটা ঠিক কথা। কিন্তু ওর মত অসাধারণ প্রাণস্ফুলিঙ্গ আমি কখনো দেখিনি। তবে ওকে বুঝেছিলেন অশোককুমার সরকার। ওর পূর্ণ মূল্য দিয়েছিলেন অশোকবাবু। অশোকবাবুর ছেলেরাও ওকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে।

অনেক কথা বলার। মনেও আসে অনেক কথা। সবকথা বলা যায় না। বলা যায়, ও আমার নিজের চেয়ে বেশি ছিল। ওর পড়া, লেখা, ওর জীবনের সঙ্গেই জড়ানো ছিল। ওর সাংবাদিকতাও জীবন-জড়ানো। জীবনকে বোঝা—বিশ্বকে জানার একটা দারুণ আকুলতা ছড়িয়ে আছে ওর সমস্ত জীবন জুড়ে।

['বর্তমান সাপ্তাহিকী' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

সুকুমার সেন

১. সুহৃদ্ সন্তোষ

ইংরেজি "ফ্রেন্ড" শব্দের এখন বাংলা অনুবাদ চলছে 'বন্ধু'। কিন্তু "ফ্রেন্ড" শব্দের ব্যাপক দ্যোতনা বন্ধু শব্দে নেই। সে দ্যোতনা প্রকাশ করতে গেলে আমাদের ধাত্রীভাষা থেকে কমপক্ষে চারটি শব্দ নিতে হয়,—বন্ধু, মিত্র, সখা ও সুহৃদ্। বন্ধু শব্দে লেগে আছে বন্ধনের অর্থাৎ বিবাহবন্ধনের রং। মিত্র শব্দে বোঝায় কোনওরকম সহকর্মিতার অথবা সহধর্মিতার সম্পর্ক। সখা শব্দ দ্যোতনা করে সমান বয়স ও সমান ভাবনা। সুহৃদ্ শব্দটি জানিয়ে দেয় মনের মিল। সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আমার (এবং আমার মত তার অনেক অনুরাগীর) সম্পর্ক ছিল সৌহৃদ্যের। সন্তোষবাবুর মনটি ছিল খোলামেলা, তাঁর হৃদয়খানি ছিল প্রশস্ত। তাই তিনি বহুজনের মন টানতে পেরেছিলেন। আমার সঙ্গে সন্তোষবাবুর পরিচয় বেশিদিনের নয়। অনেককাল থেকেই তাঁর লেখার সঙ্গে কিছু পরিচয় ছিল, তাঁর সাংবাদিক দক্ষতার সম্বন্ধেও আমার সশ্রদ্ধবোধ ছিল। সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল প্রায় বছর পনেরো আগে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিন তাঁকে নিয়ে আমার বাড়িতে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন (সেজন্য আমি প্রেমেন্দ্রবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ)। একটু ভুল বললুম। সেদিন আমার বাড়িতে সন্তোষবাবুর সঙ্গে ঠিকমত পরিচয় হয়নি, যা হয়েছিল তা বলতে পারা যায় সাক্ষাৎকার। সন্তোষবাবু মুখ বেশি খোলেননি। তাই সেদিন তাঁর অন্তরের পরিচয় কিছু পাইনি।

সন্তোষবাবুর খাঁটি পরিচয় প্রথম পেলুম বেশ কয়েকবছর পরে। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিওর কর্তা সৌরীন্দ্রবাবু—এঁরা মিলে ফটোটাইপ প্রিন্টিং-এর সুবিধার জন্য বাংলায় যুক্তব্যঞ্জন অক্ষর কমানো যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে একটি ছোট কমিটি করেছিলেন। সেই কমিটিতে আমিও ছিলুম সন্তোষবাবুও ছিলেন। এই কমিটির একটি মিটিংয়ে আমি সন্তোষবাবুর প্রথম খাঁটি পরিচয় কিঞ্চিৎ পাই। দেখলুম লোকটি সজাগ এবং বিচক্ষণ, অনেক বিষয়ে জানবার তাঁর সজীব আগ্রহ আছে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে সন্তোষবাবুর পরিচয় পেলুম যখন আমি প্রাইমারি শিক্ষা থেকে ইংরেজি বিতাড়নের বিরুদ্ধে বাক্ ও মসীযুদ্ধে নেমে পড়েছি। এ সংগ্রামে সন্তোষবাবু খুব খেটেছিলেন। তা থেকে আমি উপলব্ধি করেছিলুম যে সন্তোষবাবুর বুদ্ধি যেমন উজ্জ্বল, বিচক্ষণতাও তেমনি তীক্ষ্ণ এবং তিনি সাংবাদিক হয়েও পোলিটিক্যাল ধান্দাবাজি বরদাস্ত করেন না।

এই সময়ের অল্পকাল পরে আমি টেগোর ইনস্টিটিউট অব কালচারে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে একটি ভাষণ দিয়েছিলুম। সেই ভাষণ শুনতে সন্তোষবাবু গিয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। আমি জানতুম না তিনি রবীন্দ্রনাথের গান এত পছন্দ করেন। আমার ভাষণের অন্তে তিনি যে কটি কথা বলেছিলেন তাতে আমি তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের গান সন্তোষবাবু এত ভালবাসেন? বুঝলুম সন্তোষবাবুর মত লোক "কোটিকে গোটিক" হয়।

তারপর সন্তোষবাবুর সঙ্গে ঘরে বাইরে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক বারেই তাঁকে আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। তার কারণ এ নয় যে তিনি আমার মতে সর্বদাই মত দিয়েছেন। তার কারণ এই যে সন্তোষবাবু সর্বদাই মনকে খোলা রেখেছেন। কখনও ঢাকেননি বা ঢাকতে চেষ্টা করেননি।

সন্তোষবাবু সভাশোভন পুরুষ ছিলেন। তাঁর গালভরা পান, হাসি মুখ, স্ফুরিত অধরের বাণী অনায়াসে সভা জমিয়ে তুলত।

সন্তোষকুমার ঘোষ আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাঁর নিবৃতি হয়েছে আনন্দে। তদ্‌ব্রহ্ম।

সংসারমরুকান্তারখেদক্লিষ্টাং দিবং গতম্।
পুষ্ণন্তু মানসে সন্তঃ সন্তোষং স্নিগ্ধসৌহৃদাঃ।।

২. সন্তোষ স্মৃতি

সন্তোষকুমার ঘোষের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল কিন্তু তাঁকে কখনো দেখিনি। প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল প্রায় বিশ বছর আগে। প্রেমেন্দ্রবাবু একদিন তাঁকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। সেই প্রথম আলাপ। কিন্তু সেদিন পরিচয় বিশেষ অগ্রসর হয়নি কারণ সন্তোষবাবু খুব চুপচাপ ও সঙ্কুচিত ছিলেন। হয়তো আমার সম্বন্ধে কিছু ভয় তাঁর মন থেকে ঘোচেনি।

বেশ কয়েকবছর পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হল একটি ছোট কমিটিতে। ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও-র কর্তা সৌরীন্দ্রবাবু তখন বাংলা মুদ্রণ অক্ষরের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি কমিটির আয়োজন করেছিলেন এবং আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই কমিটিতে সন্তোষবাবুর সঙ্গে যে আলাপ হল তাতে আমি তাঁর যোগ্যতার সম্যক পরিচয় পেলুম। বুঝলুম নানা বিষয়ে তাঁর বেশ জ্ঞান আছে এবং তাঁর কমন সেন্সের অভাব নেই। সন্তোষবাবুর ওপর আমার শ্রদ্ধা জন্মাল।

এর কয়েক বছর পরে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা—এক বক্তৃতা সভায়। স্বর্গত সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিপালিত টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউটে আমি একটি বক্তৃতা পড়েছিলুম। (পড়েছিলুম বলা ঠিক হল না, পড়িয়েছিলুম কারণ তখন আমার চোখ খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছিল)। আমার বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের গানের

বিশেষত্ব জ্ঞাপন। সন্তোষবাবু শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। ভাষণটি পড়বার পর তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা প্রায় ভক্তি-তে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত হল।

তারপর অনেকবার দেখা হয়েছে। অধিকাংশই আমার বাড়িতে। অনেক বিষয়ে কথা হয়েছে। তাতে তাঁর মনের প্রসন্নতার ও ভাবনার গভীরতার অনেক পরিচয় পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল আমারই বাড়িতে প্রায় দুঘণ্টা ধরে। তাঁর একটি কাজ আমার পছন্দ হয়নি। সেই কথা আমি তাঁকে ভর্ৎসনার সুরে জানালুম। ভেবেছিলুম তিনি তর্ক তুলে আমার সঙ্গে লাঠালাঠি করবেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না, তিনি অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেন, আমি পরাজিত হলুম। উঠে যাবার সময় কথা হল পুজোর ছুটির মধ্যে তিনি একবার বর্ধমানে আমার বাড়িতে সদলবলে আতিথ্য স্বীকার করবেন। কিন্তু সে আর ঘটল না। "মনে রয়ে গেল মনেরই কথা।"

সন্তোষবাবু আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি তিনি আমাকে ভালবাসতেন। এ বস্তু অত্যন্ত দুর্লভ। তাঁর ভালবাসাকে আমি প্রণাম জানাই।

মনুমহারাজের একটি প্রবচন অবান্তর হলেও আমার মনে জাগছে। কেন জানি না। সেইটি বলে আমি আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

সন্তোষং হৃদি সংস্থাপ্য সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।।

সুহৃদ্বর সন্তোষকুমার ঘোষ

গজেন্দ্রনাথ মিত্র

সন্তোষবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৬০ সালের প্রথমে। দিল্লিতে গিয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের গেস্ট হাউসে কদিন ছিলাম। নিউ দিল্লি স্টেশনের কাছে রামনগরে ওঁদের আপিস ও প্রেস—আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ কাগজখানা বন্ধ করে দিতে এখন অন্য কী একটা বড় প্রেস বসেছে সেখানে। বোধ হয় চাঁদ প্রেস।

ওখানে থাকতে থাকতেই অশ্বিনীদার মুখে শুনলাম, সন্তোষবাবু ওখানেই থাকেন—লেখক সন্তোষবাবু—তিনিই কার্যত বার্তা-সম্পাদক। আমার কৌতূহল স্বাভাবিক, নিজেই একদিন গিয়ে আলাপ করলাম। একতলার একটি ছোট ঘরে বসেন। বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই কথাবার্তা বললেন, সদালাপী মিষ্টভাষী লোক। আমার চেয়ে বয়সে ছোট, দেখতেও মোটামুটি সুশ্রী। ভাল লাগল মানুষটিকে। কথাসাহিত্য পত্রিকায় লেখার কাজ বললাম।

সেই শুরু। কাগজ পাঠাই, পড়েন কিনা কে জানে। বিনামূল্যে বই পত্রিকা পেলে অনেকেই বিশেষ পড়েন না।

এর কিছুদিন পরে কোথায় একটা সভায় যাচ্ছি জিপগাড়িতে করে এটা মনে আছে। কলকাতার কাছাকাছি, কোথায় জায়গাটা ঠিক মনে পড়ছে না। যাচ্ছি—আমি, সুমথবাবু, অধ্যাপক জিতেন্দ্র চক্রবর্তী—এবং শেষ পর্যন্ত উঠলেন সন্তোষবাবু। যেতে যেতে নিজে থেকেই বললেন, আমি আপনাদের কাগজ নিয়মিত পড়ি, বিশেষ করে আপনার সম্পাদকীয়। রামানন্দবাবুর পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে, এমন সম্পাদকীয় আর কোনও সাময়িক পত্রে পড়িনি।

চমকে উঠলাম। বুকটা লাফিয়ে উঠল। যাঁরা আগেকার প্রবাসী পড়েছেন, সেই সময়কার সাময়িক পত্রের আবহাওয়ার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে—তাঁরাই বুঝতে পারবেন—বাঙালি সম্পাদকের পক্ষে এর চেয়ে বড় কমপ্লিমেন্ট আর হতে পারে না।

তারপর থেকে ওঁর এই আশ্চর্য গুণের পরিচয় পেয়েছি বার বারই। কখনও বা ফোন করে বলতেন, 'আপনাদের কাগজ ঝুলে যাচ্ছে একটু এদিকে নজর দিন।'

আবার হয়তো মাসকতক পরে একদিন আমিই ফোন করলাম কি কোথাও দেখা হয়ে গেল—বললেন, 'না, গত কমাস আবার বেশ চলছে। ভাল হচ্ছে।'

কোনও এক লেখকের অকালমৃত্যুতে শেষ বার্তা লিখেছিলাম—আন্তরিক আবেগেই উনি টেলিফোন করে জানালেন, 'এমন অবিচুয়ারি দীর্ঘ কাল চোখে পড়েনি।'

ইদানীং কিছুকাল ধরেই কথাসাহিত্যের সব সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা সম্ভব হচ্ছিল না। উনি বুঝতে পারতেন, বলতেন, এখন আর আপনি এডিটোরিয়াল লেখেন না। কেন? উনিও এক একসময় আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় লিখতেন—আমি লেখার স্টাইল বা ভাষা দেখেই বুঝতে পারতুম কোনটা ওঁর লেখা। ওঁকে জানালে খুশি হতেন হয়তো বলতেন, 'পরশুর লেখাটাও আমার ছিল, বুঝতে পেরেছিলেন?'

এক মহৎ গুণ ছিল সন্তোষবাবুর, বহু ব্যস্ততার মধ্যেও কেউ বই উপহার দিলে উনি পড়তেন, এবং ভাল লাগলে তা জানাতেন। ভাল না লাগলে, দীর্ঘকালের পরিচিতির ক্ষেত্রে তাও জানাতেন। আমার 'পাঞ্চজন্য' পড়ার পর, আমার অসাক্ষাতেও অনেকের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন—তা আমি তাঁদের কাছেই শুনেছি।

একবার আনন্দবাজারে প্রকাশিত ওঁর লেখা (স্বাক্ষরিত) এক শোকবার্তা পড়ে আমি ওঁকে বলেছিলুম, 'আমি মরবার পর আমার সম্বন্ধে আপনি লিখবেন।' তা উনি হেসে বলেছিলেন, 'বেঁচে থাকলে অবশ্যই লিখব।' আমি বলেছিলাম 'না না এটা না লিখে যাবেন না। প্লিজ।'

কিন্তু আমার সে অনুনয় উনি রাখলেন না। আগেই চলে গেলেন। বেলভিউতে যেদিন শেষ দেখা—আমি গলায় জোর দিয়েই বলেছিলুম, 'না না, ভাল হয়ে উঠবেন নিশ্চয়ই। এখন গেলে চলবে কেন। আমাকে কথা দিয়ে রেখেছেন মনে আছে তো? আমার অবিচুয়ারি লিখে তবে যাবেন।'

কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল। উনি কিছু বললেন না—শুধু হাতটা চেপে ধরে রাখলেন অনেকক্ষণ, মুখে ম্লান একটু হাসি।

অশ্বিনীকুমার গুপ্ত, দিল্লি সংস্করণের সম্পাদক। দরাজ দিল মানুষ, মনে করে রাখার মত।

সমরেশ বসু

১. অপরাজিত

প্রথম যেদিন সন্তোষদা'র অশুভ ব্যাধির সংবাদ পেলাম, হিসাবে মেলাতে পারিনি। কী করেই বা পারব। ১৯৭৬, জুলাইয়ের পরে জানতাম, আমাদের উভয়ের ব্যাধি একটাই। সেটা হৃদরোগ।

সালটা ঠিক মনে করতে পারছি নে। সন্তোষদা তখন ডঃ এ. বি. মুখার্জির চিকিৎসাধীনে বেলেভ্যু নার্সিংহোমে। দেখতে যাব কি না স্থির করতে পারছিলাম না। সম্ভবত সেবারই সন্তোষদা প্রথম হৃদরোগে আক্রান্ত হন। আমার একটা বরাবরের দুর্বলতা, হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে কারোকে দেখতে যেতে পা সরে না। কোথায় যেন ঠেকে যায়। হয়তো অবচেতনে সেটা আমারই মৃত্যুভয়। কিন্তু আমাকে সবাই এক বাক্যে জানালেন, 'কিছু ভাববেন না। সন্তোষবাবু সংকট কাটিয়ে উঠেছেন। এখন বেশ ভাল। কেবল হাসি আর গল্প।'

কথাটা মিথ্যে ছিল না। ভিজিটিং আওয়ারে গিয়ে দেখলাম, সন্তোষদার গায়ে ড্রেসিং গাউন। পায়জামা পরা, যুগল চরণে জোড়াসনে বসে আছেন কোমল শয্যায়। ওঁর পাশেই, চেয়ারে বসে আছেন একজন স্যুটেড বুটেড ভদ্রলোক। ব্যাধি ব্যামোর কোনও ছায়া নেই ওঁর মুখে। দিব্যি হাসিমুখে খোশমেজাজে গল্প করছেন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের, উত্তরে কাঁচের বন্ধ জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছবির মত কলকাতার এক দূর প্রান্ত।

যতদূর মনে পড়ছে, সেটা ছিল ফোর্থ ফ্লোর। অথবা ফিফথ? যথেষ্ট উঁচু। কেবিন না। পুরো একটি সুইট। সন্তোষদার সঙ্গে দেখা হবার আগেই, সামনের ঘরে দেখা হয়েছিল নীহার বউদি, মেয়ে দোলনের সঙ্গে। আরও কেউ কেউ ছিল। ভাল করে লক্ষ করিনি। লক্ষ তো একটাই। সন্তোষদাকে দেখা। তার আগেই সামনের ঘরে সকলের হাসিখুশি মুখ দেখেই আন্দাজ করতে অসুবিধে হয়নি, আর যা-ই হোক, ব্যাধির বালাই সেখানে নেই।

সন্তোষদার ঘরের দরজা আধ খোলা। কে যেন দরজাটা পুরো খুলে দিল, 'ভেতরে যান।'

পিছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সন্তোষদা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। চোখাচোখি মাত্রই ভ্রূকুটি হেনে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

প্রেমের ভাব তো সবাই বোঝে না। ভাষাও অন্তঃসলিলে বহে। কিঞ্চিৎ রুক্ষতা মেশানো। আমি ভিতরে সহজ। বাইরে কিঞ্চিৎ বিব্রত। বিব্রত হাসিমুখেই, চেয়ারে বসা ভদ্রলোকের দিকে একবার দেখলাম। তারপর সন্তোষদার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কিছুই নয়। তোমাকে দেখতে এলাম।'

'কেন দেখতে এলি? আমি তো তোকে ভালবাসি না।' চোখে আর তখন ভ্রুকুটি দৃষ্টি নেই। মুখে ছড়িয়ে পড়েছে হাসি। তাকিয়ে দেখলেন একবার চেয়ারে আসীন ভদ্রলোকের দিকে।

আমি হেসে বললাম, 'সে তো জানি।'

'ছাই জানিস।' সন্তোষদার সেই নিজস্ব ভঙ্গি ও স্বরের কথা, 'তুইও আমাকে ভালবাসিস না, জানি। আমাকে যারা ভালবাসে, তারা অনেক আগেই আমাকে দেখে গেছে। জানিস, কে কে আমাকে এর মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে গেছে? শুনলে তোর হিংসে হবে। বলব না।'

অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে, হেসে হেসে নিজস্ব ভঙ্গিতে এমন কথা সন্তোষদাই বলতে পারতেন। সবাই জানত, সন্তোষকুমার ঘোষের কথন ভঙ্গি অননুকরণীয়। কিছু রহস্য, আর সব কথাতেই কিছু অকথিত কথাও থেকে যেত। যার বোঝার, সেই বুঝত। আসলে সবটাই তো অভিমান। যাদের জানার, তারাই জানত, সন্তোষদা কীরকম অভিমানী ছিলেন। আমার অপরাধটা যে কোথায়, তা আমিই বুঝতে পারছিলাম। নার্সিংহোমে কখন কেমন আছেন, সব খবরই রাখতাম। এমন কি, কারা তাঁকে গান শুনিয়ে গিয়েছেন, তাও জানতাম। কিন্তু বলতে পারিনি।

আমি অপরাধীর মত হেসে বললাম, 'কিছুদিন ধরেই আসব আসব করছি।'

'ওসব ঢের বোঝা আছে আমার।'

সন্তোষদা বাঁ হাত নেড়ে আমার কথা উড়িয়ে দিলেন। চেয়ারে আসীন ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে হাসলেন। তারপরে ওঁর সেই ছটফটানো ভঙ্গিতে, তর্জনী নেড়ে বললেন, 'সমরেশ বসুর অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কাদের সঙ্গে, তা আর এ ভদ্রলোকের সামনে বলতে চাইনে। ছুঁচো আর মিথ্যুক, এবার বোস।'

ছুঁচো মিথ্যুক, এসব আদৌ কোনও গালাগালই না। সন্তোষদার কিছু ভালবাসার গালাগাল ছিল। হয়তো তার মধ্যে কিছু অশ্লীলতা থাকত, কিন্তু উপভোগ্য ছিল। আবার রেগে যাওয়া খারাপ গালাগালও ছিল। সে-সব বর্ষিত হত কাজের লোকদের প্রতি। সন্তোষদার সেই চেহারাই ছিল আলাদা। যাকে বলে, একেবারে রক্তচক্ষু রুদ্রমূর্তি। ভাগ্য ভাল, ওঁর সঙ্গে আমার কোনও কাজের সম্পর্ক ছিল না। অতএব সেসব গালাগাল আমাকে কোনওদিন শুনতে হয়নি।

যাই হোক। ঘরে চেয়ার ছিল। আমি বসতে গেলাম। সন্তোষদা হাত নেড়ে বললেন, 'ওখানে কেন? বেডে এসে বোস।'

আমি একটু ইতস্তত করে, বিছানায় গিয়ে বসলাম। সন্তোষদা জোড়াসন ভেঙে,

পায়জামা পরা দুপা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পায়ে ধরে মাফ চা।'

আমি অসংকোচে ওঁর দুপায়ে হাত ছুঁইয়ে কপালে ঠেকালাম। এ সব নতুন কিছু না। শরীরটা আরও ভাল থাকলে মাথার চুল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেন। তার বদলে কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে, চেয়ারে আসীন ভদ্রলোককে বললেন, 'ওর নামটা তো শুনলেনই।' আমাকে বললেন, 'ইনি ডঃ এ. বি. মুখার্জি।'

নমস্কার বিনিময়ের পর ডঃ মুখার্জি হেসে বললেন, 'মজার রহস্য এনজয় করা গেল।'

কিন্তু সন্তোষদার গলায় মারণাত্মক কর্কট ব্যাধি? কবে থেকে সেই শমনের পদক্ষেপ ঘটেছিল, কে জানত।

হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পরেও অনেকগুলো বছর কেটেছে। দেখে বুঝতে পারিনি, সন্তোষদার কোথাও ভাঙন ধরেছে। আসলে ওঁর জীবনমৃত্তিকার শক্ত পাড়ে, কোথাও ভাঙন ধরেনি। দেখেছি, আগেরই মত সেই কর্মোদ্যম। চলাফেরায় সেই দ্রুতগতি চঞ্চলতা। বিস্তর কথা, আর হাসিখুশি আড্ডা। ধূমপান বন্ধের জন্য, হাতে আস্ত সিগারেট। নাকের কাছে টেনে টেনে তামাকের গন্ধ শোঁকা আর চটকানো। ঠোঁটের কষ বেয়ে পানের পিক প্রায় গড়িয়ে পড়ছে। পকেট থেকে, লেখার কাগজের প্যাড ছিঁড়ে মুখ মুছে ফেলে দিতেন বাজে কাগজের টিনের ঝুড়িতে। তার সঙ্গে পানের পিক।

হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পরে, সেই প্রথম সিগারেটের পরিবর্তে পান চিবুনো শুরু। কিন্তু চোখ যেন ঈষৎ লাল? টেবিলের ওপরে রাখা সাদা জলের গেলাস কি নিতান্তই সাদা? আমি হয়তো ওঁর সিগারেটের প্যাকেটে হাত বাড়ালাম, 'একটা সিগারেট খাচ্ছি।'

'মারব এক থাপ্পড়, রাসকেল!' বলেই সিগারেটের প্যাকেট ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন, 'তোর হার্ট অ্যাটাকের পর সিগারেট খাওয়া বারণ না?'

আমার মুখে বিব্রত হাসি। মিথ্যা তো বলেননি। ইতিমধ্যে আমার হৃদযন্ত্রও বিকল হয়েছিল। নার্সিংহোমে অনেকগুলো দিন কাটাতে হয়েছিল। ধূমপান বারণ ছিল ঠিকই। কিন্তু, সেই কথায় বলে, 'ধরলে চিঁ চিঁ করে, ধরলে বিয়াল্লিশ লাফ মারে।' আমি নেশার বশীভূত। টালমাটাল হৃদযন্ত্র নিয়েও ঐ বিষ ছাড়তে পারিনি। কিন্তু যিনি আমার সামনে থেকে সিগারেটের প্যাকেট ছোঁ মেরে তুলে নিলেন, তিনিই কি পহেলা ধাপে ধূমপান ছেড়েছিলেন? যতই আস্ত সিগারেট নিয়ে তামাকের গন্ধ শুঁকুন, আর হাতে করে চটকান, তারপরেও দেখেছি, রাজা মাপের দামী সিগারেট টানতে। আগের মত সেই অগুনতি না। তবে, তখনও একেবারে ত্যাগ করতে পারেননি। তা বলে আমাকে দেবেন কেন? বরং উপদেশই দিতেন, 'খাসনে খাসনে, মরবি। তোরা একজন একজন করে মরবি, আর আমাকে তোদের নিয়ে লিখতে হবে? নরেন মিত্তির, নারাণ (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), শান্তিরঞ্জন (বন্দ্যোপাধ্যায়) এদের নিয়ে তো লিখতেই হয়েছে। তারপরে কি তোর জন্যও লিখতে হবে?'

এর পরে আমার লেখা থামানোই উচিত। সেই অজানা ভবিষ্যতের, অথচ অনিবার্য দিনটি পর্যন্ত সন্তোষদাকে আর অপেক্ষা করতে হল না। আজ ওঁকে নিয়ে আমাকে লিখতে হচ্ছে। অথচ এবার আরও বিশেষ করে নার্সিংহোমে সন্তোষদাকে দেখতে যেতে আমার পা সরেনি। কত কাছে—কয়েক পা হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যেত। যাঁরা গিয়েছেন, তাঁদের মুখে সন্তোষদার অবস্থার কথা শুনেছি। মুখে শুনেছি। টেলিফোনে শুনেছি। সত্যি বলতে কি, শুনতেও ইচ্ছা করত না। যাঁরা দেখতে গিয়েছেন, তাঁরা ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী। আমি দুর্ভাগা। যাব যাব করে অনেকবার পা বাড়িয়েছি। শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি। এ কি আমার অবচেতনে সেই মৃত্যুভয়?

না, সেই দিন আর নেই। মৃত্যুভয়কে অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছি। উঠতে পেরেছি নিজেরই বারে বারে রোগভোগের কষ্টে। তবু যে যাইনি, তার একাধিক কারণ ছিল। অনিবার্য আর নিশ্চিত শেষযাত্রীকে দেখার ইচ্ছা আমাকে বারে বারে বাধা দিয়েছিল। ওঁকে দেখতে গিয়ে, নিজে কী করে বসব, সে-বিষয়ে আমার সংশয় ছিল। নিজের ওপর আস্থা ছিল না একটুও। আর এই শেষযাত্রার আগে, সন্তোষদার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার টেলিফোনে কথা হয়েছে। অফিসের টেলিফোনে না। আলিপুরের বাড়ির টেলিফোনে। এ কথা বেশ কয়েক মাস আগের। কী যেন বলার ছিল সন্তোষদার। নিজেই বলেছিলেন, 'তোর সার্কাস রেঞ্জের ফ্ল্যাটে যাব। তুই আর আমি, সেখানে আর কেউ থাকবে না। দুজনে কথা বলব।'...এ কথার সঙ্গেই, ওঁর সেই নিজস্ব ভঙ্গির হাসি। আর মনে করিয়ে দেওয়া, 'তোকে অবিশ্যি আমি আর ভালবাসি না। ঘৃণা করি, বুঝলি, খুব ঘৃণা করি। তবু যাব, কয়েকটা কথা বলব। আমি বাড়ি থেকে খেয়ে, অফিসে যাবার পথে তোর কাছে যাব।'

সন্তোষদার ভাল না বাসা আর ঘৃণা, তার অন্তর্নিহিত অর্থ অনেক আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। আমিই সন্তোষদাকে আলিপুরে টেলিফোন করতাম, 'কই, তুমি তো এলে না?'

টেলিফোনে সন্তোষদার ক্ষীণ স্বর শোনা যেত, 'যাব। শরীরটা খুব ভাল নেই। আমার কথা শুনে বুঝতে পারছিস তো? এর ওপরেও কত রকম ঝামেলায় যে কাটে। রোজ সভা, রোজ বক্তৃতা, একটা না একটা কিছু ঝামেলা আছেই। তুই ভাবিস না, আমি ঠিক যাব।'

আসেননি। সন্তোষদা আর কোনওদিনই আসেননি। সেই সময়ের মধ্যেই, হঠাৎ অফিসে বা কোথাও যে দেখা হয়নি, তা না। দেখা হলেই আমার জিজ্ঞাসা, 'এলে না তো?'

'যাব। এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? সিরিয়াস কাজের কথা তো কিছু নয়। মনে অনেক কথা জমে আছে। মনের কথা। তোর হয়তো ভাল লাগবে না শুনতে।' সন্তোষদার মুখে ওঁর সেই নিজস্ব হাসি। কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস আর সন্দেহ। তারপরেই সেই মুহূর্তে ডাক,

'চল না, এখনই চল, কোথাও গিয়ে একটু বসি।'

মাথা নেড়ে হেসে বলতাম, 'না। আমার একটু কাজ আছে।'

আজ আর কী জন্য মিথ্যা কথা বলব? কাকে মিথ্যা স্তোক দেবার জন্য বলব? বাইরে কোথাও সন্তোষদার সঙ্গে বসতে ইচ্ছা করত না। ঐ বসাটার মধ্যে, শেষের দিকে থাকত বড় ফাঁকি। আগের সেই সন্তোষদাকে খুঁজে পেতাম না। একটু কঠিন করে বলতে হলে, বলতে হয়, বাইরে কোথাও বসার মানেই, মাথামুণ্ডহীন সব কথা। যার কোনও পরম্পরা থাকত না। সন্তোষদা একতরফা বকে যাবেন, যে-সব কথার সঙ্গে আমার কোনও যোগসূত্রই নেই। অথচ শুনে যেতে হবে।

সন্তোষদা কি তা বুঝতেন না? বুঝতেন, আর স্পষ্টই বলতেন, 'তোরা কেউ আমার সঙ্গে যেতে চাস না। জানি, আমাকে আর ভালবাসিস না। এড়িয়ে যাস। না-ই গেলি। তবে জেনে রাখিস, এখনও আমাকে কেউ কেউ ভালবাসে। সঙ্গীর অভাব হবে না। ঠিক আছে, তোর সেই কোথায় যেন? সার্কাস রেঞ্জ। সেখানেই যাব।'

আসেননি। সন্তোষদা কথা রাখেননি। আর কোনওদিনই আসেননি।

এবার একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। আমি সন্তোষদার সাহিত্য সাংবাদিক প্রতিভার কথা লিখতে বসিনি। নিতান্তই ব্যক্তি সন্তোষদার কথার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা করছি। ব্যক্তি সন্তোষদার বিষয়ে স্মৃতিচারণ? সে কি সম্ভব? বরং একেবারেই অসম্ভব। আমাদের দেশে ওসব সম্ভব হয় না। চারদিকে কেবলই নিষেধের ভ্রূকুটি। আর এই নিষেধের ভ্রূকুটিকে, আমাকে রেয়াত করতেই হয়। শ্রদ্ধা অবিশ্যিই না।

সেই উনিশশো পঞ্চান্ন সাল থেকে, উনিশশো পঁচাশি, পুরো তিরিশটি বছর। ঘটনা তো অনেক। অনেক কথা। অনেক নরনারী যে-সব ঘটনা ও কথার মধ্যে জড়িয়ে আছে। সব কথা তো বলা যাবে না। 'প্রণয়' শব্দটি উচ্চারণ করতেই মনে হচ্ছে, বিদ্যুতের বিশাল ভোল্টের লাল নরকরোটির ওপর ক্রস চিহ্ন আঁকা সাবধানী নিষেধ চোখ রাঙাচ্ছে। অথচ সন্তোষদার মত এক রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রণয় বিষয়টি যেন গাঁটছড়া বাঁধা। প্রণয় সব সময়ে কেবল প্রণয়ই নয়। অনেক দুষ্টু দুষ্টু খেলার গল্পও আছে।

বলা যাবে কি সেই এক রাত্রির ঘটনা, এক ভদ্রমহিলা ওঁকে যেমন করে হোক সেবা করবেনই। তুষ্টি বিধান করবেনই। আর সন্তোষদা অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। শেষ পর্যন্ত রফা, একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ সেবা ও তুষ্টি বিধান করতে পারে। অতএব, মহিলা তাতেই রাজি। গান ধরলেন। সন্তোষদাকে দেখে মনে হল, ওঁর মনোদ্রেক হবে। একটার পর একটা গান চলেছে। সন্তোষদা প্রথমে হাসছিলেন। তারপরে বিরক্ত। বোধহয় ক্রুদ্ধও। ওদিকে রাত বেড়ে চলেছে। সঙ্গে গাড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পরিণামে, আমি গালে চাটিও খেলাম। আবার আদরও পেলাম। কিন্তু ফিরব কেমন করে? রাস্তায় একটা ট্যাক্সি নেই।

আমিও তখন গৃহ ছাড়া। সাময়িক কয়েকদিন বাস করছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার সামনেই, এক তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে। সন্তোষদা তখন যেমন করে হোক, অফিসে ফিরতে চাইছিলেন। মহিলার বাড়ির ভৃত্য কোনও ট্যাক্সিরই সন্ধান পেল না। বরং একটা পুলিশ ভ্যানকে আসতে দেখে, ভয়ে পালিয়ে গেল। আমরা স্বস্তি পেলাম। সন্তোষদা সেই পুলিশ ভ্যান দাঁড় করিয়ে অনুরোধ করলেন, আমাদের একটু আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। পুলিশ ভ্যানের মধ্যে কোন শ্রেণীর অফিসার ছিলেন, জানি না। এক কথায় রাজি হয়ে গেল। আমরা ভ্যানের পিছনের দড়ি ধরে উঠে পড়লাম।

কিন্তু সত্যি কি আর সন্তোষদা অফিসে গিয়েছিলেন? অফিসের সামনে নেমেছিলেন। আমাকে বললেন, 'তোর ঐ বাজে হোটেলে আমি যাব না। চল, মিনার্ভায় যাই।'

আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, সেই অধিক রাত্রে মিনার্ভা হোটেলের দরজা আদৌ খুলবে কি না। কিন্তু আগন্তুকের নাম সন্তোষকুমার ঘোষ। দরজা তো খোলা হলই। দোতলার একটি ঘরের ঠাণ্ডা মেসিন খুলে দেওয়া হল। দুই খাটে দু'টি বিছানা। এমন কি, অধিক রাত্রি সত্ত্বেও, কিছু খাদ্য আর পানীয়ও জুটল। জুটল না কেবল পান। সন্তোষদার তখন পান চিবোবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তখন সব পান সিগারেটের দোকান বন্ধ।

সেই রাত্রে অনেক হেসেছিলাম দুজনে। আমি আর জেগে থাকতে পারছিলাম না। কোনওরকমে একটু খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। সন্তোষদা টেবিলের ড্রয়ার ঘেঁটে বের করেছিলেন হোটেলের রাইটিং প্যাড। কলম ছিল সঙ্গে। আমাকে বললেন, 'তুই ঘুমো। আমি একটু লিখি।'

'এখন কী লিখবে?' আমার অবাক জিজ্ঞাসা।

সন্তোষদা হেসে বললেন, 'গানের বিভীষিকা নয়। ওটা ভোলবার জন্য একটা কাজের লেখাই লিখব।'

ওটাও সন্তোষদার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

যে-কথাটা কোনওদিনই বলা হয়নি, আজ সেই কথা বলি। বলা হয়তো হয়েছে। লেখা হয়নি। কেমন করে সন্তোষদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। যে-পরিচয় দুজনের বয়সের চার বছরের ব্যবধানকে, বন্ধুত্ব আটকাতে পারেনি।

১৯৫৫-এর ডিসেম্বর। সেবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল লখনৌতে। একটা জরুরি কথা বাকি থেকে যাচ্ছে। সন্তোষকুমারের সঙ্গে আমার তখন চাক্ষুষ পরিচয় না ঘটলেও, তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। সেটাকে পরিচয় না বলে, প্রেমে পড়া বলাই সঙ্গত। সেই সময়ে ওঁর এক একটা ছোটগল্প পড়তাম, আর ভিতরটা টগবগিয়ে উঠত। ভাষা আর শব্দের কী বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য! এক নতুন শব্দের আমদানি, সেই সময়ে একমাত্র সন্তোষ ঘোষের গল্পেই পাওয়া যেত। কী অসাধারণ বিষয়বস্তু আর গল্পের বাঁধুনি! প্রতিটি শব্দকেই মনে হত, দীপ্ত, প্রখর তীক্ষ্ণ, অথচ চিকন আর স্নিগ্ধও।

'কিনু গোয়ালার গলি' তখন সব বিশাল সুদীর্ঘ রাজপথকে ম্লান করে দিয়েছে।

সন্তোষদার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের আগে, সাগরদার (সাগরময় ঘোষ—সম্পাদক 'দেশ') মুখে ওঁর কিছু কথা শুনেছি। যেমন কৌতুকপূর্ণ, তেমনই অপরিচিত জগতের এক মানুষ বলে মনে হত। ১৯৫৫-তে, হঠাৎ কী ঘটেছিল জানি না। অনেক কমিউনিস্ট লেখক প্রাবন্ধিক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমাকে তখনও পার্টির লোক ভাবা হত। কিন্তু আমি আর তখন পার্টি সদস্য ছিলাম না।

সন্তোষকুমার ঘোষও তখন লখনৌ-এর সম্মেলনে উপস্থিত। কেউ কি ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন? মনে করতে পারছি না। হয়তো দিয়েছিলেন। সন্তোষকুমার সোৎসাহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, 'আপনি সমরেশ বসু? থুড়ি, কালকূট? অমৃতকুম্ভের সন্ধানের লেখক? সাগরবাবু না জানালে আমি বিশ্বাসই করতাম না, সমরেশ বসু অমৃতকুম্ভের সন্ধানে লিখেছেন? কী গোগ্রাসে যে গিলেছি লেখাটা। বন্ধুত্ব পাতাতে চাই। আপত্তি নেই তো?'

আপত্তি? আমারও তো সেই কথা। আপনিই সেই কিনু গোয়ালার গলি-র লেখক? আর চীনে মাটির মত গল্পের? লখনৌ-এর শীতে, দুজনের হাতের স্পর্শে কী উষ্ণতা! বন্ধুত্ব ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। যেন সেটা অনিবার্যই ছিল। আমার সঙ্গে ছিল, জ্যেষ্ঠ কন্যা বুলবুল। বছর দশেক বয়স। জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে বললেন, 'এত বড় মেয়ে? ও তো আমার বড় মেয়ে দোলনেরই বয়সী প্রায়। আপনি কি বর্ণচোরা আম নাকি? জিজ্ঞেস করতে নেই। তবু, বয়স কত?'

বললাম। শুনে বললেন, 'আমার থেকে চার বছরের ছোট। অথচ অন্য দিকে এগিয়ে আছেন দেখছি।'

সেই শুরু। লখনৌতে তিন দিনের মধ্যেই, দুজনের ঘনিষ্ঠতা এত বেড়ে উঠেছিল, দুজনে মধ্য রাত্রে টাঙা ভাড়া করে পথে-পথে বেড়িয়েছি। টাঙার চালককে হটিয়ে দিয়ে, সন্তোষকুমার নিজেই চাবুক হাতে বসে গিয়েছিলেন। দুজনের একটা বড় আকাঙ্ক্ষা। লখনৌতেই যখন এসেছি, তখন বাঈজির নাচ দেখা হবে না? তয়ফাওয়ালীর গান? কিন্তু কোথায় সে সব? দুজনের কেউ একবারও ভেবে দেখেনি, দুজনের কারোর পকেটেই নবাবি করার মত রেস্ত ছিল না। তবু খুঁজে দেখতে দোষ কী? বাঈজিদের খুঁজেই পাইনি। টাঙাওয়ালা আমাদের সব উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে বলেছিল, 'লখনৌতে ওসব আর নেই। সরকার থেকে বিলকুল হটিয়ে দিয়েছে।'

সাহিত্য সম্মেলনের পর অনেকেই গিয়েছিলাম দিল্লিতে। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে ছিলেন ননী ভৌমিক, সুলেখা সান্যাল, সিদ্ধেশ্বর সেন। দিল্লি বেড়ানো শেষ করে, আমাদের যাবার কথা আগ্রায়। দিল্লিতে যাবার আগেই সন্তোষকুমারকে আমার কথা দেওয়া ছিল, গিয়ে নিশ্চয়ই দেখা করব। তিনি তখন দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের বার্তা বিভাগের কর্মী। না কি নিউজ এডিটর ছিলেন, এখন আর মনে করতে পারছি না।

আমি বুলবুলকে নিয়ে, সুলেখার সঙ্গে উঠেছিলাম ভূপেশ গুপ্ত এম পি কোয়ার্টারে। আমার মাথায় তখন সন্তোষকুমার। দিল্লির অচেনা পথের খোঁজখবর করে, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ঠিকানায় পৌঁছেছিলাম। সন্তোষকুমার জড়িয়ে ধরলেন। এম পি কোয়ার্টারে উঠেছি শুনে, মুখ ব্যাজার, 'ওখানে উঠতে গেলেন কেন? বুলবুলকে নিয়ে আমার বাড়িতে চলে আসুন।'

আমি একটু ইতস্তত করেছিলাম। বিশেষ করে সুলেখার জন্যই। নানা কারণে সুলেখার মন মেজাজ তখন ভাল ছিল না। বিশেষ করে, ননী ভৌমিক সোজা আগ্রায় চলে যাওয়ায় উনি খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলেন। যদিও পরে আমাদের একসঙ্গেই আগ্রায় যাবার কথা। সেখানে মার্কসবাদী রাজনীতিক এবং প্রাবন্ধিক রামবিলাস শর্মা এবং আরও কয়েকজন আগ্রায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সন্তোষকুমার আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিজেই গেলেন এম পি কোয়ার্টারে। আমার মালপত্র নিয়ে, আর বুলবুলের হাত ধরে বললেন, 'চলুন। আগ্রায় যাবার দিন আবার ফিরে আসবেন।'

সিদ্ধেশ্বর ছিল। তবু সুলেখা আমার ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে, সন্তোষকুমারের আতিথ্য গ্রহণে। ওঁর মত একটা স্টঞ্চ অ্যান্টি কমিউনিস্টের আতিথ্য আমি কী করে গ্রহণ করতে পারি? কিন্তু আমি সত্যি নাচার ছিলাম। সন্তোষকুমারকে আমি কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট-এর মাপে বিচার করতে পারিনি। বাস্তবিকই সেটা ছিল একজন দরদী শিল্পীর সঙ্গে বন্ধুত্বের বিষয়। এই তিরিশ বছর পরেও আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, সন্তোষদার সঙ্গে আমার রাজনীতি নিয়ে কোনও সিরিয়াস আলোচনা বা বিতর্ক ঘটেনি। তথাপি সন্তোষকুমারের আতিথ্য গ্রহণকে কেন্দ্র করে, কলকাতায় বেশ কিছু জলঘোলা করা হয়েছিল।

যে-কদিন দিল্লিতে ছিলাম, সন্তোষদার ফ্ল্যাটেই ছিলাম। বুলবুলও সেখানে গিয়ে, সঙ্গী-সাথী পেয়ে খুশি হয়েছিল। সন্তোষকুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছিল। দুজনেই পরস্পরের কাছে, মনের দরজা খুলে দিয়েছিলাম। ওঁর একটা কথা এখনও মনে আছে। বলেছিলেন, 'এ মেলামেশার ব্যাপারটা ভাল হল না সমরেশবাবু। প্রেমের বড় দায়। পরে হয়তো দাগা খেতে হবে।'

পরস্পরের মনের কথা ছাড়াও, কলকাতার সাহিত্য সাহিত্যিক আর সাহিত্য-পরিবেশ নিয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হত। তারপর কলকাতায় ফিরে, দুজনের মধ্যে বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয়েছিল। তখনও আমরা 'বাবু' আর 'আপনি' সম্বোধনে আবদ্ধ। সন্তোষকুমারের চিঠির একটি কথা এখনও ভুলতে পারি না। ...'অল্প কয়েক দিনের সঙ্গ নেশায় এমন মাতাল করে দিয়ে গিয়েছেন, খোয়ারি কাটাতে একবার কলকাতায় না গেলেই নয় দেখছি।'

কলকাতায় বরাবরের মত চলে আসার আগে, সন্তোষকুমার দু-একবার কলকাতায়

এসেছিলেন। অন্তত আমি দু-একবারের কথাই জানতাম। তিনি আমাকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। যদিও নরেনদা আর নারায়ণদার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল আগেই। প্রকাশক মহলে সন্তোষকুমার ঘোষকে নিয়ে তখন খুবই কাড়াকাড়ি। আর তখনই সন্তোষকুমারের প্রস্তাব ছিল, 'নরেন নারায়ণ যদি আপনার দাদা হতে পারে, তা হলে আমিই বা নয় কেন? আমাদের সম্বোধন বদলাবার কি সময় আসেনি?'

নিশ্চয়ই এসেছিল। সেই থেকেই সন্তোষকুমার সন্তোষদা। কেবল সন্তোষদা না। সম্বোধনও 'তুমি'। মনে আছে, নরেনদা আমাকে একদিন ডেকে বলেছিলেন, 'তুমি সন্তোষবাবুকে যেমন তুমি করে বলো, আমাকেও তাই বলো।'

আমি আপত্তি করিনি। কিন্তু মজাটা ঘটেছিল নারানদাকে নিয়ে। আমার সামনেই নারানদাকে একদিন নরেনদা বললেন, 'সমরেশ তোমাকেও তুমি বলেই সম্বোধন করতে পারে।'

নারানদা সজোরে মাথা আর হাত নেড়ে বললেন, 'না না, তা আমি চাইনে। সবাই একরকম হবে নাকি?'

লজ্জাটা আমিই পেয়েছিলাম। এর কিছুকাল পরেই সন্তোষদা বরাবরের জন্য কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

সংক্ষেপে যে-স্মৃতিচারণাকে সারতে চেয়েছিলাম, তার রাশ টেনে ধরে রাখতে পারছি না। ছোটখাটো আর দু-তিনটি বিষয়ের উল্লেখ না করে, আপাতত থামতেও পারছি না। তিরিশ বছরের লাগাতার সব কথা বলবার সময় এখন না। যা বলছি, সবই টুকরো কথা।

একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। যতদূর মনে পড়ে, এ ঘটনাটি আজ পর্যন্ত কারোকেই বলতে পারিনি। প্রফুল্লকুমার সরকার স্ট্রিটের অফিস তখনও বর্তমানের চেহারা নেয়নি। তিন তলা, চার তলায় নানা পরিবর্তন ঘটেই চলেছে। তিন তলায় উঠে, বাঁ দিকে গেলে, ডান দিকে তখন 'দেশ'-এর অফিস। বাঁ দিকের পার্টিশনে বসেন সন্তোষদা আর সরোজ আচার্য। দরজা বলে কিছু ছিল না। সামান্য কাপড়ের পর্দা ঝুলত।

আমি পর্দা সরিয়ে হাসিমুখে ঢুকলাম। এগিয়ে গেলাম সন্তোষদার টেবিলের দিকে। সন্তোষদা ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুহূর্তেই ওঁর দুচোখে জ্বলন্ত ক্রোধ ঝলকে উঠল। কোনওদিন আমার দিকে ওরকম চোখে তাকাতে দেখিনি। সরোজদা কানে কম শুনতেন। তিনি চোখ না তুলে নিজের কাজ করছিলেন। সন্তোষদা গর্জে উঠলেন, 'বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই নে। আই হেট য়ু। গেট আউট, গেট আউট।'

আমি স্তম্ভিত! থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম ওঁর হাতে কাচের পেপারওয়েট। ছুঁড়ে মারবেন কি না, ইতস্তত করছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এ সন্তোষদা আলাদা মানুষ। স্বরে সুরে ভঙ্গিতে কোথাও সেই ঠাট্টা রহস্যের স্পর্শ নেই। 'তুমি' করে

সম্বোধন করছেন। কিন্তু কী ঘটেছে? কী করেছি? শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। বেশ কয়েকদিন পরেই সন্তোষদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অনেক কথাও জমেছিল। ইতিমধ্যে এমন কী ঘটে গেল, সন্তোষদা আমাকে প্রায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারবেন? মাথা ফাটবে? ফাটুক। আমিও পিছিয়ে যাওয়ার পাত্র ছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করেছি আমি?'

'কোনও কথা বলতে চাইনে।' সন্তোষদার গর্জিত স্বর অস্বাভাবিক রকম চিৎকার করে উঠল, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আর কোনওদিন আমার কাছে আসবে না। বেরিয়ে যাও।'

দেখলাম, কাচের পেপারওয়েট ওঁর হাতে কাঁপছে। বুঝতে পারলাম, এ অবস্থায় আর কোনও প্রশ্ন করা চলে না। কোনও প্রশ্ন বা জবাবের মত অবস্থা সন্তোষদার ছিল না। আমার মানসিক অবস্থা শোচনীয়। অপমানে আর লজ্জায়, মুখ ফিরিয়ে পর্দার দিকে পা বাড়ালাম। কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরেই, সন্তোষদার ডাক শুনলাম, 'শোনো।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় ফিরে তাকিয়ে দাঁড়ালাম। সন্তোষদার হাতে তখন আর পেপারওয়েট নেই। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পশ্চিমে ছিল ব্যালকনি। সেদিকের দরজাটা খোলাই থাকত। সন্তোষদা সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এক মিনিটের জন্য ওখানে চলো। আমি একটি কথাই তোমাকে জিজ্ঞেস করব।'

সন্তোষদার চোখমুখ তখনও লাল। মনে আছে, সেদিন সন্তোষদা একেবারে সুটেড বুটেড সাহেব। গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরা। লাল টকটকে টাই ঝুলছে। সন্তোষদার এসব দিকে মোটে নজর নেই। আমি সন্তোষদার সঙ্গে ব্যালকনিতে গেলাম। সন্তোষদার তীক্ষ্ণ চোখে তখনও ক্রোধের রক্তাভা। নিজেকে হয়তো সামলাবার চেষ্টাও করছিলেন। আমার চোখে চোখ রেখে, শান্তিনিকেতনের এক বিশেষ গৃহের উল্লেখ করে, তীক্ষ্ণ স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সেই বাড়িতে মদ খেয়েছিলে। মাতলামি করেছিলে?'

শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। যে-বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বপূর্ণ, যে-বাড়িতে সেই প্রথম আমাকে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, সে-বাড়িতে আমি মদ খেয়ে মাতলামি করব? চিন্তারও অতীত। তা ছাড়া, সেই সময়ে মদে আমার তেমন তৃষ্ণাও জন্মায়নি। ভাবতেও পারি না, দিনের বেলা মদ্যপান করে আমি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি খেতে যেতে পারি। আমি বেশি কিছু বললাম না। কেবল দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিলাম 'সর্বৈব মিথ্যা কথা। আমি এতটা নিচে নামতে শিখিনি।'

বলেই আমি ফিরতে উদ্যত হলাম। সন্তোষদা আমার একটা হাত চেপে ধরলেন, 'সমরেশ।'

আমি ওঁর দিকে তাকালাম। ওঁর চোখমুখের চেহারা তখন বদলাতে শুরু করেছে। তবু একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি? তুই মিথ্যে বলছিস নে?'

'আমি তোমাকে কখনও কোনওদিন মিথ্যে বলিনি।' জবাবটা দিতে গিয়ে আমার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

সন্তোষদার চোখের কোণে তখন জলের বিন্দু চিকচিক করছে। আর সেটা এমনই সংক্রামক, আমার চোখও শুকনো থাকল না। সন্তোষদা আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর সমরেশ। যে আমাকে এই মিথ্যে কথাটা বলেছে, সেই ইয়াগোকে আমি বুঝতে পেরেছি। আজ আর আমি তোর সঙ্গে কোনও কথা বলব না। আগামীকাল সকালেই আমি নৈহাটিতে তোর বাড়ি যাব। সারাদিন তোর সঙ্গে কাটাব। আমার এই দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে যা। আমার মাথার ঠিক ছিল না।' দুজনেই চোখ মুছলাম। কিন্তু হাসতে পারলাম না। সেই দিন আমি কলকাতায় আর কোথাও যাইনি। আনন্দবাজার থেকে বেরিয়ে সোজা নৈহাটি ফিরে গিয়েছিলাম।

পরের দিন সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে সন্তোষদা নৈহাটিতে গিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী (প্রথম) গৌরী সন্তোষদাকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। জানত, সন্তোষদা আসবেন। ও নানা রকম রান্নার আয়োজন করেছিল। আমি আর সন্তোষদা উঠে গিয়েছিলাম চিলেকোঠার নিরালায়। সন্তোষদাই ব্যাখ্যা করেছিলেন, কে সেই ইয়াগো, কেন আমার বিরুদ্ধে সন্তোষদাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। অপবাদ দিয়েছিল।

আমাদের দুজনের মধ্যে ঐরকম ভুল বোঝাবুঝি আর কখনও ঘটেনি। শুধু বলেছিলেন, 'এ গল্পটা আমিই লিখব। তুই লিখিস নে।'

গত কয়েক বছর ধরে, আমাদের অনেকের সঙ্গেই সন্তোষদার একটা দূরত্ব বাড়ছিল। সে কি কেবল সন্তোষদার দোষ? না, আমাদেরও কিছু দোষ ছিল?

আমি মনে করি, দূরত্বের কারণটা, সন্তোষদারই দুই সত্তার সংকটের মূল। সাংবাদিক সন্তোষদা, আর সাহিত্যিক সন্তোষদা। বছর দুয়েক আগে সন্তোষদার সঙ্গে আমার বেশ কয়েক ঘণ্টা একান্তে কথা হয়েছিল। বিষয় সাহিত্য। বলা বাহুল্য, বক্তা সন্তোষদাই। সংক্ষেপে ওঁর বক্তব্য ছিল, আমার এবং আরও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের সম্পর্কে। এবং ওঁর নিজের সম্পর্কেও। ওঁর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, তোরা কিছু করতে পারছিস না। দু-চারটি নতুন ছেলে যাও বা পারছে, অন্তত চেষ্টা করছে, তোরা সেখানে আত্মতুষ্টিতে ভুগছিস। আমিও পারছি না। কিন্তু চেষ্টা করছি। আমি পুরনো ভাষা হারিয়েছি। নতুন ভাষা খুঁজছি। নতুন ফর্ম খুঁজছি। তোদের তা ভাল লাগছে না।

সন্তোষদার সিদ্ধান্তকে আমি একেবারে বর্জন করব না। আমাদের কয়েক জনের কাছে ওঁর যে-প্রত্যাশা ছিল, তা পূরণ হচ্ছিল না। কিন্তু সন্তোষদা নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্তে বোধহয় একটা ভুল করেছিলেন। আজ ওঁর মৃত্যুর পরে, 'সাহিত্যিক সাংবাদিক' প্রতিভার কথা বড় করে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যিক সন্তোষদা কোথায় চলেছিলেন? যখন তিনি ভারতের সার্থকতম সাংবাদিক, তখন ওঁর সেই অবিস্মরণীয় সাহিত্যের জগৎটি কোথায়? সন্তোষদা মাথা কুটে খুঁজে মরছিলেন। এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না, সাংবাদিকতার জগৎ ওঁকে, একদিকের মূল ছিন্ন করে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছিল। ওঁর সাহিত্য চিন্তাকেও সাংবাদিকতার মধ্যেই মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন অনিবার্যভাবেই ওঁর সাহিত্য জগতে ফিরে আসতে চাইলেন, তখন সেই শক্তিশালী সাহিত্যের কলম কেবলই অভূতপূর্ব সব শব্দের খাঁচায় বন্দি। সৃষ্টির ধারায় সেই বেগ আর স্বচ্ছতা স্তব্ধ প্রায়।

একদিক থেকে দেখতে গেলে, একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই বোধহয় সন্তোষদার তুলনা দেওয়া চলে। এ মতামত একান্ত আমার। কিন্তু আমাকে তো এ কথাও স্বীকার করতেই হবে, সন্তোষদা তথাপিও ছিলেন নিবন্তর সন্ধানী। থেমে থাকতে পারেননি। কেউ ওঁকে থামিয়ে রাখতেও পারেনি। এবং, ওঁর সন্ধানে কখনও কোনও দ্বিধা বা জড়তা ছিল না। সবই করেছেন অতি সজ্ঞানে। কত সজ্ঞানে, তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন, ওঁর শেষ প্রহরের রোজনামচাতে।

সেখানেই সন্তোষদা আমাদের কাছে চিরকালের অপরাজিত।

সাপ্তাহিক 'দেশ' ৫৫ বর্ষ ২১ সংখ্যা

২৩ মার্চ ১৯৮৫

৯ চৈত্র ১৩৯১

২. জানতে

এবার 'যাত্রাভঙ্গ' দিয়েই শুরু করা যাক।

কিন্তু কী-ই বা শুরু করব? যে-জীবনটা, বাইরের সকলের সামনে দেখিয়ে গেল। সে আছে সকলের সব আসরে। সকলের মনের দরজায় নাকি সে করাঘাত করে, দরজা খুলে, সব কথা জেনে নিত। সবাইকে পিছু হটিয়ে দিয়ে, সে নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ থেকে শেষ পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, শেষবারের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সম্রাটের মত বিদায় নিত। আমি আমার দেখা প্রথম পট থেকে দেখেছি, সেই জীবনটা আসলে নিরবচ্ছিন্ন নিজেকেই খুঁজে গিয়েছে।

ওঁর সেই নিজের বইয়ের উৎসর্গের মতই ব্যাপারটা। উৎসর্গের কথাগুলো যথাযথ মনে নেই। ওঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে, নিজের এমন বিস্মৃতিকে ক্ষমা করা যায় না। কারণ ওঁর মত স্মার্ত মেলাও ছিল ভার। যাইহোক, সম্ভবত উৎসর্গের কথাগুলো ছিল এইরকম, ওকে নয়। তাকেও নয়। শেষ পর্যন্ত অতএব নিজেকেই।

কোনও লেখকের এমন অভূতপূর্ব উৎসর্গপত্র পূর্বে আর দেখা গিয়েছে কি? আমি তো দেখিনি। এই উৎসর্গের কোনও ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ত তিনি কোথাও দিয়ে গিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। অথচ মনটা ছিল খুবই জিজ্ঞাসু। তারপরেও তো অনেকবার—সত্যিকারের অনেকবার অনেকখানে দেখা হয়েছে। কথাও হয়েছে অনেকতর। কিন্তু ওই কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করিনি, না। কথার ফাঁকে, এমন সব প্রসঙ্গ এসে পড়ত, ঘটনার, ব্যক্তির, আর তার মধ্যেই দু'জনেই এত মগ্ন হয়ে যেতাম, জিজ্ঞাসাটা যে আদৌ মনের কোথাও ডুব দিয়ে আছে, সেটাই জানা যেত না।

সকলের জীবনই বোধহয় এরকম। কিছু কিছু জিজ্ঞাসা, শেষ পর্যন্ত মনেই থেকে

যায়। তা আর কোনওদিনই উচ্চারিত হয় না। জিজ্ঞাসা করা হয় না। মন জিজ্ঞাসুই থেকে যায়।

তাই থাকবার কথা ছিল। কিন্তু যাঁকে জিজ্ঞাসা করার ছিল, তাঁকে যখন পাওয়া যায় না, মন তখন নিজেকে নিয়ে পড়ে। জবাবের দাবি করে নিজের কাছেই। কী তাৎপর্য ছিল সেই উৎসর্গটির?

আমার নিজের মত জবাবটা বোধহয় দিয়ে এসেছি আগেই। যে কারণে উৎসর্গপত্রটির কথাগুলো মনে পড়ল। নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন খুঁজে যাওয়া। যা একান্তভাবে আত্মঅন্বেষী-রচনা, যা অপরের খাদ্য পথ্য কিছুই হবে না, কিংবা হলেও হতে পারত নিতান্তই অভোগ্য, অপাচ্য আর অজীর্ণতার কারণ, অতএব তা আকণ্ঠ নিজেকেই গিলে নিতে হয়েছে। উৎসর্গের মধ্যেই নিজেকেই খোঁজা।

সেই প্রথম জানা গিয়েছিল, নিজের সব রচনাই, যাকে খুশি উৎসর্গ করা যায় না।

ভেবেছিলাম, এবার 'যাত্রাভঙ্গ' দিয়ে শুরু করব। কিন্তু তার আগেই যে এল মন ঘিরে অনেক কথা। অথচ জানি, 'যাত্রাভঙ্গ' ছাড়া, এবার ওঁর বিষয়ে আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। তবু শেষের অনেকগুলো কথা বারেবারেই, মন ঘিরে গণ্ডি কাটছে। যে কথাগুলো ডুবুডুবু বেলার আকাশ-শেষ মাংসখণ্ডের মতো জীর্ণ আর লাল, তার অন্তর্নিহিত অর্থগুলো, প্রথম শুরুর আলোয় কী ভীষণ আরক্ত ছিল। সেই রক্তই শুধু দেখতে পাচ্ছি। কথাগুলো পড়তে পারছি কি?

জানি, অনেকগুলো যেমন ছিল চিঠি, তেমনি কিছু ছিল একান্তই নিজের কথা। চিঠিতেও কি নিজের কথা থাকে না? থাকে। কিন্তু সেই ভয়ংকর কথাটা, যেটা চিরকাল বাইরে, জোয়ারের ঢেউয়ের মত ছিল প্রগলভ। অথচ ভিতরে থেকে গিয়েছে উহ্য। কেবল কেউ যদি স্বাদ নিত, তা হলে লবণাক্ত ছাড়া আর কোনও স্বাদই মিলত না। বাইরের উচ্ছ্বসিত প্রগলভতার মধ্যে, লবণাক্ত স্বাদটাই সমস্ত ভিতরটাকে ভিজিয়ে রেখেছিল।

ওঁর কথা কী বলব। উনি যে নিজেই সে কথাটা বলবার জন্য নিজের সঙ্গেই এমন ছলচাতুরি করেছেন, আর মেরেছেন নিজেকে, রক্তাক্ত করেছেন, সেই অন্তর্নিহিত হাহাকার কি কেউ শুনতে পেয়েছে? আমি তো কিছু কথাই পড়েছি। উৎকর্ণ আমি কি শুনতে পেয়েছি, সেই অন্তর্নিহিত কথা?

একটা জিজ্ঞাসা : সেই আদিতে "আপনি অনেক ভালবাসা পেয়েছেন না?"

হাসি ছাড়া কী-ই জবাব ছিল সেই জিজ্ঞাসার। তবু মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "না। কোথায় আর পেলাম?"

"লোকটা আপনি ভারি মিথ্যুক।" ভারতের রাজধানী, দিল্লিনগরীতে, ওঁর নিজ শয্যায় শুয়ে সেই আদি অভিযোগ, পেয়েছেন, ভালই তো। ও বস্তু তো আর কেড়ে নেবার নয়। বিষটিষ খেলে, ওরকম আমিও হয়তো পেতাম।

আদিতে বুঝতে অসুবিধে হত। লোকটার কথার কোনও থই পেতাম না। মনে হত,

মানুষটার থইও পেতাম না। সব কথাকেই মনে হত, হেঁয়ালি। এক রকমের হেঁয়ালি তো বটেই। গূঢ় ভাষাই যার নাম। বাউলের কোন কথাটাই বা সুবোধ্য? চর্যাপদের ভাবদশাগ্রস্ত কবির কোন কথাটা বোধ্য?

বিষ খেয়েছি কিনা জানি না। নিজেই তো বিষ। এই সামান্য ইঙ্গিতটা আদিতে বুঝতে পারিনি।

না, আদি মধ্য অন্ত, এত ধাপে ধাপে যাবার সময় আমার নেই। প্রাগ-অন্তঃকালে, আবার সেই জিজ্ঞাসা ফিরে এসেছে। ভুল হল। জিজ্ঞাসা না। চোখে আর ঠোঁটের হাসিতে বিদ্রূপ : "কতই পেলি ভালবাসা / তবু না তোর মেটে আশা..."

জবাব একটা দেবার আগেই ধমক : "শোন রাসকেল। গানটা তোর মুখে আমি শুনিনি। শুনে এসেছি, কয়েকদিন আগে নৈহাটিতে, একজনের মুখে। যার পায়ের ধুলোর যুগ্যি তুই নোস। অথচ জানতাম, সে যখন গাইছিল, তখন কার মুখ তার চোখের সামনে ভাসছিল। কিন্তু জেনে রাখিস মহব্বত কা বাহাদুর। শেষের জন্য রয়ে গিয়েছে, শুধু একলা ঘরে বসে কাঁদা। একলা ঘরে বসে কাঁদবি। সেদিন আমরা কেউ শুনতে যাব না।"

প্রায় হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিলেন। ছেড়ে দেবার পাত্র আমি ছিলাম না, "তোমারটা কে শুনতে যাবে? অনেকে?"

সেই ভ্রূকুটি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকানোটা কোনওদিন ভোলবার না। এখনও চোখের সামনে ভাসছে। চোখ দুটো কি একটু আরক্ত হয়ে উঠত? টেবিলের আশেপাশে তাকাতেন। পেপারওয়েটটার দিকেই নজর বেশি যেত। ছুঁড়ে মারবেন? মারলেও কিছু করার ছিল না। আসলে সবটাই যে ছলনা।

এ ছলনাটা অনেকে বুঝতে পারেনি। উজানের নৌকা গুন টেনে নিয়ে যায় যে মাঝি। তার কষ্ট কোনওদিন সওয়ারি বুঝতে পারেনি। গুন টানা মাঝির সেই মাথা নিচু। ঘাড়ে নৌকার জোয়াল। সারা গায়ের সর্পিল পেশীগুলো ফেটে ফেটে পড়ে গেল। দিকভ্রান্তি তার নেই। অথচ ভ্রান্ত লোকেরাই মাঝিটার সামনে দাঁত বের করে, নৌকার অনায়াস গতির ফন্দিফিকির বলে। অথবা এমন কথা বলে, মাঝির মেজাজ ঠিক থাকে না। গেট আউট, ইউ সোয়াইন। ইউ গেট আউট অন মাই সাইট।

একটু বোধহয় পার্শিয়ালিটি হয়ে গেল। কেবল উজানে গুন টানার কথাটাই বলেছি। প্রতিক্ষণের রক্তক্ষরণের কথা তো বলিনি। সেই যে ছলনাটা।

হাসতে হাসতে তুই ওর (কোনও তরুণী) সঙ্গে কোনওদিন মেশবার সুযোগ পেয়েছিস?

আমি 'না।'

'হা হা হা। তুই সেই মেয়েটির গালে গাল রেখে কোনও দুপুর কাটিয়েছিস, কলকাতার গঙ্গায় নৌকোর ছইয়ের ছায়ায় বসে?'

'না।'

'হা হা হা! সেই যে সেই রমণী, ঠোঁটে হালকা পানের দাগ? কোনও নিরালা দুপুরে তার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিস? সে দরজা খুলে তোকে ভেতরে নিয়ে গেছে?'

'না।'

'হা হা হা! তোর লেখা বই নিয়ে কোনও রূপসী বিদুষী কোনওদিন চুমো খেয়েছে?'

'না।'

'হা হা হা!....'

'শেষের সেই দিনটায় কি একলা ঘরে বসে কাঁদতে হবে না?'

'কফিতেই বদলে যেত চোখ মুখের চেহারা। চোখ বরাবরই সহজেই হয়ে উঠত আরক্ত। ভ্রূকুটি সন্দেহ সেই চোখের মানে?'

'মানে, এরপরেও কি শেষের দিনে একলা ঘরে বসে কাঁদতে হবে না?'

'বিদ্রূপ?'

'তা কেন?'

'বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে।'

'আমি বরাবরই হুকুমবরদার না হয়েও হুকুমবরদার। সোজা উঠে একেবারে দরজার কাছে।'

'জবাবটা শুনে যা।'

'ফিরে দাঁড়াই। সে মুখ, সে মুখ না! সেই মুখ দেখিয়াছি আমি। চোখ আরক্ত। কিন্তু সেই ক্রোধ নেই। বিদ্রূপ নেই ঠোঁটে। চোখে কি বাষ্পের ছায়া? ঠোঁটে কি বাতাসের ঝাপটা? আর চেষ্টা, ধরে রাখা একটু হাসি ; জানিস, শেষের সেই দিনের জন্য আমি বসে নেই। আমার ঘর সব সময়েই ভরা দেখলি। শূন্যই তো দেখলি না। বড় অহঙ্কার? সত্যি তোকে যে কী ঘৃণা করি! বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা।'...

এই কথাগুলোর প্রতিধ্বনি বেজে উঠল বিসর্জনের বাজনার তালে, 'যাত্রাভঙ্গ যাত্রাভঙ্গ যাত্রাভঙ্গ।'

'যাত্রাভঙ্গ'-এর সেই মানুষটাকে দিয়ে শুরু করতে গেলে, আমি থামতে পারব না। কালের—মহাকালের যাত্রায়, 'যাত্রাভঙ্গ' একেই তো আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এক গল্প। গল্প চেনাটা পাঠকের চোখ দিয়ে। কিন্তু অন্য চোখে তাকিয়ে দেখি, ওটা রক্ত দিয়ে লেখা। কিন্তু যাত্রাভঙ্গ হল কোথায়? এক অজ্ঞাত অন্ধকারের জবাবহীন, পরিচয়হীন, শূন্যতার সামনে শান্ত তুমি। কেবল ছাড়তে পারলে না ওকে। অথচ জানতে...। জানতে না? অথচ কোন অজ্ঞাত অশেষ পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমারই ভয় করছে।

'অথচ জানতে। জানতে না?'

সন্তোষ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সেটা কত সাল হবে?

উনিশশো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে বোধ হয়। গানটান নয়, তখন চুটিয়ে গল্প লিখছি। সেসব গল্প ছাপাও হচ্ছে এখানে ওখানে। লেখালিখির জন্য বন্ধুদের কাছে বেশ খাতির-টাতিরও পাচ্ছি। সুধাংশু সেনগুপ্ত, জগৎ দাশ, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দু-চারজন বন্ধু নিয়ে 'কল্যাণ সঙ্ঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক চক্র তৈরি করেছিলাম। প্রতি সপ্তাহেই আমরা এই সঙ্ঘে সাহিত্যসভা করতাম। গল্প-কবিতা পড়তাম। সাহিত্যের নামে তখন টগবগ করে ফুটছি। গান গাইব, গায়ক হিসেবে নাম করব—মাথার মধ্যে তখন এসব ভাবনাই ছিল না। সন্তোষের সঙ্গে সেইসময় আমার আলাপ। প্রথম আলাপেই ওকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। সেই ভালবাসা এতকাল, মানে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে জিইয়ে রেখেছিলাম, এতটুকু চিড় ধরেনি।

সন্তোষের মত বন্ধু পাওয়া সত্যিই খুব ভাগ্যের ব্যাপার। ওর মত প্রাণখোলা সরল মানুষ আমি জীবনে দুটি দেখিনি। ওর রাগ, অভিমান, আহ্লাদ সবই ছিল শিশুর মত। যে কোনও কঠিন বিষয়কে ও সরস করে বলতে পারত। যে কোনও সভা, সে যে ধরনের সভাই হোক না কেন, তাকে অনায়াসে সন্তোষ জীবন্ত করে তুলতে পারত।

অমিতাভ চৌধুরী কোথায় যেন লিখেছেন, সন্তোষকুমার ভারতের শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাংবাদিক। আমি ওর সঙ্গে একমত। সাংবাদিকতার ধারাটাকেই সন্তোষ একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। শুধু বাংলা নয়, সন্তোষের মত ইংরেজিই বা ক'জন লিখতে পারেন? ইংরেজি বাংলা এই দুই ভাষারই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সন্তোষকুমার দু'হাত ভরে আমাদের দিয়েছে।

ওর লেখা নিয়ে আমি ওকে বহুবার তিরস্কার করেছি। একবার বলেছিলাম, "কী সব ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লেখো, ল্যাজামুড়ো কিছু বুঝতে পারি না, একটু সহজ করে লিখতে পারো না?' সন্তোষ প্রতিবাদ করেনি আমার কথার, শুধু মৃদু হেসেছিল।

আমার গান ভারি পছন্দ করত সন্তোষ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান। এই গান নিয়েও ওর সঙ্গে আমার তর্ক-বিতর্ক কম হয়নি। তর্ক করেছি যত, লাভ হয়েছে তার বহুগুণ। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান—সব গুলে খেয়েছিল সন্তোষ। যে-সভাতেই ওর সঙ্গে আমার দেখা হত, 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' গাইবার জন্য ফরমাশ করত। সত্যি, এরকম গানপাগলও আর দুটি দেখিনি।

আমার এতকালের বন্ধু সন্তোষ চলে গেল। বড় তাড়াতাড়ি এই চলে যাওয়া। যেখানেই থাকুক—ও ভাল থাকুক, সুখে থাকুক—কোনও অসন্তোষ যেন ওকে স্পর্শ না করে।

অনুলিখন : শ্যামলকান্তি দাশ

সন্তোষ ঘোষ মানুষটা

অহিভূষণ মালিক

সেই সত্যযুগের কথা বলছি। এখনকার সত্যযুগ নয়, সে সত্যযুগের মালিক ছিলেন রামকৃষ্ণ ডালমিয়া, জেনারেল ম্যানেজার প্রতাপকুমার রায় এবং সম্পাদক সত্যেন মজুমদার। সত্যযুগে কাজ করতাম আমি, গৌর ঘোষ, নীরেন চক্রবর্তী। যতদূর মনে পড়ছে সন্তোষ ঘোষের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ওই সত্যযুগ অফিসে। অফিস ছিল ২১, কনভেন্ট রোড। তারপর থেকে কত ঘটনাই না ঘটে গেছে, কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সন্তোষ ঘোষ তখন স্টেটসম্যান কাগজের জুনিয়র সাব এডিটর। প্রতাপকুমার রায়ের সাথে সন্তোষবাবুর বহুদিনের আলাপ। প্রতাপবাবু এক সময় কালান্তর নাম দিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা চালাতেন, সন্তোষ ঘোষ ছিলেন ওই মাসিক পত্রিকার লেখক। কালান্তর নামটাও তো পরবর্তী কালে ধার করা হয়েছে। সত্যযুগ অফিসে সন্তোষ ঘোষের আসা-যাওয়ার কারণ শুধু প্রতাপ রায়ই না, নীরেন চক্রবর্তী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গৌর ঘোষের সাথে সন্তোষ ঘোষের যে কবে থেকে আলাপ তার হিসেব রাখিনি, তবে সন্তোষ ঘোষকে গৌর ঘোষ হঠাৎ, সত্যযুগ অফিসেই সেজদা বলে ডাকতে শুরু করল ; বড়দা নয়, মেজদা নয়, নদা নয়, ছোড়দা নয়, সেজদা। কেন? তার জবাব একমাত্র গৌর ঘোষই দিতে পারবে। সন্তোষ ঘোষের ওপর আমাদের বিলক্ষণ হিংসে ছিল, সাহেবি কাগজের কর্মী, মোটা মাহিনা নিশ্চয়! আসতেন উনি কেতাদুরস্ত হয়ে স্যুট পরে। আমরা তখন মাহিনা পাই একশো পঁচিশ টাকা করে, তাও আবার তিন-চারটে কিস্তিতে। নীরেন চক্রবর্তী আর গৌর ঘোষের বন্ধু, সুতরাং আমার সাথেও ওঁর ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হল না। বিশেষ করে, আমি গান গাইতাম বলে! তখন আমি সুবিনয় রায়ের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালিম নিচ্ছি। সমীরণ মজুমদার, আমার সম্পর্কে আত্মীয় হলেও ছেলেবেলার বন্ধু। সমীরণ বা শম্ভুই আমাকে, প্রায় হাত ধরেই বলতে হবে, নিয়ে যায় সুবিনয় রায়ের কাছে। সন্তোষ ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন। সুর সম্বন্ধে ওঁর খুবকিছু জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না, অনেক ভুলভাল গাইতেন কিন্তু সন্তোষ ঘোষের প্রশংসার অন্ত ছিল না। গৌর ঘোষ আমার আরেক মস্ত গুণগ্রাহী। সন্তোষ ঘোষের বাড়ি গৌরের যাতায়াত ঘনঘন ; আমি যে সব সময়েই গৌরের সঙ্গ নিতাম তা নয়, তবে প্রায়শই থাকতাম ওর সাথে। গান শোনাতে হত সন্তোষ ঘোষকে এবং ওঁর গৃহিণীকে। শ্রীমতী ঘোষের আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ছিল না।

একদিন সমীরণ এল সত্যযুগ অফিসে, ওদের 'দক্ষিণী' রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন করছে, ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতাপ রায় মশাই শুনে বললেন সত্যযুগে একটা

ক্রোড়পত্র হোক রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষে। সম্পাদনার ভার, বোধকরি পড়ে নীরেন চক্রবর্তীর ওপর। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তি হাতের কাছে কোথায়? কাকে দিয়ে প্রবন্ধ লেখানো হবে? সমীরণ অভয় দিল, সব লেখা সেই-ই জোগাড় করে দেবে। সত্যযুগের ব্যবস্থা তো হল, এবার অন্য কাগজে সমীরণ কার মাধ্যমে যোগাযোগ করবে? আমাদের হাতের লোক সন্তোষ ঘোষ, স্টেটসম্যানে অসুবিধে হবে না। সন্তোষ ঘোষ স্টেটসম্যানের এক অতি ক্ষুদ্র কর্মী, এ বিষয়টা নিয়ে তৎকালীন সাহেব বার্তা-সম্পাদকের সাথে কথা বললেন চিফসাব এস বি চ্যাটার্জি। এস বি চ্যাটার্জির সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় অবশ্যই সন্তোষ ঘোষ মাধ্যমে। ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশন আর রাসবিহারী এভিনিউ-এর মোড়ে দক্ষিণী সঙ্গীত শিক্ষায়তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষে প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছে ওই খানেই। আমরা দু'জনে, সন্তোষ ঘোষ এবং আমি আমন্ত্রিত হয়েছি, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে নয় ; সমীরণ বলে গেল তোমাদের জন্যেই তো আজ আমাদের প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হল তাই তোমাদেরও আসতে বললাম। আমরা একটু বেশি আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম, সময় কাটাতে বসলাম গিয়ে দেশপ্রিয় পার্কে। সন্তোষ ঘোষকে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠান থেকে তখন ডাকা হচ্ছে দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে বার্তা-সম্পাদনার দায়িত্ব নেবার জন্যে। দেশপ্রিয় পার্কে বসে উনি শুধোলেন, কাজটা কী ঠিক হবে। আমার উত্তর, "আপনার মাথা খারাপ হয়েছে? স্টেটসম্যানের চাকরি ছেড়ে আপনি যাবেন দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে?" ওঁর জবাব, "আমিও সেই কথাই ভাবছি, স্টেটসম্যান ছেড়ে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে যোগ দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।" দক্ষিণী প্রেস কনফারেন্স নির্বিঘ্নে শেষ হল, আমি ফিরে গেলাম আমার বাসস্থানে, সন্তোষ ঘোষ গেলেন ওঁর অফিসে, নাইট ডিউটি ছিল। কিন্তু পরের দিনই সন্তোষ ঘোষের মত পাল্টে গেছে, কেন আমি বলতে পারব না, উনি রওনা দিয়েছেন দিল্লি। দিল্লিতে সন্তোষ ঘোষ কতকাল ছিলেন মনে নেই, উনি কলকাতায় ফিরে এলেন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হয়ে। এর মধ্যে কলকাতার প্রেস-পটভূমিকার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, নীরেন চক্রবর্তী আনন্দবাজারে যোগ দিয়েছে, গৌর ঘোষ আনন্দবাজারের রিপোর্টার হয়ে পুলিশের হাতে প্রহার খেয়েছে। সত্যযুগ কাগজ উঠে গেছে। সত্যযুগ কার্যালয় থেকে টাইমস অব ইন্ডিয়ার কলকাতা সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছিল, এক প্রভাতে যথারীতি অফিস করতে বেরিয়েছি, দেখি অফিসের গেটে প্রকাণ্ড বড় তালা, নোটিস ঝুলছে 'আজ থেকে টাইমস অব ইন্ডিয়া, সত্যযুগ এবং নবভারত টাইমস-এর প্রকাশনা বন্ধ'। পাশের ছোট্ট দরজা দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম, দেখি প্রতাপদা, প্রতাপ রায় মশাই দিব্যি হাসছেন, ওঁর সামনে বসে আছেন সৈয়দ মুজতবা আলি। সৈয়দদা বললেন "চটপট একটা কার্টুন এঁকে ফেল, প্রতাপ উপুড় হয়ে পড়ে আছে, আর ওর পিঠে ঢোকানো একটা মস্তবড় ছোরা।"

চাকরি নেই, আনন্দবাজারে ঘোরাঘুরি শুরু করেছি। সন্তোষ ঘোষ বার্তা-সম্পাদক হবার পর আবার ওঁর সাথে আনন্দবাজারে দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, কিন্তু আগেকার সেই উষ্ণতাটা

আর নেই, উনি অনেক ওপরতলায় উঠে গেছেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতেও এক বড়সড়ো বোদ্ধা বলে সম্মানিত। স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা ওঁকে দারুণ খাতির করে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে ওঁকে প্রায়শই যেতে হয় প্রধান অতিথি হয়ে। দেখি, আমার একদা রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুদেবও সন্তোষ ঘোষকে কম খাতির করছেন না। খবরের কাগজের মানুষকে, বিশেষ করে বার্তা-সম্পাদককে, শিল্পীরা তো খাতির করবেনই। আমি বার্তা-সম্পাদক হতে পারিনি, সামান্য চারুকলা সমালোচক, আমারই কি কম খাতির? এক সিনিয়র মহিলা শিল্পী একবার বলেই ফেলেছিলেন সংবাদপত্রের সমালোচকরাই হলেন ওঁদের ভাগ্যবিধাতা।

সন্তোষ ঘোষ কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। কবিতা, সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ওঁর অবদান কে অস্বীকার করতে পারবে? আজ বাংলা সাংবাদিকতায় যে রীতির প্রচলন, তা এক বাক্যে সবাই বলবেন সন্তোষ ঘোষেরই সৃষ্টি। আমি ওঁর সাহিত্যের সাথে পরিচিত হই সেই প্রতাপ রায় সম্পাদিত কালান্তরে। আমাকে ওই পত্রিকার অলঙ্করণ করতে হত। সন্তোষ ঘোষকে বার কয়েক দেখেছিলাম সিমলা স্ট্রিটের গ্রন্থভবন ছাপাখানায় কালান্তরের কার্যালয়ে। তখনও আলাপ হয়নি, কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে দারুণ শ্রদ্ধা হয়, ওঁর লেখা পড়ে। কালান্তর অফিসেই দেখা হয় প্রথম নরেনদা, নরেন মিত্রের সাথে। আর ওই কালান্তর অফিসেই দেখি গৌর ঘোষকে ছেঁড়া জামা আর ভারী পুরু গ্লাসের চশমা পরা। সমরেন রায়ের সাথে গৌর আসে, যদি ছিটেফোঁটা কিছু লেখার কাজ পাওয়া যায় এই আশায়। সন্তোষ ঘোষ মানুষটা কী ছিলেন সে সম্বন্ধে আর একটা কথা বলেই আমার কথা শেষ করব। দিব্যেন্দু পালিত তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রুফরিডারের চাকরি করে বিজ্ঞাপন বিভাগে। হঠাৎ তার চাকরি গেল। বিনা দোষেই চাকরি গেল। আমিই তাকে পরামর্শ দিই, কয়েক বছর ধরে অস্থায়ীভাবে চাকরি করছে, পাকা চাকরির আবেদন করে সে দরখাস্ত পেশ করুক, কিন্তু ফল হল—গেট আউট। নিমিত্তের ভাগি আমি বললাম, ভাই দিব্যেন্দু, প্রুফরিডারের চাকরি গেছে, ভালই হয়েছে, তুমি অনেক বড় হবে। আজ দিব্যেন্দু স্টেটসম্যান প্রতিষ্ঠানের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ম্যানেজার। আমার ভবিষ্যৎ বাণীটা মিলে গেছে। সেটা আসল বক্তব্য নয়, বক্তব্য হল, দিব্যেন্দুর আনন্দবাজারের চাকরি যাবার পর, কোনও ভাবে সন্তোষ ঘোষের কানে আসে, দিব্যেন্দুর বিশ্বাস ওঁর লাগানিতেই তার চাকরিটা গেছে। সন্তোষ ঘোষের সাথে দিব্যেন্দুর বাক্যালাপ বহুদিন থেকেই বন্ধ চলছিল, ওরকম কথাবন্ধ অনেকের সাথেই সন্তোষ ঘোষের হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতকে আনন্দবাজারের লিফটের সামনে দেখতে পেয়ে উনি লিফট থামিয়ে নেমে এসে বলেন, 'দেখুন, শুনেছি আপনি মনে করছেন আমিই আপনার চাকরি খেয়েছি। চাকরি দিতে পারি না, চাকরি খাব! এতটা নীচ আমাকে মনে করবেন না।' আর সন্তোষ ঘোষ একটিও কথা নয়, লিফটে ফিরে গেলেন।

প্রয়াত সন্তোষ ঘোষের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলাম, যা এতক্ষণ বললাম, ওঁর ওপর অগাধ শ্রদ্ধা নিয়েই বলেছি, যদি কেউ কোনও ভাবে ব্যথা পেয়ে থাকেন আমি তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষার্থী।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

১. সন্তোষের সুখ অসুখ ইত্যাদি

আমাদের অনেকের তুলনায় সন্তোষের স্বাস্থ্য ভাল ছিল। তার হাতের কবজি এবং বুকের ছাতি, দুই-ই বেশ চওড়া ছিল। তার বালককালের কথা জানি না, কৈশোরে অনেকের মত সেও ম্যালেরিয়ায় ভুগত। তারপরে তার তেমন কোনও অসুখ হয়নি। একবার খুব সম্ভব, ১৯৪২-এ, সন্তোষ তখন মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে থাকত, তার প্যারা টাইফয়েড হয়েছিল। বছর সাত-আট পরে আর একবার তার এই অসুখ করেছিল। সে তখন টালিগঞ্জে, আদি গঙ্গার কাছে, একটা ভাড়া বাড়িতে থাকত। এর পরে প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর তার তেমন কোনও অসুখ হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৭১ কি ১৯৭২ সালে উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জ কলেজে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে, সেখানে সে প্রথম বুকে ব্যথা বোধ করেছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন তাকে দ্রুত কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য সন্তোষ সেই প্রথম বেলভ্যু নার্সিংহোমে ঢুকেছিল। তারপর থেকে তাকে প্রত্যেক বছর দু-তিন বার বেলভ্যুতে ভর্তি হতে হত। তার মূল অসুখ ছিল হার্টে, সঙ্গে ডায়াবেটিস ছিল। ডক্টর বক্সী বরাবর তার চিকিৎসা করতেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সন্তোষ শেষ বারের মত বেলভ্যু থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর কোনওদিন সে সেখানে ফিরে যাবে না।

গত বারো-তেরো বছর ধরে সন্তোষকে দেখেছি, সে আমাদের মত হাঁটাহাঁটি করতে পারত না। সামান্য হাঁটলেই তার বুকে ব্যথা হত। পকেটে সরবিট্রেট থাকত। তাই খেত।

তবুও তার সম্পর্কে আমার মনে তেমন কোনও উদ্বেগ ছিল না। জানতাম, সে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলছে। জানতাম, সে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসার মধ্যে আছে। আরও একটা কারণে তার সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম এই কারণে, হাস্যকর শোনালেও বলি, তার কোষ্ঠী। সন্তোষের মা আমাকে বলেছিলেন, ওর কোষ্ঠীতে রাজকীয় ঐশ্বর্যের আভাস আছে। কোষ্ঠীর সেই অংশ মিলেছিল দেখেছি। তাতে আরও ছিল যে, সন্তোষ দীর্ঘজীবী হবে। ও একদিন আমাকে বলেছিল, আমরা চলে যাব, সে থাকবে। তা হয়নি। দুঃশাসন ক্যানসার সবাইকেই নেয়। তাকেও নিয়ে গেছে।

অথচ সন্তোষ থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু যেমন তেমন করে বেঁচে থাকতে চায়নি। ডাক্তারকে সে বলেছিল, যদি আগের মত বেঁচে থাকতে পারি, তাহলে তার ব্যবস্থা করুন। না হলে, শুধু বাঁচার জন্য বেঁচে থাকতে চাই না।

এই নার্সিংহোম, গত কয়েক বছরে তার দ্বিতীয় গৃহ হয়ে উঠেছিল। এর আগে

যতবার সে এখানে এসেছে তাকে দেখতে গেলে, কে রোগী চেনা যেত না, নিজেকে রোগী বলে মনে হত। এ সম্পর্কে আনন্দবাজারে, কলকাতার কড়চায় ৯ এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে "এক ঝিল, অনেক পাখি" শিরোনামে লিখেছিলাম, "একজন কৃতী সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক এখন এই শহরে একটি নার্সিংহোম-এ চিকিৎসাধীন আছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে একটি সুইট-এ তাঁকে ঘিরে একটি মনোরম এবং অভিনব পরিবেশ রচিত হয়। এতে বিশেষ করে সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে চিত্র ও মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও সেখানে দেখা যায়। যারা অটোগ্রাফ শিকার করে বেড়ায় তারা এখনও এই ঠিকানাটার সন্ধান পায়নি। পেলে, তারা এখানে, একটি ঝিলে অনেক পাখি ধরতে পারত।

যিনি এই পরিবেশের মধ্যমণি, তিনি, সুস্থ শরীরে যেমন, অসুস্থ শরীরেও তেমনি, তির্যক সরস। কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীন বাক্যবন্ধে, নব্বুই মিনিট কাল সকলকে আপ্যায়িত করেন, আপ্লুত রাখেন। অন্য সকলে প্রসন্ন হাসিতে, যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, তাঁরা দু-তিনটি গান গেয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। এই শহরে সান্ধ্য অনুষ্ঠানগুলিতে যাঁরা যোগ দেন, তাঁদের মনে হবে, জানুয়ারির শেষ দিকে একটি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত উৎসবের একটি খণ্ডচিত্র এখানে অন্য ফ্রেমে বাঁধা পড়ে আছে।"

১৯৮৪ ডিসেম্বরে, ১৯৮৫ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে সেই নার্সিংহোম, সেই সুইট, সবই আগের মত ছিল। শুধু সন্তোষ, আর তাকে যারা দেখতে যেত, তারা আর আগের মত ছিল না। একটা মন্থর, ম্রিয়মাণ আবহ ধীরে ধীরে সেই সুইটকে আচ্ছন্ন করেছিল। যে সন্তোষ পূর্বে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে অনর্গল কথা বলত, সে তখন বাক্‌শক্তিহীন। আর সন্তোষ যেখানে হতবাক, অন্যরা স্বভাবতই সেখানে বিমূঢ়।

ক্যানসারে রোগীর খুব কষ্ট হয় জানি। পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর সন্তোষ যখন কাশত, তখন সে শুধু নিজে কষ্ট পেত না, কাছে যারা থাকত, তাদেরও খুব কষ্ট হত। কিন্তু অন্য সময় সে যে খুব কষ্ট পাচ্ছে, তার চোখমুখ দেখে তা বোঝা যেত না। দিনলিপিতে যে যন্ত্রণার কথা সে লিখেছে, তার চোখেমুখে তা ফুটে উঠতে দেখিনি। মৃত্যুকে ধ্রুব জেনেও, কীভাবে এক পা এক পা করে তার দিকে এগিয়ে যেতে হয়, বীরের মত তাকে বরণ করতে হয়, তার নির্ভুল নিশানা সে আমাদের জন্য রেখে গেল।

সন্তোষের অসুখের কথা লিখে আর কী হবে। এখন বরং তার সুখের কথা কিছু বলি। সে সবচেয়ে সুখী হত লিখে। লেখার আনন্দে সে লিখত। বই বিক্রির কথা ভাবত না। কোনও পুরস্কারের কথা তো নয়ই। তবুও দুটো পুরস্কার অন্তত সন্তোষ পেয়েছিল। একাদেমি পুরস্কার এবং আনন্দ পুরস্কার। একদিন সন্ধ্যায় আনন্দবাজারে টেলিপ্রিন্টারে যখন তার একাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তির খবর আসে, তখন আমি তার ঘরে ছিলাম। সে উচ্ছ্বসিত ভাবে আমাকে খবরটা জানিয়েছিল। তারপর বাড়িতে টেলিফোন করেছিল। লক্ষ করেছিলাম, তার সেই উচ্ছ্বাস ছিল একান্ত তাৎক্ষণিক। সন্তোষ যে আনন্দ পুরস্কার পাবে, সেই খবর, সরলা মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত সভার পূর্ব পর্যন্ত তার কাছে গোপন রাখা

হয়েছিল। সভায় যখন পুরস্কার প্রাপক হিসাবে তার নাম ঘোষণা করা হল, তখন তার চোখেমুখে যে কৌতূহল উঁকি দিতে দেখেছিলাম, এখনও তা আমার মন থেকে একেবারে মিলিয়ে যায়নি। যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি এই সব পুরস্কারকে বিশেষ মূল্য দেন না। সন্তোষও দেয়নি। তবুও অন্যরা যখন পাচ্ছেন, তখন সে না পেলে নিশ্চয়ই তার খুব খারাপ লাগত। সুতরাং পুরস্কার পেয়ে তার ভাল লেগেছিল বৈকি। কিন্তু তার লেখার জন্য প্রকৃত পুরস্কার সে অন্য ভাবে পেতে চাইত, এবং মাঝে মাঝে পেত। এ সম্পর্কে তার একটি অভিজ্ঞতার কথা সে আমাকে বলেছিল, এবং আমি "কড়চায়" ৭-৫-৭৩-এ তাকে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। "একজন লেখক তিন যুগ আগে যখন লিখতে শুরু করেন, তখন তিনি একটা গল্প লিখে পাঁচ টাকা পেতেন। এখন পাঁচশো পান। চাইলে হাজার টাকাও পেতে পারেন। অথচ তাঁর বই তেমন বিক্রি হয় না। তাই তাঁর মনে হয় বই ছেপে তিনি যা পান না, লিখে তাই পেয়ে যান। তাঁর একদিকের ক্ষতি, অন্যদিকে এই ভাবে পূরণ হয়। ঈশ্বর তাঁকে লেখার পুরস্কার থেকে কখনও বঞ্চিত করেননি, করেন না।

এই ভাবেই চলছিল। শেষে এক দিনের সামান্য একটি অভিজ্ঞতা তাঁর এত দিনের সব পাওনাকে ছাপিয়ে গেল। তিনি পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে সমুদ্রের ধারে একটি অভিজাত হোটেলে উঠেছিলেন। একদিন বিকেলে তিনি দেখলেন, বারান্দায় ইজিচেয়ারে একজন বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি একদা ছিল, এখন নেই। পাশে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে, হয়তো নাতনি, তাঁর শেষ উপন্যাসটির অংশ বিশেষ তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছে। লেখকের মনে হল, এর চেয়ে পবিত্র, এবং মহৎ পুরস্কার তিনি কোনওদিন পাননি।"

সন্তোষ আমার কাছে কী ছিল, তা লিখে বোঝানো সহজ নয়। আমার সদ্য প্রকাশিত একটি ইতিহাসের বইয়ের নিবেদনে আমি তাকে অর্ধশতাব্দীর অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলে উল্লেখ করেছি। তবুও আমার মনে হয়, যথেষ্ট বলা হলেও, সব কথা সেখানে বলা হয়নি। বলতে ইচ্ছে করে, ফ্রেন্ডশিপ কুড গো নো ফারদার। সন্তোষও আমাকে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে মনে করত। অন্যের কাছে আমার পরিচয় সে এই ভাবেই দিত। কিন্তু আমাদের এই সম্পর্ককে লালন করার দায়িত্ব সে কোনওদিনই তেমন নেয়নি। শুধু আমার সম্পর্কেই নয়, অন্যত্রও তার স্বভাবে, এ বিষয়ে খানিকটা শৈথিল্য ছিল। হয়তো কিছুটা অনধিকার চর্চা হবে, তবুও বলি যে, তার সংসারকে সে যতটা পালন করেছিল, ততটা লালন করেনি। তার ছেলেমেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বাড়িতে টেলিফোন করতে হত। এটা তার স্বভাবের ত্রুটি, আমি তা বলছি না। সবাই তো সব পারে না। সে আরও পারত না এই জন্য যে, যত দিন গেছে, সে ধীরে ধীরে শিল্পজগতের বাসিন্দা হয়েছিল। শেষ দিকে সে সর্বক্ষণ শিল্পের মধ্যেই বাস করত। তার এই শিল্পময়তা দিনে দিনে তাকে নিঃসঙ্গ করেছিল। এই নিঃসঙ্গতা তাকে পীড়িত করত, এবং তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে নিজেকে আরও শিল্প সর্বস্ব করে তুলেছিল। এ সবই আমি জানতাম এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্বের এই শর্তকে মেনে নিয়েছিলাম। তবুও মনে ক্ষোভ বা অভিমান একেবারে জমেনি, তা নয়।

জমেছিল, এবং অন্তত একবার আজকালের আয়নায় "বন্ধুর পথ" শিরোনামে তাকে এইভাবে প্রকাশ করেছিলাম। দুই বন্ধু। একজন আর একজনের বাড়িতে একদা খুব যেত, খেত, থাকত। এখন যায় না, খায় না, থাকে না। এ জন্য তার আগে কষ্ট হত। এখন হয় না। এখন সপ্তাহে নিয়মমাফিক দেখা হয়। বড় টেবিলটা বরাবর মাঝখানে থাকে। একদিন বন্ধুটি বলল, রবিবার বিকেলে বাড়িতেই থাকব, আসিস। অপরজন উত্তরে হ্যাঁ বা না, কিছুই বলতে পারল না। সে মনে মনে জানত, সে যেতে পারবে না। সে আরও জানত, না গেলে তার বন্ধু সে সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। কিন্তু দেখা গেল, তার হিসাবের শেষে সামান্য ভুল হয়েছিল। আবার যে দিন দেখা হল, সে দিন বন্ধু বলল, সে দিন এলি না যে। আমি সারা বিকেল বাড়িতেই ছিলাম। ওর মনে হল, এ ভাবে নয়। আমি যাব বলে আবার যদি কোনওদিন বাড়িতে থাকিস, সেদিন যাব। আমাদের যা মনে আসে, তার সামান্য অংশই বাইরে প্রকাশ করা যায়। তাই এই কথা তার মনে এলেও, সে মুখে তা উচ্চারণ করতে পারল না। থুথুর সঙ্গে সে তার কথাকেও গিলে ফেলল। (১১-৮-৮২)

সন্তোষ নিজে লিখতে ভালবাসত। অন্যের লেখা পড়তে তার ক্লান্তি ছিল না। তবুও আমার মনে হয় সে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিত প্রেমকে। এই প্রেম, সন্তোষের বয়স যখন মাত্র উনিশ-কুড়ি, একবার নিঃশব্দ চরণে তার কাছে এসেছিল। সন্তোষ সেই প্রেমের পরিপূর্ণ মূল্য দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি, সামাজিক বাধা থাকায়, ততটা চায়নি। কাকতালীয় হলেও, সন্তোষের স্বভাবে যে অস্থিরতা, তার সূচনা তখনই হয়েছিল। তারপর যতদিন গেছে, এই অস্থিরতা কখনও বেড়েছে, কিন্তু একেবারে যায়নি। এখন মনে হয়, সন্তোষ তার অস্থিরতা কাটিয়ে উঠুক, আমাদের মত শান্তশিষ্ট হোক, আমরাও বোধ হয় তা চাইতাম না। কেননা, এই অস্থিরতা তার স্বভাবে একটি অতি আকর্ষণীয় মাত্রা যোগ করেছিল। তার খরচে তার অস্থিরতাকে উপভোগ করেছি, এ কথা ভাবলে এখন নিজেকে মাঝে মাঝে অপরাধী মনে হয়।

সন্তোষ নিজে ছিল প্রেমিক। তাই অন্যত্র এই প্রেমের পরিচয় পেলে, তাকে সম্মান জানাতে তার মুহূর্ত দেরি হত না। এ সম্পর্কে একদিনের একটি কাহিনী, সে আমাকে বলেছিল। অন্তত তিন বছর আগের কথা। ওর একমাত্র ছেলে, টিটো, বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতা থেকে কয়েকশো মাইল দূরে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল। যেদিন যে ট্রেনে, তার ফিরবার কথা, সে ফেরেনি। সন্তোষ উদ্বিগ্ন হয়ে তার নিউ আলিপুরের বাসা থেকে টেলিফোনে যতটা সম্ভব খোঁজখবর নিয়েছিল। এই সময় সকাল নয়টা-দশটা আন্দাজ দুটি মেয়ে টিটোর খোঁজে তাদের বাসায় এসেছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ে মুখে ফরফর করছিল। সন্তোষকে বলছিল, এটা করুন, ওটা করুন। আর একটি মেয়ে কোনও কথা বলেনি। সে সন্তোষের ঘরের দরজায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। আর ওর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছিল। সন্তোষ আমাকে বলেছিল, এই হচ্ছে প্রেম। এবং এই প্রেমকে আনন্দে স্বীকৃতি দিতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। আজ প্রায় আড়াই বছর হল, সেই মেয়েটি, মঞ্জরী, সন্তোষের পুত্রবধূ।

২. সন্তোষের সকাল

১৯৮৪ ডিসেম্বরে সন্তোষ যখন বোম্বাই থেকে ফিরে একটি নার্সিংহোমে ছিল, তখন তাকে নিয়মিত দেখতে যেতাম। প্রথম যেদিন যাই, তখন সে কথা বলতে পারত না। যা বলার, সাদা কাগজে পেনসিল দিয়ে লিখত। প্রথম দিন আমার জন্য যে কয়েকটি কথা সে লিখেছিল, তাকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব। সে লিখেছিল, এই অসুখটা করে আমার উপকার হল। দিনলিপি লিখলাম। তোকে পড়াব। এই কথাগুলি থেকে, লেখাকে সে কী চোখে দেখত, আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কত নিবিড় ছিল, তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখাই ছিল সন্তোষের জীবনের পরম আনন্দ। সে যখন লিখতে পারত না, তখন সে অসন্তুষ্ট, অস্থির হয়ে উঠত। এই অবস্থায় সে আমাদের মত সাধারণ মানুষের চোখে না করতে পারত, এমন কাজ নেই। অন্য অনেক ব্যাপারেও তার ঘোরতর অসন্তোষের কারণ ছিল বলে সে মনে করত। তার সম্পর্কে যে সব কাহিনী প্রচলিত, তার মূলে ছিল এই স্বর্গীয়, প্রায় সর্ব্বব্যাপী অসন্তোষ।

সন্তোষের ছোটবেলায়, সে যে এমন হবে, অনুমান করা যায়নি। সে ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, চঞ্চল অথচ লাজুক। ১৯৩২ থেকে ১৯৮৪, ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। সর্বদা এক জায়গায় থেকেছি, বা নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ বা পত্রালাপ হয়েছে, তা নয়। তবে যেখানে যে ভাবেই থাকি, তাকে নিত্য স্মরণ করেছি। আমাদের পারিবারিক কথাবার্তায় তার নাম বার বার উচ্চারিত হত। আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে আমার বিশেষ মিল ছিল না। ভবানীপুর দেনা ব্যাঙ্কের ওপরে যখন সে থাকত, তখন একদিন রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে আমাকে এই কথা বলেছিল। বলেছিল, তবুও কোথায় যেন একটা গভীর মিল আছে। সে যাই হোক, তার বন্ধুত্বকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করি।

১৯৩২-এ সন্তোষ ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি শহরে রাজা সূর্যকুমার ইন্সটিটিউশনে (স্থাপিত ১৮৮৮) সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুল থেকে সামান্য দূরে তার দাদুর বাড়িতে সে তার মায়ের সঙ্গে থাকত। মায়ের বাবা, রামচন্দ্র ধর শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত। তাঁকে আমি বেশি দেখিনি। তবে দেখেছি তিনি বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাড়িতে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ইত্যাদির গ্রন্থাবলী ছিল। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাদি ছিল বলে মনে পড়ে না। সন্তোষ যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই তার মধু-হেম-নবীন-বঙ্কিম-শরৎ অনেকাংশে পড়া হয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়ির পাশেই স্কুলের হেডমাস্টার ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল। সন্তোষ যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, তখন তার দাদু মারা যান। তারপর থেকেই ত্রৈলোক্যবাবুই ছিলেন তার প্রকৃত অভিভাবক।

সন্তোষের কাছে শুনেছি ত্রৈলোক্যবাবুর অনুপস্থিতিতে সাময়িক ভাবে যিনি হেডমাস্টার হয়ে এসেছিলেন, তাঁর কাছেই সে ইংরিজি সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিল। ল্যাম্বের শেক্সপিয়র কাহিনী তখনই তার পড়া হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া শেক্সপিয়রের

রচনার কারুকার্য সম্পর্কেও এই ভদ্রলোক সন্তোষকে যথাসম্ভব শিক্ষিত করেছিলেন।

সন্তোষের বাবা সুরেশচন্দ্র ঘোষ কলকাতায় থাকতেন। খেয়ালী মানুষ। জীবনে না করেছেন, এমন কাজ নেই। তবে কোনও কাজেই বেশিদিন টিকে থাকেননি। কিছুকাল সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। যতদূর জানি, কেশরী, বন্দেমাতরম, এই সব পত্রিকার সঙ্গে। সেদিক থেকে বলা যায়, সন্তোষ তার সাংবাদিক জীবন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। তিনি একবার কালি তৈরি করে ব্যবসা শুরু করেছিলেন, দেখেছি। তিনি ছিলেন বরিশালের মানুষ। ঘরে-বাইরে সর্বত্র সর্বদা বরিশালের ভাষায় কথা বলতেন। রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। খুব কম সেখানে যেতেন। যখন যেতেন, তখন সন্তোষ এবং তার মা খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতেন। বাবার প্রতি সন্তোষের মন প্রসন্ন ছিল না। বাবা কিন্তু সন্তোষকে খুবই স্নেহ করতেন। সন্তোষ যখন কলকাতায় কলেজে পড়তে আসে, তখন ১৪, রাধানাথ মল্লিক লেনের এক কামরার বাসায় সন্তোষ ঘুমিয়ে পড়লে তার বাবা গরমের রাত্রিতে তার পিঠে পাউডার মাখিয়ে দিতেন।

অথচ সন্তোষ তার লেখায় মোটামুটি ভাবে বাবাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। তার প্রথম দিকের লেখায়, বিশেষত কিনু গোয়ালার গলি এবং নানা রঙের দিনে তার মা এবং দিদি অনেকটা জায়গা জুড়ে আছেন। শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে তো ঘোষিত ভাবেই মাতৃকেন্দ্রিক। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মা ও ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়েনই তো এই উপন্যাসের মূল বিষয়। তবে এতে তার বাবাও গুরুত্বের দিক থেকে মর্যাদার আসন পেয়েছেন। দেশ পত্রিকায় যখন এই উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন একটি চিঠিতে আমি সন্তোষকে লিখেছিলাম, তুমি সারা জীবন সব লেখায় বাবাকে এড়িয়ে গেছ। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখো, সকলের শেষে এসে তিনি তাঁর প্রাপ্য পুরো আদায় করে নিলেন। ধারাবাহিক উপন্যাসটি পড়বার সময় আমার মনে হচ্ছিল, এর অনেকাংশ জুড়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ওর বাবা। আরও মনে হয়েছিল, এবং সন্তোষকে লিখেছিলাম, যখন থেকে তার বাবা কাহিনী থেকে সরে গেলেন, তখন থেকে উপন্যাসের গল্পরসও যেন কমে গেল। সন্তোষ সেদিন আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেনি।

সন্তোষের মায়ের নাম ছিল সরযূ। তিনিও বরিশালের মেয়ে। প্রথম জীবনে পুত্র-শোক পেয়েছিলেন। সন্তোষের দাদা সরোজ কলেজে আই এসসি পড়ার সময় টাইফয়েড রোগে মারা যান। সেই থেকে সন্তোষের মা একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক সময় আপন মনে বিড়বিড় করতেন। অকারণ মাথা দোলাতেন। কিন্তু তাঁর মত মা আমি আর দেখিনি। প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থায় তিনি যে ভাবে তাঁর স্নেহ দিয়ে, ব্যক্তিত্ব দিয়ে সন্তোষকে বড় করে তুলেছিলেন, যতটা সম্ভব তাকে রক্ষা করেছিলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আমাদের সঙ্গে তাঁর খুব মধুর সম্পর্ক ছিল। আমি এবং আমাদের বন্ধু জগৎ দাশ দুজনই তাঁকে মাসিমা বলতাম না, মা বলতাম। ঝরঝরে বাংলায় তিনি দ্রুত চমৎকার চিঠি লিখতেন। দু-একটা চিঠি আমাকেও

লিখেছিলেন। সন্তোষকে তিনি সর্ব প্রযত্নে রক্ষা করতে চাইতেন। সব মা-ই যা চান। কিন্তু তাঁর এই চাওয়া রীতিমত চোখে পড়ত। সন্তোষের বিবাহের পর তিনি তাকে মাঝে মাঝে তার স্ত্রীর কাছ থেকেও দূরে রাখতে চাইতেন। সন্তোষ হয়তো কাগজের আপিস থেকে রাত একটা-দেড়টায় ফিরল। বাকি রাত সে শান্তিতে ঘুমোক, তার মা এই চাইতেন। এবং শুধু চাওয়া নয়, সেই রকম ব্যবস্থা করতেন। সন্তোষ বাইরে যাই করুক, ঘরে মায়ের ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারত না। করত না।

সন্তোষের একমাত্র দিদির (ডাকনাম টাপু) বিবাহ হয়েছিল কোচবিহারে। জামাইবাবু তারাপদ বিশ্বাস সেখানে ওকালতি করতেন। পরিবারে সন্তোষের বাবা নন, এই জামাইবাবুই ছিলেন প্রকৃত অভিভাবক। এই দিদির সঙ্গে সন্তোষের অতি মধুর সম্পর্ক ছিল। ভাইফোঁটার সময় দিদি কোচবিহার থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সন্তোষের জন্য উৎকৃষ্ট ধুতি-পাঞ্জাবি পার্সেল করে পাঠাতেন। সন্তোষের মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৮৩ আগস্টের শেষে দিদি মারা যান। পুজোর তখন খুব দেরি ছিল না। সন্তোষ দুঃখ করে বলেছিল, পুজোয় কেনাকাটার ফর্দে শাড়ির সংখ্যা একটা কমে গেল।

সন্তোষ স্কুলে তার ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিল। পড়াশুনা করত, তবে বইয়ের পোকা ছিল না। ক্লাসের পড়ার পাশাপাশি বাইরের বই সমান ভাবে পড়ে যেত। রাজবাড়ি উডহেড পাবলিক লাইব্রেরির সে সদস্য ছিল না। তবে অন্যের কার্ডে সে নিয়মিত সেখান থেকে বই আনত। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের বেশির ভাগ লেখা সে তখন পড়ে ফেলেছিল। যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে তার প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখনও তাঁর সম্পর্কে তার বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়েনি।

বাংলা খবরের কাগজ বলতে তখন মফঃস্বল শহরে প্রধানত আনন্দবাজার পত্রিকা বোঝাত। সন্তোষ এই কাগজ সম্পর্কে তখন থেকেই বিশেষ আগ্রহী ছিল। রাজবাড়ি স্টেশনে চট্টগ্রাম মেইলে কলকাতা থেকে কাগজ গিয়ে পৌঁছত বেলা বারোটা আন্দাজ। সেই কাগজ বাড়িতে বিলি হতে এক-দেড় ঘণ্টা দেরি হত। সন্তোষ দেরি করতে চাইত না। বৈশাখ মাসে, যখন স্কুল সকালে হত, তখন দেখতাম সে দুপুরের রোদে তাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মিনিটের পথ, স্টেশনে কাগজ আনতে যাচ্ছে। সে শুধু নিজেদের কাগজই আনত না। প্রতিবেশীদের কাগজও বগলদাবা করে নিয়ে আসত।

তখন আমাদের মত সেও ম্যালেরিয়ায় ভুগত। সর্বদা বাড়িতে ডাক্তার দেখানো, বা ওষুধ কিনে খাওয়ার মত সচ্ছল অবস্থা তাদের ছিল না। অনেকদিন তাকে শিশি হাতে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাতায়াত করতে দেখেছি, মনে পড়ে।

সন্তোষ বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করলেও, সে যখন দশম শ্রেণীতে পড়ে, তখন কী একটা কারণে ওর মা কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। সন্তোষ তখন কয়েক মাস হস্টেলে ছিল। আমিও ছিলাম। সেই সময়ই আমাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তখন আমরা স্কুলের সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চাঁদার খাতা হাতে একসঙ্গে কোর্টকাছারিতে উকিল

মোক্তারদের কাছে, বাজারে দোকানদারদের কাছে গিয়েছি মনে পড়ে। শীতের সকালে নবীন ময়রা হস্টেলে নলেন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আসত। তখন বড় একটা সন্দেশের দাম ছিল চার পয়সা। একদিন সকালে নবীন যখন এসেছিল তখন, কেন মনে নেই, আমি হস্টেলের বাইরে ছিলাম। সন্তোষ চারটে সন্দেশ কিনে, তার মধ্যে দুটো আমার জন্যে রেখে দিয়েছিল। বাড়ির বাইরে এই স্নেহ কোনওদিন কোথাও কারও কাছ থেকে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

সন্তোষের সঙ্গে আমার যেমন ভাব ছিল, তেমনই সেই বয়সে যা স্বাভাবিক, রাগারাগি, মান-অভিমানের পালাও চলত। এই সময় আমাদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যেত। তবে এই অবস্থা বেশিদিন থাকত না। একবার এই রকম একটি সময়ে সে আমাকে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখে, দরজার ফাঁক দিয়ে আমার ঘরে ফেলেছিল।

সারাজীবন সন্তোষ আমাকে কয়েকশো চিঠি লিখেছিল। অনেকগুলি ছোট, কিন্তু অনেকগুলি বেশ বড়। চিঠিগুলি মামুলি ছিল না। তাতে অনেক কথা, অনেক আলোচনা থাকত। বেশির ভাগ চিঠিই আমি নষ্ট করে ফেলেছি। ১৯৩৪-এ সে আমাকে পোস্টকার্ডে প্রথম যে চিঠি লিখেছিল, সেটা সৌভাগ্যক্রমে এখনও আছে। এখানে সেটা তুলে দিলাম। সন্তোষের অনুরাগী পাঠকদের হয়তো ভাল লাগবে। যে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি তার সারা জীবনের লেখার মূল বৈশিষ্ট্য, এখানে হয়তো তার আভাস পাওয়া যাবে।

চিঠি

ওঁ
মা

S.K. Ghosh
Rajbari
E.B. Ry
27-10-34

ছবি, ('লেখকের ডাক নাম)

আজ তোমার চিঠি পেলাম, বিজয়ার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, তাই আর ওটা দিলাম না। তোমার মতো 'Style' করে তিন পয়সা নষ্ট কোরবার প্রবৃত্তি আমার নেই ; —তাই সুদে আসলে 'কোণা কানাটী'ও বাদ দেবো না। 'জগত' যাদবপুর—P.O নলীয়া। ই বি আর—ঠিকানায় আছে। তোমার আজকের চিঠি তার কাছে Redirect কোরলাম। School খুলবার দিনই আসবে তো? না,—Vacationটা আরো Prolong ক'রবে? 'জগত' যদি তোমায় এরী মধ্যে চিঠি দিয়ে থাকে তা'লে বোধহয় আমার 'স্নেহাশীর্বাদ' পেয়েছো? 'পড়াশুনা', এক রকম চ'লছে—তোমার কেমন? একরকম আছি। তোমারও 'দুই রকমের আশা' করি না।

ইতি

Badal (সন্তোষের ডাকনাম)

এই চিঠিটা ছাড়া তার আরও দু-একটা চিঠি আমার কাছে আছে। মাঝে-মাঝে মনে হয় চিঠিগুলি সব থাকলে ভাল হত। আবার মনে হয়, নেই, ভাল হয়েছে। সন্তোষের

মৃত্যুর পরে পড়তে যেয়ে দেখেছি, পড়া যায় না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, গলা শুকিয়ে যায়।

স্কুলে ওপরের ক্লাসে পড়ার সময় সন্তোষ সিগারেট ধরেছিল। বেশি খেত না, নেশা হয়নি, তবে উপযুক্ত পরিবেশে খেত। রাজবাড়িতে একবার একসঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়ে তাকে প্রথম সিগারেট খেতে দেখি। কাঠের গ্যালারিতে বসে সে সিগারেট ধরিয়েছিল। আমাকেও একটা দিয়েছিল।

তবে ১৯৩৬ মার্চ মাসে ফরিদপুর শহরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে তার দেওয়া দুই-একটা সিগারেট্ খেয়েছিলাম। ফরিদপুরে আমরা ছিলাম জেলা স্কুলের হস্টেলে। সেজন্য দশ-পনেরো টাকা খরচ লেগেছিল। সন্তোষ এই খরচও জোগাতে পারেনি। মনে আছে, সে শহর থেকে সামান্য দূরে টেপাখোলায় তার এক আত্মীয় বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল।

পরীক্ষা দিয়ে আমি রাজবাড়ি থেকে এগারো মাইল দূরে আমার গ্রামে ফিরে এসেছিলাম। সন্তোষ রাজবাড়িতে ছিল। আমি শিগগিরই আমার মাসিমার বাড়ি পালামৌতে বেড়াতে যাব, সন্তোষ জানত। সেই সময় একটি পোস্টকার্ডে সন্তোষ আমাকে লিখেছিল, "পশ্চিমের রাঙা ধুলোর আগে পুবের রাজবাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে, ক্ষতি কী। মা দেখতে চান।" গিয়েছিলাম। মনে হয় রাজবাড়িতে সেই আমাদের শেষ দেখা।

পরীক্ষায় সন্তোষ আর আমি দুজনই বাংলায় লেটার পেয়েছিলাম। সন্তোষ অঙ্কেও পেয়েছিল আমি পাইনি।

তারপর সন্তোষ মায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিল। উঠেছিল এন্টালিতে, ৫৭ সি পুলিশ হাসপাতাল রোডে, তার মাসতুতো দিদির বাড়িতে। এখানে সে আগেও অনেকবার এসেছে। তাই কলকাতাকে সে তখনই আমাদের তুলনায় অনেক বেশি চিনত। এখানে তার সমবয়স্ক এক ভাগ্নে ছিল, বীরেশ্বর বিশ্বাস। তার সঙ্গে সন্তোষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং দীর্ঘদিন তা বলবৎ ছিল।

সন্তোষ সেই যে রাজবাড়ি ছেড়ে এসেছিল, আর কোনওদিন সেখানে যায়নি। বাংলাদেশ হওয়ার পর একবার কয়েক ঘণ্টার জন্য, ঢাকা যাওয়ার পথে রাজবাড়িতে ছিল। এই সময় সে বাংলাদেশ সরকারের অতিথি হিসাবে স্টিমারে তার পিতৃভূমি বরিশাল শহর ছুঁয়ে এসেছিল। সন্তোষের স্বভাবে এই একটা দিক ছিল। সে দ্রুত একজনকে গ্রহণ করত, এবং দ্রুততর তাকে বর্জন করত। আমাকে একদিন সে বলেছিল, আমার সঙ্গে তোর সম্পর্ক, সেটা তুই-ই বাঁচিয়ে রেখেছিস। কথাটা একেবারে মিথ্যা বলেনি।

এন্টালি থেকে সন্তোষ উঠে এসেছিল, তৎকালীন মির্জাপুর স্ট্রিটে, রাধানাথ মল্লিক লেনে। এখানে একটি মাত্র ঘরে সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত। চার বছরের বেশি সে এখানে ছিল। সন্তোষের সাহিত্যে এই গলিটি বারবার ফিরে এসেছে। কিন্তু গোয়ালার

গলিকে তো এই গলিরই ভাষ্য বলা যায়। তার একটি বিখ্যাত গল্প 'পনেরো টাকার বৌ'-এ এই গলি বোধহয় তার প্রাপ্য শেষ বারের মত আদায় করে নিয়েছিল।

সন্তোষ এই বাড়ি থেকে সবচেয়ে কাছে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তার যে মেধা, তাতে সে অনায়াসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে পারত। হয়নি। আর্থিক অনটন ছিল। বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হওয়ার একটি কারণ অন্তত আমি জানি। সেই কলেজে তখন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পিতা, সর্বজনশ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সেই সুবাদে সন্তোষকে কলেজে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন। তখন কলেজে আই-এ ক্লাসে মাসিক বেতন ছিল ছয় টাকা।

সন্তোষের সঙ্গে আমাদের বন্ধু জগৎও কলকাতায় এসেছিল। সে আর কলেজে পড়েনি। কলকাতায় সে প্রধানত ছাত্র-ছাত্রী পড়াত। কখনও কারও বাড়িতে, কখনও বা কোনও দরিদ্র মেসে থাকত। সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চা করত। পার্কে বক্তৃতা দিত। তখনকার সংবাদপত্রে তার রিপোর্ট বের হত। তার পিছনে, যেমন রাজবাড়িতে, তেমন কলকাতায়, গোয়েন্দা লেগে থাকত। মাঝে-মাঝে তাকে তৎকালীন ইলিসিয়াম রো-তে গোয়েন্দা দপ্তরে যেয়ে ধমক খেতে হত। এই জগৎ তখন কয়েকটি গল্প লিখে অনেককে চমকে দিয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায়, যুগান্তরে, পূর্বাশায় তার গল্প বের হয়েছিল। জগতের সংগঠন ক্ষমতা বরাবরের। সে কোনওদিন ফুটবলে লাথি মারেনি, অথচ সে ছিল স্কুল টিমের ক্যাপটেন। সেই মহকুমা শহরে, যারা তার থেকে উঁচু ক্লাসে পড়ত, তারাও তাকে দাদা বলত।

জগৎ নিজের উদ্যোগে কলকাতায় একটি সাহিত্য সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিল। নাম ছিল, দুর্বার সঙ্ঘ। সে সব সময় সন্তোষকে পুরোভাগে রেখে, নিজে পিছনে থাকত। দুর্বার সঙ্ঘের প্যাডে সভাপতি হিসেবে নাম ছাপা হত সন্তোষের। এই সঙ্ঘের সভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত, রমাকৃষ্ণ মৈত্র নিয়মিত আসতেন। কোনও কোনও সভায় বুদ্ধদেব বসু, এবং হয়তো প্রেমেন্দ্র মিত্রও এসেছিলেন। কলকাতার সাহিত্য জগতে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে সন্তোষকে জগৎই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে নিজে পিলসুজ হয়ে সন্তোষকে সর্বদা প্রদীপের মত তুলে ধরত। মাসে সে কুড়ি-পঁচিশ টাকা আয় করত। কিন্তু তা থেকে প্রায়ই সন্তোষের মাকে (আমাদেরও মা) পাঁচ-দশ টাকা সাহায্য করত।

সন্তোষ যখন কলেজে পড়ে তখন জগৎ তার সঙ্গে যুগ্মভাবে একটি গল্প সংকলন বের করেছিল। খরচ হয়েছিল ৭৫ টাকা। সব টাকা জগৎই জুগিয়েছিল। বইয়ের নাম ছিল ভগ্নাংশ। এতে সাতটা গল্পের মধ্যে চারটে ছিল জগতের, তিনটে সন্তোষের। তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, প্রবাসীতে পর্যন্ত, এর প্রশংসা করা হয়েছিল। বইটি ওরা আমাকে উৎসর্গ করেছিল। লিখেছিল, বর্তমান সমাজের যে মানুষগুলি কেউ-ই পুরোপুরি মানুষ নয়, মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র, তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক। জগৎ বেশিদিন

তার লেখার অভ্যাস বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। সন্তোষ শেষ পর্যন্ত পেরেছিল, এবং এই ভগ্নাংশকেই সে তার সম্পূর্ণ মূলধন হিসাবে নিয়েছিল।

অন্য অনেকের মত সন্তোষও কবিতা হাতে নিয়ে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছিল। তার প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি কবিতা, নাম পৃথিবী। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত নবশক্তিতে, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চে এই কবিতাটি বেরিয়েছিল। সেই সংখ্যাটি আরও একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলায় যে ভাষণ দেন, এই সংখ্যায় সেটিও মুদ্রিত হয়েছিল। যেহেতু প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদনায় ছিলেন, তাই বলা যায় যে তাঁর কাছেই সন্তোষের সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়েছিল। পরে প্রেমেন্দ্রবাবু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সন্তোষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সন্তোষ যখন দিল্লিতে ছিল, তখন সে মাঝে-মাঝে কলকাতায় এসে পনেরো-কুড়ি দিন থাকত। একবার কলকাতায় এসে সে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে উঠেছিল এবং ছিল।

নবশক্তিতে পৃথিবী কবিতাটি ছাপা হয়েছিল দুই পৃষ্ঠা জুড়ে। এতে সবসুদ্ধ পাঁচটি কি ছয়টি স্তবক ছিল। প্রতি স্তবকে আটটি পঙ্‌ক্তি ছিল। প্রথম স্তবক এবং দ্বিতীয় স্তবকের অর্ধাংশ এখনও আমার মনে আছে। নিচে সেই অংশ তুলে দিলাম।

হে পৃথিবী, তপনের অকলঙ্ক তপ্ত আলিঙ্গনে
হয়ে স্বপ্নাতুর
পুঞ্জীভূত নীহারিকা কুঞ্জতলে, বিশ্বের প্রাঙ্গণে
বিবশ বিধুর
স্পন্দহীন ছিলে তুমি, আদিতম সম্ভোগ তৃষায়
কালের প্রাক্কালে,
বাসনার অগ্নিশিখা আত্মহারা অনন্ত নিশায়
জ্বলেছিল ভালে।
তারপর সূর্য যবে অকস্মাৎ উদ্ধত হেলায়
দিল দূরে ফেলি,
চূর্ণ হল স্বপ্ন তব, প্রৌঢ়ত্বের আসন্ন বেলায়
মিলাল কুহেলি।

এই কবিতার ভাষা ও ছন্দে তখন কলেজ-পাঠ্য অক্ষয়কুমার বড়ালের "মানব-বন্দনা" কবিতার ছায়া দেখেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে এই কবিতার মধ্যেই হয়তো সন্তোষের জীবন ও সাহিত্যের অন্তর্লীন বীজ নিহিত ছিল। এর প্রথম স্তবকে যে সম্ভোগ তৃষার কথা বলা হয়েছে, তাই ছিল সন্তোষের জীবনের মন্থনদণ্ড। শুধু সে নয়, তার গল্প উপন্যাসের নরনারীরাও বহুলাংশে এর শিকার হয়েছিল। সন্তোষ সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ককে যে ভাবে দেখেছিল, তার সাহিত্যে নারী পুরুষের পারস্পরিক গ্রহণ বর্জনের মধ্যে সেই ভাব বার বার ফিরে এসেছিল। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, যে মানুষটি

প্রায় ৬৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিল, এবং লিখেছিল, তার জীবনের ও সাহিত্যের মূল সুরটি হয়তো সতেরো বৎসর বয়সেই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। একথা ঠিক যে, সন্তোষ যেমন দৈনন্দিন জীবনে, তেমন সাহিত্যেও, কোথাও স্থির হয়ে থাকেনি। সে নিরন্তর নিজেকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। বারংবার লিখে লিখে বারংবার মুছে ফেলাই ছিল তার বিলাস। তবুও গান যেমন তানে লয়ে বিস্তার লাভ করলেও, সব শেষে সমে এসে থামে, তার জীবন ও সাহিত্য, বিশেষত ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে হয়তো দেখা যাবে, তারাও বারবার বাহু বিস্তারের পর এই মূল সুরে ফিরে এসেছিল।

সন্তোষের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'বিলাতি ডাক'। যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বের হয়েছিল। গল্পটি যখন পড়ি, তখন তারাশঙ্করকে মনে পড়েছিল। এখন পড়লে হয়তো তা মনে হবে না। এখন লিখতে গিয়ে অন্য কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সন্তোষের ব্যবহৃত এই নামকে প্রতীক হিসাবে নিলে কেমন হয়। সে নিঃসন্দেহে কল্লোল-পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। কিন্তু লেখক হিসাবে সে যতটা কৃতী, তত জনপ্রিয় কোনওদিনই নয়। এর একটি কারণ হয়তো এই যে, তার পাত্র-পাত্রীরা ততটা মাটি থেকে উঠে আসেনি, যত এসেছে মন থেকে। আর সন্তোষের এই মন বিদেশি সাহিত্যের রসে বিশেষ ভাবে জারিত ছিল। কান পাতলে তার অনেক গল্পেই হয়তো বিদেশি গল্পের "ডাক" শোনা যায়। অনেকে তার লেখায় সমারসেট মমের প্রভাব দেখতে পান। প্রভাব থাকুক আর না থাকুক, আমাদের সমকালীন একজন লেখকের লেখা পড়লে, মমের কথা মনে আসে, এটাই কী কম।

আনন্দবাজার পত্রিকার পূজাসংখ্যায় তার প্রথম প্রকাশিত গল্প "শীত ও বসন্ত"। খুব সম্ভবত ১৯৩৮-এ প্রকাশিত এই গল্পের বিষয়, একই পরিবারে সমান্তরাল ভাবে একটি মৃত্যু ও একটি জন্মের কাহিনী। আজ পড়লে হয়তো গল্পটিকে অনেকাংশে দুর্বল মনে হবে। কিন্তু একজন আঠারো বছরের যুবকের পক্ষে এই গল্প সামান্য ছিল না।

তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। পরে কবি অজিত দত্ত তাঁর দিগন্ত পাবলিশার্স থেকে এটি বই আকারে বের করেন। 'কিনু গোয়ালার গলি' পার হয়ে, 'নানা রঙের দিন'কে পিছনে রেখে সন্তোষ রাজপথে নেমেছিল, আর কোনওদিন পিছনে তাকায়নি। যত দিন ছিল সামনে হেঁটেছে, সমানে চড়াই উতরাই পার হয়েছে। শেষে একেবারে অন্তিম লগ্নে সে ক্ষণকালের জন্য 'যাত্রাভঙ্গ' করেছিল, দিনলিপি লিখেছিল। এই দিনলিপি যে তার দিন শেষের লিপি হবে, সে কথা তার চেয়ে বেশি কেউ জানত না। কিন্তু তবুও তো সে লিখেছিল। এ কথা ভাবি আর মনে হয়, সন্তোষ তার সাহিত্য সকলের কাছে রেখে গেলেও সকলের জন্য রেখে যায়নি, কিন্তু সে তার সাহস, তার সাহিত্য প্রেম সকলের জন্য রেখে গেছে।

[শনিবারের চিঠি থেকে পুনর্মুদ্রিত]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১. নতুনত্বের, নবীনতার উপাসক

সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়, আমাদের অনেকের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। সেই অধ্যায়ের সঙ্গে শুধু আমাদের কর্মজীবন নয়, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনও জড়িয়ে ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে।

আমাদের কলেজ-জীবন যখন শেষ হয়নি, কথাসাহিত্যিক হিসাবে সন্তোষের সুখ্যাতি তখনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তার প্রথম উপন্যাস তখনো ছাপা হয়নি, প্রকাশিত হয়েছে নেহাতই একটি গল্পগ্রন্থ, 'ভগ্নাংশ'—তার একার লেখা নয়। অথচ সেই গ্রন্থের যেটুকু অংশ সন্তোষের নিজস্ব তাই নিয়ে তখন যেমন আমাদের, তেমন প্রবীণ সমালোচকদেরও উত্তেজনার অন্ত ছিল না। চায়ের দোকানে সন্তোষ তখন আমাদের তুমুল তর্কের বিষয়। তর্ক এই নিয়ে নয় যে, সন্তোষ একজন শক্তিমান লেখক কি না। বরং এই নিয়ে যে, এই অমিতশক্তির যিনি অধিকারী, বাংলা কথাসাহিত্যের মোড় তিনি কতটা ঘুরিয়ে দেবেন।

১৯৪৪ সালে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। বি এ পাস করে সেই বছর আমি দৈনিক 'প্রত্যহ' পত্রিকায় যোগ দিই। তার কিছুদিন বাদে সন্তোষ সেখানে বার্তা-সম্পাদক হয়ে আসে। ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু ভেতরে নিশ্চয় রয়ে গিয়েছে কোনও বিরাট উত্তেজনার উৎস, তাই বাইরেও একটা ছটফটানি লেগেই থাকত, সন্তোষ সেটাকে কিছুতেই গোপন করতে পারত না। সন্তোষ আমার চেয়ে চার বছরের বড়। কিন্তু বয়সের এই ব্যবধান আমরা কেউই স্বীকার করিনি। খুব দ্রুত আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যাই। বন্ধুত্বের প্রধান সূত্র সাহিত্য। সন্তোষের অধীনে তখন বার্তা বিভাগের কাজ করেছি, কাজ শিখেছি। কিন্তু কাজের পালা ফুরোবার পরেই সাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যেত। সেই আলোচনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে, কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, বাড়ি ফিরবার বাস বা ট্রাম পাইনি। তার শোভাবাজার এলাকার বাড়ি থেকে আমাদের শিয়ালদা এলাকার বাড়িতে ফিরেছি মাঝ রাত্তিরে, পায়ে হেঁটে।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে। একটার পর একটা কাগজ বেরচ্ছে, আবার তাদের ঝাঁপ বন্ধও হয়ে যাচ্ছে ঝটপট। চাকরির কোনও নিরাপত্তা যেহেতু ছিল না তাই সন্তোষ তখন একসঙ্গে একাধিক কাগজে কাজ করত। কিন্তু কোনও কাগজকেই যে সে তার পরিশ্রম ও যত্নের ভিতর দিয়ে যথাসম্ভব সুন্দর করে তুলবার কাজে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখত, তা নয়। তার ফল দাঁড়িয়ে ছিল এই যে, উদয়াস্ত তাকে খাটতে হত অমানুষিক। কিন্তু তাই নিয়ে যে

তার চিত্তে কোনও ক্ষোভ ছিল, এমনও আমাদের কখনো মনে হয়নি। আসলে, যেমন সাহিত্য, তেমনই সাংবাদিকতা সম্পর্কেও তার মমতা অথবা আগ্রহ, কিছু কম ছিল না। কিংবা কে জানে তার ভালবাসার বেশির ভাগ তখন হয়তো কেড়ে নিয়েছিল তার বৃত্তি এবং সেই কারণেই তার সাহিত্যসৃষ্টিতে তখন হয়তো কিছুটা ভাটা পড়ে যায়।

এই নিয়ে যেমন আমার, তেমনি আমাদের দুজনের বন্ধু শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ক্ষোভ ছিল অনেকখানি। আমার মনে আছে সন্তোষ যখন 'জয় হিন্দ' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক, শান্তিরঞ্জনের 'অভিবাদন' পত্রিকায় তখন সন্তোষের সাহিত্য সম্পর্কে একটা লেখা বার হয়। এবং সেই পত্রিকাটি নিয়ে আমরা 'জয় হিন্দ' পত্রিকায় গিয়ে সন্তোষকে ভীষণ গালাগাল করতে শুরু করি। শান্তির গালাগালিতে কাজ হয়েছিল নিশ্চয়, কেননা, তারপরেই আমরা লক্ষ করি যে, সন্তোষ আবার গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করেছে।

সন্তোষের সাহিত্যকৃতির বড় রকম স্বীকৃতি মিলেছিল 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসটির সূত্রে। 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষও সেই উপন্যাস পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন নিশ্চয় নইলে আর দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখবার জন্য তাকে ডাক দেবেন কেন। সন্তোষ সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল। লিখেছিল তার 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস। সেই উপন্যাস যে তখন কী রকমের সাড়া জাগিয়েছিল আজ সেকথা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। সন্তোষ ইতিমধ্যেই স্টেটসম্যান ছেড়ে দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে যোগ দেয়। সেটা ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। কিন্তু দিল্লিতে যাবার পরে আবার তার সাহিত্য রচনায় পড়ে মস্ত ভাটা। ১৯৫৮ সালে সন্তোষ যদি না কলকাতায় ফিরত, তার সাহিত্যে তাহলে আবার জোয়ার বইত কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে।

সন্তোষ বলা বাহুল্য, জোয়ার নিয়ে এসেছিল আনন্দবাজার পত্রিকাতেও। কিংবা বলা যায়, বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই। এক্ষেত্রে তার দান যে কতখানি তা সবাই জানেন। একটা মস্ত দান অবশ্যই সাধু বাংলার বদলে চলিত বাংলার প্রবর্তন। যা কিনা খবরের ভাষাকে যেন বা জাদুমন্ত্রে জীবন্ত করে তুলেছিল। খবর সম্পাদনা করা, খবরের সারাংশকে টেনে বার করে আনা, 'ইনট্রো'র মধ্যেই খবরের সারাৎসারকে পরিবেশন করা, নিখুঁত হেডলাইন দেওয়া, কোনও কাজেই তার জুড়ি কখনও দেখা যায়নি। একই সঙ্গে সে লিখেছে সম্পাদকীয় নিবন্ধও। দিনের পর দিন। সে সব নিবন্ধের কিছু তো ঐতিহাসিক মূল্য পেয়ে গেছে।

এরই মধ্যে চলছিল তার সাহিত্য রচনার কাজও। এরই মধ্যে সে লিখেছে শেষ নমস্কার এবং জল দাও-এর মতো উপন্যাস। সাংবাদিকতাই করুক, আর সাহিত্য রচনাই করুক, সব কিছুর মধ্যেই সে ধরবার চেষ্টা করত সেই নবীনতাকে যার সতেজ সান্নিধ্য মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না, নতুন পথে এগোবার, নতুন পথে চিন্তা করবার প্রেরণা জোগায়।

সন্তোষ সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাটাই হয়তো সবচেয়ে সত্যি কথা। সবচেয়ে দামীও বটে। সন্তোষের এক সংবর্ধনা সভায় প্রেমেন্দ্র বলেছিলেন, 'অন্যদের লেখা পড়বার আগে যে আমি সন্তোষের লেখা পড়ি, তার কারণ, আমি জানি, যাই সে

লিখুক, তাতে নতুন কিছু থাকবে।'

সন্তোষ ছিল নতুনত্বের নবীনতার উপাসক। এটাই তার সম্পর্কে প্রথম কথা এবং শেষ কথা।

[আনন্দবাজার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫]

২. আমার বন্ধু

কাউকে পুরোপুরি চিনে উঠতে কতদিন লাগে? পাঁচ বছর? দশ বছর? পনেরো বছর? সন্তোষের সঙ্গে আমার পরিচয় পুরো চল্লিশ বছরের। আমার কলেজ-জীবন সবে যখন শেষ হয়েছে, বয়স মাত্র উনিশ, সেই সময়ে সন্তোষকে আমি প্রথম দেখি। আজ আমার বয়স ষাট। কিন্তু স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই যে, সন্তোষকে আমি আজও চিনে উঠতে পারিনি।

অথচ আমাদের পরিচয় যে নেহাতই মৌখিক ছিল, তাও তো নয়। দিনের পর দিন ওকে দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। তর্ক করেছি যুদ্ধ, শান্তি, দাঙ্গা, সাহিত্য, গান, ছবি, সিনেমা, থিয়েটার, ফুল, নারী, মৃত্যু ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে। তর্কের মধ্যেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে, বিকেল গড়িয়ে রাত। তর্ক তবু শেষ হয়নি। রাত বারোটায় ওর শোভাবাজারের বাড়ি থেকে আমাদের শেয়ালদার আস্তানায় ফিরেছি পায়ে হেঁটে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। কালো কাপড়ের ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে গ্যাসের বাতি। আর সেই দুঃস্বপ্নে-ভরা কলকাতার অন্ধকার রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে এক উনিশ বছরের উন্মনা বালক,—সন্তোষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিনগুলির কথা যখন ভাবি, তখন শুধু সন্তোষকে নয়, নিজেকেও আমি খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাই। বুঝতে পারি, সেই বালকের সেই সময়ে এমন একজন বন্ধুরই দরকার ছিল, যে তার চেয়ে সাহিত্যপথের সন্ধান আরও বেশি রাখে। কিন্তু শুধু সাহিত্য কেন, গোটা জীবনের সন্ধানও সন্তোষ অনেক বেশি রাখত। ছাত্র যেখানে অনুভূতিশীল, দারিদ্র্যের চেয়ে ভাল শিক্ষক সেখানে আর কে? সন্তোষ ছিল অতিশয় সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ, এবং তার কৈশোর কেটেছে দারিদ্র্যের পাঠশালায়। জীবনকে সে তাই প্রথম থেকেই চিনতে শিখেছিল। তার বয়স যখন বাইশ-তেইশ, তখনই সে জেনে গিয়েছিল যে, টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের হাসির মতন অনেক ব্যাপারই বস্তুত নকল ব্যাপার ; জেনে গিয়েছিল, অমৃতভাণ্ড ভেবে মানুষ যাতে মুখ ডোবায়, তার ভিতরে গরল থাকা কিছু বিচিত্র নয়, অনেক ক্ষেত্রে থাকেও।

অত অল্প বয়সে এত সব অস্বস্তিকর সত্য জেনে যাওয়া কি ভাল? যারা জেনে যায়, নৈরাশ্যবাদই কি তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায় না? সন্তোষও ধীরে-ধীরে নৈরাশ্যবাদের চোরাবালিতে ডুবে যেতে পারত। যায়নি, তার কারণ, তার জীবনপিপাসা ছিল অসম্ভব রকমের তীব্র। জীবনের যাবতীয় কুশ্রীতা সম্পর্কে ষোল-আনা সচেতন থেকেও সে তাই জীবনের ওষ্ঠেই স্থাপন করেছিল তার ওষ্ঠ। জীবনকে সে

ভালবেসেছিল।

"জীবনকে আমি ভালবাসি।" পুরুলিয়ার সার্কিট হাউসে একবার মধ্যরাতে সন্তোষ আমাকে বলেছিল, "তার ঠোঁটে যে বিষ আছে, তা কি আমি জানি না? জানি। তবু ভালবাসি।" কথাটা বলেই নিজেকে সংশোধন করেছিল সে। বলেছিল, "ঠিক বললুম না। 'তবু' না-বলে 'তাই' বললেই ঠিক হত।"

আশ্চর্য এই যে, এর উলটো কথাও অনেকবার ওকে বলতে শুনেছি। সেইজন্যেই ওর সম্পর্কে কিছু বলতে বড় দ্বিধা হয়। মনে হয়, ওকে কি আমি জানি? কেউ কি ওকে পুরোপুরি জেনেছিল?

পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করেছি আমরা। দিনের পর দিন। ঝগড়া করেছি, তর্ক করেছি। বছরের পর বছর। যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, এই কলকাতা শহরের প্রতিটি বন্ধ-দরজা আমরা লাথি মেরে ভেঙে ফেলব, চায়ের দোকানে বসে তখন একই রকমের স্বপ্ন দেখতুম আমরা। হরেক জায়গায় একই সঙ্গে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি। হরেক শহরে একই হোটেলে রাত কাটিয়েছি। একই সঙ্গে খেলেছি তাসের জুয়া। একই পানশালায় পরস্পরের সঙ্গী হয়েছি। আবার একই সভায় ওর খানিক বাদেই বক্তৃতা দিতে উঠে তুমুল প্রতিবাদ করেছি ওর প্রতিটি কথার। যেমন ওকে রাগে জ্বলে উঠতে দেখেছি, তেমনি আবার বেদনায় ভেঙেও পড়তে দেখেছি বারবার। ওর প্রেম, ঘৃণা, মমতা, বিদ্বেষ, লোভ, ঔদার্য, উচ্চাশা, স্বপ্ন, হতাশা, সব কিছুরই আমি সাক্ষী। কিন্তু তবু কি ওকে পুরোপুরি জানা গেল?

সন্তোষের মত এত অসংখ্য রকমের কাজ করতে, অন্তত আমার বন্ধুমহলে, আর কাউকে আমি দেখিনি। আবার এত অকাজ করতেও না। পরের দিন বাজার করবার মত পয়সা যখন ওর পকেটে নেই, তখনও ওকে নিজের পকেটের শেষ দশ টাকার নোটটা একেবারে নির্বিকার চিত্তে চৌরঙ্গির এক ভিখিরির পাত্রে ফেলে দিতে দেখেছি।। আবার একই সঙ্গে ওকে মাপতে দেখেছি, কর্মক্ষেত্রে ওর টেবিলটা বড়, না ওর সহকর্মীর টেবিলটা। ভূতের ভয়ে একলা ঘরে রাত কাটাতে পারত না। তাই, ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে যাতে ওর ঘরে গিয়ে আমি রাত কাটাই, তার জন্যে ওর পেলিক্যান কলমটা পর্যন্ত ও আমাকে ঘুষ হিসেবে দিতে চেয়েছিল। আবার পাটনা থেকে যখন কলকাতায় ফিরি, মারকুটে দুই গুণ্ডাকে যে তখন ও চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে অন্য কামরায় উঠতে বাধ্য করেছিল, তাও তো সত্যি। কই, তখন তো ওকে একটুও ভীতু মনে হয়নি। আর ওর জীবনের শেষ মুহূর্তে, ঈশ্বরের হাত ধরে, যেভাবে ও পেরিয়ে গেল মৃত্যুর পরিখা, তারপরে ওর সাহস সম্পর্কে কি আর কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবেন?

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এমন মানুষ আমার ষাট বছরের জীবনে আমি আর একটিও দেখিনি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, চল্লিশ বছর ধরে যে-মানুষকে আমি প্রতিনিয়ত দেখেছি, সেই সন্তোষ আজও আমার কাছে এক মস্ত ধাঁধা।

আমি কি ওঁকে বুঝেছি?

অম্লান দত্ত

সন্তোষ ঘোষের মৃত্যুর পর বারো বছর কেটে গেছে, চলতি ভাষায়, যাকে বলা হয় এক যুগ। অনাসক্তভাবে তাকাবার পক্ষে অনুপযুক্ত নয় এই সময়, কালের দুঃখাপহারী ব্যবধানে।

আমাদের ভিতর প্রধান সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের। আমার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতেই সন্তোষ ঘোষ ভালবাসতেন। তবু ভাবি, আমি কি ওঁকে বুঝেছি? কাউকেই তো বোঝা সহজ নয়। যাঁরা কাছে আসেন, তাঁরাও দুর্জ্ঞেয় থেকে যান।

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই জীবনের লক্ষ্য, অন্তত মানববাদীরা অনেকেই এইরকম বলে থাকেন। সন্তোষও সম্ভবত তাই ভাবতেন। এর ভিতর কিন্তু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক, সম্ভাবনা বিচিত্র, প্রায়শ পরস্পর মেলে না। সৃষ্টিশীল হৃদয়বান মানুষের একটা মূল দ্বন্দ্ব সন্তোষের ভিতর মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সৃষ্টিশীলতা একটা দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের উত্তরণ। এই দ্বন্দ্বে সবাই জয়ী হন না। যাঁরা জেতেন তাঁরাও অক্ষত থাকেন না। কে-ই বা অক্ষত!

ওঁকে বাদ দিয়েই প্রথমে সমস্যার চরিত্রটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক। ব্যক্তির বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর শান্তিস্থাপন করা কঠিন। অগভীর অস্থায়ী বাসনার কথা বলছি না। আরও গভীর সমস্যার কথাই তুলছি। আমরা কিছু করতে চাই, সদর্থে কিছু হয়ে উঠতে চাই। এ দুয়ের ভিতর—করা আর হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য আনা কিন্তু সহজ নয়, করাটা বাইরের জিনিস, হওয়াটা ভিতরের। কিন্তু করতে গিয়ে মানুষ এমন সব উপায় মেনে নেয়, মানতে "বাধ্য" হয়, যাতে কাজটা সম্পন্ন হল, কিন্তু বিবেকের সমগ্রতা তাতে রক্ষা পেল না। কাজটা করা না গেলে আমরা ব্যর্থ, কাজটা হলেও কিন্তু আমরা সার্থক নই। যা আমরা হতে চেয়েছি তা হয়ে ওঠা হল না। এ যেন এমন এক যুদ্ধ যাতে পরাজিত হবারই নানা পথ আছে, জয়ী হবার পথ নেই।

প্রশ্নের শেষ নেই এরপর। আমরা কাছের মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। কিন্তু শুধু কিছু কাছের মানুষকে সন্তুষ্ট করাই কি জীবনের লক্ষ্য? আরও বড় কিছুর জন্য আমরা বাঁচতে চাই। বড় কিছুর জন্য বাঁচতে গিয়ে কাছের মানুষকে সন্তুষ্ট করে ওঠা হয় না। হয়তো বা কাছের মানুষের প্রতি অন্যায়ও করা হয়। তা হলে এর শেষ কোথায়?

কিছু মানুষের প্রতিভা বহুমুখী। অনেকেরই একাধিক দিকে কমবেশি যোগ্যতা থাকে।

বহুর প্রতি বিমুখ হয়ে ব্যক্তি কি নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে? তবু একের কাছে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাও অদম্য। বহুর ভিতর একের অন্বেষণ মানুষের অন্তরের ধর্ম। অতিসাধারণ মানুষের এই অন্বেষণটা নিস্তেজ, তাই সমস্যা সেখানে কঠিন নয়। অসাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু আত্মখণ্ডনের পীড়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কোন দেবীর কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন?

আমাদের সময় এবং সম্পদ তো অসীম নয়। নানা দিকে নিজেকেও ছড়িয়ে দিলে কোনও দেবীকেই তুষ্ট করা হয় না, কোনও কাজই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। দেবী অসন্তুষ্ট হলে তাতে শেষ অবধি ব্যক্তি নিজেই নিজের ভিতর খণ্ডিত। সেই আত্মখণ্ডনকে জোড়া দিতে দিতে সে ক্লান্ত। শেষ অবধি যতটুকু করা সম্ভব ছিল তাও করে ওঠা হয় না। আর তাইতে ভিতরে ভিতরে ব্যক্তিটি আরও হতাশ, নিজের প্রতি নিজেই আরও ক্রুদ্ধ। "আমায় যে সব দিতে হবে...।" কিন্তু কাকে?

সন্তোষ ঘোষ কথা ভালবাসতেন, শব্দের শরীরকে ভালবাসতেন। সাপুড়ে যেমন বাঁশি বাজিয়ে সাপকে হেলায় দোলায়, সন্তোষও তেমনই শব্দ নিয়ে খেলা করতেন। বাগ্‌দেবীর কাছে নিজেকে নিবেদন ও সমর্পণ করবার একটা ঐকান্তিক ব্যগ্রতা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি হয়ে উঠলেন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর ভূমিকা গৌণ হলে সমস্যা থাকত না। কিন্তু তা তো হল না। বরং তার বিপরীত। এই সমস্যা ছিল না নরেন্দ্রনাথ মিত্রর। নেই সুনীলের। ওঁরা তো প্রধানত সাহিত্যিক নিঃসন্দেহে। কিন্তু সন্তোষ ঘোষ? একটি শক্তিশালী সংবাদপত্রকে দাঁড় করাবার কাজে তাঁর ভূমিকা হল প্রকাণ্ড। এ কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। এটাই হয়ে উঠল সংসারে তাঁর প্রতিপত্তির স্তম্ভ। এইখানেই হয়তো একটা বিষম দ্বন্দ্বের শুরু, অতিসচেতন স্পর্শকাতর মানুষের মর্মপীড়া। লোকে তাঁর কাছে কেন আসে? তিনি সাহিত্যিক বলে? বন্ধু ভেবে? নাকি তিনি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাবান বলে? সেই ক্ষমতার জগতেও তিনি কি সত্যি স্বাধীন? স্বাধীন হলে কি তিনি ক্ষমতাবান হতে পারতেন? খণ্ডিত এক আত্মপরিচয় সন্তোষ ঘোষের মনের ভিতর কাঁটার মত বিঁধে রইল। ওঁর আয়ত্তে ছিল না কোনও ক্ষতনিবারক প্রলেপ, ছিল শুধু কিছু উত্তেজক প্রতিদ্বন্দ্বী। আত্মপরিচয়ের এই সংকটের আঘাতে সন্তোষ ঘোষের ব্যক্তিত্বে হয়তো বেড়ে উঠেছিল একটা মেজাজি আতিশয্য।

মদ্যের প্রতি একসময় তিনি একটু বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষী কোনও কোনও বন্ধু তাঁকে সতর্ক করে দিতে চাইতেন। সন্তোষ বিরক্ত হতেন ঃ আমাকে ওরা বোঝে না, আমার ভিতরটা ওরা দেখতে পায় না। বন্ধুরা হয়তো বলতেন, হতাশা কি আমাদের মধ্যেও নেই? তবু মাত্রা রক্ষা করা উচিত্। এইসব সদুপদেশে বা সৎপরামর্শে সন্তোষ সহানুভূতির অভাবই দেখতেন। যতদূর মনে পড়ে, আমি পরামর্শ দিতে যাইনি। দ্রষ্টা হয়েই থেকেছি। চিকিৎসক হতে চেষ্টা করিনি।

মৃত্যুশয্যায় সন্তোষ হয়ে উঠেছিলেন অনুপম। কর্কটরোগে যখন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তখন কিন্তু তাঁর হৃদয় অক্ষত। পাশে গিয়ে বসলে আগের মতই "আড্ডা" জমাতে

চাইতেন। কথা বলতে না পারলে, টুকরো টুকরো কাগজে লিখে লিখে চলত বাক্যবিনিময়ের খেলা। আসন্ন মৃত্যু তাঁকে বিন্দুমাত্র ভীত করতে পারেনি। হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে ক'দিনের জন্য নিজের নতুন বাড়িতে এসেছেন শুনে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। ছুটি ফুরোলেই আবার হাসপাতালে ফিরতে হবে, এই রকম ঠিক ছিল। বাড়িতে পা রাখতে পেরেছেন, তাতেই বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। আমাকে বললেন, অন্তত পনেরো দিন তো আছি। পরের দিনই তিনি নেই।

তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। বিদায়ের আগে তাঁকে প্রফুল্ল দেখেছি। আসন্ন মৃত্যু তাঁর মন থেকে আশা আকাঙ্ক্ষার সব বৈপরীত্য কেড়ে নিয়েছিল, হতাশার ক্ষত মুছে দিয়েছিল। মৃত্যুর পটেই চিত্রিত দেখেছিলাম সন্তোষ ঘোষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, সব দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। সবাই এমনভাবে চলে যেতে পারেন না। তবে সন্তোষই একমাত্র নন। একই আদিম প্রশ্ন অনেকের ভিতর উত্তর খুঁজছে, উত্তর খুঁজেছে। মাঝে-মাঝে দেখেছি মৃত্যুর পটে উদ্ভাসিত সেই উত্তর, জীবনে যার সন্ধান মেলেনি। একে একে কাছের মানুষেরা দূরে সরে গেছেন। সন্তোষের স্মৃতির প্রতি এই তর্পণ মনে হয় যেন অনেকের উদ্দেশেই তর্পণ।

সন্তোষকুমার ঘোষ : কয়েকটি প্রসঙ্গ

জ্যোতির্ময় বসু রায়

দেখতে দেখতে একটি বছর ঘুরে গেল। অতীতের পর্দা তাঁর ওপর ভারী হয়ে নেমে এসেছে। সন্তোষকুমার ঘোষ, আমাদের সন্তোষবাবুর কথা বলছি। এক সময়ে ভাবাই যেত না, তাঁর সম্পর্কে অতীতকাল প্রয়োগ করে বাক্যবিন্যাস কবতে হবে। মনে পড়ে, সন্তোষবাবু আমাকে বলতেন, কতবার বলেছেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে—কখনও ইংরেজিতে, কখনও বাংলায় : 'আমি নিশ্চিত জানি, আপনার মৃত্যু আমাকে দেখে যেতে হবে। সে-ই আমার বিধিলিপি। যারা আমার প্রিয়জন তাদের আয়ু আমার আগেই ফুরিয়ে যায়।' দেশবিদেশের ঘটনা সম্পর্কে সন্তোষবাবুর ভবিষ্যদ্‌বাণী খুব ফলে যেত। এ তো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তাঁর নির্ভুল ভবিষ্যৎ-দর্শনের একটা ক্ষমতা ছিল বলে আমাদের মনে হত। এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলবান হল না। ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল। সন্তোষবাবু কথা দিয়ে বরাবর কথা রেখেই এসেছেন। আমার জানার মধ্যে তিনি বড় রকমের কথার খেলাপ করলেন এই একটি-বারই।

*　　*　　*

সন্তোষকুমার ঘোষের অসামান্য সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রতিভার বিষয়ে ইতিমধ্যে অনেকে সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় লিখেছেন এবং বলেছেন নানা স্মরণসভায়। আশা করা যেতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে আরও বিশদরূপে তাঁর প্রতিভা ও অবদানের মূল্যায়ন করা হবে। এই বিষয় অবশ্য এখানে আমার আলোচ্য নয়। সন্তোষবাবুর কথা ভাবলেই মনে পড়ে, তাঁর অপরিসীম রবীন্দ্রানুরাগ আর রবীন্দ্রসংগীত প্রীতির কথা। সেই সঙ্গে তাঁর সহৃদয় রসবোধের কথা। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমগ্র রচনা সম্বন্ধে সন্তোষবাবুর জ্ঞান এবং ধারণা ছিল এককথায় অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যখন তিনি কিছু বলতেন—রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আদৌ কিছু বলতে অথবা লিখতে পারতেন কি? —তখন তাঁর সেই কথনে প্রকাশ পেত একই সঙ্গে শ্রদ্ধা, গভীর অনুরাগ আর মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা, রবীন্দ্রসংগীত তাঁর জীবনের পাথেয় স্বরূপ। আর সহৃদয় রসবোধ? মনে হত, সেই বস্তুটিও তাঁর অস্তিত্বের অন্যতম শর্ত যেন। শিল্পকলার সকল মাধ্যমের প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন, এ ব্যাপারে উন্নাসিকতা বা অবজ্ঞার মনোভাব কোনও ক্ষেত্রে দেখাননি। কলাক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি প্রধানত অনুরাগী ছিলেন সাহিত্য ও সংগীতের। সুখ্যাত, অল্পখ্যাত, অখ্যাত—সব

লেখকের লেখা তিনি পড়তেন—পেলেই পড়ে ফেলতেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা —সব। নামকরা পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন—কিছুই বাদ দিতেন না। তিনি পড়তেন সহৃদয় মনোভাব নিয়ে এবং অধিকাংশ লেখাতেই কিছু-না-কিছু প্রশংসনীয় বস্তু পেয়ে যেতেন। কত যে নতুন, তরুণ লেখককে তিনি তাঁর অকৃপণ প্রশংসায় অভিষিক্ত করেছেন, উৎসাহিত করেছেন, তার হিসাব দেওয়া কঠিন! গায়ক-গায়িকাদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রশংসার ব্যাপারে এত উদারতা, এমন সহৃদয় ভাব আর কারও মধ্যে আমি দেখিনি।

* * *

তাঁর সত্তার প্রধান তিনটি অঙ্গের কথা সংক্ষেপে বলেছি। এখন মানুষ সন্তোষকুমার সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলি। সন্তোষবাবুর মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে এবং স্মরণসভায় তাঁর মানসিকতার একটি দিক সম্পর্কে অথবা চরিত্র প্রসঙ্গে এমন কিছু মন্তব্য দেখেছি ও শুনেছি যা আমার ভ্রান্তিপ্রসূত মনে হয়েছে। সেই ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করছি।

* * *

একটি সংবাদপত্রে বলা হয় : সন্তোষকুমারের প্রচণ্ড মৃত্যুভয় ছিল ; আশ্চর্যের বিষয়, সেই ভীতি তিনি জীবনের শেষ পর্বে অনায়াসে জয় করেছিলেন, শান্ত চিত্তে নিয়তির বিধান মেনে নিয়েছিলেন। এই বিবৃতির শেষাংশে তাঁর শান্ত চিত্তে মৃত্যুবরণের যে-উল্লেখ করা হয়েছে সেটি নিয়ে কোনও বিবাদ নেই। আসলে প্রস্তাবের গোড়ায় গলদ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি নাকি ভীরু স্বভাবের মানুষ ছিলেন!

সন্তোষবাবুর খুব কাছাকাছি থেকেছি দীর্ঘকাল—প্রায় তিন দশক জুড়ে। কখনও কখনও দিনের মধ্যে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়েছি—কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে, গাড়িতে, রাজপথে, নানা জায়গায়। তাঁকে নানা মেজাজে দেখেছি। কিন্তু কখনও ভয়বিহ্বল অবস্থায় দেখিনি। কখনও ভীরু মনে হয়নি তাঁকে। এমন নয় যে, উদ্বেগের ছায়া থেকে তাঁর চিত্ত সতত মুক্ত থাকত। কিন্তু প্রায় সব সময়েই দেখা যেত, তাঁর উদ্বেগ নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য। আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল, ভাবপ্রবণ মানুষ। ভাবপ্রবণ মানুষের বেলায় উদ্বেগ তো সহজেই দেখা দেয়। তাঁর ভয় ছিল একটি জায়গায়—ভূতের ভয়। সেখানে তিনি যেন একেবারে ছেলেমানুষ ছিলেন। শেষের দিকে —বোধ হয় পঞ্চাশোর্ধ্বে গিয়ে—তা-ও একরকম কাটিয়েছিলেন। যাই হোক, রোগভীতি, শারীরিক বিপদের আশঙ্কা, মৃত্যুভয়—এসব তিনি গ্রাহ্য করতেন না। পঞ্চাশ অতিক্রম করার আগে যেমন, পরেও তেমনই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে তাঁর রুচি ছিল না। পঞ্চাশ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তার সামান্য আগে তাঁর দেহে এক কঠিন ব্যাধি দেখা দেয়, ক্রমশ তিনি আক্রান্ত হন কঠিনতর আরও এক বা একাধিক পীড়ায়। তবুও সুস্থ থাকার জন্য তাঁর দিক থেকে যথোচিত সতর্কতা দেখা যেত না। দুর্বল হার্ট নিয়েও তাঁকে মোটর চালাতে দেখেছি! জীবনযাপন সম্পর্কে তিনি ছিলেন এককথায় বেপরোয়া।

১৯৭১ সনে নকশাল আন্দোলনের সময়ে সর্বদা তাঁকে মাথা উঁচু করে থাকতে দেখেছি। তখন তো সন্ত্রাসের দিন—আর কত গুজব তখন শোনা যেত! তাছাড়া ভয়াবহ কাণ্ডও তো ঘটছিল দিনের পর দিন। তাঁকে কিন্তু কখনও ভয়ে অস্থির হতে দেখিনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সময়েও তাঁকে দেখিনি পিছনের সারিতে—নিরাপত্তার স্বার্থেও না। ১৯৮৪ সনে আনন্দবাজার পত্রিকা দফতরে পুনঃপ্রবেশের যাত্রায় তিনি সামিল হয়েছিলেন অসুস্থ শরীরে। এক সময়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তিনি নিজেকে দেখেন নিঃসঙ্গ। ওই অবস্থাতেও লক্ষ্যচ্যুত হননি ; আহত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও ধীরে ধীরে—অপটু শরীর, তাই ধীরে—অগ্রসর হয়েছিলেন এবং উপনীত হয়েছিলেন কর্মক্ষেত্রে। অতঃপর? অতঃপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেছিলেন লেখনীর মাধ্যমে। আনন্দবাজার পত্রিকার সেই 'নমস্কার, অঙ্গীকার' অগণিত পাঠককে শ্রদ্ধায় অবনত করেছে। ভীরু মানুষের পক্ষে ওই নিঃসঙ্গ যাত্রা, ওই সম্পাদকীয় রচনা সম্ভব?

সন্তোষবাবুর 'প্রচণ্ড মৃত্যুভয়' ছিল এই ধারণার সপক্ষে একটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে : তিনি মুমূর্ষু রোগীর নিকট যেতে চাইতেন না, সেই নৈকট্য পরিহার করে চলতেন। একান্ত আপনজনের ক্ষেত্রেও তাঁর এই প্রবণতা দেখা গিয়েছে। রোগশোকের পরিবেশ তিনি এড়িয়ে চলতেন...ইত্যাদি। যে-প্রবণতার কথা বলা হয়েছে, তার মূলে মৃত্যুভয় এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। অপরের কষ্টের মুখোমুখি হতে তিনি একান্ত অস্বস্তি বোধ করতেন ; তাই তাঁর পক্ষে রোগশোকের পরিবেশ ছিল প্রায় অসহনীয়। ভাবপ্রবণতার পাশাপাশি তাঁর স্বভাব বা কর্মের একদিকে ছিল কর্মোদ্যম, অন্য দিকে আনন্দোচ্ছলতা। দুঃখের বিলাস তিনি পছন্দ করতেন না। ব্যক্তিগত দুঃখের দিনেও বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করেছি। তাঁকে দেখেছি, আঘাতের পরক্ষণেই বিষাদের বাতাবরণ সরিয়ে কর্মে প্রত্যাবৃত্ত হতে। নেহরুর মৃত্যুসংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকার টেলিপ্রিন্টারে আসা মাত্র অসহায় শিশুর মত তিনি অশ্রু বিসর্জন করেছেন। পরমুহূর্তেই তাঁর সাংবাদিক সত্তা, সম্পাদক সত্তা জাগ্রত। অসাধারণ কল্পনাশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দক্ষ পরিচালনার সমন্বয় ঘটিয়ে পরদিনের আনন্দবাজার পত্রিকার স্মরণীয় সংখ্যাটি কেমন করে তিনি সম্ভব করে তুলেছিলেন, আমরা অনেকেই তার সাক্ষী। মৃত্যুসংবাদ স্বভাবতই তাঁকে বহুবার পেতে হয়েছে—প্রয়াতদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রিয়জন, সুহৃদ। প্রতিবারই তিনি বেদনার্ত হয়েছেন, আবার পরমুহূর্তে সাংবাদিকের দায়িত্ব, লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। আমার জানার মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল একদিন—যেদিন বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান হয়। সেদিন তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, এক লাইনও লিখতে পারেননি।

না, মৃত্যুভয় তাঁর মধ্যে ছিল না। এটা কোনও অত্যুক্তি নয়। তাঁর রচিত গল্পে মৃত্যু বারে বারে বিষয় বা চরিত্রের অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে। নিজে মৃত্যু সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। ষাটে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট আগে থেকেই বলতেন, মৃত্যুর জন্য আমি

প্রস্তুত; শুধু তার আগে দরকারি কাজগুলো সেরে ফেলার কথা মনে হয়। মৃত্যুভয়? নিজেই এই প্রশ্ন তুলে উত্তরে বলেছিলেন : না, সেদিক থেকে ভয় নয়, শুধু পদ্ধতিটা আমার বেলায় কী হবে মাঝে-মাঝে ভাবি। তাঁর ভাষায়, এ-ব্যাপারে হার্ট অ্যাটাক বেশ জিনিস। ঘুমের মধ্যে মরণ?—নাথিং লাইক ইট! অর্থাৎ নিজে ভুগতে আর সেই সঙ্গে অপরকে ভোগাতে ছিল অনিচ্ছা।

পদ্ধতিটা, সকলেই জানেন, শেষ পর্যন্ত সহজ হয়নি। যে-ব্যাধি সকলের কাছে ভীতিপ্রদ, শেষে সেই কালরোগে তিনি আক্রান্ত হলেন। আক্রান্ত হয়ে নিশ্চিতই বুঝেছেন মৃত্যু আসন্ন। তারপর চার মাস মৃত্যুদূতকে সামনে রেখে স্থৈর্য আর সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় যেভাবে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন তার তুলনা বিরল। এই সময়ে তাঁকে ভয়ে বা বিষাদে মগ্ন হতে দেখা যায়নি—যে কথা অনেকেই বলেছেন। এই দারুণ অসুস্থতার মধ্যে তিনি রবীন্দ্রসংগীত শুনেছেন, খেলার খবর নিয়েছেন, খবরের কাগজ এবং বই পড়েছেন, একটি অসামান্য গল্প লিখেছেন, লিখেছেন প্রচুর চিঠি। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পত্র রচনা করেছেন স্বহস্তে। আর রোগশয্যায় রচিত সেই দিনলিপি ("চলার পথে") তার ছত্রে ছত্রে আমরা সান্নিধ্য অনুভব করি নির্ভীক, ব্যবস্থিতচিত্ত এক রসস্রষ্টার, যিনি নিজের ক্লেশকর অবস্থা নিয়ে স্বচ্ছন্দে পরিহাস করতে সক্ষম। কলকাতার নার্সিংহোমে কোনও-কোনও দিন তাঁকে খুব কষ্ট পেতে দেখেছি, কিন্তু কখনও বিচলিত হতে দেখিনি। মরণকে শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তভাবে বরণ করে নিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে তাঁর ঘর থেকে সকলকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। মহাযাত্রা করলেন কাউকে সাক্ষী না রেখে। এই সাহসিকতা সহসা কারও মধ্যে প্রকাশ পাওয়া কি সম্ভব? প্রকাশ যে পেল, তার কারণ মৃত্যুভয়হীনতা ছিল তাঁর সত্তায়। সন্তোষবাবুর স্বভাবসুলভ, বেপরোয়া সাহসী, আনন্দোচ্ছল ভাবের যথার্থ পরিণতি দেখা গেল তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে—জীবনের সীমানা অতিক্রমের কালে।

* * *

এক সুখ্যাত নাট্যবিদ সন্তোষবাবুকে জটিল চরিত্রের মানুষ বলেছেন। কেন বলেছেন তিনিই জানেন। সন্তোষবাবুর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কিন্তু ভালরকমই জানা আছে যে তাঁর চরিত্র ও মন ছিল খোলা বইয়ের মত উন্মুক্ত। মন মুখ এক—অধিকাংশ সময়ে। তাঁর আচরণ সর্বদা যে সকলের পক্ষে প্রাতিপদিক হয়নি, হতে পারেনি, তার কারণ তিনি তাঁর মনোভাব গোপন করতে পারতেন না। যাঁর কাজে বা ব্যবহারে তিনি অসন্তুষ্ট তাঁকে সে কথা বুঝিয়ে দিতে দেরি করতেন না। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে ছিল অভিমান—ফলত নিজে দুঃখ পেয়েছেন, ঝোঁকের মাথায় অপরকেও দুঃখ দিয়েছেন, এবং প্রায়ই অপরে তাঁকে ভুল বুঝেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং অন্যত্র তাঁর যা প্রাপ্য তা তিনি পাননি। তিনি এটি বিশেষভাবে অনুভব করতেন। সংবেদনশীল মানুষ, অতএব কষ্টভোগ তাঁর অনিবার্য ছিল কিন্তু সংবেদনশীলতা অথবা ভাবপ্রবণতা আর জটিলতা কি

সমার্থক? না, জটিলতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। সন্তোষবাবুকে বুঝতে পারার জন্য খুব একটা বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োজন ছিল না, দরকার ছিল শুধু হৃদয়বত্তার অথবা সহানুভূতিশীল মনের।

এই সহানুভূতির অভাবে অনেকে সন্তোষবাবুকে ভুল বুঝতেন। বস্তুত আমরা সকলেই কোনও-না-কোনও সময়ে তাঁকে ভুল বুঝেছি, অবিচার করেছি তাঁর প্রতি। তিনি অনেকের প্রভূত উপকার করেছেন, অনেককেই দিয়েছেন প্রচুর (অধমর্ণের দলে আছে অবশ্যই এই লেখকও)। এই দানের বিনিময়ে তিনি একটি জিনিস মনে মনে চাইতেন। না, কৃতজ্ঞতা নয়, কিছু ভালবাসা। ওইটুকুই। কিন্তু সেটুকু দিতেও আমরা কার্পণ্য করেছি— আমরা অনেকেই, তাঁর অভিমানী স্বভাবের অন্তঃস্থলে যে একটি বিক্ষত হৃদয়, সেটি অনেকে বুঝে দেখেননি। মন মুখ এক হওয়ার মাশুল তাঁকে বার বার দিতে হয়েছে। প্রায় সকলেই বড় করে দেখেছেন স্বভাব বা মেজাজের দিক দিয়ে তাঁর ত্রুটি অথবা দুর্বলতাকে। সেসবের ঊর্ধ্বে যে-গুণগ্রাহিতা, যে-প্রেম, সেই দিকে চোখ মেলে তাকানোর অবসর হয়নি অনেকেরই। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের যে-স্বীকৃতিতে ছিল তাঁর নিঃসংশয় অধিকার, তাঁর জীবৎকালে সেটুকুও তিনি যথেষ্ট পাননি। সেখানেও কৃপণতা দেখেছি। অথচ আশুতোষ এই মানুষটিকে কত সহজেই না তুষ্ট করা যেত!

বিদায় নেবার আগে তিনি কিছু ভালবাসা পেয়েছিলেন। সেইটুকুই শেষে মনে রেখেছেন, ভুলে গিয়েছেন পুরনো অসন্তোষের কথা। কী পাননি, কে তাঁর শোধেনি দেনা, সে-হিসাব মেলানোয় তখন তাঁর রুচি ছিল না। শেষের কয়দিনে ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন সন্তুষ্ট চিত্তে—আক্ষরিক অর্থে নিজের নামটি সার্থক করে।

* * *

সবশেষে তাঁর আধ্যাত্মিক-মনস্কতার প্রসঙ্গ। এই দিকটি নিয়ে বোধহয় কেউ আলোচনা করেননি। আমিও যে এ ব্যাপারে যথোচিত আলোকপাত করতে পারব, তা নয়। তবে যেটুকু বুঝেছি বা অনুভব করেছি, সেইটুকুই প্রকাশ করতে চাইছি।

আগেই বলেছি, আমরা সুদীর্ঘকাল একসঙ্গে কাটিয়েছি তাঁকে দেখেছি, পেয়েছি নানা অবস্থায়। অভিমান, ক্রোধ, ক্ষোভ, তৃপ্তি, উচ্ছলিত আনন্দ—চিত্তের প্রায় সব অবস্থাতেই। আধ্যাত্মিক আকুতির স্ফুরণ কি তাঁর মধ্যে কখনও লক্ষ করেছি? এক সময়ে তার লক্ষণ দেখেছি। তখন তিনি আধ্যাত্মিক শান্তি অন্বেষণ করছিলেন। তার জন্য ব্যাকুলতাও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মানসিকতায়। দেখা দিয়েছিল যাকে বলে 'ডিভাইন ডিসকনটেন্ট'। কিন্তু অনেক কাজ, অনেক লেখা, অনেক দায়দায়িত্ব মেটানো ; আবার অনেক ভোগও বাকি ছিল—তাই সে ব্যাকুলতা তাঁর সত্তার স্থায়ী অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাঁর বোধের গভীরে সেই ব্যাকুলতা, মনে হয়, থেকে গিয়েছিল। 'তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে'—রবীন্দ্রনাথের গানের এই চরণটি বুঝি তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হত।

তিনি বোধহয় অপেক্ষায় ছিলেন। মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়। যখন সব দিতে পারবেন পরম একজনকে। তাঁকে সব দিয়ে যখন সব পাবেন। কালব্যাধিতে যখন আক্রান্ত, জীবনের সেই অন্তিম পর্বে কি তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর প্রার্থিত পরম লগ্নটি উপস্থিত? ঘটনাক্রমে তখন তো তিনি পরমেশ্বরকে সব দিয়েছেন—তাঁর সুখ, স্বাস্থ্য, শক্তি, কণ্ঠস্বরটুকুও। উজাড় করে সব দিয়ে কী পেয়েছিলেন? কিছু কি পেয়েছিলেন? জানি না। শুধু জানি, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর মুখের রেখায় ক্ষোভ বা অভিমানের চিহ্ন ফুটে ওঠেনি। বরং শান্তি আর স্থৈর্যের ছবিই যেন সেখানে অঙ্কিত দেখেছি।

তবে কি তিনি শেষের দিকে তাঁর পরানসখার নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনুভব করতে পারছিলেন? *'সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি'*—এই চিন্তায় বিভোর হয়েছিলেন? আর চিনতে পারছিলেন ঘোর অন্ধকারে তাঁর পরম বন্ধুর প্রসারিত হাতখানি? জানি না। স্পষ্ট করে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, জিজ্ঞাসা করা সম্ভব ছিল না বলেই। তিনিও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। শুধু একদিন ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। আর একদিন দেখেছিলাম, তাঁর হাত কপালে ঠেকানো : অদৃশ্য কাকে যেন নমস্কার করছেন। আমার মনে হয়—তাঁকে, যাঁর অপেক্ষায় তিনি ছিলেন।

পাইকপাড়ায় সন্তোষকুমার

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সন্তোষকুমার ঘোষ পাইকপাড়া রো-তে আমাদের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে পরে আসেন। কিন্তু চিঠিপত্রে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ পঞ্চাশ সাল থেকেই। স্টেটসম্যান ছাড়ার পর দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে তিনি বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে বছর কয়েক সেখানে ছিলেন। সেই সময়ে যাঁরা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শক্তির জোরে সাহিত্যে স্বস্থান অধিকারের প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিচ্ছেন, সন্তোষ তাঁদের অন্যতম। অতএব মিত্রালয়ের প্রকাশিত বই-এর তালিকায় তাঁর ছোটগল্পের বই চাই। রাম না হতে রামায়ণের মত সন্তোষের সাহিত্য জীবনের প্রথম আমলেই 'সন্তোষকুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশিত হয়। 'নানা রঙের দিন' আর 'কিনু গোয়ালার গলি' দুটি স্বল্পায়তন উপন্যাসেও তিনি বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখেন। সম্ভবত শ্রীমান গৌরের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে চিঠিতে পরিচয় হয়। ১৯.৯.৫১ তারিখে নয়াদিল্লি থেকে চিঠিতে জানান "...গল্পের বই-এর নাম স্থির করেছি 'নটে গাছটি'। এ নামে কোনও গল্প অবশ্য থাকবে না। লক্ষ্মীপুজোর আগে নিশ্চয়ই ছাপাখানা খুলবে না। আমি পুজোর পরই গল্পগুলি বাছাই এবং সম্পাদনা করে পাঠাব। আনুমানিক কত ফর্মা চান জানাবেন। দাম ২ থেকে ৩ এর মধ্যে হলে ভাল হয়—ধরুন দেড়শো পৃষ্ঠা। কিছুদিন পূর্বে আপনার একটি গল্প পড়েছিলাম ; নায়িকা মনে হয় জাহানারা বেগম। অনুমান সত্যি কিনা জানাবেন।...প্রস্তাবিত গল্পের বই-এর প্রুফ আমি দেখতে চাই না। আপনিই বন্দোবস্ত করবেন। অসুবিধা হয় তো কলকাতায় কোনও কোনও বন্ধুকে লিখে দেব ; তাঁরা অন্তত একটা প্রুফ দেখে দেবেন। বইটি ক্রিসমাসের আগে যাতে বাজারে পড়ে, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন। আমি এ বইয়ে বস্তুতান্ত্রিক এবং রোমান্টিক দু'রকম গল্পই দেব। নমস্কার নেবেন।—ইতি সন্তোষকুমার ঘোষ।"

এরপর তিনি কলকাতায় এলে চাক্ষুষ পরিচয়ে যে অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয় তার চিহ্ন ২৯.৪.৫২ তারিখের পত্রে "...এখন কলকাতায় আপনাদের সাহচর্যতপ্ত দিনগুলির কথা মনে পড়ে। সুরূপা দেবীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন (দোহাই, এই অতিভক্তিকে চোরের লক্ষণ মনে করবেন না যেন)...।" এর কাছাকাছি সময়ে আমাকে লেখা খান কয়েক চিঠি আছে, যেগুলি মূলত ব্যবসায়িক হলেও একটি মানুষের প্রকৃতির কিছু পরিচয় তাতে প্রতিফলিত। যথা, একটি চিঠিতে লিখেছেন : ..."দেশে 'চীনামাটির'

বিজ্ঞপ্তি দেখলুম। আমাকে দিয়ে অমিয় সান্যালের পা টিপিয়ে নিয়েছেন। এর চেয়ে আলাদা একটু ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিলেই পারতেন..."। চিঠির পর চিঠি চালাচালিই হয় কিন্তু পাণ্ডুলিপি পৌঁছয় না। ৯.১০.৫২ তারিখে লিখেছেন, "গল্পের বই বের করার সংকল্প আপনার অটুট আছে তো? নামটি আপনার যখন পছন্দ হয়নি তখন বদলেই দেব। কপি এই সপ্তাহের শেষে পাঠাতে শুরু করব।" তার এক মাস পরে ১০.১১.৫২ তারিখের চিঠি :

"গল্পগুলো পাঠাতে কিছু দেরি হল, মার্জনা করবেন। এই সঙ্গে তিনটি গল্প পাঠালাম : চীনেমাটি, বিষ, যাদুঘর। এই তিনটি পর পর যাবে। এগুলো মোটামুটি edit করে দিয়েছি এবং কম্পোজ সারা হতে না হতে বাকিগুলি পেয়ে যাবেন।

"বইয়ের নাম 'চীনেমাটি'—কিংবা চীনেমাটির পুতুল, যেটা আপনার পছন্দ। প্রচ্ছদপট ভাল হবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার আর পাঁচটা বই তো দেখেছি।

"একটি প্রুফ আপনি স্বয়ং, আর একটি নারায়ণ চৌধুরী, নীরেন চক্রবর্তী কিংবা দেবদাস পাঠককে দিয়ে দেখাবেন। সময় থাকে তো আপনি নিজেই দুটো প্রুফ দেখে দেবেন। বইটা যত তাড়াতাড়ি বের হয়, ততই ভাল। দেখবেন, ছাপাখানায় এটাকে ফেলে রেখে যেন আচার বানাবেন না। 'পরপুরুষ' নামক একটি উপন্যাসে হাত দিয়েছি। যদি কোনও কাগজে প্রকাশ নাও করি, বইটি আপনিই পাবেন। 'দেশে' বেরুলে পাবলিসিটি একটু ভাল হয়, না।

"কথাসাহিত্য পেয়েছি। আপনি 'নানা রঙের দিন' পেয়েছেন? একরকম আছি। আশা করি ফুলফল এবং লতাটি নিয়ে আপনি ভালই আছেন। ইতি সন্তোষকুমার ঘোষ।"

তিনটি গল্প হাতে নিয়ে বসে রইলাম কেননা এর আগে বই-এর আংশিক কপি প্রেসে দিয়ে বেশ কয়েক বার ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছে। আর সন্তোষ যে কেমন তড়বড়ে মানুষ তা খানিকটা বুঝে ফেলেছি। ওই মাসের শেষের চিঠিতেও তিনি বই প্রেসে দেবার জন্য প্ররোচিত করলেন এবং জানালেন "উপন্যাসটি মনে মনে ঠিক হয়ে আছে। লিখতে বসতে পারিনি। সাগরবাবু লিখেছেন তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাস শেষ হলেই ওটি শুরু করতে, (করবেন?) দেখি।"

প্রসঙ্গত বলে রাখি 'দেশ' পত্রিকায় সন্তোষের ধারাবাহিক ওই উপন্যাসের নাম দেওয়া হয়েছিল 'মোমের পুতুল' এবং নিজের পূর্বপ্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গ্রন্থাকারে মিত্রালয়কে প্রকাশের ভার তিনি দেননি। অবশ্য আমিও প্রস্তাব দিইনি। কেননা আগেই খবর পেয়েছিলাম যে, অন্য প্রকাশকের তরফ থেকে অ্যাডভান্স রয়্যালটি দিয়ে (দাদন!) উপন্যাসটি কব্জা করার চেষ্টা হচ্ছে। কেউ যদি বলেন এটা আমার ব্যবসায়িক তৎপরতার অভাব, তার জবাবে সবিনয়ে নিবেদন করতে পারি যে, স্বাস্থ্যকর আত্মমর্যাদাবোধ থাকাটা মানুষের একটা আবশ্যিক লক্ষণ। ছোটগল্পের বই কম বিক্রি হয় জেনেও যে প্রকাশক তার গুণগত বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে তুলে ধরতে এগিয়ে আসে, তাকে, বাজারে যা বেশি বিক্রি হয় অর্থাৎ উপন্যাস প্রকাশের সুযোগ দেবেন এই কথা

দিয়েও লেখক যদি না দেন তো দেবে কে। এ নিয়ে অন্য প্রকাশকের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করতে হবে কেন!

একদা যে চৌকিতে পাশাপাশি শুয়ে বড়দা (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে 'ইচ্ছামতী' উপন্যাসের পরিকল্পনার কথা বলতেন, যে চৌকিতে বসে গজেনদা (মিত্র) 'অপরাজিত' উপন্যাসটি প্রকাশে মিত্র ঘোষের তরফ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা 'পথের পাঁচালী' পেয়েছেন অতএব 'অপরাজিত' গৌরীশঙ্করেরই পাওয়া উচিত বলে বড়দা রায় দিয়েছিলেন, সেই চৌকিই বোধহয় আমাকে কারবারের ঝানু চৌকিদার হতে দেয়নি। তা ছাড়া 'কিনু গোয়ালার গলি' বা 'নানা রঙের দিন' এর পরে 'মোমের পুতুল' যেন তেমন আকর্ষণ করেনি আমাকে, মূল যৌনচিত্রের দিকে লেখকের ঝোঁকও তার একটা কারণ হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা সেই সময় মিত্রালয়ের দপ্তরে প্রকাশের অপেক্ষায় সবসময় বিস্তর পাণ্ডুলিপি এবং পুনর্মুদ্রণের চাপও থাকত। কাজেই দু-একটা বই পাওয়া না পাওয়ার জন্য কিছুই ইতরবিশেষ হত না। তাই দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ হবার পর সন্তোষকুমার অবাধেই পাইকপাড়াতে আমার তখতে তাউসে আড্ডা জমালেন। চৌকিটা বড় না হলেও তার গৌরব তখততাউসের মত। দিল্লির কাগজ উঠে গেলেও ব্রজেনের মত সন্তোষের চাকরি গেল না তার কারণ তাঁর নিয়োগ হয়েছিল কলকাতা ভিত্তিক। আনন্দবাজার পত্রিকা এমন একটা প্রতিষ্ঠান যাঁরা পত্রিকা বন্ধ করার যথেষ্ট আগেই কর্মীদের গোচরে এনেছিলেন এবং দিল্লিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণও দিয়েছিলেন। বেশ মনে আছে ব্রজেন কলকাতায় এল অনেক টাকার মালিক হয়ে আর আমি তার কাছ থেকে হাজার কয়েক টাকা ধার নিলাম। বললাম, 'তোর হাতে থাকলে উড়িয়ে দিবি বরং আমি এখন কাজে লাগাই।'

সন্তোষ প্রথমে একাই এলেন, তাঁর পরিবার রইল দিল্লিতে। কলকাতায় যখন যেখানে মর্জি ২/৪ করে দিন কাটাচ্ছেন আর বলছেন এভাবে চলে না। একটা বাসা-টাসা দেখে দাও। নীহার বেচারা দিল্লিতে পড়ে রইল--কী মনে করছে! দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর ডেরা হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র অথবা সাগরময় ঘোষের বাড়ি আর উত্তরে আমরা দুই পরিবার—নরেন মিত্র আর গৌরীশঙ্কর। উঠেপড়ে লেগে গেল সবাই। এর আগে যেমন শিবনারায়ণ রায়ের জন্যে বাড়ি জোগাড়ের চেষ্টায় সুরূপা সাফল্য দেখিয়েছিল এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। পাইকপাড়ায় দুনিয়ার সবাইকে টেনে আনাই যেন ওর ব্রত! পাইকপাড়া রো-তেই মিলে গেল ভালবাসা এবং প্রথম রাত্রিবাসের সময় সন্তোষের সঙ্গী ছিল দেবদাস পাঠক। বিছানা বালিশ তো সমস্যা নয়—আসল ঢাল-তরোয়াল তো মশারি। সবই জোগাতে হল--তাকে কিছুতেই ঠেকানো গেল না। 'রাতে না থাকলেও বাড়িটা চুরি হবার ভয় নেই। একেবারে দিল্লি থেকে সবাইকে নিয়ে আসুন, আমরা সব গোছগাছ করে দেব।' বলে কোনও লাভ হল না।

সন্তোষ বাস শুরু করায় আমার আড্ডার এতদিনের মৌরসিপাট্টা দু-টুকরো হল। সকালের দিকে প্রথম দফা দক্ষিণাদা, গৌর, মাঝে-মাঝে শিববাবু আমার ঘরে জমতেন।

পরে একটু বেলায় গেলে সন্তোষের বাড়িতে দেখতাম ধীরেনদা মিত্র আর বিমল। অবশ্য আরও একজন আসতেন তিনি আনন্দবাজারের বিনোদ বোস। হাতে যাঁর সিগারেটের টিন আর মুখে অভ্যর্থনার হাসি। নরেন মিত্র ক্বচিৎ। এছাড়া একটি তরুণকে যে কোনও সকালে নিয়মিত এবং দীর্ঘকাল দেখা যেত, সে মাঝেসাঝেই সন্তোষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করত। প্রথমে ভাবতাম সে সন্তোষের কোনও আত্মীয়। পরে একদিন আলাপ করিয়ে দিল সন্তোষ, বলল—বরুণ। বরুণ সেনগুপ্ত। ওর একটা পত্রিকা আছে। তুমি লেখা দিও। সন্তোষ আনন্দবাজারের বার্তা-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেবার পরই পত্রিকার খোলনলচের ভোল পাল্টে দিল। সংবাদ পরিবেশনে আধুনিক ধারা প্রবর্তনে সন্তোষকুমার ঘোষ অতি অল্পদিনেই প্রবাদপুরুষ হয়ে পড়লেন একথা কে না জানে!

পাইকপাড়াতে আমাদের তখনকার দৈনন্দিন জীবনটাই যেন উৎসবের আমেজে কেটেছে। আনন্দবাজার আর যুগান্তর দুই বাংলা সংবাদপত্রের দুই বার্তা-সম্পাদক একই গলির বাসিন্দে এবং সুখে-দুঃখে পরস্পরের অংশীদার হয়ে কাটানোর সেই সব নানা রঙের দিন সন্তোষের মৃত্যুর পরও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে তার সেই কথা। মাঝেমধ্যে সে আমার কাছে জ্যেষ্ঠত্বের দাবি করে বলত, 'জানো তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট। সেইভাবে কথা বলবে!' দু-সপ্তাহ আগে পৃথিবীতে পা দিয়েছিল সে। অবশ্য তার সঙ্গে আমার কোনও দিক দিয়ে তুলনাই হয় না। একই সঙ্গে সাহিত্য ও সংবাদজগতে এমন শক্তির স্বাক্ষর এ যুগে তো চোখে পড়ে না। এরই নাম বোধহয় প্রতিভা!

সন্তোষদা : বাইরে দূরে?

অমিতাভ চৌধুরী

বাংলা সাংবাদিকতার শুরু সন্তোষকুমার ঘোষের হাতে ১৯৫৯ সালে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সাহিত্যিক সন্তোষকুমার সাংবাদিক সন্তোষকুমারের চেয়ে অনেক বড়। সন্তোষদা নিজেও চটে যেতেন তাঁকে কেউ 'সাহিত্যিক সাংবাদিক' বললে। তবে এই সম্বোধনের জন্যে তিনি নিজেই দায়ী। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি এমনভাবে সংবাদপত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন যে তাঁর সাংবাদিক সত্তা প্রবল ও প্রখর হয়ে ওঠে। সন্তোষদার কাছে মাফ চেয়ে স্বীকার করা ভাল, একেবারে শেষতম গল্পটি বাদ দিলে তাঁর শেষদিককার সাহিত্যকর্ম অনেক জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল।

এ কথা কেউ বললে তিনি চটে যেতেন, যদিও নিজে জানতেন চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের গল্পকার সন্তোষ ঘোষ, যার জন্যে তাঁর খ্যাতি, সংবাদপত্রের জোরালো সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও হেডিং ডিসপ্লের ভারে চাপা পড়ে গেছেন। মনে আছে আমরা যখন ছাত্র, তখন পূর্বাশা বা দেশ এলে কিংবা শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হলে সর্বপ্রথম পড়তাম তাঁরই লেখা গল্প। প্রত্যেকটিতে চমক, প্রত্যেকটিতে নতুন হাওয়া। কানাকড়ি, চীনেমাটি, ধাত্রী, পনের টাকার বউ, অমৃতস্য, ভেবেছিলাম ইত্যাদি অসাধারণ। সব ছোটগল্প পড়েছিলাম তারিয়ে তারিয়ে। আজও যখন পড়ি, বড় বিস্ময় লাগে। তিনি নিজেই বলতেন আমি মম মপাসাঁ ও-হেনরি রবিঠাকুরের ইস্কুলে তালিম নেওয়া লেখক, যাঁরা গল্পকে গল্পই করতে চেয়েছিল। আর একটু স্পষ্ট করে তাঁর ভাষাতেই বলি—"যে জীবন সে দেখত, যে জীবনের মধ্যে ছিল তার নীচতা-উচ্চতা ক্রূরতা-মহত্ব, প্রতিহিংসা-ভালবাসা এই সব তার প্রথম যৌবনকে উদ্বেল আকুল করত। সেই ছাঁচেই সে ঢালতে চাইত গল্পকে। কেউ কেউ তারিফ করতেন, অনেকেই ছিলেন উদাসীন। তবু, এতখানি বয়সের রাস্তা পেরিয়ে সে কখনও থেমে, কখনও গল্পটল্প থামিয়ে পৌঁছে তো গেল। পৌঁছনো মানে যে উত্তরণ নয়, এটা আজ দিব্যি টনটনে টের পাচ্ছে। তখনকার মদতদাতারা একে একে হাততালি বন্ধ করে বোবার মত চুপ হয়ে আছেন। এই নিয়ে এ লেখকের কিছুমাত্র নালিশ নেই। তার প্রধান নালিশ নিজের বিরুদ্ধে।"

ঠিক কথা। বাংলা সাহিত্যকে পরবর্তীকালে বঞ্চিত করার অপরাধে দোষী তিনিই। পরে অনেক লিখেছেন বটে, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ অনেক গভীর অনেক মননশীল। কিন্তু স্বয়ম্বরা, কস্তুরী মৃগ, জোড়বিজোড়, যাদুঘরের সন্তোষ ঘোষ আর তিনি ছিলেন না।

তাই বলছি সাংবাদিকতা সন্তোষদাকে যেমন খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছে, তেমনি তলে তলে ধ্বংস করেছে সাহিত্যিক সত্তাকে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর কীর্তির কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন করে কিছু বলার নেই। এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু আবার কবুল করতে চাই, এই যে সাংবাদিক আমি, তার ষোল আনা সৃষ্টিকর্তা, সন্তোষদা। রাগী, স্নেহময়, খামখেয়ালী। অভিমানী-পরস্পরবিরোধী নানা রকম আবেগে উদ্দাম এমন মানুষ আমি কম দেখেছি। তাঁর সঙ্গে দিনে একনাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা কাজ করার আনন্দ ও নিরানন্দ—দুই-ই উপভোগ করেছি।

আনন্দ এই কারণে যে, এমনভাবে আমরা দু'জনে কাজ করতাম যে কাজকে কখনও কাজ বলে মনে হয়নি। তিনি কাজ করছেন, দেখে আমি শিখেছি। তিনি ভাবছেন, সেই ভাবনা প্রকাশ করার আগে আমি ধরে ফেলেছি! নিরানন্দ এই কারণে যে, কখন কোন তুচ্ছ কারণে বা অকারণে তিনি চটে যাবেন বুঝতে পারতাম না।

তিনি আমায় স্নেহ করতেন প্রধানত দুটি কারণে। এক রবীন্দ্রনাথ, দুই সমান ওয়েভ লেংথ। কাজের সময় বা আড্ডা মারার সময় তাঁর মনের কথাটা আমি দ্রুত আঁচ করে নিতে পারতাম। তাঁর ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিশে যেত। তাই যখন আমি আনন্দবাজার ছেড়ে চলে আসি, তিনি এক অনুষ্ঠানে বলে বসেন "অমিত চলে যাওয়ার পর আমি এখন নিরানন্দবাজারে কাজ করছি।" বেফাঁস কথা বলার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সিদ্ধকণ্ঠ।

একদিকে তিনি যেমন ভালবাসার কাঙাল, তেমনি প্রচণ্ড কানপাতলা লোকও ছিলেন। কেউ কিছু বললে যাচাই না করে বিশ্বাস করে বসতেন। ফলে গোড়ায় তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় খুব টেনশন হত। ভুল বোঝাবুঝি অবশ্যি বেশিদিন থাকত না। নিজেই একদিন বাড়িতে এসে হাজির হতেন, বলতেন কী খাওয়াবে, খাওয়াও, কিংবা বলতেন আজ দুপুরটা তোমার এখানে থাকব। তারপর গল্প হাসি ঠাট্টা, ভাষাতত্ত্ব রবীন্দ্রসংগীত কলকাতার ভূগোল দস্তয়ভস্কির গল্প। নানা বিষয় নিয়ে অজস্র কথাবার্তা। কে বলবে দু'দিন আগে ভ্রূকুটি তুলে উনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

সন্তোষদার ভালবাসাবাসির একটা ক্রমপর্যায় ছিল উইম্বলডনে টেনিস খেলোয়াড়দের বেলায় যেমন থাকে। এই ক্রমপর্যায় আবার ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালটাত। আজ দুপুর বারোটায় হয়তো আছি তালিকার শীর্ষে, রাত ন'টায় দেখা গেল আমি নেমে গেছি সাত নম্বরে। কোনও কোনও দিন একেবারে 'আনসিডেড' হয়ে যেতাম। শুধু আমি নয়, গৌরদা, শান্তিরঞ্জনদা, জ্যোতির্ময়বাবু, বরুণ, অরুণ সকলের বেলায় তাই ঘটত এবং এ নিয়ে আমরা আড়ালে খুব হাসাহাসি করতাম।

তাঁর কাজের টেবিলের সামনে আমরা বসে আড্ডা মারতাম, তর্ক করতাম। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করার আনন্দে ডুবে থাকতাম। মনে মনে বলতাম 'মোদের যেমন মেলা তেমনি যে কাজ, জানিসনে কি ভাই, কাজকে কভু আমরা কী ডরাই।' সংবাদ নির্বাচন বা সংবাদের শিরোনাম স্থির করার ফাঁকে রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ কোনও শব্দের ব্যবহার

কিংবা বাংলা কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে চটজলদি আলোচনায় মেতে উঠতাম। বার্তা-সম্পাদক হওয়ার পর তিনি আমাকে হাতে ধরে কাজ শেখাতেন। গোড়ায় মাসের পর মাস সকাল দশটায় আমাকে অফিসে হাজির করিয়ে রাত দেড়টায় নিজের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। সে এক আনন্দের দিন গিয়েছে। সন্তোষদা নেই আমার কাজেও আনন্দ নেই। যুগান্তরে যোগ দেওয়ার পর একটা ভাল হেডিং করে ভাবতাম, সন্তোষদা কী বলবেন, তাঁর ভাল লাগবে তো? অনেক সময় পরদিন তিনি টেলিফোন করে বলতেন অমিত দারুণ হয়েছে। আমি সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়ে যেতাম। এমন কেউ আর আমাকে বলার নেই।

অনেকেই জানেন না, সন্তোষদার ছবি আঁকার বাতিক ছিল। কথা বলার মাঝখানে কিংবা একনিষ্ঠ বন্ধু জ্যোতির্ময় বসুর বা তাঁর বাল্যবন্ধু সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিভৃত আলোচনার সময় লাল নীল পেনসিল দিয়ে নানা রকম ছবি আঁকতেন তারপর ফেলে দিতেন ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে। আমি তার অনেকগুলো কুড়িয়ে নিজের কাছে রেখেছিলাম। ১৯৭৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিনে সেগুলো ভাল কাগজে সেঁটে একটা বড় অ্যালবাম করে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। জানি না, সেটা আছে কিনা। থাকলে সবাই সন্তোষদার আর একটি দিকের প্রতিভার পরিচয় পেতেন।

সন্তোষদার বহু গল্প উপন্যাস "আমার লেখা।" চমকাবেন না আমারই লেখা। সন্তোষদা ডিকটেশন দিতেন, আমি লিখতাম। কখনও তাঁর বাড়ির খাওয়ার টেবিলে, কখনও অফিসের কাজের টেবিলে। জল দাও, স্বয়ং নায়ক এবং শেষ নমস্কার বইয়ের বহুদংশ, দেশ পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক ভ্রাণাকরে এই ভাবেই লেখা। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধও আমাকে লিখতে হয়েছে। প্রথমত, নিজের হাতে লিখতে তাঁর ভাল লাগত না। দ্বিতীয়ত, আমি শুদ্ধ বানানে দ্রুত লিখতে পারতাম। বাংলা বানান ভুল তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বানান সংস্কারে আমি তাঁর প্রথম সহযোগী ছিলাম বলে তিনি আমার উপর দারুণ খুশি হয়েছিলেন।

সন্তোষদার সঙ্গে মান-অভিমান ভক্তি-ভালবাসার কথা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। এমন প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবন্ত মানুষের পূর্ণ পরিচয় কোনও ছোট লেখায় দেওয়া সম্ভবও নয়। শুধু স্মৃতি নয়, তাঁর লেখা প্রচুর চিঠিও আমার কাছে জমা আছে। দেশের বাইরে গেলে প্রায় রোজই আমাকে চিঠি লিখতেন। চমৎকার সব চিঠি। ইচ্ছে করছে তার দু-একটির পত্রাংশ তুলে ধরি।

১৯৬৬ সালে সন্তোষদা আমেরিকা যান। আমি গিয়েছিলাম ১৯৬৪ সালে। তাঁর আগে মার্কিন সরকার থেকে আমার নেমন্তন্ন হয়েছিল বলে আমি তাঁকে খ্যাপাতাম। উনি মৃদু হাসতেন। মনে মনে আমেরিকার উপর একটু চটতেনও।

মার্কিন দেশে তাঁর প্রবাসের সময় সেখানকার অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি ডাকে পাঠাতেন। আমি সাজিয়ে-গুছিয়ে ছাপাতাম। সেগুলোই 'বাইরে দূরে' নামে আনন্দবাজারে প্রকাশিত হত। পরে বই হয়ে বেরিয়েছে। এই ভ্রমণকাহিনী সুষ্ঠুভাবে

ছাপা নিয়ে তাঁর ছিল দারুণ উৎকণ্ঠা। কারণ জীবনযাত্রায় না হলেও সাহিত্যে ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পারফেকশনিস্ট। বড্ড খুঁতখুঁতে।

এবারে তাঁর লেখা প্রবাস-পত্রের দু-একটি তুলে ধরছি—ওই 'বাইরে দূরে' নিয়েই প্রধানত।

(১)

সানফ্রানসিসকো

১৮।৮।৬৬

অমিত, তিনটে বাংলা লেখার কাটিং পেয়েছি, একটা ইংরেজির। ডিসপ্লে অভাবনীয়। ছবি কি প্রতিবার বদলাচ্ছ? ছাপার সামান্য ভুল চোখে পড়ল। মার্কিন নামধাম তুমি একটু চেক করে দিও। জ্যোতির্ময়কে দিয়ে প্রুফ দেখিয়ে নেওয়া যায় না? আমার লেখা অস্পষ্ট, উপরন্তু ছাড় থাকে।

আনন্দবাজারের গল্প শেষ করেছি। শকিং থিম, তবে আমার "পুরনো রীতি"র টেকনিকে লেখা। পটভূমি মার্কিন নাইট ক্লাব। আমেরিকা ছাড়া এই গল্প লেখা সম্ভব হত না। (তুমি আবার মার্কিন বিষয় নিয়েই পুজোয় লেখোনি তো?) কমপিটিশনে পারব না। তবে পুত্রও শিষ্যের মত। ভ্রাতার কাছেও পরাজয়েৎ।

আনন্দবাজারের গল্পটা নিয়ে, H.S-এর তৃতীয় কিস্তিও হয়েছিল, ব্যস্ত ছিলুম বলে এবার "বাইরে দূরে" ছোট করলাম, প্রকৃতি দিয়েই ঠেসে দিলাম। হালকা দিকটা তো 'দেশ'-এ পাঠিয়ে তোমার চাপ হালকা করছি। ছাপা হচ্ছে তো?...

ভালবাসা—সকলকে। যারা চিঠি দেয় না, তাদেরও। ইতি। সন্তোষদা।

(২)

লুইভিল,

৯।৮।৬৬

অমিত, এই লেখা যখন পাবে, তখন হয়তো ১৫ আগস্ট পেরিয়ে গেছে। এবারে লেখাটা ছোট ছিল। পরেরটা পাঠাব সানফ্রানসিসকো থেকে—একটু দেরি হতে পারে। যাই হোক, তোমার হাতেও তো অনেক মজুত। কষ্ট করে 'স্থান দিও হে'—। তোমার চিঠি পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। তবু ভালবাসা দ্রৌপদীর মত, ইত্যাদি। দ্রৌপদী তো বুঝলাম, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের কোন জন কে? জ্যোতির্ময় অবশ্য যুধিষ্ঠির, গৌর ভীম। আর তুমি—? নকুল সহদেবের নামও আন্দাজে ঠিক করেছি, কিন্তু লিখব না। তারা যদি চটে যায়। এক রকম আছি। কাল যাব কানসাস, পরে মিসৌরী।—সন্তোষদা।

(৩)
হিউসটন, টেকসাস
১।৯।৬৬

অমিত, এই চিঠি পেয়েই তুমি মিলুকে ফোন করে বকবে। আমার মেয়ে কিনা সানফ্রানসিসকো বানান সানফ্রান্সিস্কো লেখে। Spelling reform, like charits should being at home. 'সহধর্মিনী' তিনটি পড়েছি, খুব ভাল। মর্মস্পর্শী লেখা। সবচেয়ে কোনটা আমার ভাল লেগেছে? রবীন্দ্র মৈত্রের স্ত্রী। চোখে জল আসে। 'যদিও'-ও খুব অভিনব—বিশেষত আইডিয়া। কিন্তু সুনীলের স্টানডার্ড্ রাখতে পারব কি? দেখি। আমারও লেখার ধক আর দরকার দুই-ই ফুরিয়ে আসছে। 'বাইরে দূরে' আর বড়জোর ২।৩টি পাঠাতে পারি (সবগুলো পেয়েছ তো? নম্বর মিলিয়ে নিও)।

লিখেছ, তোমার উপর 'খুব যাচ্ছে।' কী?—কাজ? সেটা তো বুঝতে পারি। কিন্তু আর কিছু কি? খুলে লেখো না, ওই তোমার দোষ। ঈশ্বর, তোমার কবজিকে বোমবাই মেল করেছেন, তবু কৃপণতা। অফিসে বসে দু'ছত্র লিখে দায় সারো, আর সেই চিঠি আমি ফিরে ফিরে দশবার পড়ি। বাড়িতে বসেও তো লিখে আনতে পার। আর তো বড়জোর একটা চিঠি পাব—ন্যু ইয়রকে।...আর কী। ভালবাসা। সন্তোষদা।

(৪)
মায়ামি, ফ্লো।
৩।৯।৬৬

অমিত, এই গেল 'তেরো' নম্বর। যোল কলা পূর্ণ হবে কিনা জানি না। পনেরোতে শেষ হতে পারে। এবারে শেষের দিকে দু'টি ইংরাজি ছড়া ও কবিতা আছে। আলাদা কমপোজ করিয়ে ভাল করে পড়িয়ে নিও। অন্তত কোটেশন-এ যেন ছাপার ভুল না থাকে। তুমি, জ্যোতির্ময় বা অরুণ পড়লে ভাল হয়। এবারেরটা লিখতে ভাল লেগেছে। আজ 'দেশ'-এও একটা উড়ো চিঠি ছাড়লাম। পৌঁছল কিনা লিখো। তোমার বাচ্চার অন্নপ্রাশন হল? তোমার বউদির চিঠিতে জানলাম। দীর্ঘায়ু হোক প্রার্থনা করি। ভালবাসা। ইতি সন্তোষদা।

অল্প কয়েকখানা চিঠি তুলে ধরলাম। আরও অনেক চিঠি রাখা আছে। প্রত্যেকটিতে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং নিজের লেখার প্রতি উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে আছে।

আর 'বাইরে দূরে' নিয়ে তাঁর চিঠি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল কুড়ি বছর আগে যখন আমরা ঘনিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু এখন সন্তোষদা নিজেই আমাদের কাছ থেকে অনেক 'বাইরে দূরে'।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? তিনি আজও আমার 'নিকটে কাছে।' যতদিন আছি ততদিন তাই থাকবেন।

যে বৃত্ত আজ অসম্পূর্ণ

অরুণ বাগচী

আমরা তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই অধমকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছেন। এখন তাঁরই হাতে রোপিত শিশুবৃক্ষ, শান্তিনিকেতন আশ্রম ফুলে ফলে সমৃদ্ধ বনস্পতি—ক্রমেই আমার শোণিতস্রোতে আমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করছে। গাছতলার ক্লাসে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করি। কিন্তু ওইসব অবশ্যপাঠ্য কেতাবের চেয়ে ঢের বড় আকর্ষণে টানে আচার্য ক্ষিতিমোহন লাইব্রেরির ওপরতলার ঘরটি, যেখানে কখনো শুনি শঙ্করাচার্যের 'সৌন্দর্যলহরী'র ব্যাখ্যা, কখনো দাদু-র অথবা রুমীর অন্তর্দর্শন, কখনো কল্ডওয়েলের সর্বশেষ রচনার মূল কথা, এবং সর্বদাই রবীন্দ্রনাথ। অধ্যক্ষ অনিল চন্দ এবং রানিদির কোনার্ক—সেখানেও আশ্রমপিতার বিরাট উপস্থিতি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্দ্রজিৎ) এবং অমিয়কুমার সেন ক্লাসে যতটা পড়াতেন তার চেয়ে অনেক বেশি পাঠ দিতেন ক্লাসের বাইরে। ঠাকুরবাড়ির পৌর্ণমাসি মহিলার প্রতীকস্বরূপ তখনও জীবিত ছিলেন রথীন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী।

কিন্তু সর্বদিক থেকে আলোয় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা মানে এই ছিল না যে আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথেই মগ্ন ছিলাম। আদৌ না। আমার বিশ্বাস আমি একদিকে জীবনানন্দ ও অন্যদিকে ডিলান টমাসকে সত্যকার চেনা চিনেছি ওই রবীন্দ্র-পটভূমিতে বসে। এমনকী, ভয়ে ভয়েই বলি, যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ—আমার কাছে শব্দ বা প্রত্যয়াদি কোনও দিক দিয়েই বরণীয় ছিলেন না, তাঁকেও অনেক পরিমাণে আবিষ্কার করি শান্তিনিকেতনে বসে। সন্তোষকুমার ঘোষ নামক সদ্য-উদিত প্রতিভাকে অবলোকন করি ওই বিশ্বভারতীর অঙ্গন থেকেই।

তবে মাসে অন্তত একবার তো কলকাতায় আসতামই। কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকান, কফি হাউস, বন্ধুবান্ধব, প্রেসিডেন্সি কলেজ, লাইট হাউসে নতুন বিলিতি সিনেমা এসবের আকর্ষণ ছিল। চীনে রেস্তোরাঁ ক্যাথে তখন অতি উৎকৃষ্ট পোর্ট এবং বিফ স্টেক পরিবেশন করত। নানকিন পেইপিং চাংওয়া, রয়াল নিজাম, দ্বারিকের লুচি-ডাল-তরকারি, বসুশ্রীর চিকেন কাটলেট, ফিরপো ফেরাজিনি ম্যাগ্স—এসব তো ছিলই। কিন্তু সবচেয়ে জোরালো টানে টানত পত্রিকা অফিসগুলি, সাহিত্যের আড্ডাগুলি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং আমি একবার অমনি কলকাতা ঘুরতে এসে, গেছি পূর্বাশা অফিসে। সেখানে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাগ্নে অনিল চক্রবর্তীর মুখে শুনলাম সন্তোষকুমার

গঙ্গায় ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছেন। মুহূর্তে থমকে গেলাম। তিনি বেঁচে গেছেন এই স্বস্তি ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল চিন্তা--কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর কিছু একটা হয়ে গেলে অমন সবুজ, সজীব, দুরন্ত, জীবন্ত, আধুনিক গল্প লিখবে কে? এবং এই ভাবনার আবির্ভাবমাত্র বুঝতে পারলাম, সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ আমাদের কাছে কতখানি জরুরি হয়ে উঠেছেন।

আরও পরেও শুনেছি যে সন্তোষকুমার বান আসবার মুখে গঙ্গায় নেমেছিলেন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। শুনে পুলক জেগেছিল। তাহলে মানুষটার সাহস আছে। সাহিত্যিক মাত্রই ললিত লবঙ্গলতা, সমালোচকদের এই বক্রোক্তির তুমুল প্রতিবাদ মেরুদণ্ডী সন্তোষ ঘোষ। পরে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরাও তাঁকে ভীতু আখ্যা দিয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে যেত ওই বানের মুখে গঙ্গায় নামবার ঘটনা। ওই মানুষ ভয় পাওয়া মানুষ হন কেমন করে? জীবনের অন্তিমপর্বে এসে আবার দুর্জয় সাহসী চিত্তের নিদর্শন রেখে গেলেন সন্তোষবাবু। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ওই সাহস দেখানো সহজ কাজ নয়। রোগশয্যায় তাঁর যে নির্ভয় মূর্তি তা কখনো কি ভোলা যাবে? সিরানো দ্য বারজেরাকের মত অসি হাতে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে তিনি মৃত্যুকে সম্মুখ সমরে ডেকেছেন। তারপর অনলস্নানে চলে গেছেন চিরকালের যাত্রী।

পূর্বাশা অফিসে বসে বুঝতে পেরেছিলাম হাউ মাচ হি মিনস টু মি। কিন্তু স্বচক্ষে তাঁর দর্শন পেতে পেতে আরও কয়েক বছর কেটে গেল। দূর লন্ডনে তখন আইনের ছাত্র আমি। ছুটিছাটায় কাজ করি আনন্দবাজার--হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড অফিসে। ডঃ তারাপদ বসুর সঙ্গে বা অফিসের অশোক গুপ্তের সঙ্গে আড্ডা দিতে প্রায়ই যাই সেখানে। ছাপান্ন সালের শেষাশেষি শীতার্ত কুয়াশা জড়ানো এক বিকেলে ঘণ্টিবাজানো টেলিফোনের অপর প্রান্তে সন্তোষকুমার ঘোষ। দ্বিধাজড়িত গলায় পরিচয় দিচ্ছেন : আমি দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার নিউজ এডিটর সন্তোষকুমার ঘোষ। প্রবল আনন্দে তাঁকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই বলে উঠলাম--আপনি সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ? তাহলে সেই কথাই বলুন না কেন! কী সব অপ্রয়োজনীয় উপাধি ঘোষণা করছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত (আসলে উপবিষ্ট) সন্তোষবাবু এই সেদিনও আমাকে বলেছেন--আপনি জানেন না হোয়াট এক্সিলিয়ারেশন ইউ গেভ মি দ্যাট ডে, ট্যার্নিং আ মিস্টি ড্যাম্প মিজারেবল আফটারনুন ইনটু সামথিং স্পেশাল, সামথিং গর্জাস, আ ফাউন্টেনহেড অব ওয়র্ম সানশাইন! তারপরই মুচকি হেসে যোগ করেছিলেন--অনেস্টলি বলুন তো, ক'জন লোক মুখে মুখে এমন ইংরিজি বলতে পারে।

এইখানেই ছিল মানুষটার মজা। মানুষটির হৃদয়বত্তা। তাঁর বিরাট প্রতিভা, প্রখর বুদ্ধি বাইরের লোক দেখেছে। তাঁর ইমোশনের প্রাবল্য সম্বন্ধে সবাই সচেতন নন। বিদেশে বসে এক অপরিচিত অখ্যাত ছাত্রের মুখে 'সাহিত্যিক' বিশেষণটির প্রয়োগ শুনে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এইখানে বলে রাখি, কত বড় সাংবাদিক তিনি ছিলেন সে সম্পর্কে কোনও ভুল ধারণা করার উপায় আমার নেই। প্রায় সিকি শতাব্দী একই

অফিসে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। শিক্ষক, পরামর্শদাতা, বন্ধু, নির্দেশ দেবার অধিকারী সবই তো ছিলেন তিনি। তাঁর কাচের টেবিলঢাকার নিচে মজা করে লেখা থাকত : কিপ কোয়ায়েট / ইউ আর ইন দ্য প্রেজেনস অব আ জিনিয়াস। ওটা লেখা না থাকলেও আমরা সবাই জানতাম, খর্বকায় সন্তোষবাবু সাংবাদিক হিসাবে ছিলেন দৈত্যাকৃতি। কিন্তু একথাও সমান জোর দিয়ে আমি বলি, সাহিত্যিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়। অনেকে আমার এই ধারণা অপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। অহঙ্কার থেকে একথা বলছি না। অথবা হতে পারে, ওইটুকুই আমার অহঙ্কার।

একবার •সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আছি। গেস্ট হাউসে। সন্তোষবাবু তাঁর মেজ মেয়ের কাছে এসে উঠেছেন জানি, কিন্তু দেখা করতে যাইনি যেহেতু শুনেছি তিনি বড় লেখা লিখছেন, কোনও ভিজিটর এসে উপদ্রব করুক তা তিনি চান না। তৃতীয়দিন ভোরে 'যাবজ্জীবন' ভাড়া নেওয়া রিকশা চেপে তিনি স্বয়ং এসে হাজির গেস্ট হাউসে। অভিমানে ভরপুর হয়ে আছেন, কারণ তিনি 'উপেক্ষিত'। অনেক কষ্টে বোঝানো গেল যে ত্রুটি ইচ্ছাকৃত নয়, অতএব মার্জনীয়। আড়াই ঘণ্টা বাদে প্রচুর কথাবার্তার পর যখন তাঁর খেয়াল হল যে খোদ বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে তিনি বসিয়ে রেখেছেন তখন আমাদেরও দিনের প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেছে। তা নিয়ে আমার তিলমাত্র ক্ষোভ ছিল না, আজও নেই। সেদিনকার তাঁর উজ্জ্বল আলোচনা ভাঙিয়ে আমি দশটা সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখতে পারতাম। যদি আলস্য আমার কাল না হত, তো লিখতাম।

দু'দিন বাদে যাচ্ছি বক্রেশ্বর হয়ে তারাপীঠ। বললেন, তারাপীঠ যাব না। ওখানকার শ্মশানে দাঁড়ালে মনে হয় 'আমারই চিতা' এখুনি জ্বলবে। তবে বক্রেশ্বর ট্যুরিস্ট লজ ইজ আ গুড আইডিয়া। কীভাবে গাড়ি নিয়ে আমি বক্রেশ্বর ও তারাপীঠ যাব তার মৌখিক নির্দেশ দিলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর কাগজ কলম নিয়ে ম্যাপ আঁকতে বসলেন। একাধিক ম্যাপ এবং নির্দেশিকা তৈরি করলেন। দুঃখের বিষয় সেগুলো কিছুই রাখিনি। অনেক কাগজ নিজেই তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। রাখলে, আমার বিশ্বাস, ঢাউস একটা কেতাব লেখা যেত এবং বীরভূম ও কাছাকাছি গোটা কয়েক জেলায় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের ব্যবসা বাড়ত।

ওঁর গাড়ি চলছে আগে আগে পাইলটের কায়দায়। হঠাৎ নির্দেশ দিচ্ছেন, গাড়ি রোকো! আমার স্ত্রীকে বলছেন, এখানকার পান ফার্স্ট ক্লাস। খয়ের বাদ, এলাচ সুপুরি দিয়ে। খাঁটি একশো বিশ জর্দা। বকুনি খাওয়া মুখে দোকানদার এক ডজন পানের বুন্দা পৌঁছে দিয়ে গেল গাড়িতে। খানিকটা এগিয়েই আবার হল্ট। "এখানকার সিঙাড়া এবং জিলিপি দুইই অসাধারণ। আপনার ছেলেরা লাইক করবে।" অর্ডার দিয়ে দু'জনে চা খেতে বসেছি। স্থির হয়ে বসা সন্তোষবাবুর স্বভাবেই ছিল না। হঠাৎ দেখি নিজের হাতে জিলিপির ঠোঙা নিয়ে তিনি সস্নেহে আমার ছেলেদুটির হাতে তুলে দিচ্ছেন। এবার আমার চোখে জল আসার পালা।

অফিসে ওঁর সঙ্গে কাজ করা অনাবিল সুখের ছিল না। ক্রোধ প্রকাশ যদি

অলিম্পিকের সূচিতে থাকত তবে তিনি ভারতের জন্য একাই অথবা দুর্বাসা মুনির সঙ্গে টিম তৈরি করে কয়েক ডজন মেডেল নিয়ে আসতে পারতেন। অনেক বছর ধরে তাঁর রাগের নানা রূপ দেখেছি। যাকে উনি নিজেই বলতেন চণ্ডালের রাগ, তা তাঁর ছিল। লাগাম ছেঁড়া, যুক্তিতর্ক ধূলিসাৎ করা, বাঁধভাঙা বন্যার মত অশাসিত রাগ ক্ষণে ক্ষণে ফুঁসে উঠত। তার সামনে শত্রুমিত্র যে পড়ত তার রক্ষা থাকত না। সেইসময় মুখেও তাঁর কিছু আটকাত না। একবার (তখনো আমি আনন্দবাজারে যোগ দিইনি) এক তরুণ এবং অসামান্য মৌলিক প্রতিভার অধিকারী এক সাহিত্যিককে তাঁর বকুনির তোড়ে পড়ে চোখের জল ফেলতে দেখেছি। ঝড় থেমে গেলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—সামান্য কারণে অত চটলেন কেন? আপনার নিজের পক্ষেই তো এত রাগ খারাপ। বিষণ্ণ গলায় তিনি বললেন—সবই বুঝি। কিন্তু কিছু করতে পারি না। নিজেকে থামাতে পারিনি। আমার রক্তে কোনও বুনোজন্তুর রক্ত মিশে গেছে। সামহোয়ার ডাউন দ্য লাইন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশুদ্ধ রাগের মত তাঁর ওই রাগও ছিল অকৃত্রিম। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর ক্রুদ্ধ হবার পিছনে যা কাজ করত তা হল অভিমান। গভীর বেদনাবোধ। শৈশব কৈশোরের বহু অপ্রাপ্তি, বহু অভাব, অসংখ্য অসহায়তা আজীবন তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে ঝড়ের মেঘের মত। পরবর্তী জীবনে বৈভব, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কেন্দ্রে বসেও তিনি ভিতরে ভিতরে অনিশ্চয়তার রোগে ভুগেছেন। যেন সবটাই স্বপ্ন। যেন চোখ মেলে হঠাৎ দেখবেন, কোথাও কিছু নেই, সব ফাঁকি। এইখানে চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের মিল। যে চার্লি বলেন—না, লন্ডনের ইস্ট এন্ডে আমার বেড়াতে যাবারও ইচ্ছে নেই। হু ওয়ান্টস টু বি রিমাইন্ডেড? সুখবহ স্মৃতি নয় ওগুলো। খ্যাতির শীর্ষে ওঠা এমনিতেই নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয়। অনেকের কাঁধে মাথায় পা রেখে সেখানে উঠতে হয়। পক্ষান্তরে জীবনে বহু মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন তিনি। এবং সংসারের স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্তে পেয়েছেন অকৃতজ্ঞতা। কিছু ক্ষেত্রে কৃতঘ্নতা। ভালবাসার ভিখারি তাঁর মন এতে ধাক্কা খেত। বৈদান্তিক নির্লিপ্তি তো তাঁর উপাসনার বিষয় ছিল না। ফলে তাঁর দুঃখ, অভিমান, অসহিষ্ণুতা সবই ক্রোধের আকারে আত্মপ্রকাশ করত।

আনন্দবাজারে তাঁর বহু সহকর্মীর মধ্যে সম্ভবত তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় বসু রায় এবং অমিতাভ চৌধুরীকে। ফলে তাঁর রাগের অভিমানের ধাক্কা এঁদের ওপর দিয়ে যেত বেশি। একটা সময় সন্তোষবাবুর ধারণা হয়েছিল সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল ক্রমেই। আমরা বহু চেষ্টা করেও তা ঘোচাতে পারিনি। একদিন অমিতদা এবং আমি সন্তোষবাবুর ঘরে বসে কথা বলছি। হঠাৎ প্যাড টেনে অমিতদা ওই ষড়যন্ত্র ফোবিয়ার ওপর স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্রতা ও সরসতা মিশিয়ে অপূর্ব ছড়া লিখে তাঁকে উপহার দিলেন। এতে কিছু কাজ হল। কারণ এর পর বিষয়টা নিয়ে আগেকার মত উদ্বেল হতে সন্তোষবাবুকে দেখিনি।

সন্তোষবাবুর পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি আমরা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু এবং সহকর্মী মিলে

পালন করেছিলাম। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন জ্যোতির্ময় বসু রায় ও সেবাব্রত গুপ্ত। সেদিন অনেক আনন্দের মধ্যে গভীর এক বিষাদ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। কেবলই মনে হয়েছে, আমরা তাঁকে ফাঁকি দিলাম। তাঁর পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি অত সামান্য কোনও ঘটনা তো নয়। আরও অনেক বড় করে, অনেক ব্যাপকভাবে ওই অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল। ইদানীং যে, কোনও না কোনও কবি বা সাহিত্যিককে নিয়ে প্রায়ই রবীন্দ্রসদন বা কলামন্দিরে সাহিত্যসন্ধ্যা ইত্যাদি হচ্ছে তখন তা চালু ছিল না। তাছাড়া ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা অনুরাগীমহল থেকে উৎসব পালন এক, আর বৃহত্তর সুধীসমাজের উদ্যোগে এবং উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা আর এক ব্যাপার। নতুবা কোথাও একটা ফাঁক থেকে যায়। মাঝে মাঝে একথা ভেবে দুঃখ পাই যে আজকাল আমরা সাহিত্যক্ষেত্রেও রাজনীতির স্টাইল আমদানি করে ফেলেছি। কোনও না কোনও মঞ্চে আরোহণ করে আর সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হচ্ছি। অপরের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সম্পর্ক রাখা—এগুলো বাতিল। এই ব্যাপারেও সন্তোষবাবু ছিলেন আশ্চর্য। এত নাম না জানা পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়তেন, অসংখ্য অখ্যাতনামা লেখককে তিনি খুঁজে বার করতেন। দুঃখের বিষয়, যে উদারতা তিনি আর দশজনকে দিয়েছেন সেই উদারতা নিজে তিনি অপরের কাছ থেকে পাননি।

জীবনের একটা বড় অংশ তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে জীবিকার প্রয়োজনে। তাতে আক্ষেপের কিছু নেই। পেশার ক্ষেত্রে সবাই তো কৃতী হতে পারেন না। তিনি হয়েছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর তুল্য বড় সাংবাদিক কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অঘোষিত সম্রাট। কিন্তু সেজন্য তাঁকে বড় খেসারত দিতে হয়েছে। প্রবল একটা বিরুদ্ধতা তাঁর মনোবলকে ক্রমাগত গ্রাস করতে চেয়েছে। রাজনৈতিক শত্রুতা প্রতি পদে তাকে ব্যাহত করতে চেয়েছে। পেশাগত ঈর্ষাও তাঁর উত্তুঙ্গতাকে খর্ব করতে নিত্য প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের রথচক্র সাংবাদিকতার মেদিনী গ্রাস করেছিল বলে যে প্রচলিত ধারণা, এই অধম সাহিত্যপ্রেমী তার সঙ্গে আদৌ একমত নয়। জনপ্রিয়তার লোভ মানুষ সন্তোষকুমারের অবশ্যই ছিল, সব্বারই থাকে। কিন্তু শিল্পী সন্তোষকুমার অনেক বড় হয়ে উঠে সর্বদা সেই লোভনীয় সহজ পথকে বর্জন করেছেন। এটা তাঁর প্রতিভার উত্তরণ, তাঁর লেখকসত্তার স্খলন নয়। তিনি সবার মত লিখতে যাননি, তিনি তাঁর মতই লিখে গেছেন। ভাবীকাল তাঁর সাহিত্যকর্মের নতুন করে বিচার করবে। দুঃখের বিষয়, সেদিন আমরা যেমন থাকব না, তাঁর অমৃতমুখ বিষকুম্ভ সমালোচকরাও থাকবেন না। কিন্তু জানি, যে বলয়কে আজ ছিন্ন করা হয়েছে, সেটি আগামী দিনে তাঁর পরিক্রমা সম্পূর্ণ করবে।

সন্তোষকুমার ঘোষ

বরুণ সেনগুপ্ত

বাংলা সাংবাদিকতায় এবং সাহিত্যে সন্তোষকুমার ঘোষ এক অসাধারণ ও বিরল ব্যক্তিত্ব। খুব কম সফল সাহিত্যিক সফল সাংবাদিক হতে পেরেছেন। আবার তেমনি, খুব কম সফল সাংবাদিক সফল সাহিত্যিক হয়েছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ একদিকে যেমন ছিলেন একজন সফল সাংবাদিক, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন একজন সফল সাহিত্যিক।

কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর এই সাফল্যের পরিমাপ সাধারণ মানুষ খুব বেশি একটা জানেন না। বাংলা সাংবাদিকতায় সন্তোষকুমার ঘোষ যে একটা নব যুগের সূচনা করে গিয়েছেন এটা সাধারণ মানুষ তো জানেনই না, এমনকি আজকের অনেক তরুণ সাংবাদিকও তাঁর অবদান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন। সন্তোষবাবু বাংলা সাংবাদিকতার মান অটুট রেখেও তাকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করেছেন। তিনি যে শুধু কথ্যভাষায় কাগজে খবর লেখার রীতিটি প্রবর্তন করেছেন তাই নয়, বিষয় নির্বাচনেও তিনি একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছেন। আগে বাংলা সংবাদপত্রে প্রধানত সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত যেগুলি শুধু মুষ্টিমেয় বেশি-শিক্ষিত মানুষকে আকৃষ্ট করত। সন্তোষবাবু এমন সব বিষয় বাছাই শুরু করলেন এবং সেগুলি এমন সুন্দরভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন তাকে সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারল এবং তার রসগ্রহণ করতে শুরু করল।

ভাষা, বিষয় নির্বাচন, উপস্থাপনার রীতি, বিভিন্ন দিক থেকে তিনি বাংলা সাংবাদিকতায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। এই পরিবর্তনের কথা সমসাময়িক সাংবাদিকরা ছাড়া আর খুব কম লোকই জানেন। সাধারণ মানুষ বাংলা সাংবাদিকতায় এই পরিবর্তন দেখেছে, এ জিনিসে আকৃষ্ট হয়েছে এবং এরই ফলে বাংলা কাগজের প্রচার বেড়ে গিয়েছে। বাংলা সংবাদপত্র অল্প কয়েকজনের পরিবর্তে অনেকের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতেই পারেনি, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনটা কে আনলেন।

সন্তোষকুমার একজন অসাধারণ ঔপন্যাসিক এবং গল্পলেখকও ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সৃষ্টির যে উৎকর্ষ সেই পরিমাণে জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করতে পারেননি। সমঝদার যাঁরা তাঁরা তাঁর বহু লেখার প্রচুর প্রশংসা করেছেন। তবে, তাঁর

সাহিত্যসৃষ্টি খুব সাধারণ মানুষের জন্য ছিল না। তাঁর চেয়ে অনেক কম কৃতী সাহিত্যিক তাঁর থেকে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁদের বইও সন্তোষবাবুর বইয়ের চেয়ে বেশি চলেছে। কিন্তু সমঝদাররা স্বীকার করেন, তাঁর বই অনেকের চেয়ে কম চললেও সন্তোষবাবু সাহিত্যিক হিসাবে বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

হয়তো সন্তোষকুমার ঘোষ যদি শুধু সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে থাকতেন তাহলে তিনি আরও অনেক কিছু আমাদের দিয়ে যেতে পারতেন। তবে, তাহলে, বাংলা সাংবাদিকতার আবার বিরাট ক্ষতি হত। সন্তোষকুমার ঘোষ প্রথমে ছিলেন ইংরেজি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। ১৯৫৮-৫৯ সন নাগাদ তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় বার্তা-সম্পাদক হয়ে আসেন। এবং সেই সময় থেকে শুরু হয় বাংলা সাংবাদিকতায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বলতে গেলে, প্রথম কয়েকবছর দিনে ২০ ঘণ্টা খেটে তিনি এই পরিবর্তন এনেছিলেন। সেই সময় দেখেছি, তাঁর ধ্যানজ্ঞানই ছিল বাংলা সাংবাদিকতা। সেই সময়টা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি বিশেষ অবহেলিত হয়েছে। সেইটাই সম্ভবত ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

আর্ত, উতরোল মনস্বী বন্ধু সন্তোষকুমার ঘোষ

শিবনারায়ণ রায়

সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তাঁর গোড়ার দিকের কয়েকটি ছোটগল্প এবং "কিনু গোয়ালার গলি" পড়ে। মনে হয়েছিল তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসাধকদের একজন। তিরিশের এবং চল্লিশের দশক দুটিতে যেমন বাংলা কবিতায় তেমনি বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কয়েকজন প্রতিভাধর ব্যক্তি দেখা দেন যাঁরা শুধু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করেননি, নানা নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর মতই বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু ও অন্নদাশঙ্করের কোনও উত্তরসাধক মেলেনি।

পরবর্তী কালে কাহিনীকারদের ওপরে সব চাইতে প্রকট প্রভাব পড়ে তারাশঙ্করের, তবে কেউ কেউ মাণিকের স্কুলে পাঠ নিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর বিষয়গত দিগন্ত বাড়িয়ে দেন, কাহিনীতে নিয়ে আসেন এমন সব অঞ্চল ও সামাজিক স্তরকে যাদের উপস্থাপনার যথার্থ বিচার শহুরে শিক্ষিত সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সাধ্যবর্তীত! অপর পক্ষে নিতান্ত পরিচিত সাধারণ স্ত্রী-পুরুষদের প্রাত্যহিক আচরণের আড়ালে মাণিক এমন সব জটিল ও সূক্ষ্ম অবচেতন ও অর্ধচেতন কূটাভাসের ইঙ্গিত করেন যাদের উপস্থিতি অনস্বীকার্য কিন্তু দুর্বিষহ। এই দুর্বিষহতাই সম্ভবত মাণিককে শেষপর্যন্ত মতবাদের সঙ্কীর্ণ নিশ্চিন্ততাতে আশ্রয় নিতে প্রলুব্ধ করে এবং তাঁর প্রবল সুরাশক্তি ও আত্মহনন বৃত্তির প্রবর্ধনে সহায়ক হয়। সন্তোষের লেখা পড়ে মনে হয়েছিল যে ঘটনাপুঞ্জের অন্তরালে মানস কূটাভাসের অবস্থিতি বিষয়ে তিনি নিত্য সচেতন, এবং চেতনার এই দুঃখসহ খরতাই তাঁর রচনারীতির অবধারক।

সন্তোষের সঙ্গে প্রথম যখন সাক্ষাৎ ঘটে, এবং পরে যখন আমাদের বন্ধুতা গাঢ় হয়ে ওঠে তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্য কয়েকটি দিক ধরা পড়ে, তাঁর লেখা থেকে প্রথম পাঠে যে দিকগুলির কথা অনুমান করতে পারিনি। আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্কের শুধু তিনটি বিশেষ লক্ষণের কথা উল্লেখ করি। তিরিশ বছরের মধ্যে আমাদের দুজনের মধ্যে কখনও মনান্তর ঘটেনি। অথচ আমাদের চিন্তায় ও চরিত্রের গঠনে প্রবল পার্থক্য ছিল। তাঁর এবং আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সন্তোষের সম্পর্ক এক সময়ে নানা কারণে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। সেই যন্ত্রণার কথা তাঁদের কাছেই আমি শুনি। কিন্তু তার ফলে সন্তোষের সঙ্গে অথবা ওই বন্ধুদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্যে কোনও চিড় খায়নি। দ্বিতীয়ত, আমার চেনাজানার মধ্যে সন্তোষ সেই দুর্লভ ব্যতিক্রমদের মধ্যে একজন, যাঁদের সঙ্গ-

সাহচর্য আমার কাছে ক্লান্তিকর ঠেকত না, বরং যাঁদের সঙ্গ আমার কাছে প্রতিবারই প্রীতিপ্রদ ও চিৎপ্রকর্ষী মনে হয়েছে। সন্তোষের বহু বিষয়ে আগ্রহ ছিল এবং ফলে তাঁর সঙ্গে আলাপে পুনরাবৃত্তি বা একঘেয়েমির আশঙ্কা থাকত না। তৃতীয়ত, আমাদের বন্ধুতা ছিল একেবারেই বিশুদ্ধ--দু'পক্ষের একজনের মনেও তা থেকে কোনও ফলের প্রত্যাশা ছিল না। সন্তোষ তাঁর প্রকাশিত প্রায় সমস্ত বই-এর একটি করে কপি আমাকে উপহার দিয়েছেন, একটি বই আমাকে উৎসর্গ পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু তাঁর কোনও বই রিভিউ করবার জন্য একবারও উপরোধ করেননি। আমি তার সঙ্গ উপভোগ করেছি, কিন্তু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপত্তিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করেছি। হয়তো এই প্রত্যাশারিক্ত শুদ্ধতাই সম্ভাব্য মনান্তর ও সাম্পর্কিক ক্লান্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল।

সাক্ষাৎ পরিচয়ের আদিপর্বের একটি ঘটনার কথা বলি। পাইকপাড়ায় তখন একটি সাহিত্যিক বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল--বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন যাঁরা শুধু পাশাপাশি বাস করতেন না, যাঁরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত ছিলেন। আমিও সে সময়ে এঁদেরই একজন ছিলাম। পাইকপাড়ার আড্ডায় বাইরে থেকেও অনেকে আসতেন। একদিন দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করের কাছে এলেন, এসেই জানালেন আড্ডায় তিনি থাকবেন বটে কিন্তু তাঁকে অতি অবশ্যই রাত হবার আগে তাঁর বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তিনি থাকতেন কলকাতার অপর প্রান্তে! আড্ডা ও আহারাদি শেষ হতে রাত হল, শেষ বাসও তখন চলে গেছে, দীপেন আকুল হয়ে বললেন, "গৌরীদা হেঁটে হলেও আমাকে যে বাড়ি ফিরতেই হবে। গৌর ও আমি তাঁর অবস্থা দেখে আশ্বাস দিলাম যে অন্য উপায় না থাকলে না হয় ট্যাক্সি করেই আমরা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসব। সে সময়ে আমরা সবাই কায়ক্লেশে সংসার চালাই, কিন্তু যৌবনের ওই সব উচ্ছল বেহিসেবিপনা তখনো অকল্পনীয় ছিল না। ট্যাক্সি করে দীপেনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে গৌর বললেন, এ দিকে রাস্তায় সন্তোষদার ফ্ল্যাট, চলুন তাঁকে তুলে নিই। তখন রাত একটা-দেড়টা হবে। ডাক দিতেই সন্তোষ গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে এলেন, কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধা না করে চললেন এই দুই বে-আক্কেলের সঙ্গে পাইকপাড়ায়। সেখানে পৌঁছে বললেন, "আজ নরেনবাবুর (নরেন্দ্রনাথ মিত্র) বাড়িতে মোহর (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছে, চলুন তাকে তুলে গান শোনা যাক। তোলা হল। নরেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী শোভনা ডাকতেই চোখেমুখে জল দিয়ে কণিকা এসে বসলেন আমাদের ভিতরে, শেষ রাতে তাঁর গলায় একটির পর একটি রবীন্দ্রনাথের গান শোনা হল। এই সুখস্মৃতি আমাদের মনে এখনও অম্লান হয়ে আছে। সেই উদ্বেল যৌবনকালে নিটোল উপভোগের জন্য সোমরসের আস্বাদ অপরিহার্য ঠেকেনি।

গানের ব্যাপারে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপারে সন্তোষের আগ্রহ, উৎসাহ ও গভীর জ্ঞানের কথা অনেকেই জানেন। কয়েক বছর আগে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য নৃতত্ত্ববিদ সুরজিৎ সিংহ মহাশয়ের আমন্ত্রণে আমি মাস তিন-চারের জন্য শান্তিনিকেতনে আসি। সেই সময় সন্তোষও পৌষমেলা উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য

শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি জানতেন আমি যত কট্টর নাস্তিকই হই না কেন আমার প্রজন্মের অন্যান্য শিক্ষিত বাঙালিদের মতই আমিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। সন্তোষ ভার নিলেন শান্তিনিকেতনে প্রত্যহ আমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাবার। সকালে প্রাতরাশের পর আভাগড়ের রাজবাড়ির দোতলায় আমাদের কাছে চলে আসতেন, তারপর আমাকে নিয়ে কখনও গেছেন নীলিমা সেনের বাড়ি, কখনও ডেকে পাঠিয়েছেন আলপনা বা বুলবুলকে এমন কি সুচিত্রা মিত্র শান্তিনিকেতনে এসেছেন খবর পেয়ে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সুচিত্রার আশ্চর্য অক্লান্ত গলায় গান শুনেছি, কখনও চা করতে করতে, কখনও উনোনের রান্নায় হাতা নাড়তে নাড়তে সুচিত্রা একটির পর একটি গান গেয়ে যাচ্ছেন, আর সন্তোষ কখনো কখনো তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলছেন, "না না, পদটা ঠিক হল না, কথাটা এই হবে।" এইসব গুণীজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম সন্তোষ অনুরোধ করলে এঁদের কেউই অসম্মত হতে পারেন না। সন্তোষ আমাকে উজাড় করে এইভাবে সুখের সান্নিধ্য দিয়েছিলেন। আমার কাছ থেকে তিনি নিজে কী পেয়েছিলেন জানি না। আমি যে বেশিরভাগ সময়ে মেঘে মাথা রেখে পথ চলি হয়তো এটাই তাঁর ভাল লেগেছিল।

প্রবল প্রাণময়তা সত্ত্বেও সন্তোষ অসুখী ছিলেন এবং একথা তিনি গোপন করেননি। ভয়ঙ্কর কর্কট ব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভিতরে নিয়ত নানা দ্বন্দ্ব তাঁকে পুড়িয়ে ফেলছিল। যে আঠারো বছর আমি ভারতবর্ষের বাইরে ছিলাম সেই সময়েও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কে শিথিলতা আসেনি। ঐ দীর্ঘ প্রবাসপর্বে প্রায় প্রতি দেড়বছর-দুবছর অন্তর অল্প সময়ের জন্য হলেও আমি ভারতবর্ষে ঘুরে যেতাম এবং কলকাতায় এলে যে দু-তিন জনের জন্য কিছু নিভৃত সময় অতি অবশ্য আলাদা করে রাখা থাকত সন্তোষ তাঁদের ভিতরে একজন। আমি তাঁর দপ্তরে প্রবেশ করা মাত্র তিনি সাংবাদিক কাগজপত্র চাপা রেখে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন, আমরা কোনও বার-এ একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টার জন্য বসতাম, আমাদের সমস্ত আলোচনাই হত—সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, নানা নৈর্ব্যক্তিক বিষয় নিয়ে। বিষয়গুলি নৈর্ব্যক্তিক ছিল বটে, কিন্তু সন্তোষের বলার মধ্যে তাঁর আর্তি এবং অস্থিরতা গোপন থাকত না। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে আমার কোনওদিনই কোনও যোগ বা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি, তবে ওই পত্রিকার যে দু-চারজন কর্মীকে আমি চিনি তাঁদের মুখে শুনেছি দৈনিক আনন্দবাজারের পাঠক সংখ্যা প্রবর্ধনে এবং মানের উন্নয়নে সন্তোষের বিশেষ ভূমিকা ছিল। যতদূর জানি ওই প্রতিষ্ঠানে তিনি খুব উঁচু এবং দায়িত্বশীল পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা থেকে মনে হত সাংবাদিকতার প্রবল দাবির কাছে সাহিত্যের সূক্ষ্মতর প্রয়োজনকে খাটো করার জন্য তাঁর মনে অস্বস্তি দ্বিধা, হয়তো বা গ্লানি ছিল। সংবাদপত্রের সেবায় তিনি কখনও ফাঁকি দেননি, সেক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব সর্বস্বীকৃত। কিন্তু যে শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে তিনি সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তার পূর্ণবিকাশ মনে হয় নানা ব্যস্ততায় ব্যাহত হয়েছিল।

একটি সন্ধ্যার কথা বিশেষ করে মনে আছে। প্যারিতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা

অনুষ্ঠানের শেষে সেদিন সকালে কলকাতা পৌঁছেছি ; দিন দুই পরে মেলবোর্নে ফিরে যাবার কথা। বুদ্ধদেব বসু সেদিন রাতে আমাকে তাঁদের নাকতলার বাড়িতে খাবার এবং থাকবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি উঠেছিলাম চেতলায় আমার দিদির বাড়িতে ; সন্তোষ সন্ধেবেলায় নিউ আলিপুর থেকে এলেন তাঁর গাড়িতে আমাকে নাকতলায় নিয়ে যাবার জন্যে। গাড়িতে ওঠবার একটু পরেই সন্তোষ আমার দু'হাত জড়িয়ে বললেন, "শিববাবু, আমার যে ঈশ্বরকে ভয়ানক ভাবে দরকার। হোক না আপনি নাস্তিক, আপনি কি তাঁর কোনও খোঁজ দিতে পারেন না? তিনি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না, কেন তাঁর প্রয়োজন এত তীব্র ও অপাবৃত তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি, তাঁকে কোনও মিথ্যা প্রবোধ দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি, আমি তাঁর আর্ত মুখের দিকে চেয়ে সমবেদনায় মথিত হয়েছিলাম, ঈশ্বরবিহীন জীবন যে শূন্য, ব্যর্থ, অন্ধকারময় অথচ ঈশ্বরের অপরোক্ষবোধ এমন কি ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস পর্যন্ত যে তাঁর অনায়ত্ত--গাড়িতে বসে একথা তিনি বারবার বলেছিলেন। আমি নিরীশ্বরবাদী জেনেও তিনি যে আমার কাছে তাঁর দৈব বুভুক্ষার যন্ত্রণা অনাবৃত করেছিলেন তা থেকে তাঁর প্রয়োজনের ঐকান্তিকতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। কোনও গভীর দুঃখ নিয়ে বিতর্ক চলে না ; এবং সংবেশন ঘটিয়ে তাঁকে বিশ্বরূপ দেখাতে পারি এমন সামর্থ্যে আমি বঞ্চিত। তবে বুদ্ধদেবের বাড়িতে পৌঁছে সন্তোষের এই আর্তভাব কেটে গেল। ডি, এইচ, লরেন্সের গদ্যরীতি ও সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনার অভিস্যন্দে সাময়িকভাবে হলেও ঈশ্বরাকুতি নিষ্ক্রান্ত হল। আহারাদির পরে বুদ্ধদেবের জিম্মায় আমাকে রেখে সন্তোষ যখন তাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন তখন তাঁকে ক্লান্ত দেখালেও আর্ত মনে হয়নি।

সন্তোষের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল উতরোলের দিকে। আমার কাছে একটি আলোচনার নব্বই মিনিট ব্যাপী টেপ-রেকর্ডিং আছে। রবিবারের আড্ডা বসেছিল গৌরকিশোরের বরানগরের ঘরে। ছিলেন রাজ্যেশ্বর মিত্র, নরেন মিত্র, নীরেন চক্রবর্তী এবং আরও দু-একজন। তাছাড়া গৌর, সন্তোষ ও আমি। গান থেকে সাহিত্য। সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্য। নাক উঁচু বলে আমার প্রভূত দুর্নাম আছে ; কিন্তু সেই আলোচনায় সব চাইতে উঁচুতে গলা চড়েছিল সন্তোষের। আমার তখন টেপ-রেকর্ডিং-এর শখ ছিল ; বাইরে থেকে যখন কলকাতায় আসতাম গান, কবিতাপাঠ রেকর্ডিং করে নিয়ে যেতাম। সন্তোষ সেদিনের আলোচনায় কাউকে রেয়াত করেননি। আমি যে একসময়ে টেপ-রেকর্ডারটি চালিয়ে দিয়েছিলাম সেদিকে তাঁর সম্ভবত খেয়াল ছিল না। আলোচনার পর শান্তিপর্বে আমি টেপের কিছুটা বাজিয়ে শোনাই। সন্তোষ চেঁচিয়ে উঠলেন, "সর্বনাশ, করেছেন কি, এ আলোচনা অন্যরা শুনলে পশ্চিমবাংলায় আমার তো রুজি-রোজগারের উপায় থাকবে না, তখন আপনাকেই আমার জন্যে বাইরে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।" আমি কথা দিয়েছিলাম, ওই আলোচনায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছাড়া আর কাউকে সে টেপ আমি শোনাব না। কথা আমি রেখেছি, যদিও আমার ধারণা সেদিন সন্তোষ যে সব উক্তি করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকগুলি যথার্থ এবং মূল্যবান। আর্তি বা উতরোল তাঁর মননকে শিথিল করেনি।

সন্তোষকুমার ঘোষের স্মরণে

প্রতিভা বসু

দিগন্ত পাবলিশার্স থেকে সন্তোষকুমার ঘোষের কিনু গোয়ালার গলি যখন বেরুচ্ছিল, তখন নানা প্রয়োজনে বই সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকাশক কবি অজিত দত্তের কাছে তাঁকে আসতে দেখেছি। আমরা দোতলার বাসিন্দা, অজিতবাবুরা তেতলার। সুতরাং দোতলার সিঁড়ি বেয়েই তাঁকে তেতলায় উঠতে হত। মানুষটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, খুব যে একটা কৌতূহল ছিল তা-ও নয়। কিন্তু পায়ের শব্দটা বোধহয় চিনে ফেলেছিলাম। আমাদের ২০২ নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে, আমাদের দোতলার ফ্ল্যাটের দ্বারও যেমন অবারিত ছিল, বন্ধু অবন্ধু আত্মীয় অনাত্মীয় প্রিয় অপ্রিয় সব ধরনের ব্যক্তির আসা-যাওয়াও তেমনি অবারিত ছিল। সদরদরজা সারাদিন সপাটে খোলা। দোতলা ছাড়িয়ে তেতলায় উঠে যাওয়া পায়ের শব্দ কিছু বিরল। দুই ফ্ল্যাটের সন্তানরা সারাদিন উঠছে নামছে ধমক খাচ্ছে, তার মাঝে নিচ থেকে এসে কোনও পায়ের শব্দ দোতলা ছাড়িয়ে উঠে গেলেই অমনোযোগী শ্রবণও বুঝে ফেলছে ওপরে কেউ এল। পায়ের শব্দ দ্রুত এবং চঞ্চল হলেই বুঝে ফেলতাম এ লোকটি সন্তোষ ঘোষ। কেমন করে বুঝে ফেলেছিলাম এখন তা মনে নেই। সশরীরে প্রথম দেখলাম তার অনেক পরে। মৌচাকের বার্ষিক সভায়। সভা শেষে নিজে থেকে এসে আলাপ করেছিলেন। মনে হয় সঙ্গে সমরেশ বসুও ছিলেন। দু'জনের সঙ্গেই প্রথম আলাপ, দু'জনের নামই তখন আমার খুব প্রিয়, তাঁদের যে কটি বই বেরিয়েছে, মোটামুটি সবই পড়েছি। সাহিত্যিকদের প্রতি আগ্রহী মানুষ আমি সেদিন খুব সুখ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। দু'জনকেই খুব ভাল লেগেছিল। অদ্যাবধি এই দুটি নাম আমার মনে তেমনি দাগ কেটে আছে।

সন্তোষ ঘোষের সঙ্গে তারপরে দেখা হয় দিল্লিতে, বঙ্গভবনে। সালটা বোধহয় ১৯৫২-র শেষে, গভীর শীতে।

আমার স্বামী বুদ্ধদেব বসু তখন ইউনেসকোর কাজে কিছুকালের জন্য আমাদের নিয়ে দিল্লিতে ছিলেন। আমাদের বাসস্থান বঙ্গভবনে স্থির করা হয়েছিল। খবর পেয়ে সন্তোষ ঘোষ দেখা করতে এসেছিলেন। একাধিক দিন এসেছিলেন, নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত লাজুক, কিছুটা তড়বড়ে বুদ্ধদেবের কাছে নত দৃষ্টি আমার কাছে নিঃসংকোচ। অতি সরল স্বভাব, অতিশয় বুদ্ধিমান, ধারালো কথাবার্তা, রসিকতা প্রিয়। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করছেন সেখানে। বন্ধুতার সূত্রপাত। তারপর

কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতায় এলেন, দেখা হয়েছে ঘন ঘন, বন্ধুতা গাঢ় হয়েছে। আমরা ২০২ নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে থাকাকালীন যতটা এসেছেন, এই নাকতলার বাড়িতে আসার পরে তার চেয়ে অনেক বেশি এসেছেন। এই বন্ধুতাকে একদিন আমাদের অতি বিপদের দিনে তিনি যেখানে টেনে নিয়ে গেলেন, সেই ঋণ শোধনীয় নয়। তিনি কী মাপের লেখক ছিলেন আমি সেই ব্যাখ্যায় যাব না, তার জন্য অসংখ্য পাঠক আছেন, সমালোচক আছেন, গুণগ্রাহী আছেন। তিনি কী মাপের মানুষ ছিলেন এই সুযোগে আমি সকলকে সে কথাটাই জানাতে চাই। ১৯৭২ সালে কোনও একটি ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ায় আমার শরীরের সমস্ত স্নায়ু এত দুর্বল হয়ে যায় যে সঙ্গে সঙ্গে আমি স্থাণু হয়ে যাই। আমার দেহে কোনও ক্ষমতাই থাকে না। কিছুদিন চিকিৎসা বিভ্রাটের পরে ফিজিওথেরাপির কল্যাণে ডাক্তার এস. কে. ব্যানার্জির কৃতিত্বে আবার ধীরে ধীরে সব ফিরে আসতে থাকে। সেই সময়ে নাকতলা থেকে চৌরঙ্গির লর্ড সিনহা রোডে ডক্টর ব্যানার্জির চেম্বারে গিয়ে পায়ের জোর বাড়াবার জন্য প্রতিদিন একটি ইলেকট্রিক 'শক' নেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাব কী ভাবে? যে সময়ে চেম্বারে যেতে হবে সেটা আপিসের সময়, ট্যাক্সি পাওয়ার সম্ভাবনা পরপারে। আমাদের গাড়ি নেই যে যাব। তবে কি আমার চিকিৎসা হবে না? বুদ্ধদেব দু-একজন গাড়িওলা ধনী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সুবিধে হল না। সন্তোষ ঘোষ মাঝে-মাঝেই আসেন, বুদ্ধদেবের সঙ্গে বিমর্ষ মুখে বসে থাকেন! এ খবর শুনে তৎক্ষণাৎ বললেন. 'আমারই তো গাড়ি আছে, আপনি এ নিয়ে এত ভাবছেন কেন?' আমার কাছে এসে বললেন, 'এবার আপনি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবেন। আবার আমরা এ বাড়িতে কত আনন্দ করব, ফুর্তি করব। দূর কিছু ভাল্লাগে না।'

এই 'শক' নেয়া আমার এক বছর ধরে চলে। সন্তোষ ঘোষের গাড়ি প্রতিদিন বেলা নটার সময়ে কাঁটায় কাঁটায় এসে আমাদের দুয়ারে থাকে, আমি চেম্বারে যাই, চিকিৎসিত হয়ে ফিরে আসি। একেক দিন একেক সময়ে! ডাক্তারখানার ব্যাপার, কতদিন কতসময় বসে অপেক্ষা করতে হয় তার কি ঠিক আছে? গাড়ি থাকে, ড্রাইভার থাকে, তেলটা পর্যন্ত ভরতে দেন না। সে বিষয়ে কোনও কথাই তুলতে দেন না। কিছু বলতে গেলে বলেন, 'কী আশ্চর্য! আমাকে আপনারা এটুকুও করতে দেবেন না। আমার বেদনার কি এটুকু মূল্যও দিতে চান না?' এর ওপরে আর কথা চলে না। উনি নিজে ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সি করে আপিসে যান। না পেলে বাসে বা ট্রামে। এ নিয়েও কোনও কথা বলতে গেলে রাগ করে উঠে যান।

এক বছর এ রকম চলার পথে ওঁর হার্ট অ্যাটাক হল। সাংঘাতিক স্ট্রোক। বাঁচার আশা ছিল না। তখন দিনেরাত্রে ওঁর নিজের চিকিৎসার জন্যই গাড়ি দরকার। সেই অবস্থাতেও তিনি আমার চিকিৎসা যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্যে চিন্তিত হলেন। বন্ধু অমিতাভ গুপ্তকে অনুরোধ করলেন অমিতাভর গাড়ি যেন নিয়মিত ভাবে আমাকে চেম্বারে নিয়ে যায়। সেই অনুরোধ অমিতাভও অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। তখন

অবশ্য আমি সপ্তাহে দু'দিন যাই। তারপর আমার কন্যা-জামাতা গাড়ি কিনে তাকে নিষ্কৃতি দিল।

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে আমার বাড়িতে সহসা একটি মর্মবিদারক ঘটনা ঘটল। সুস্থ মানুষ বুদ্ধদেব কোনও জানানি না দিয়েই সহসা ইহলোক ত্যাগ করলেন। একজন ডাক্তার বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, গল্প করছিলেন, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, ডাক্তারকে চা দিতে বললেন, সঙ্গে কিছু খাদ্য। হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'শোনো শোনো, আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে, দয়া করে কোনও জাপানি মাল দিও না, জার্মান মাল চাই।'

জাপানি মাল মানে সস্তার খাদ্য। সময়-অসময়ে লোক এলে এটা-ওটা দিয়ে টুকটাক খাদ্য বানানো আমার অভ্যেস। বুদ্ধদেবের ধারণা যেহেতু সেগুলো তাৎক্ষণিক, সেই হেতুই তার মূল্য কম। যার মূল্য কম, তা যত ভালই হোক, সেটা তাঁর চলবে না। মুর্গির মেটে খেতে ভালবাসতেন, এ দোকান ও দোকান থেকে সংগ্রহ করে আমি তার পেস্ট বানিয়ে রাখতুম। রুটির ওপর মাখিয়ে দিলে খেতে খুব ভাল লাগে। আমি তখন চাকাওলা চেয়ারে চলি, পুরনো পরিচারিকা গঙ্গামণিকে বললাম ছোট ছোট গোল গোল চাক করে রুটি কেটে তার ওপর ঘন করে পেস্ট মেখে প্লেট ভর্তি করে নিয়ে এসো। আর পট ভর্তি চা দাও। কথামত সবই এনে সাজানো হয়েছিল কিন্তু যাঁর জন্য আনা হয়েছিল তিনি এত তড়িঘড়ি চলে গেলেন যে সেটা আব খাওয়া হল না। বাথরুমে গিয়েছিলেন, ফিরলেন অসুস্থ হয়ে। ছিটকিনিটা খুলতে পেরেছিলেন কোনও রকমে তারপরে আর হাত-পা চলেনি। যে ছেলেটি বালক বয়েস থেকে আমাদের কাছে আছে, এখন যে বালক মধ্যবয়সী, প্রকাশক জগৎ যাকে কার্তিক বললে এক ডাকে চেনে সেই ছেলেটিই ছুটে এসে পাঁজাকোলা করে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। তারপর কী থেকে যে কী হলো আমার বোধগম্য হল না। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন সেরিব্রেল অ্যাটাক। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। অক্সিজেন এল, কিঙ্কর মুখার্জি নামে প্রতিবেশী ছেলেটি ছুটে এল গাড়ি নিয়ে, আরও যে কে সে এসে ঘর ভরে ফেলল। চিরদিনের ঘরকুনো মানুষটি কোথায় চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। ক্যালকাটা হসপিটালে গিয়ে ঘণ্টা পাঁচেক ছিলেন। কিন্তু ঘুমিয়ে ছিলেন। সে ঘুম আর ডাক্তাররা ভাঙাতে পারেননি। সন্তোষ ঘোষ কী ভাবে খবব পেয়েছিলেন সেটা কেউ বলতে পারে না। ছুটে হাসপাতালে গিয়ে সারারাত আর ফিরলেন না সেখান থেকে। জামাতা জ্যোতির্ময়ের কাছে শুনেছি যখন সব শেষ হয়ে গেল জ্যোতির্ময়ের কাঁধে মাথা রেখে সশব্দে বালকের মত কেঁদে উঠলেন। তারপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের গাড়িতে করে নিজের কোলে মাথা রেখে শুইয়ে সন্তোষ ঘোষই সেই মানুষকে তাঁর আপন ঘরে নিজের খাটে নিজের বিছানায় এনে শায়িত করলেন। আমি কিছুই জানতাম না। আমাকে ওরা ঘুমের ওষুধ দিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। অনেক দিন পরে একদিন সন্তোষ ঘোষ আমাকে বললেন, 'আমার গাড়িটা তাঁর দেহ বহন করে এনে শুধু পবিত্রই হয়নি, ঐতিহাসিকও হয়ে গেল। আমার কোলেই তাঁর মাথা ছিল, আমিও পবিত্র হলাম।'

ছেলে-মেয়েদের কাছে শুনেছি তারপরের সব বন্দোবস্তও তিনিই করেছিলেন। আনন্দবাজারে ফোন করে অভীক সরকারকে জানানো, সেখান থেকে লরি আনা, নিয়ে যাওয়া, বহন করা কিছুই বাকি রাখেননি।

যেবার ওঁর শেষ হার্ট অ্যাটাক অথবা সেরিব্রেল হল, (সেটা বোধহয় তৃতীয় আক্রমণ), অত্যন্ত প্রবল ভাবেই হয়েছিল। কেউ আশা করেনি উনি বাঁচবেন। কিন্তু সামলে উঠলেন। বিপদ উত্তীর্ণ হল। আমি নিয়মিত খবর নিই কিন্তু পায়ের অসুবিধের জন্য যেতে পারি না। একদিন সজোরে ফোন বেজে উঠল, 'আমি সন্তোষ ঘোষ।'

'আরে, আপনি! কী আশ্চর্য! কেমন আছেন? কেমন আছেন?'

অভিমানের সুরে বললেন, 'আর কেমন আছি, একদিন তো দেখতেও এলেন না।'

আমি বললাম, 'আপনি তো আমার অসুবিধের কথা জানেন।' বললেন, 'ওসব বাজে কথা! ওই পা নিয়ে তো দিব্যি হিল্লিদিল্লি করছেন শুধু কলকাতা থেকে কলকাতা এই বেলভিউতে আসতেই আপনার অসুবিধে। আপনি বাদে সবাই আমাকে দেখতে এসেছেন।'

আন্তরিক ভাবেই বললাম, 'সবাই সশরীরে যতটুকু গেছেন, আমি মানসিক ভাবে তার চেয়ে একফোঁটা কম যাইনি।'

'থাক থাক, ভাল ভাল কথা আর বলতে হবে না। আমি সবই জানি। শুনুন, আপনি একদিন আসুন।'

'আপনি তো শিগগিরই বাড়ি ফিরে আসবেন, বাড়িতেই দেখা হবে।' খুব বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'আমি বাঁচব না।'

'কে বলেছে? কোনও জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা হল নাকি?' 'না, ঠাট্টা নয়। আমি কী দেখলাম জানেন? জ্বলজ্যান্ত মানুষ আমি জেগে বসে আছি, ঠিক পিছনে আর একটা আমি এসে দাঁড়াল। তার চেহারা শ্মশান থেকে উঠে আসা কালো পোড়া কয়লার মত আধপোড়া। আমি আঁতকে উঠলাম। তার পরেই বুঝলাম এই আমিই আমি। অতি শীঘ্রই আমি এইখানে পৌঁছুব। আপনি চলে আসুন, লিফটে করে উঠে আসবেন, তারপর তো সমতল অসুবিধে কী? আমি লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকব।'

বিচলিত বোধ করেছিলাম সেটা সত্য কথা। কিন্তু যাওয়া হয়নি। দরকারও হয়নি। খুব অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থই হয়ে তিনি বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন।

আমার সঙ্গে খুব কম দেখা হত তখন। মাঝে-মাঝে ফোন এইটুকুই। আনন্দবাজার থেকে মাসিক পত্রিকা বার করছেন জানালেন একদিন। তিনি সম্পাদক। তিনজন অথবা চারজন মহিলার দ্বারা একটি ধারাবাহিক উপন্যাস থাকবে প্রথম সংখ্যাতে। কাকে কাকে নেওয়া যায়, কে শেষ লেখিকা হবেন এ নিয়ে কথাবার্তা বললেন এবং প্রথম কিস্তিটা যেন আমি লিখি এই তাঁর দাবি। এবং লেখাটা যেন বেশ বড় এবং কৌতূহলোদ্দীপক হয়। আমি লিখেছিলাম। লোক পাঠিয়ে তিনি নিয়েও ছিলেন কিন্তু কাগজ আর বেরয়নি। লেখাটারও কী গতি হল জানাননি বা ফেরত দেননি। শুধু ফোনে বলেছিলেন 'স্প্লেনডিড।'

ইদানীং আমি প্রায়ই শান্তিনিকেতন থাকি। ওঁর যে কবে ক্যানসার হল, কবে তা মরণান্ত হল এ সব বিষয়ে কিছুই জানতাম না। ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল তার বেশ কিছুদিন আগে, যখন বামফ্রন্ট সরকারের রোষে পড়ে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং পত্রিকার কর্মীরা চরম অশান্তি এবং লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়ে কাগজ বার করতে পারছেন না। স্নান করছিলাম, ঘরে এসে দেখি সন্তোষ ঘোষ বসে আছেন। কী ব্যাপার? না, একটা সই চাই। হাত বাড়িয়ে বললাম দিন।

উনি বললেন কাগজটা আগে পড়ুন, দেখে নিন, কেন সই কী জন্য সই।

আমি বললাম, 'আপনি যখন বলছেন সই চাই এবং আনন্দবাজার থেকে এসেছেন, কাগজ আমার দেখতে হবে না।'

হাসতে হাসতে বললেন, 'এত বিশ্বাস করবেন না মশাই, ঠকবেন।' অনেকক্ষণ বসলেন, অনেক গল্প হল, আমি খেয়ে যেতে বললাম, তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, 'ওরে বাবা আমাকে আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। শিগগিরই আসব আবার।' আসেননি।

শান্তিনিকেতনে গেলে খবরের কাগজ পড়া হয় না। কোনও খবরই আমি জানতে পারি না। কলকাতা আসার পরেই আমি প্রথম শুনলাম, তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত এবং সেই রোগ তাঁকে বহু দূরে নিয়ে এসেছে। এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে আমিও যত বিমূঢ় হলাম তত অবাক হলাম। তিন-চারবার হৃদযন্ত্রের বৈকল্য এবং মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের দুর্নিবার আঘাতকে যিনি অবলীলাক্রমে প্রতিহত করে বীরের মত বুক ফুলিয়ে সারা শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, ভক্তবৃন্দ বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে রসিকতা করে দিনযাপন করেছেন, সেই অক্লান্ত যোদ্ধার কি শেষে জীবনের লড়াইতে এখানে এসে হার মানতে হল। কী বিচিত্র জীবন।

যখন বম্বে থেকে কলকাতা এলেন, তখন তাঁকে আমি বেলভিউতে দেখতে যেতে বদ্ধপরিকর হলাম। আমার কন্যা মীনাক্ষী দেখে এসে বলল, কী আশ্চর্য মানুষ। একেবারে তীরে বসেও কত রসিকতা কত হাসি কত ঠাট্টা। কথা বলতে পারেন না সব লিখে লিখে। তোমার কথা বারে বারে জিজ্ঞেস করছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি একদিন যাও।

আমি খুব তাড়াতাড়িই যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। কার জন্য আর কে অপেক্ষা করে। যে যাবার সে এমনি করেই চলে যায়। যাব তো আমরা সবাই। সকলেরই তো একটাই গন্তব্য। তবু যে কেন এমন করে বুক ফাটে কে জানে! সহস্র স্মৃতি সহস্র শেল হয়ে কেন যে অন্তরকে এমন বিদ্ধ করে কে জানে। এরই নাম বিধাতার কৌতুক।

আমার "শিক্ষক" সেই নানা রঙের মানুষটি

সুনীত ঘোষ

ট্রেন থেকে নামতেই অবাক হয়েছিলাম। কলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছিলাম বন্ধু ও সহকর্মী জ্যোতির্ময় বসুরায়কে ; "একেবারে প্রথম যাচ্ছি রাজধানীতে বদলি হয়ে। শহরটি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, স্টেশনে দয়া করে এলে ভাল হয়।" জ্যোতির্ময়বাবু স্টেশনে আসবেন এটা ধরেই রেখেছিলাম কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে বিস্মিত হয়েছিলাম আর একজনকে দেখে। জ্যোতির্ময়বাবু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "সন্তোষবাবু, এই আমাদের সুনীত"। বছরটা ছিল ১৯৫৪ সাল। মাস ও নির্দিষ্ট তারিখ এখন মনে নেই।

সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা থাকলেও ১৯৫৪ সালের আগে ওঁর সঙ্গে মৌখিক পরিচয় হয়নি। ওই বছর থেকে সন্তোষবাবুকে আমি নানাভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি অত্যন্ত কাছে থেকে।

প্রথম দর্শনে সন্তোষবাবু আমার মত ভীরু ভীরু আনস্মার্ট ২৪ বছরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি যুবককে দেখে কী ভেবেছিলেন জানি না। কিন্তু প্রাথমিক দু-একটা কথা থেকে মনে হল খুব খুশি হননি। পরে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আনস্মার্ট হলেও সেদিন তোমাকে ভাল লেগেছিল দুটি কারণে : "এক, তুমি ফার্স্ট ক্লাসেই এসেছ দেখে। অনেক সাংবাদিকই কোম্পানি থেকে ফার্স্ট ক্লাসের পয়সা নিয়ে থার্ড ক্লাসে এসে পয়সা বাঁচান। তুমি অন্তত তা করোনি। আর দ্বিতীয়ত, তোমার সঙ্গী সেতারটি দেখে। তোমার অন্তত যে কিছু শিল্পবোধ আছে এটা বুঝলাম।"

পাছে কেউ কোনও ভুল ধারণা করেন তাই আগেই বলে রাখা দরকার সেতারটি নিয়ে মাঝে-মাঝে "পিড়িং পিড়িং" করার বেশি আর কিছু করতে পারিনি। তবে সন্তোষবাবু ওতেই খুশি। আমি আর জ্যোতির্ময় বসুরায় তখন দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের অফিসবাড়ির ছাতে একটা ঘরে একসঙ্গে থাকতাম। আমাদের পাশে একঘরে থাকতেন ইন্দ্র সেন এবং আর একঘরে থাকতেন শংকর ঘোষ এবং সুনীল বসু। সন্তোষবাবু সপরিবারে থাকতেন দেওয়াল-ঘেরা ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি ফ্ল্যাটে। মাঝে-মাঝে সকালে বা বিকেলে কখনও কখনও একটু "পিড়িং পিড়িং" ('রেওয়াজ' কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম না। ওটা বড় বড় শিল্পীদের ব্যাপার) করছি এমন সময় সন্তোষবাবু এসে হাজির। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াতেই বলতেন, "না না বাজাও, বেশ ভালই লাগছে।"

আবার খানিক পরে বলতেন, "আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের অমুক গানটি বাজাতে পার?" ঘাড় নেড়ে চেষ্টা করে যেই মোটামুটি উতরে যেতাম অমনি উনি সোৎসাহে বলতেন, "সুন্দর হয়েছে। এই নাও একটি সিগারেট"। সম্পর্কে সন্তোষবাবু ছিলেন মাসতুতো দাদা। বয়সেও বড়। ওঁর কাছ থেকে সিগারেট নিতে একটু অস্বস্তি বোধ করতাম। কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বলতেন, "ওসব ন্যাকামি ছাড়ো"। জ্যোতির্ময় ছিলেন সন্তোষবাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া সঙ্গীতরসিকও। কানের কাছে সকালে বসে "পিড়িং পিড়িং" করতাম। জ্যোতির্ময় কোনওদিন বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "বাঃ বেশ হচ্ছে"। সেতার শুনতে শুনতে সন্তোষবাবু বাংলা সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন, কখনও বা একটু গুনগুন করে উঠতেন অথবা আমাকে বলতেন, "অমুক গানটা একটু গাও তো?" জানি না কী গাইতাম, কিন্তু সন্তোষবাবু ওতেই সন্তুষ্ট।

সে সময়ে সন্তোষবাবু ছিলেন অন্যতম চিফ সাব-এডিটর সংক্ষেপে চিফসাব। ওর সহযোগী ছিলেন দুর্গা কালা (পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান টাইমস কাগজের বার্তা-সম্পাদক) এবং জ্যোতির্ময় বসুরায় (পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সিনেমা-সম্পাদক)। আমার ভাগ্য ভাল, সন্তোষবাবু আমাকে ওঁর শিফটে নিয়ে নেন। আমার পেশাগত জীবনে ওটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন, আবার সবচেয়ে আনন্দের সময়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই সময় ইংরেজি ভাষায় খুব একটা সড়গড় ছিলাম না (প্রথম হয়েছি সে দাবি করব না)। আবার সন্তোষবাবু ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষায় ছিলেন সব্যসাচী। একদিনের মধ্যে সন্তোষবাবু আমার দুর্বল দিকটা ধরে ফেললেন এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন আমাকে অনেক খাটতে হবে। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে আমিও সচেতন ছিলাম। তাই কোনও অজুহাত দিয়ে দুর্বলতা গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে ওঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, "কাজে ফাঁকি দেব না এবং শিখতে চেষ্টার ত্রুটি করব না।" সেই থেকে সন্তোষবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অনেকটা গুরু-শিষ্যের। অফিসের মধ্যে কোনওদিন আত্মীয়তার সুযোগ নেইনি, সন্তোষবাবুও সেই সুযোগ নিতে দেননি। কিন্তু সুযোগ পেয়েছিলাম ওঁর বিচিত্রগামী প্রতিভার সাথী হতে। ওঁর সাহিত্য সম্পর্কে আমার কিছু বলার অধিকার নেই, ওটা সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক এবং সমালোচকদের ব্যাপার। কিন্তু সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের সমকক্ষ ভারতে সমসাময়িক কালে খুব বেশি ছিল না এটা জোরের সঙ্গে বলতে পারি। এরকম একজন সাংবাদিকের অধীনে কাজ করা এবং কাজ শেখা আমি সৌভাগ্য বলে মনে করতাম।

জানি না, সন্তোষবাবু কখন লিখতেন। দিনে প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা তো তাস খেলতেই দেখতাম। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট লেগেই থাকত। কিন্তু 'তাসুড়ে' হলেও কোনওদিন কাজে এক মিনিটের জন্য দেরি করে আসতেন না। তাতে অনেক সময় আমাদের একটু মুশকিলই হত। আমরা খেতাম মেসে। খাওয়ার সময়ের সঙ্গে শিক্ষকের সময় সব সময় মিলত না। কখনও কখনও কাজে আসতে দু-এক মিনিট দেরি হত। সন্তোষবাবু এটা একেবারেই পছন্দ করতেন না। প্রথমে কয়েকদিন দেয়ালঘড়ির দিকে

তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। পরে একদিন ফেটে পড়েন। আমাদের রাতের 'শিক্ষা' শুরু হত ন'টায়। পাঁচ মিনিট দেরি করে নিউজরুমে পৌঁছতেই দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কটা বাজে" কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, "খেতে একটু দেরি হয়ে গেল"। ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, "এক রাতে না খেলে কী হয়। তাই বলে দেরিতে আসতে হবে"। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট গুঁজে ঝড়ের বেগে কপি বাছাই করতে শুরু করেন। অনেকটা তাস 'শাফল' করার মত। কপি বাছছেন আর ছুঁড়ে দিচ্ছেন এক একজনের কাছে। মাঝে-মাঝে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ : এটা 'ডি সি' হবে, এটা বক্স হবে ইত্যাদি। একটাও বাড়তি কথা নেই। কেবল মুখ থেকে চিমনির মত ধুয়ো বেরচ্ছে। তখন ভীষণ টেনশন থাকত। শিফটে কারও মুখে কোনও কথা নেই। যে যার কপি সম্পাদনা করে হেডলাইন লিখে সন্তোষবাবুর কাছে ফেরত পাঠাচ্ছে। সন্তোষবাবু আবার কপিগুলি দেখতেন। সম্পাদনায় গোলমাল থাকলে সে সব ঠিকঠাক করে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিতেন। কোনও কপি তা যত দীর্ঘ অথবা কঠিনই হোক না কেন—দশ মিনিটের মধ্যে সম্পাদনা করতে হবে, না হলে কড়া ধমক শুনতে হত, "মনে রেখো, দৈনিক কাগজে কাজ করছ, ম্যাগাজিনে নয়।" আবার সম্পাদনায় ত্রুটি দেখলে বলতেন, "মনে রেখো, তুমি সাব-এডিটর। কথাটির মধ্যে 'এডিটর' শব্দটি আছে। কেবল 'টি' এর মাথা কাটা বা 'আই' এর মাথায় ফুটকি দেওয়াই তোমার কাজ নয়। সংবাদ সংস্থা বা রিপোর্টারদের কপির ভুল ইংরেজি শুদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে নতুনভাবে বাক্য রচনা করতে হবে।" না, কেবলমাত্র উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, প্রায় হাত ধরে দেখিয়ে দিতেন কোন বাক্য কীভাবে লিখলে ভাল হয়। কোন Phrase-idiom দিলে বাক্য এবং হেডলাইন জোরালো হতে পারে। আর বলতেন কোন ইংরেজ লেখকের বই পড়লে সাংবাদিকতার উপযোগী ইংরেজি শেখা যেতে পারে। একটা কথা বারে বারে বলতেন, "ইংরেজি শিখতে হলে ইংরেজ লেখকদেরই লেখা পড়বে।" সবিনয়ে কেবল একটা কথাই নিজের সম্পর্কে বলতে পারি : আমি আমার দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম এবং সন্তোষবাবুর কথানুযায়ী নিজেকে তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলাম। হয়তো এটা সন্তোষবাবুও লক্ষ করতেন। কারণ পরের দিকে খুব বেশি বকাঝকা না করে মাঝে-মাঝে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন। অবশ্য মিষ্টি কথার চেয়ে সন্তোষবাবুর বকাঝকাটাই আমার ভাল লাগত এবং সেজন্য মাঝে-মাঝে উস্কে দিতাম।

এমন সময়ে দিল্লিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিনদিন ব্যাপী এক জলসা হয়। ওটা কাগজে রিপোর্ট করার দরকার ছিল। কিন্তু যিনি সাধারণত আমাদের কাগজে সঙ্গীত সমালোচনা করতেন সে-সময় তিনি দিল্লিতে অনুপস্থিত। কীভাবে অনুষ্ঠানটিকে রিপোর্ট করানো যায় সে সম্পর্কে বার্তা-সম্পাদক সত্যনাথ মজুমদার এবং সন্তোষবাবু, মনে হচ্ছিল, বেশ চিন্তিত। আমি লজ্জা-ভয় ঝেড়ে ফেলে সন্তোষবাবুকে বললাম, "আপনি অনুমতি দিলে আমি এই অনুষ্ঠানটি রিপোর্ট করতে পারি।" সন্তোষবাবু খুশি হয়ে বললেন, "তুমি করলে তো খুব ভালই হয়। তাহলে যাও, আমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "যেতে তো খুবই ইচ্ছে, কিন্তু রিপোর্টটা আপনাকে একবার দেখে দিতে হবে।" অভয় দিয়ে উনি বললেন, "ভেব না, আমি দেখে দেব।" সেদিন আর আজকের দিল্লির মধ্যে অনেক পার্থক্য। তখন দিল্লি ছিল ভীষণ ফাঁকা। বাস চলত খুব কম। 'টঙ্গাই' ছিল চলাফেরার জন্য একমাত্র নির্ভরশীল বাহন, কিন্তু গাড়ি না থাকলে অধিক রাতে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। সন্তোষবাবুর ব্যবস্থায় গাড়ি নিয়ে সেই সঙ্গীত সম্মেলনে যাই। ওস্তাদদের মধ্যে ছিলেন হাফেজ আলি খাঁ, বিলায়েৎ হোসেন খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, আলাউদ্দিন খাঁ, কণ্ঠে মহারাজ, কেশরীবাই কেরদার প্রমুখ। সঙ্গীতশাস্ত্রে এমন ব্যুৎপত্তি ছিল না যে এদের গানের সমালোচনা করতে পারি। তবু মোটামুটি একটা রিপোর্ট লিখে রাত বারোটায় সন্তোষবাবুকে দেখালাম। সে রিপোর্ট পড়ে উনি যে খুব প্রীত হননি তা ওর চোখমুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু একজন দরদী শিক্ষকের মত কোনও বিরক্তি প্রকাশ না করে কপিটি ঘষেমেজে ঝকঝকে করে দেন। পরদিন কাগজে ছাপা রিপোর্ট দেখে সন্তোষবাবু বললেন, "সুনীত তোমার রিপোর্টটা ভালই হয়েছে।" লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলাম, "ও তো আপনার লেখা।" সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত করে বললেন, "চিন্তা করো না, সাহস করে লিখে যাও। আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।" তারপর থেকে প্রায়ই নানা প্রকার সঙ্গীতানুষ্ঠানে রিপোর্ট করতে যেতাম এবং রিপোর্ট লিখে সন্তোষবাবুকে দেখাতাম, লক্ষ করতাম সন্তোষবাবু আর খুব বেশি কাটছাঁট করছেন না। রিপোর্ট প্রায় আস্তই রেখে দিতেন। অস্বস্তি বোধ করে বলতাম, "কী হল একটু কলমটা ছোঁয়ান। না হলে আমার মনে হবে আপনি বিরক্ত হয়ে আর দেখতে চাইছেন না।" আদরের সঙ্গে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন, "না না খুব কিছু করারই নেই। তোমার লেখা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। খারাপ হলে তো সংশোধন করেই দিতাম।" তবু কিন্তু আমার খুঁতখুঁত থেকেই যেত।

একদিন আমাদের বার্তা-সম্পাদক আমার হাতে একটা ফিল্ম শো-এর পাস দিয়ে বললেন, "কাল এই ছবিটা দেখে একটা রিভিউ করে দিও।" সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে উনি সোৎসাহে বললেন, "খুব ভাল। রিভিউটা লিখে আমাকে একবার দেখিয়ে নিও।" এখনো মনে আছে ছবিটির নাম ছিল "তুফান ওর দিয়া"। বোধ হয় ভি শান্তারামের ছবি। দেখানো হচ্ছিল দিল্লির 'ওডিসন' সিনেমায়। দেখে একটা রিভিউ লিখে সন্তোষবাবুকে দেখাই। উনি দু-একটা শব্দ একটু এদিক-ওদিক করে ওটা প্রেসে পাঠিয়ে দেন। ওর পর থেকে গানের আসরের রিপোর্ট ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে একটা ছায়াছবি রিভিউ করতাম। এজন্য কোনও পারিশ্রমিক না পেলেও এগুলি পরবর্তীকালে আমার রিপোর্টার হওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছে ; কারণ সে-কালে সাব এডিটরের পক্ষে রিপোর্টার হওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। আমার বিশ্বাস যে চেষ্টা করলে হয়তো আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিতে পারব। সে-সময় দিল্লির কয়েকটি কাগজে গানবাজনা সম্পর্কে সাপ্তাহিক একটা কলম থাকত। একদিন সাহস সঞ্চয় করে সন্তোষবাবুকে বললাম, "এ ধরনের একটা কলম কি

আমাদের কাগজে শুরু করা যায় না?" একটু ভেবে সন্তোষবাবু বললেন, "প্রতি সপ্তাহে গানবাজনা নিয়ে একটা কলম চালিয়ে যাওয়া খুব শক্ত। কে করবে?" আবার সাহস করে বললাম, "অনুমতি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।" হয়তো সন্তোষবাবু খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলেন না। তবু নিরুৎসাহিত না করে বললেন, "তুমি পারবে?" উত্তর দিলাম সুযোগ পেলে চেষ্টা করব। সম্মতি সঙ্গে সঙ্গে। বার্তা-সম্পাদকের সাথে একটু পরামর্শ করেই আমাকে এককথায় সবুজ সঙ্কেত দিয়ে বললেন, "আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু করো।"

এটা আমার কাছে বিরাট একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল—লেখার সুযোগ এবং সঙ্গীত জগতে ঘোরাঘুরির সুযোগ। আগেই বলে রাখছি সঙ্গীতরসিক হলেও আমি বন্ধু বিজয় চক্রবর্তীর মত সঙ্গীতশাস্ত্রে পণ্ডিত নই। কাজেই পাণ্ডিত্যের দিকটা এড়িয়ে সাধারণ সঙ্গীত-মর্মীদের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে লিখতাম। একবার ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারও এই সাপ্তাহিক কলমের বিষয় করেছিলাম। এই লেখাগুলি কখনও সন্তোষবাবু, কখনও জ্যোতির্ময়বাবু একবার পড়ে দিতেন। মনে হচ্ছিল সন্তোষবাবু লেখাগুলি পড়ে খুশিই হতেন। তখন দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট এডিটর ছিলেন শচীন্দ্রলাল ঘোষ। সকলেই ওকে শচীনদা বলে ডাকতাম। শচীনদা গান-বাজনা খুব ভালবাসতেন। নিজেও গাইতে পারতেন। মাঝে-মাঝে আমাদের ঘরে এসে অথবা ওর ফ্ল্যাটে ডেকে নিয়ে আমাদের পুরনো বাংলা গান শোনাতেন। জানতাম না যে শচীনদা নিয়মিতভাবে আমার লেখা পড়েন। একদিন সন্তোষবাবুর ফ্ল্যাটে বসে গল্প করছি এমন সময় শচীনদা সেখানে হাজির। একটা চেয়ার রোদ্দুরে টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন, "বুঝলে সন্তোষ, এই 'ছোকরা' কিন্তু ভালই লিখছে। মনে হয় গান-বাজনা বোঝে।" শচীনদার কথায় আমার অস্বস্তি লক্ষ করে সন্তোষবাবু বললেন, "তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? শচীনদা যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই তোমার কলম ভাল হচ্ছে। চালিয়ে যাও।" তারপরে প্রায় বছরখানেক, অর্থাৎ দিল্লি থেকে কলকাতা বদলি হওয়া পর্যন্ত এই 'কলম' চালিয়ে গিয়েছিলাম।

* * *

কথায় কথায় খেই হারিয়ে ব্যক্তিগত কথায় এসে গিয়েছিলাম। আসল প্রসঙ্গে আবার ফেরা যাক। নাইট ডিউটিতে টেনশন থাকত রাত নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত। তারপরে খুব বেশি কপি প্রেসে যেত না। তখন সন্তোষবাবু আর এক মানুষ। স্ফূর্তিবাজ, মজাদার, প্রাণবন্ত। সকলের জন্যই ওর ক্যাপস্টানের প্যাকেট খোলা। তখন চলত নানারকম খোস গল্প, নানা কথা। মাঝে-মাঝে আবার ওঁর খুব খিদে পেত। তখনই বাইরের দোকান থেকে কোনও প্রকারে ডিমের ওমলেট আনাবার ব্যবস্থা করতে হত। রাত একটা নাগাদ সন্তোষবাবু প্রেসে যেতেন কাগজ মেক-আপ করার জন্য। ওই সময় জ্যোতির্ময় এবং আমি প্রায়ই ওর সঙ্গে থাকতাম। সংবাদ পৃষ্ঠা সাজানো যে একটা আর্ট এটা সন্তোষবাবুর

সঙ্গে কাজ না করলে জানতে পারতাম না। ওঁর 'মেক-আপ' পদ্ধতি গতানুগতিক ছিল না। পরদিন সকালের কাগজের কী চেহারা হবে সেটা যেন আগেই ওঁর চোখের ওপর ভাসত। সেই মত উনি মেক-আপ ম্যানকে দিয়ে কাগজ সাজিয়ে নিলেন। অনেক সময় ওঁর অদ্ভুত অদ্ভুত নির্দেশে কোনও মেক-আপ ম্যান বিরক্ত হলে উনি কখনও রাগ করতেন না, বরং মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে পিঠ চাপড়ে কখনও বা কলকাতার 'রকের' ভাষা ব্যবহার করে আবার কখনও বা সিগারেটের প্যাকেট উজাড় করে কাজ করিয়ে নিতেন। কখনও কোনও মেক-আপ ম্যান কৃত্রিম প্রতিবাদ করে বলতেন, "ওসব চলবে না। এই রাতে আপনি এত খাটাচ্ছেন। আগামীকাল খাওয়াতে হবে কিন্তু।" সন্তোষবাবু তখন দিলদরিয়া। পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বের করে দিয়ে বলতেন, "এই নে, কাল খেয়ে নিস। এখন কাজটা উতরে দে।" প্রকৃতপক্ষে সন্তোষবাবু প্রেসে গেলে ওঁরাও খুব মজা পেতেন। ফলে যে সপ্তাহে উনি নাইট শিপ্ট চালাতেন সেই সাতদিনের কাগজ অন্যান্য সপ্তাহের চেয়ে বেশ অন্য ধরনের হত। সকালে কাগজ দেখেই বোঝা যেত ওটা কার চিন্তাপ্রসূত। রাত আড়াইটা নাগাদ কাগজের 'প্রিন্ট অর্ডার' দিয়ে সন্তোষবাবু ফিরে আসতেন নিউজ রুমে। তখন আবার উনি অন্য মানুষ। অফিসবাড়ি থেকে সন্তোষবাবুর ফ্ল্যাটের দূরত্ব ছিল বড়জোর পঞ্চাশ মিটার। সমস্ত ক্যাম্পাস দেয়াল ঘেরা। কিন্তু রাতদুপুরে ওই পথটুকু একা চলতে উনি ভয় পেতেন। কাজেই কখনো জ্যোতির্ময়, কখনো আমি ওঁকে ওঁর ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম। তবে সেটা প্রায়ই খুব মজার ব্যাপার হত। ভয় পাওয়ার জন্য সন্তোষবাবু অফিস থেকে বেরিয়েই কখনও প্রায় ছুটে যেতে চাইতেন, আবার কখনও কখনও একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাঁজতেন। দরজা খুলে দিতেন বৌদি (সন্তোষবাবুর স্ত্রী)। দরজা বন্ধ করলেই আমরা চলে আসতাম। সেই সময় ইচ্ছে করলে কয়েক প্যাকেট সিগারেটের জন্য ওঁকে ব্ল্যাকমেল করা যেতে পারত। গরমের রাতে খুব অসুবিধা হত না। কিন্তু কষ্ট হত শীতের রাতে। আমরাও কোনও প্রকারে ওঁকে পৌঁছে দিয়েই প্রায় দৌড়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরেই মুড়ি দিতাম।

* * *

নানা রঙের মানুষ সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে লিখতে গেলে হয়তো একখানা বই লিখে ফেলা যায়। তাই আর কথা না বাড়িয়ে এখানেই শেষ করছি।

শেষ নমস্কারে

তৃপ্তি মিত্র

সন্তোষ ঘোষ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে,—থামতে হল। কী লিখব? সত্যি এইরকম বহুধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক অসাধারণ মানুষ সম্পর্কে সমস্ত চিন্তা গুটিয়ে জড়ো করে আনা খুব শক্ত। অনেক সময়ে, অনেকানেক বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা বা এমনিই কথা হয়েছে,—সে লঘু থেকে গুরুগম্ভীর আলোচনা পর্যন্ত, তাতে যে ছবিটা মনে আসে লেখায় তা প্রকাশ করা আমার লেখিকা-বিদ্যায় কুলোবে না।—একটা কথা ইদানীং প্রায়ই বলতেন,—'সাংবাদিক হতে গিয়ে না হল ভাল সাংবাদিক হওয়া না হল ভাল সাহিত্যিক হওয়া'। অথচ ওঁর ছোট গল্পগুলো কতই না বাস্তবিক, অসামান্য এবং শক্তিশালী। 'কিনু গোয়ালার গলি'র কথা ছেড়েই দিলাম।—দেখেছি একদিন আনন্দবাজারের স্ট্রাইকের সময় ওঁর পুত্র টিটো একটা মিটিংয়ে গেছে বলে পিতা হিসেবে কতই না উদ্বেগ। আমার যা দেখা তাতে নানা আলোচনায় দেখেছি ওঁর একটা সংবেদনশীল মন ছিল ; কেউ উপযুক্ত হলে তাকে সাহায্য করতে কখনো কুণ্ঠিত হতে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি বহুবার, বহুক্ষণ ধরে, সেই সব আলোচনায় একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠত আমার কাছে যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওঁর জ্ঞানের সীমা নেই, এবং শ্রদ্ধা, ভালবাসারও। টেলিফোনে হয়তো জিজ্ঞাসা করলাম,—"রবীন্দ্রনাথের অমুক লেখাটা তমুক লেখার চাইতে আগে না পরে?—একটু আটকে গেছি খুব দরকার।" উনি বললেন, "আগে অমুক সালে।" তারপরেই বললেন, "তবু ধরুন একটু দেখে নিই" দেখতাম উনি যা বলেছিলেন সেটাই ঠিক। এরকম কত সময়ে কত সাহায্য পেয়েছি।—একদিন রবীন্দ্রসদনে কী একটা অনুষ্ঠানে দেখা, জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করছেন? চুপচাপ বসে আছেন?" বললাম, "ছিলাম, কিন্তু এখন না, একটি নাটকের বিদ্যালয় স্থাপন করে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ইস্কুল ইস্কুল খেলা করছি। ওদের দিয়ে 'রক্তকরবী' পড়াচ্ছি খুব, যাতে উচ্চারণ ইত্যাদি স্পষ্ট হয়। শিগগিরই ওদের দিয়ে পাঠের ব্যবস্থা করাব।" বললেন, "আমাকে জানাবেন কিন্তু যাব।" জানালাম। তাগাদা দিয়ে কটা আসন লাগবে তাও জানালেন। তবু আসবেন ভাবিনি,—থিয়েটার সেন্টারে এসে পাঠ শুনলেন। বললেন, "খুব ভাল লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের এসব কথাই তো এখন বলা দরকার। এটাকে স্টেজ করুন,—ইত্যাদি ইত্যাদি" পরে যে মঞ্চস্থ করতে পারলাম অনেকের উৎসাহের সঙ্গে ওঁর উৎসাহটাও খুবই কাজ করেছিল।

ক্যানসারে আক্রান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত যতবার 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়েছে, প্রত্যেকটি

অভিনয়ই উনি দেখতে এসেছেন। বলতেন, "রক্তকরবীর কথাগুলোর মানে যেন নতুন করে উপলব্ধি করছি।"

রোগাক্রান্ত হয়ে 'বেলভিউ নার্সিং হোমে' যখন ছিলেন, দু-তিনবার দেখতে গিয়েছিলাম। কত কথা বলতে চেষ্টা করতেন। সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত। একদিন আবৃত্তিও শুনতে চাইলেন। শেষ যেদিন দেখতে যাই—ঘরে ঢুকতেই সিস্টার একটুকরো ফিতে বাঁধা কাপড় মুখে বেঁধে দিলেন। ইনফেকশন বন্ধ করবার জন্যে। সন্তোষবাবু ঘুমোচ্ছিলেন বোধহয়, ঘরে ছিলেন জ্যোতির্ময় বসুরায় আর ওঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণকলি। আমরা চাপা স্বরে দু-একটা কথা বলছিলাম। উনি তাকালেন, বসতে চাইলেন, জ্যোতির্ময়বাবু তাড়াতাড়ি ধরে বসিয়ে দিলেন। আমি কিছু গোলাপ নিয়ে গিয়েছিলাম। কৃষ্ণকলিকে কোনও একটা ফুলদানিতে রাখবার জন্য দিচ্ছিলাম। উনি স্পষ্ট গলায় ফুলগুলো চাইলেন। হাতে নিয়ে আঘ্রাণ নিলেন। আমার একটু ভয় করল এরকম ভাবে আঘ্রাণ নেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে, যেখানে এত সাবধানতা?—তারপর বললেন, "কী করছেন এখন?" অনেকদিন পর দেখা হলে সেই চিরপরিচিত প্রশ্ন। তখন আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটি—বলা যায় একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। বললাম সেই কথা। 'গৃহপ্রবেশ' নিয়ে অনর্গল কথা বলে চললেন। হঠাৎ বললেন, "ভাবছেন কী করে এত কথা বলছি? ডাক্তারেরা এই যন্ত্রটা এখানে বসিয়ে দিয়েছে তাই পারছি।" দৃশ্যটা আমার খুব ভাল লাগেনি, যাই হোক—তারপর কবে 'গৃহপ্রবেশ' লেখা হয়েছিল থেকে—স্টারে যখন অহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চস্থ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে কত বদল করে দিয়েছিলেন, এবং দর্শকদের কেমন লেগেছিল, রবীন্দ্রনাথের স্পিরিচুয়ালিজম 'ডাকঘর' এবং 'গৃহপ্রবেশের'—সাদৃশ্য আছে কিনা তফাত কতটা—কত কথা। জ্যোতির্ময়বাবু এবং কৃষ্ণকলির হয়তো মনেও থাকতে পারে। একটু পরে আমার মনে হল আর কথা বলানো উচিত হবে না। বললাম, "রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ উঠেছে—আমি না চলে গেলে আপনি থামবেন না।" বললেন, "স্টেজে হলে আমি কী করে দেখব? যদি ডাক্তারেরা না যেতে দেয়? না পারি?" বললাম—"আট-নটি তো মোটে চরিত্র, যেখানেই থাকবেন ওদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আসব।" হাততালি দিয়ে উঠলেন, অনেকটা বাচ্চাছেলের মত। তারপরে দু'দিকে দু'হাত বিস্তৃত করে জড়ো করে এনে নমস্কার করলেন। খানিকটা যেন রসিকতার ভঙ্গিতেই। আমিও প্রতি নমস্কার করলাম। সেদিন বুঝতেই পারিনি এই নমস্কারই শেষ নমস্কার। এত সুস্থ লাগছিল সেদিন, পূর্বের মত কথা, রসিকতা, ভাবতেও পারিনি তার চারদিন পরেই চলে যাবেন। ভেবেছিলাম ক্যানসারের কত রকম ওষুধ তো বেরিয়েছে, অন্তত ঠেকিয়ে তো রাখা যাচ্ছে। উনিও নিশ্চয়ই ভালর দিকেই যাচ্ছেন। পরে ভেবেছি কেন সেদিন 'গৃহপ্রবেশ' নিয়ে কথা বললাম। তবে সেদিন এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ...রেডিও খুলেছি এমন সময় আমার মেয়ে এসে ঘরে দাঁড়াল—বলতে যাচ্ছি, কীরে হঠাৎ দুপুরে...? ঠিক তখনই রেডিও বলে উঠল, 'বিখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ..." শাঁওলী এই খবরটাই আমাকে দিতে এসেছিল।

শ্রেষ্ঠ পাঠ

[ছোটদের কথা ভেবে]

লীলা মজুমদার

ছোটদের সঙ্গে তাদের মত ছোট হয়ে কিছু বলা তাঁর স্বভাব ছিল না। লেখার মধ্যে কোনওরকম প্রকৃত বা কৃত্রিম ছেলেমানুষী না খুঁজে বড়দের মত করেই ছোটদের কথা বলেছেন। নিজের ছোটবেলার পটভূমিকার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে মানুষজন বিশ্বসংসারের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সহজ ভাষাতেই দিয়েছেন, বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না। 'সকালবেলা' পড়ে কি তোমাদেরও তাই মনে হয়নি?

ছোটরা তো আর একা থাকে না ; বড়দের সঙ্গেই তাদের বাস করতে হয়। যাদের তা হয় না, তারা বড়ই দুঃখী। বড়দের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটা ছোটদের জীবনের একটা দিক। অনেক সময় বড়দের জীবনের নানা সমস্যা তাদের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে, ছোটদের দুঃখ দেয়। 'টুবলুর কান্না' সেই রকম একটি গল্প। গল্পটির বস্তু ঠিক ছোটদের জীবন নিয়েও নয়, কিন্তু তার সঙ্গে ছোটরা জড়িয়ে পড়ে। বড়দের সমস্যার প্রভাব ছোটদের ওপর পড়ে। আমার মনে হয় এ গল্প টুবলুদের জন্য লেখা হয়নি, তার মা-বাবাদের জন্য হয়েছে।

আশা করি বুঝতে পেরেছ যে, যত রকম দান আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন নিজেকে দান করা আর যত রকম জ্ঞান আছে তার মধ্যে নিজেকে চেনাই শ্রেষ্ঠ। সহজ ভাষায়, অকপট চিত্তে এই মানুষটি সে কাজ করেছেন, তাই তাঁকে কখনো ভুলে যেও না।

সন্তোষকুমার ঘোষ

বিমল কর

সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল পঞ্চাশের গোড়ার দিকে। মৌখিক আলাপ মাত্র। তখন তিনি লেখক হিসেবে সুপরিচিত। আর আমি কলম ধরার মকশো করছি। গৌরকিশোর আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সপ্রতিভ, চঞ্চল, বাকপটু—মানুষটিকে ভালই লেগেছিল। এই আলাপের আগেই একধরনের পরিচয় তাঁর সঙ্গে আমার ছিল—সে পরিচয় লেখক ও পাঠকের মধ্যে যেমন থাকে—অপ্রত্যক্ষ পরিচয়। পোস্টওয়ার বা যুদ্ধোত্তর নতুন প্রতিভাবান বাঙালি লেখকদের অন্যতম ছিলেন সন্তোষকুমার, পাঠক হিসেবে তাঁকে সরিয়ে রাখার সাধ্য ছিল না।

আমাদের প্রথম পরিচয়ের পর কদাচিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও কথাবার্তা তেমন কিছু হত না। উনি গোড়া থেকেই আমাকে তুমি বলতেন, আমি বলতাম আপনি। আমাদের মধ্যে বয়সের তফাত বছরখানেকের। তিনি যে আমার সম্মাননীয় এবং অগ্রজ লেখক—এ-কথা আমি কোনওদিনই ভুলিনি।

সন্তোষবাবু কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে গেলেন। একই প্রতিষ্ঠানে তখন আমরা কাজ করি। কাজ করলেও দিল্লি আর কলকাতার মধ্যে এতই দূরত্ব যে দু'জনের মধ্যে মেলামেশার কোনও সুযোগই হয়নি। সেই সুযোগ ঘটল, সন্তোষবাবু যখন আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, ফিরে এসে পাইকপাড়ায় থাকতে লাগলেন। আমরা অনেকেই তখন পাইকপাড়ায় থাকি।

সত্য বলতে কী, সন্তোষবাবুর সঙ্গে আমার যেটুকু অন্তরঙ্গতা বা মেলামেশা—তা ওই পাইকপাড়ায় থাকার সময়। সেই সময়টা অতি দীর্ঘ নয়। তারপর তিনি বাসস্থান বদল করলেন। কর্মস্থান এক হলেও—দু'জনের মধ্যে আর তেমন মেলামেশা ছিল না। যদিও শুনেছি, উনি বরাবরই আমায় স্নেহ করতেন। আর আমি যথাসম্ভব তাঁকে সম্মান করেছি। মন এবং মেজাজের দিক থেকে তিনি যেমনটি ছিলেন, আমি বোধহয় তার উলটো ছিলাম, ফলে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা হয়নি। তা সত্ত্বেও দু-একটি এমন ব্যাপারে তিনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন যা আমাকে অবাক করেছে। এর কোনওটাই সাহিত্য সম্পর্কে নয়। সেই কথাগুলি বলা যাবে না। শুধু এইটুকুই বলা যায়, মানুষ হিসেবে তাঁর মধ্যে একধরনের নিভৃত বেদনা ও মমতা ছিল যা তাঁর গুণ বিশেষ হয়ে দেখা দিত হঠাৎ হঠাৎ। আর তখন তাঁর আচরণে অভিভূত না হয়ে উপায় ছিল না।

সন্তোষকুমার বড় সাংবাদিক ছিলেন, তিনি বাংলা সংবাদপত্রের পুরনো ধারাকে নানাভাবে পালটেছেন—গোমড়ামুখো ছানি-পড়া বাংলা সংবাদপত্রকে সজীব সপ্রাণ করেছেন, এ-সব কথা আমরা প্রায়ই শুনি। স্বীকার করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সন্তোষবাবুর সঙ্গে সংবাদ নিয়ে কোনও আলোচনা করতাম না। কারণ তিনি এত বেশি জানেন, আর আমি যেহেতু কিছুই প্রায় জানি না—আলোচনা করার ধৃষ্টতা আমার ছিল না। বরং, উনি যখন পাইকপাড়ায় ছিলেন, সকালের দিকে আড্ডা মারতে গেলে মাঝে-মাঝে আমাদের মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে কথা হত। তখনও সন্তোষবাবু আমাদের মতন মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিলেন।

একটি ঘটনার কথা এখানে বলব। একদিন, সামান্য বেলায়, সন্তোষবাবুর বাড়িতে আড্ডা মারতে গিয়েছি, দু-চার কথার পর, চা খেতে খেতে হঠাৎ আমরা সাহিত্য বিষয়ে কথা বলতে লাগলাম। প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলাম। আমার বলার বিষয় ছিল, প্রত্যেক শিল্পেরই কমবেশি তিনটি গুণ থাকে ; একটি তার চিত্রধর্ম, একটি সঙ্গীত ধর্ম, অন্যটি চিন্তা বা ভাবের ধর্ম। যিনি সঙ্গীতশিল্পী তিনি সঙ্গীত ধর্মটিকেই প্রধান করে নেন, যিনি ছবি আঁকেন তিনি প্রধান করে নেন চিত্রধর্মকে। আর লেখকদের বোধহয় প্রধান অবলম্বন—শেষের ধর্মটি। বিশেষ করে এখানে—আপনি আমি যখন গল্প উপন্যাস লিখি তখন আমাদের আর কী করার আছে। তবে ছবি বা গানের ধর্ম আমরা বাদ দিতে পারি না। লেখার ভাষা আমাদের কাছে গানের ধর্মের মতন, সেটা কানে বাজে, তার একটা সুর আছে।

সন্তোষবাবু দেখলাম, কথাটা প্রায় মেনে নিলেন। বললেন, 'তুমি ছবির গুণ লেখায় আনবে কেমন করে?'

আমি বললাম, 'চট করে দুটো নাম মনে পড়ছে। বিদেশি নাম। অস্কার ওয়াইল্ড আর ডি এইচ লরেন্স।'

সন্তোষবাবু বললেন, 'বেশ বলেছ। আমাদের বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ।'

আমি বললাম, 'একেবারে ঠিক।' বলে একটু হেসে বললাম, 'আর যদি কিছু না মনে করেন, আমাদের এখনকার মধ্যে জ্যোতিদা।'

সন্তোষবাবু সিগারেটের প্যাকেট কেড়ে নিলেন, 'তুমি আমার নাম বললে না?' আমি হেসে বললাম, 'আপনি ভাববেন আমড়াগাছি করছি।'

ছেলেমানুষের মতন হেসে উঠলেন।

খানিকটা হাসাহাসির পর বললেন, 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে হাতেনাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি।' বলে কাগজ কলম আনিয়ে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে উনি নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে বসলেন।

বসার ঘরে আমরা বসেছিলাম। রাস্তার দিকের দরজায় পরদা ঝুলছিল, জানলাগুলো খোলা, পরদা ঝুলছে। সময়টা বোধহয় গরমের শুরুর মুখ। সন্তোষবাবুর সেই ঘর, ঘরের মধ্যের আলো, বাইরের রোদ, ঘরের চেয়ার টেবিল, আমাদের দু'জনের বসে থাকা—এই

সব মিলিয়ে মিশিয়ে লেখা দিয়ে একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর বললেন, 'এখন ঠিক হচ্ছে না। পরে তোমায় দেখাব।' বলে কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

আমার যতদূর মনে পড়ছে 'মুখের রেখা' লেখাটিতে সন্তোষবাবু এই ধরনের কিছু কাজ নিখুঁতভাবে করতে পেরেছেন।

কিন্তু তিনি কী পেরেছেন—কী পারেননি—সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, ওঁর মনকে একবার নাড়িয়ে দিলেই উনি ছেলেমানুষের মতন নেচে উঠতেন, আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। তাঁর হাতের কলম কেঁপে উঠত থরথর করে।

এক সময়ে তিনি নিজে আর বড় কলম ধরতেন না। মুখে বলতেন। সেই সময়ের কথা আমি কিছু জানি না।

সন্তোষকুমার আমার অনুভূতিতে

নিশীথরঞ্জন রায়

আমাদের পরিচিত মানুষের গণ্ডির মধ্যে এহেন একশ্রেণীর মানুষ দেখা যায় যাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ না পেলেও তাদের জানতে, বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। এমনি বিরল শ্রেণীর মানুষ সন্তোষকুমার। তাঁর সঙ্গে একটানা দীর্ঘদিন মেলামেশার সুযোগ পাইনি। তবু তাঁকে জেনেছি। পরিচয়ের ক্ষণমুহূর্তে বাইরের খোলস ছেড়ে হয়তো বা নিজের অজান্তেই সন্তোষকুমারের ভিতরের আসল মানুষটি বেরিয়ে এসেছে বারবার। এই আসল মানুষটির পরিচয় তাঁর অসাধারণ সাহিত্যকীর্তির জন্য নয়। সে পরিচয় নেহাত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কর্মকৃতির বোঝাকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে যাঁরা তাঁর কাজের মূল্যায়ন করবেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসেবীদের জগতে বিশ শতকের শেষ কটি দশকের বুদ্ধিজীবীদের মহলে সন্তোষকুমারের অবদান এবং স্থান নির্ধারণ করে তাঁর কাছে আমাদের মানের পরিমাণ কিছুটা লাঘব করবেন।

সন্তোষকুমারের সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে পরিচয় ঘটেছে তাঁর লেখার সঙ্গে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়। (আগে লেখা, পরে লেখক) লেখক সন্তোষকুমারকে যতটা জেনেছিলাম তাঁর রচনার মাধ্যমে। যখন মুখোমুখি প্রত্যক্ষ পরিচয় হল তখন ভেবেছি কতটুকুই বা আগে জেনেছিলাম? মনে হয়েছে লেখার মাধ্যমে জানার বিষয়টি অল্পবিস্তর বাধ্যতামূলক লেখার লাইনের পিছনে লেখক মাঝে-মাঝেই উঁকি দেবেন অন্তর সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টিতে। এটা যেন নিয়ম অথবা প্রয়োজনের তাগাদা। কিন্তু লেখকের খোলস থেকে মানুষটি যখন বেরিয়ে আসেন সেটা প্রয়োজন--নিরপেক্ষ অথবা নিষ্প্রয়োজনীয়। এই নিষ্প্রয়োজন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বড় খাঁটি কথা।

"নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি।"

আমি সন্তোষকুমারের মধ্যে ফুলকেই দেখেছি। ফলের কথা আমার মনে হয়েছে অবান্তর। সেদিকে দৃষ্টি দিন সাহিত্যের কারবারিরা।

১৯৭৮ সাল। সে বছর আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্যোগে বাংলা মুদ্রণের দু'শো বছর পূর্তি উৎসবের ব্যাপক আয়োজন চলছে। বন্ধুবর নিখিল সরকারের সঙ্গে আমাকে নিতে হয়েছিল যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব। তখন ঘনঘন সভা হত। সেইসব সভায়

সন্তোষকুমারের সান্নিধ্য লাভ করেছি। অনেক বিষয়ে তাঁর মতামত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মনে হয়েছে এই মানুষটির মন গতানুগতিকতার নাগপাশে বদ্ধ নয়।

রাজা রাধাকান্ত দেবের জন্মের দুশো বছর পূর্তি নিয়ে উৎসবের আয়োজন চলছে। আমি উৎসব সমিতির সভাপতি—সন্তোষকুমার সদস্য—নামজাদা আরও বহু ব্যক্তি এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। পর পর বেশ কয়েকটি সভা ডাকা হল। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি একটি-দুটি ছাড়া সব ক'টি সভাতেই সন্তোষকুমারের উপস্থিতি। বিস্ময়ের কথাটি তুললাম এই জন্য যে তাঁর শরীর তখন ভাল নয়। নিত্যদিনের কাজকর্মের তাড়াও কিছুমাত্র কম নয়, তবু সভায় শুধু উপস্থিত থাকতেন না—এই উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্য কী কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বহু পরামর্শ দিতেন। সভার শেষে দু-এক দিন একান্তে বলেছেন—রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে কিন্তু নতুন করে ভাববার আছে—লেখারও প্রয়োজন এসেছে—এ নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন বিস্তর। লেখার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল কর্মকর্তাদের পীড়াপীড়ির জন্য ততটা নয় যতটা তাঁর নিজের মনের তাগাদায়। দুর্ভাগ্য আমাদের, সে প্রতিশ্রুতি তাঁর পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। যদি হত নিশ্চয়ই আমরা পুরনো কথার চাইতে অনেক বেশি নতুন কথা পড়ার সুযোগ পেতাম। এখানে সসঙ্কোচে একটি কথা বলছি। ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি যখন কারো জীবনী লেখেন তখন সে রচনা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তথ্যের দিক থেকে ঠাসবুননী—হয়তো কিছু তত্ত্বের অবতারণাও তাতে থাকে। কিন্তু তথ্যভারাক্রান্ত না হয়েও অ-ইতিহাসবিদ্দের মহল থেকে এমনি ধরনের রচনা পাওয়া যায় যার মধ্যে আলোচ্য জীবনীর একটি-দুটি কিংবা ততোধিক দিক উদ্ঘাটিত হয় যার প্রতি ইতিপূর্বে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। আমি এই কারণেই অনেক আশা নিয়ে সন্তোষকুমারের কাছ থেকে রাধাকান্তদেবের মূল্যায়নের প্রতীক্ষা করছিলাম।

আরও বহু সভাসমিতিতে সন্তোষকুমারের দেখা পেয়েছি। তাদের মধ্যে আর একটি মাত্র অভিজ্ঞতার কথা বলব। যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কিছু দিন আগে তাদের সংগৃহীত স্বদেশী যুগের নথিপত্রের সঙ্গে কিছু কিছু নতুন উপাদান যুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। তাদের প্রয়াস সার্থক হবার সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছিল বন্ধুবর স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বদান্যতায়। কালীচরণ বহু অর্থব্যয়ে এবং বহুতর পরিশ্রমে স্বদেশী আমলের যেসব ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তবু তাঁর সংগৃহীত বহু তথ্য যা নিয়ে গবেষণা হয়নি, অথচ গবেষণার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এমন ধরনের তথ্য সমাবেশ যা তিনি করেছিলেন, বিনা দ্বিধায় তিনি তা তুলে দিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্তৃপক্ষের হাতে। তার পরে একদিন যাদবপুর ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিদগ্ধজনদের নিয়ে এক প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কিত নতুন তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের উপযোগী একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন। সেই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

সন্তোষকুমার। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিয়েছিলেন। অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ-এর সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি মহাকালের অবিরাম গতি ও ছন্দের যে রূপকল্পনাটি তুলে ধরেছিলেন তা সেদিনকার পরিবেশটিকে গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছিল।

তিনি সে দিন মনে করিয়ে দিলেন—

"যে মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরলে,
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরলে"

সন্তোষকুমারের কলমের ধার যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন তাঁর অন্তরে ছিল এক পরম ঔদার্যবোধ। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন তাঁরাই এই বোধের উষ্ণতার স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাঁর চোখে লক্ষ করেছি তির্যক দৃষ্টি মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির স্নিগ্ধতা—তাতে মেশানো থাকত যতটুকু কৌতূহল তার চাইতে অনেক বেশি প্রসন্নতা সুন্দরের অনুভূতি। এখানেই বোধহয় তাঁর জীবন দর্শনের মূল তত্ত্ব।

বাইরে ও ভিতরে দুটো মানুষ

সেবাব্রত গুপ্ত

সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে শেষ দেখা বেলভিউ নার্সিংহোমে। তার আগে ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম বোমবাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে। দুটি সাক্ষাৎই আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিশুর মত সরল মনে হয়েছিল তাঁকে। একটা সময় তাঁকে খুব রাগী মানুষ ভেবে ভয় পেতাম। সেটা আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার প্রথম দিকে। তাঁর গালি অবশ্য খেয়েছি অনেক পরেও। তাঁর অধীনে আমি কাজ করতাম না, আমি ছিলাম 'দেশ'-এ। তবু আমরা, সাংবাদিকরা, এই সুতারকিন স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁর অধীনেই ছিলাম। শিক্ষার্থী অথবা ছোটভাই হিসাবে। এবং তার চেয়েও বেশি ভালবাসার টানে। ওঁর তিরস্কার অনেক খেয়েছি, সাংঘাতিক তিরস্কার, কষ্টদায়ক ভাষায়। 'কষ্ট' হত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা চলেও যেত, কারণ জানতাম গালি দিয়ে আমাদের চেয়েও বেশি কষ্ট পেতেন তিনি। এটাও জানতাম গালি দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেবার পরই তিনি আবার ডেকে পাঠাবেন অথবা নিজেই ছুটে আসবেন। আমি তাঁর অধীনে কাজ করতাম না, তবু তাঁর বকুনি খেয়েছি। স্রষ্টা সন্তোষবাবু বলেই সম্ভব ছিল। কারণ তিনি ভালবাসতে জানতেন।

সেই রাগী মানুষটিকে কেমন যেন শিশুর মত অসহায় মনে হল। ব্রিচ ক্যান্ডিতে বিকেলে ওঁর ঘরে ঢুকেই দেখি উনি জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কথায় তাঁর চমক ভাঙল, ফিরে তাকালেন, আনন্দে তাঁর চোখ চিকচিক করে উঠল। তখন তিনি কথা বলতে পারতেন না। যা বলবার তিনি কাগজে লিখে দিতেন, হাতের কাছে। বাইটিং প্যাড পেন্সিল থাকত। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়েছে। মনে মনে ভাবছিলাম ওঁর মনের জোর বাড়াবার চেষ্টা করব। আমার এই স্পর্ধা বিফলে গেল। মনে হল এক নির্মম ভবিতব্যকে তিনি শান্ত মনে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মনে আমি আর কী সাহস জোগাব। একবার কাগজে এই কয়টি কথা লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন—'শরীর যা দেখছেন—বাইরের। আমার মনের জোর। হার্ট অ্যাটাকের পরেও তো বেলভিউ-তে আড্ডা বসত। কেউ বুঝেছে? আমি অতিরঞ্জন করি না। এটা genuine বলেই আপনাকে নিজের লোক ভাবি বলেই'—যতক্ষণ পারা যায় ওঁর সঙ্গে কথা বললাম। চলে এসে বারান্দা পেরিয়ে আবার ফিরে গেলাম ওঁকে দেখতে। তখন আমাদের দু'জনের চোখই ভিজে এসেছে।

কোনও রবীন্দ্রশিষ্য বা রবীন্দ্রভক্ত সন্তোষবাবুর চেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসেছেন কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথের কথা, গান, বাণী সন্তোষবাবুর অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সেই কারণেই হয়তো শেষের সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে তাঁর মনে এক আধ্যাত্মিক প্রত্যয় জন্মেছিল। সুখ-দুঃখকে সমান করে নেবার সাধনা চলছিল তাঁর অন্তরে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যতটা ভালবেসেছেন ততটাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে তিনি ভালবাসতে পারেননি—এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আমার ছিল। সেই অভিযোগ তিনি খণ্ডন করে গেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকেই তিনি রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে এবং আমাদের বন্ধু জ্যোতির্ময়বাবুকে অনেক কথা বলেছেন। তাঁর অনুভূতির কথা ভাবনার কথা। জ্যোতির্ময়বাবু (জ্যোতির্ময় বসুরায়) ছিলেন সন্তোষবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার সঙ্গে সন্তোষবাবুর ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত জ্যোতির্ময়বাবুর মাধ্যমেই। ক্রমে আমি তাঁর অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে গেলাম। একটা সময়ে কেবল অন্তরঙ্গরাই ৯ সেপ্টেম্বর সন্তোষবাবুর জন্মদিনে দুপুরে তাঁর সঙ্গে বসে খাবার সাদর আমন্ত্রণ পেতেন। ভবানীপুর বাড়িতে ৯ সেপ্টেম্বরের সেই দুপুরগুলি ছিল খুব আনন্দের। সন্তোষবাবুও আমাকে দলে টেনে নিলেন। পরে অবশ্য নিউ আলিপুর বাড়িতে জন্মদিনে আরও বেশি লোক আসতেন, গান-বাজনা হত। রাগ-অভিমান মেশানো ভালবাসার এক অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল ওঁর সঙ্গে। দুপুরে ওঁর জন্মদিনে যেতেন গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী, অরুণ বাগচী ও জ্যোতির্ময় বসুরায়। এবং সেই সঙ্গে আমিও। অনেক রকম মজার ব্যাপার হত। একটি ছিল সন্তোষবাবুর তালিকায় কে প্রথম হবে কে দ্বিতীয় হবে সেই নিয়ে কৌতূহল ও উত্তেজনা। তালিকায় প্রথম যে সেই সন্তোষবাবুর সব চাইতে আপন—এই ভাবেই একের পর এক নামের তালিকা তৈরি হত। দু-এক মাস পর আবার ওলোটপালোটও হত। কেউ ওপর থেকে নিচে নামতেন, কেউ নিচে থেকে ওপরে উঠতেন। কারো সঙ্গে কিছু কাল বাক্যালাপ বন্ধ থাকত। এমনই সুন্দর আন্তরিক ছিল আমাদের মেলামেশা। অনেক কিছু তাঁর কাছে আমরা শিখেছি। বিশেষ করে সাংবাদিকতা ও ভাষার কারুকার্য। শব্দ চয়নের দারুণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। আমার স্ত্রীকে একটি উপহার দিলেন—তাতে লিখলেন 'সেবাব্রতীকে'। আমাকে ওঁর লেখা যেসব বই দিতেন প্রায় সবকটিতেই গালি থাকত।

অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ছিল সন্তোষবাবুর। কখনো মনে হত বুঝি তাঁর স্বভাব শুধু জটিলতাতেই ভরা। কখনো মনে হত এমন সরল লোক হয় না। যাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ ছিল তার কিছু লেখা পড়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। অন্যের গুণকীর্তনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর ক্ষমতা ছিল অল্পেতেই অন্যকে ভুল বোঝার। আবার ভুল যখন অচিরেই ভাঙত তখন অনুতাপের শেষ থাকত না। বড্ড অভিমানী ছিলেন তিনি। নিজের হৃদয় উজাড় করে তিনি অন্যকে ভালবাসা দিতেন, সেই পরিমাণে ভালবাসা ফেরতও চাইতেন। তিনি সেটা পেতেন না, পাওয়া যায় না। সেজন্য তাঁর কষ্ট হত। সেই কষ্টের কথা অন্তরঙ্গ দুয়েকজনকে বলতেন। কিন্তু কারো প্রতি কোনও বিদ্বেষ পোষণ করতেন

এমন শুনিনি বা দেখিনি। তাঁর মধ্যে ছেলেমানুষি ছিল খুব, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটাও খুব জোরদার ছিল। কিন্তু তাঁর স্বভাবে বিদ্বেষ ছিল না। মারা যাবার কিছুকাল আগে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। পত্রিকাটি অবশ্য বেরয়নি। সেই ব্যাপারে আমার ওপর তাঁর কিছুটা নির্ভরতা ছিল। অল্পতেই তিনি নিরাশ হতেন, আবার পরক্ষণেই আশায় বুক বাঁধতেন। নিরাশার একটি মুহূর্তে তিনি আমাকে বলেছিলেন : 'সত্যিই কি আমার কোনও প্রয়োজন আছে আর?' বলেছিলাম : আপনি জানেন না এই প্রতিষ্ঠানে আপনার মূল্য কতখানি। আনন্দবাজার পরিবারের কাছে তাঁর মূল্য কত গভীর ছিল সেটা সন্তোষবাবু তাঁর রোগশয্যাতেই জেনে গেছেন। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন রোগশয্যা থেকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠিতে। কিন্তু তাঁর কাছে আনন্দবাজারের আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতার কি শেষ আছে। কারোর প্রতি কোনও অভিমান নিয়ে তিনি বিদায় নেননি। মৃত্যুর অল্প কাল আগে তাঁকে দেখে মনে হয়েছে যেন সব হিসেব তিনি চুকিয়ে ফেলেছেন। না কি আমারই ভুল? হয়তো বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, সকলেরই যেমন থাকে। তবে ভয়ের মুখোশকে বিশ্বাস করে অনর্থ পরাজয়কে সন্তোষবাবু মেনে নিতে চাননি।

স্বগত বিদায়

আনন্দ বাগচী

সন্তোষদার গোটা জীবনটাই একটা স্বরচিত নাটকের মত, অন্তত তাঁর চলে যাওয়াটি নিশ্চয়ই, আচমকা, অতি আচমকা, এত বিস্ময়করভাবে যবনিকা নেমে এল যে ড্রপসিনের বাঁশিটা পর্যন্ত আমরা শুনতে পেলাম না। তাই তাঁর সঙ্গে শেষ কথাটা বলবার সময় পেলাম না আমরা। শেষ নমস্কার জানানো হল না। Life begins with fire and ends in smoke—কথাটি অনেকের পক্ষে খাটলেও সন্তোষদার ক্ষেত্রে মেলেনি। তাঁর শুরুতে আগুন শেষেও আগুন। আগুন নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন, আজীবন আগুনকেই লালন করেছিলেন নিজের ভেতর, শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সেই আগুনের নিঃশব্দ শিখা স্পষ্ট চোখে পড়েছে। কোথাও কোনও ঝাপসা ব্যাপার নেই, আচ্ছন্নতা নেই, মালিন্য নেই। স্মৃতি যেন আরও প্রখর, চেতনা আরও দীপ্ত, অনুভূতি আরও অন্তর্ভেদী। করগুনতি শেষ কটা দিন তিনি নির্ভাষ কিন্তু নির্ভাষণ ছিলেন না। কথা থেমে গিয়েছিল কিন্তু কলম থামেনি। মৃত্যুকে নতুন করে চিনে নিচ্ছিলেন নিজের মত করে, প্রতি মুহূর্তের নিকষে কষে কষে। অগ্নিকণ্ঠ সন্তোষদাকে নীলকণ্ঠের মতই মনে হয়েছিল জীবনের আকস্মিক শেষ পর্বে এসে। তিনি চলে গেলেন না যাত্রাভঙ্গ করে আমাদের মধ্যেই রূপান্তর থেকে গেলেন, সেটা বুঝতে পারার সময় এখনও আসেনি।

সন্তোষদা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেবারে সন্তোষদার সঙ্গে গেছি জলপাইগুড়িতে। একটা সাহিত্যসভা উপলক্ষে। সন্তোষদার তখন পূর্ণ যৌবন, আমি ছেলে-ছোকরাদের দলে পড়ি। বড় বড় সাহিত্যসভায় আমার ডাক পাবার কথা নয়। সন্তোষদাই বোধহয় ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

উঠেছিলুম প্ল্যান্টার্স ক্লাবে। ইদানীং দেখেছি, ওই প্ল্যান্টার্স ক্লাবের একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা, তখন ঠিক এরকম ছিল না। তখনও চা-বাগানগুলিতে বাঙালিদের কিছুটা আধিপত্য ছিল।

প্ল্যান্টার্স ক্লাবের বাড়িটি বেশ পুরনো, মোটা মোটা দেয়াল। দোতলার অতিথি কক্ষগুলি প্রকাণ্ড। আমাদের দু'জনকে দেওয়া হয়েছে দুটি আলাদা ঘর।

সাহিত্যসভা তো নিমিত্ত মাত্র। আসল উদ্দেশ্য ভ্রমণ। সন্তোষদার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। উত্তর বাংলার প্রতিটি ছোটখাটো জায়গা, বিভিন্ন রাস্তা, সব তাঁর মুখস্থ। একটা জিপ নিয়ে প্রচুর ঘোরাঘুরি হল, মাঝে-মাঝেই কোনও ছিমছাম নিরিবিলি জায়গায় থামা এবং অনর্গল আড্ডা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি কিংবা শেকসপিয়ারের শব্দ ব্যবহার যে-কোনও বিষয়েই সন্তোষদা নতুন কিছু শোনাতে পারতেন।

বাংলা কবিতার কিছু একটা প্রসঙ্গে সন্তোষদার সঙ্গে আমার মতভেদ হল। তুমুল তর্কাতর্কির পর ঝগড়া। তারপর কথা বন্ধ। এ রকম প্রায়ই হত। অনেকেরই নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞতা আছে।

সাহিত্যসভা শেষ হবার পরেও অনেকে সঙ্গে এলেন। সন্তোষদার ঘরে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। আমার সঙ্গে তো বাক্যালাপ নেই, তাই আমি পাশের ঘরে। আমি শুনতে পাচ্ছি, সন্তোষদা অন্যদের কাছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, সুনীল? ওকে আমি ঘৃণা করি। ওর মুখও দেখতে চাই না আমি।

বেশ ভাল কথা। আমারও মুখ দেখাবার আগ্রহ নেই। আমি শুয়ে পড়লুম কম্বল চাপা দিয়ে। অন্যরা চলে গেল, তাও টের পেলুম।

আধঘণ্টা বাদে, চতুর্দিক নিঝুম রাত্রি মিশমিশ করছে, সেই সময় এক অনতি-দীর্ঘ পুরুষ এসে দাঁড়ালেন আমার ঘরের দরজার সামনে। ভাববাচ্যে বললেন, আমার ঘরে দুটি খাট আছে, সেখানেই দু'জন শোওয়া যেতে পারে।

আমিও ভাববাচ্যে বললুম, এখানেই যথেষ্ট আরামে আছি। অন্য কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

সন্তোষদা বললেন, আমার ঘুম আসছে না।

আমি বললুম, তাতে অন্য কারুর কিছু করার নেই।

সন্তোষদা বললেন, পুরনো বাড়ি, এক কালে সাহেবরা থাকত। এখানে ভূত আছে।

আমি হা-হা করে হেসে উঠলুম।

সন্তোষদা রাগে কিংবা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হ্যাঁ, ভূত আছে! আমি টের পেয়েছি। আমি একা ঘরে শুতে পারি না। তুমি আমার ঘরে আসবে কি না? এক্ষুনি উঠে এসো, আমার অর্ডার! কথাটা কানে যাচ্ছে না? আমার অর্ডার!

আমি হাসতে হাসতে উঠে বসলুম। একজন ভয়ার্ত মানুষের এমন ক্রুদ্ধ অর্ডার বোধহয় কেউ কখনো শোনেনি।

তারপর সারারাত প্রায় গল্পে গল্পে কেটে গেল!

এমন কত ঘটনা গল্প আর মানুষ সন্তোষদার কথা মনে পড়ে যায়।

সন্তোষদা আজ নেই, আমার জীবনে এ এক চরম অনুপস্থিতি। তবুও—অনুপস্থিতির মধ্যেও এমন তীব্র উপস্থিতি আর কার? দেখতে দেখতে সময় কেটে যাচ্ছে, তবু এখনও তিনি একটু মিলিয়ে যাননি। ঘুরেফিরে আসেন নানান কথাবার্তায়। স্মৃতিতে। ওঁকে ঘিরেই স্মৃতি। এক একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ে, সন্তোষদা সত্যিই নেই? দেশ পত্রিকায় দিনলিপির টুকরোগুলি যখন ছাপা হচ্ছিল, মনে হয় যেন ওঁর মুখের কথা শুনছি।

শেষের বছর খানেক কিংবা বছর দেড়েক ওঁর সঙ্গে দেখা হত খুব কম। তাতে কিছু যেত আসত না। কখনও আমার ওপর একটু বিরূপ হলে গম্ভীরভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন, আমি হাসতুম। কারণ, জানতুম, উনি আমার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখছেন। এরকম তো শুধু আমার একার সম্পর্কে নয়, হাজার জনের সম্পর্কে।

আমার অনেক কথা মনে পড়ে। বহু জায়গায় একসঙ্গে ভ্রমণ, সারারাত আড্ডা, ব্যক্তিগত আলোচনা। সেসব কিছু লেখার সময় এখন নয়। একটা জীবনেই সন্তোষদা অন্তত পাঁচটা জীবন যাপন করেছেন, অদ্ভুত অদম্য জীবনীশক্তি। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর উদ্দেশে তুড়ি মেরে গেলেন।

এই তো কয়েকদিন আগে বেথুয়াডহরি জঙ্গলে যাওয়ার একটা আমন্ত্রণ এল। সেবার ওখানে গিয়েছিলুম সন্তোষদার সঙ্গে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন টগবগ করে ফুটছিল। এবারে একা যাব?

ইচ্ছে হল না।

সন্তোষদা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

যাঁকে নিয়ে এই লেখা তিনি একাই ছিলেন একশো রকম। এমন বর্ণাঢ্য মানুষ খুব কমই দেখা যায়। ছটফটে, চঞ্চল, শিশুর মত রাগী, অসহিষ্ণু, কথাপ্রিয়। আবার এই মানুষই একদিন বাংলা গদ্যে খাত-বদলের কাজে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। প্রায় একা বাংলা সংবাদ পরিবেশনায় ঘটিয়েছিলেন বিপ্লব। এক একসময়ে যখন একা নিঃসঙ্গ বোধ করতেন তখন হৃদয় থেকে অবারিত উঠে আসত তাঁর নানা স্বীকারোক্তি, কাতরতা, ঈশ্বর-বুভুক্ষা। "কেন মদ খাই জানো?" একবার বলেছিলেন, "আসলে গরিব ঘরের ছেলে, হঠাৎ টাকার স্বাদ পেয়ে কী করব তা ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না।" এই যুক্তি কতদূর গ্রাহ্য তা কে জানে? তবে দেখেছি, প্রায়ই বউদির কাছে মদের গন্ধ চাপা দেওয়ার সৎ উদ্দেশ্যে গায়ে উৎকট গন্ধের ইউক্যালিপটাস তেল মেখে বাড়ি ফিরছেন।

স্ববিরোধ? হ্যাঁ, তা সন্তোষদার অনেক ছিল হয়তো। যে কোনও বলিষ্ঠ মানুষেরই থাকে। সন্তোষদার মধ্যে তা ছিল মাত্রায় আর একটু বেশি।

কাজে তিনি ছিলেন দৈত-সদৃশ। চেহারাটা ছোটখাটো। আত্মশাসন ছিল না, কিন্তু পাগলের মত দিনে আঠারো ঘণ্টা বিশ ঘণ্টা কাজ তাঁকে করতে দেখেছি।

কৈশোরে সাহিত্যের পাঠক হিসেবে তাঁর প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছি। যখন তাঁকে চোখে দেখলাম তখন অন্য আর এক আকর্ষণ যুক্ত হল। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। তারপর চিনলাম বউদিকে। সন্তোষদা প্রায়ই বউদির কথা বলতেন ইদানীং। বউদির মত এরকম শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষ আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।

সন্তোষদা চলে যাওয়ার মাত্র কয়েকমাস আগে তাঁর সঙ্গে রূপনারায়ণপুরের এক সভায় গিয়েছিলাম। সম্ভবত তাঁর জীবনে ওইটাই ছিল শেষ সাহিত্যসভা। একাই সারাক্ষণ জমিয়ে রেখেছিলেন আমাদের। সেই প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখেছি তাঁর মৃত্যুশয্যাতেও। তিলে তিলে মৃত্যু টেনে নিচ্ছে, কিন্তু তিনি হার মানছেন না। হাসছেন, যথাসাধ্য কথা বলছেন, চিঠি এবং গল্প লিখছেন। লিখছেন অসাধারণ ডায়েরি।

সন্তোষদার কাছ থেকে এখনও বহুদিন ধরে বহু কিছু শিখতে হবে।

আক্ষেপ থেকেই যাবে

দিব্যেন্দু পালিত

সন্তোষদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫৮ সালে। আকস্মিক পিতৃবিয়োগের পর সে-বছরই আমি পাকাপাকিভাবে চলে এসেছি কলকাতায়—প্রায় অনিশ্চিত এবং ভয়-ভাবনার দিনযাপন, চিনিও না বিশেষ কাউকে। দু-তিন বছর হল লেখালেখি শুরু করেছি সামান্য। লেখার সূত্রেই মাঝে-মাঝে যেতাম আনন্দবাজারে কিংবা আরও দু-একটি কাগজের দফতরে।

যতদূর মনে পড়ে, সন্তোষদাও সেই বছরই দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন আনন্দবাজারের নতুন দায়িত্ব নিয়ে। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তখনই বিখ্যাত, বিশেষত তরুণদের চোখে ; সাংবাদিক হিসেবেও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর ভূমিকা।

মনে আছে, একদিন আনন্দবাজারের বার্তা বিভাগে দেখা করতে গিয়েছিলাম শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শান্তিদা তাঁর পাশের টেবিলের নতুন এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'চেনো এঁকে?'

চেহারায় চেনা লাগছিল, তবু আড়ষ্ট বোধ করলাম। ভদ্রলোক ততক্ষণে সহাস্য তাকিয়েছেন আমার দিকে। শান্তিদা আলাপ করিয়ে দিলেন, 'সন্তোষ, এই ছেলেটির নাম দিব্যেন্দু—'

যাঁকে বলা হল তিনি তখন উদ্ভাসিত। প্রায় টেনে বসালেন সামনের চেয়ারে। তারপর শুরু হল অনর্গল কথা। চা খাওয়ালেন, এমনকি, অসঙ্কোচে সিগারেটও। সেজন্যে নয়। আমি অভিভূত বোধ করছিলাম অন্য কারণে। কিছুদিন আগেই রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল 'প্রতিনায়ক' নামে আমার একটি গল্প, সেই গল্পটির প্রশংসামিশ্রিত চুলচেরা বিচার শুরু করেছেন সন্তোষকুমার। দাঁতে চিবুনো দায়সারা স্তুতি নয় ; লেখাটি যে পড়েছেন তা বোঝা যায় তাঁর ঘটনা, বর্ণনা, সংলাপ ও ট্রিটমেন্টের উল্লেখ দেখে। তখনই মনে হয়েছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক হিসেবে এবং মানুষ হিসেবেও, এই ভদ্রলোক আলাদা—একেবারে আলাদা।

ঘটনাটির উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, সেদিন একজন অপরিচিত তরুণ লেখককে তার লেখালেখি বিষয়ে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত করে অনেকটা আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিলেন সন্তোষদা।

কিছুদিনের মধ্যেই খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন সন্তোষকুমার। এক ধরনের

প্রশ্রয়মিশ্রিত আকর্ষণ ছিল তাঁর আচরণে, টানতেন সব সময়। প্রায়ই যেতাম তাঁর পাইকপাড়ার বাড়িতে। পরে, যখন তিনি উঠে এলেন ভবানীপুরে, একই পাড়ায় থাকার জন্যে নিয়মিত হয়ে উঠল দেখাসাক্ষাৎ। আমি একা নয়। এখন বিখ্যাত, তখন অখ্যাত অনেক সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রকারের যাতায়াত ছিল তাঁর ফ্ল্যাটে।

অফুরান প্রাণশক্তি ছিল সন্তোষদার ; আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল সকলকে কাছে টেনে নেওয়ার—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার কিংবা অনর্গল কথা বলার। প্রয়োজনে তিরস্কার করারও। লক্ষ করেছি, মুড ব্যাপারটি ভীষণভাবে আক্রান্ত করত তাঁকে। ইংরিজিতে যাকে বলে ইমপালসিভ, তিনি ছিলেন তাই—মেঘে-রৌদ্রে মেশানো, কিন্তু অকপট, কখনোই দু'রকম নন। অনেকের ওপরেই রাগতেন, কিন্তু, কারও ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারতেন না।

চেনাশোনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁর ছিল অসীম কৌতূহল এবং আগ্রহ—এর মধ্যে ভান ছিল না কোনও। বিনা নোটিশে, তাঁর চেয়ে তুলনায় নগণ্য অনেকের বাড়িতে হঠাৎ-হঠাৎ চলে যেতে একটুও দ্বিধা বোধ করতেন না কখনো ; নির্দ্বিধায় বলতেন, আজ তোমার এখানে খাব। এরকম কয়েকবারই এসেছেন আমার বাড়িতে, তারপর গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছেন আর কারও বাড়িতে। আপাতদাম্ভিক মানুষটিকে এসব সময় সরল মনে হত খুব, কখনো বা মনে হত নিঃসঙ্গতা ব্যাপারটিকে ভয় পান খুব—কেউ তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে কিংবা অস্বীকৃত হচ্ছেন তিনি, এটা একেবারে সহ্য করতে পারেন না। এসব থেকেই গড়ে উঠত তাঁর অভিমান।

নিজেকে উজাড় করে দিতে পারার জন্যেই শুধু নয়, যার জন্যে যা পারতেন তা করতে কখনো ইতস্তত করেননি সন্তোষদা। তাঁর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা এইরকমই বলে। সত্যি বলতে, নিঃস্বার্থভাবে উপকার করার ঝোঁক সন্তোষদার যেমন ছিল, তেমনটি খুব কম জনের মধ্যেই দেখেছি। আমার বড়ো দুঃসময়ে ও দারিদ্র্যের দিনে যেভাবে তিনি বার বার সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন, আমার পক্ষে তা ভুলে যাওয়া অনুচিত হবে। তাঁর অন্যান্য সব গুণের কথা ভুলে গেলেও, আমার সমসাময়িক আরও অনেক লেখক ও সাংবাদিকই সন্তোষদার এই পরোপকারের গুণটির কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। তাঁদের অনেকেরই প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল তাঁরই হাতে।

সন্তোষদা কত বড় মাপের লেখক তা অনেকেই জানেন, যদিও তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়ন এখনও ঠিকঠাক হয়নি। হবে যে তাতে সন্দেহ নেই কোনও ; একক সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাতা এই লেখককে ভবিষ্যৎ এড়াতে পারবে না। তবে লেখক হিসেবে তিনি যেমন ছিলেন অন্য জাতের, তেমনি মানুষ হিসেবেও ছিলেন অন্য ধাতের। তাঁর লেখায় যে পরিশীলন, বৈদগ্ধ ও নাগরিকতা, তাঁর ব্যবহারে কিংবা চরিত্রে তা ছিল না। বস্তুত, অন্য অনেকের চেয়ে বেশি হীরকদ্যুতিসম্পন্ন হলেও তাঁর সংস্পর্শে এলে পাওয়া যেত খনিজের গন্ধ। পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেখেছি তাঁকে—গোড়ার দিকে খুব কাছে থেকে, পরে বেশ কিছুটা দূরত্ব থেকে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার এই ধারণাটা

পাল্টায়নি। একসময়, শুনেছি, তাঁর খামখেয়ালিপনা বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। আমার সৌভাগ্য, তাঁর সম্পর্কে এরকম ধারণা করার সুযোগ আমার কখনো ঘটেনি। বরং অবাক লাগত, যখন বহুদিনের অদর্শন ও যোগাযোগের অভাব সত্ত্বেও হঠাৎ টেলিফোনে বেজে উঠত তাঁর গলা—আমি সন্তোষদা বলছি। তুমি তো লাটসাহেব, আমার খোঁজখবর করো না। যাকগে, যে-জন্যে ফোন করছি—তোমার পুজোর উপন্যাসটা পড়লাম—, ইত্যাদি। তখন মনে হত, এই আন্তরিকতা, ঔদার্য এবং নিরহঙ্কারই মানুষকে বড় করে এবং আমার মত যারা ক্ষুদ্র, তাদের আরও ছোট করে দেয়। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে যে সন্তোষদাকে দেখেছিলাম, বম্বের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে বাকরুদ্ধ তাঁর সঙ্গে শেষ দেখার দিনেও দেখেছি সেই একই মানুষটিকে। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর দিনলিপিতে দেখেছি মৃত্যুর সম্ভাবনা তাঁকে কত সাহসী, সুন্দর ও ক্ষমাশীল করে তুলেছিল। এটা কি সকলের হয়? সম্ভবত হয় না। মনে হয় অনুরূপ বোধে উন্নীত হবার পটভূমি সন্তোষকুমার ঘোষ হয়ে জন্মালেই তৈরি হয়।

সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে অনেক কথা লেখা যায়, মানুষ সন্তোষদা সম্পর্কেও। কিন্তু, এই লেখাটি লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে দুই কাজের পক্ষেই আমি অনুপযুক্ত। এসব চেষ্টায় কিছু ব্যর্থতাবোধও থাকে। কেউ চলে গেলেই উচ্চারিত হয় আমাদের স্মৃতি—এটাই নিয়ম। যদি তা না হত, যদি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্মৃতি ও সম্পর্কের আলোয় আরও কিছু উপলব্ধি হত, তাহলে হয়তো যা দিতে পেরেছি তার চেয়ে কিছু বেশি দেওয়া যেত সন্তোষদাকে। আরও কিছু শ্রদ্ধা, আরও কিছু প্রীতি।

এই আক্ষেপ থেকেই যাবে।

এক কালো মোটরগাড়ির গল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

তখন থাকতাম ক্যান্টোফার লেন নামে এক গোলকধাঁধার মত এঁদোগলিতে। এক সকালে সেলুনে চুল কাটতে গেছি, হঠাৎ একটা কালো অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে থামল। তারপর গাড়ি থেকে লম্বা চওড়া শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক বেরুলেন। সেলুনের দরজায় উঁকি মেরে জিগ্যেস করলেন, এখানে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আছেন? বললাম, হ্যাঁ। কী ব্যাপার?

আপনি আসুন।

অবাক হয়ে বললাম, কোথায়?

ভদ্রলোক খপ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে গাড়িতে ঢোকালেন। বললেন, বেশি কথা বলার সময় নেই। সন্তোষবাবুর হুকুম যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় তুলে নিয়ে যেতে।

ততক্ষণে আমি ভীষণ হকচকিয়ে গেছি! এমন পেল্লাই এক মানুষ। আর মোটরগাড়ি। ওই সময়টাতে খবরের কাগজে প্রায়ই ডাকাতি আর খুনখারাপির খবর বেরুত এবং সে সবের সঙ্গে প্রায়ই কালো অ্যামবাসাডার গাড়ির রহস্যময় যোগাযোগ থাকত। তার ওপর তখন নকশাল আন্দোলনের সন্ত্রাসও চলছে।

প্রাণের আশা ছেড়ে দিলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, সন্তোষবাবু কে বলুন তো?

ভদ্রলোক মিটিমিটি হেসে বললেন, সন্তোষকুমার ঘোষ।

সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ?

হ্যাঁ। তিনিই।

আপনার নামটা জানতে পারি?

পরিমল চন্দ্র। আনন্দবাজার প্রচার দফতরে আছি।

তবু দ্বিধা এবং ভয়টা কাটল না। সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা সাহিত্যে যেমন, তেমনি সাংবাদিকতার জগতেও ডাকসাইটে মানুষ। কিংবদন্তীর নায়ক আমার কাছে। তাঁর সম্পর্কে ভালমন্দ বিস্তর গল্প শুনেছি। তিনি নাকি সম্রাটের মত পরাক্রান্ত এবং স্বেচ্ছাচারী। অষ্টপ্রহর হাতে মাথা কাটা অভ্যাস।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, আমাকে উনি কেন নিয়ে যেতে বলেছেন, জানেন কি চন্দ্রমশাই?

চন্দ্রমশাই বললেন, না।

আমি কি ওঁর কাছে কোনও অপরাধ করেছি?

চন্দ্রমশাই আরও ভয় জাগিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কী করেছেন আপনিই জানেন। খুঁজে দেখুন।

খুঁজছি তো পাচ্ছি না।

চন্দ্রমশাই গাড়ির গতি বাড়িয়ে বললেন, নিশ্চয় কিছু করেছেন। মুখোমুখি শুনবেন।

কিছুক্ষণ পরে ভবানীপুর এলাকায় বড় রাস্তার ধারে একটা দোতলা লম্বা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চন্দ্রমশাই আবার আমার হাত ধরলেন। তারপর টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে গেলেন। একটা সুন্দর সাজানো গোছানো বসার ঘরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমি মড়ার মত সিঁটিয়ে বসে রইলুম। পায়ের শব্দ শুনি আর বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

একটু পরে রাতের পোশাক পরা একজন অমায়িক অথচ তীক্ষ্ণ চেহারার মানুষ এসে আমার মুখোমুখি বসে পড়লেন। দরজার কাছ থেকে চন্দ্রমশাই ঘোষণা করলেন, আসামি হাজির। যা হয় করুন, আমি চললাম।

রাতের পোশাক পরা মানুষটি সুন্দর হাসছিলেন। বললেন, তুমি বলছি। রাগ কোরো না। সম্প্রতি 'ধ্বনি' পত্রিকায় তোমার একটা গল্প পড়ে মনে হল তুমি হয়তো তারাশঙ্করের দেশের ছেলে। তাই কি?

এতক্ষণে ভয় কেটে গেল। প্রণাম করতেও খেয়াল হল। সন্তোষকুমার মুহূর্তে বদলে গিয়ে বললেন, ওভাবে নত হবে না। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

আমি মুর্শিদাবাদের।

কোন অঞ্চল?

কান্দি।

সন্তোষকুমার বললেন, ঠিক তাই। তোমাদের অঞ্চল আর তারাশঙ্করের অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মানুষ একই রকম। জেলার সীমাটা কৃত্রিম। তুমি ভেবো না যে তোমাদের অঞ্চল আমার অজানা।

মানুষটি যে এত অকপট ; সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ, কল্পনাও করিনি। সারা মুর্শিদাবাদের ভূ-প্রকৃতি, মানুষজন, সংস্কৃতি, হিন্দু-মুসলিম প্রসঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে একনাগাড়ে বলে চললেন। অবাক হয়ে গেলাম। এমন পর্যবেক্ষণ এবং ভাবনাচিন্তা করেন এত সব বিষয়ে, এ আমার পক্ষে একটা অভিজ্ঞতা। সন্তোষকুমারকে জানতাম সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। আবিষ্কার করলাম তিনি একজন যথার্থ পণ্ডিত মানুষও।

সেদিনই তিনি হয়ে গেলেন আমার সন্তোষদা।

আর সেই যে মুখোমুখি পরিচয়, তা থেকে শুরু হল এক বিচিত্র বন্ধুত্ব। বড়র সঙ্গে ছোটর নাকি বন্ধুত্ব হয় না। হয়েছিল! সেই বন্ধুত্বের মধ্যে প্রীতি যত ছিল, তত ছিল গভীর স্নেহ। আমার দিক থেকে ছিল তেমনি শ্রদ্ধা। তবে শুধু আমি কেন, সব তরুণ

লেখকের ছিলেন তিনি পরম বান্ধব এবং স্নেহশীল অভিভাবক।

উনসত্তর-সত্তর সালে সেই সময় ছিলেন তিনি ভীষণ অস্থির এক মানুষ। প্রায় হুট করে চলে আসতেন। এঁদো গলির ভেতর তাঁর কালো গাড়িটি নিয়ে সমস্যায় পড়তেন। তবু চলে আসতেন। তারপর বেরিয়ে পড়তেন আমাকে নিয়ে। রাত অব্দি কতদূর ঘুরে আসতাম দু'জনে। কখনও বি. টি রোড। কখনও যশোর রোড ধ'রে কতদূর। মাঝে-মাঝে বোম্বে রোড ধরে কোলাঘাট আসি। বোম্বে রোডে আশি মাইল বেগে গাড়ি চালাতেন। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি দেখলে মিটিমিটি হেসে বলতেন—আমি অত্যন্ত দক্ষ ড্রাইভার। অন্তত আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হব না।

বড় খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন সন্তোষদা। বোম্বে রোডে যেতে যেতে হঠাৎ পাশের রাস্তায় ঢুকে যেতেন। তারপর হাওড়া জেলার ভেতর গ্রাম গ্রামান্তরে চক্কর দিতে দিতে অন্য রাস্তায় ফিরে আসতাম দু'জনে। কালো গাড়িটি হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের প্রতীক। ওই রকম গতিশীলতা ছিল তাঁর জীবনে।

এমন প্রচণ্ড প্রাণশক্তিও সচরাচর দেখা যায় না। তুমুল হইচই ; দাপাদাপি সারাক্ষণ এবং সব কিছু সাহিত্য নিয়ে। একবার শান্তিনিকেতনে রাত তিনটে অব্দি প্রচণ্ড সাহিত্য আলোচনা, হইহল্লার পর ভোর ছটায় দেখি দাড়ি কেটে একেবারে ফিটফাট। আবার তৈরি হয়ে গেছেন উদ্দীপনাময় একটি দিনের জন্য। এই ক্ষমতাটি ছিল ওঁর চরিত্রগত। কিছুতেই ক্লান্ত হতেন না।

ইদানীং সন্তোষদা ক্রমশ নিজেকে একা করে নিচ্ছিলেন। এত বছর ধরে দেখেছি সারাক্ষণ তাঁর চারপাশে নানা বয়সী মানুষ। তিনি একাই বক্তা এবং সবাই শ্রোতা। তারপর ক্রমশ কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যেন। একলা থাকতে চাইতেন। নিজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলেন হয়তো।

একদিন হঠাৎ শুনতে পেলাম, জল প্রতাপের মত ওই শক্তিমান মানুষটি বাকরুদ্ধ। এ যেন সারাদিনের উদ্দাম ছোটাছুটি ও খেলার পর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মায়ের কোলে শুয়ে পড়া ছেলেটির মত স্তব্ধ হয়ে যাওয়া।

তারপর তিনি চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন চিরনিদ্রায়। কিন্তু তাঁর সেই কালো রহস্যময় অ্যামবাসাডার দুর্ধর্ষ গতিতে এখনও আমার বুকের ভেতর ছুটে চলেছে। আমৃত্যু তার এই গতি বুকে নিয়ে থাকব।...

পরাজিত মৃত্যু

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ আধুনিক সাংবাদিকতার এক প্রবাদ পুরুষ। সাহিত্যিক হিসেবেও অনন্য, অসাধারণ। ছাত্রজীবনে সদ্য প্রকাশিত 'কিনু গোয়ালার গলি' পড়ে মুগ্ধ। সে একটা সময় গিয়েছে। আনন্দবাজার তখন প্রকাশনায়, অঙ্গসজ্জায়, সংবাদ পরিবেশনায় নিত্যনতুন চমক সৃষ্টি করে চলেছে। ভাষার কী ধার! শিরোনামে সে কী ধাক্কা!

এই সব কিছুর পেছনে ছিলেন আবেগময়, প্রাণময়, সন্তোষকুমার ঘোষ। সাহিত্যে, সাংবাদিকতায় তাঁর দানের তুলনা ছিল না। একটা ইতিহাস তৈরি করে রেখে গেলেন।

মানুষ হিসেবে ছিলেন বৈচিত্র্যময়।

ক্রোধ ও আবেগময়তার আবরণে নিজেকে রহস্যময় করে রাখতেন। সাহস ভরে কাছে এগোতে পারলে প্রতিভার ছোঁয়া পাওয়া যেত। পাণ্ডিত্যের তুলনা ছিল না। কত রকমের পড়াশোনা। কী অসাধারণ স্মৃতি! সমস্ত পত্র-পত্রিকা বড়-ছোট ম্যাগাজিন সবই পড়তেন। কোনও লেখা ভাল লাগলে, হয় চিঠিতে না হয় ফোনে লেখককে জানিয়ে দিতেন। বড়, ছোটর বাছবিচার ছিল না। প্যারার পর প্যারা আউড়ে যেতেন। এমন একজন মানুষ সহজে পাওয়া যাবে না।

আর যদি বলি জীবনসাধক তাহলে মনে হয় কম বলা হল। তিনি ছিলেন তারও বড়। রবীন্দ্র অনুরাগী। তাঁর মন্ত্র জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। সেই মন্ত্রের সাধক ছিলেন—সন্তোষকুমার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—রোগ জানুক আর দেহ জানুক, মন তুমি আনন্দে থেকো। রোগশয্যায় সন্তোষকুমার অম্লান, অপরাজিত। মৃত্যু পরাভূত হয়ে ফিরে গেল।

মৃত্যুকে যিনি ফুৎকারে ম্লান করে দিতে পারেন তিনি অমর।

সন্তোষকুমার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

১.

বিপদ যেমন মনের কোণে উঁকি দেয়—একটা বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর Sense of futility সবসময় ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তখন মনে হবে—যা-ই করি না কেন—পরিণামে তো সে-ই ওয়ে অফ অল দ্য ফ্লেশ?

তখন নিউজপ্রিন্টের গল্প, নতুন লেখা গল্পের প্রতিক্রিয়া, পুরস্কার অথবা রচনাবলী সবই ফিউটাইল লাগে। এ ব্যাপারটা আমাদের বাবারা ভুলে থাকতেন অনেক সন্তানের জনক হয়ে—অনেক ঝাল দিয়ে রান্না মাংস খেয়ে আর ঝগড়া করে, ধার করে—যাত্রা দেখে।

সন্তোষকুমার ঘোষ অন্য কয়েকটি রাস্তা এজন্যে আবিষ্কার করেন। তিনি এজন্যে খবরের কাগজে নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে একটি পতনোন্মুখ দৈনিককে চাঙ্গা করে তাকে দৌড়ে একনম্বর ঘোড়া করে তোলেন। সহকর্মীদের শরীরে উৎসাহের ইঞ্জেকশন দেন। কাজ ভাল হলে প্রশস্তি। খারাপ হলে প্রায় মৃত্যুদণ্ড। কাউকে কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়তে দেবেন না বলেই বাংলা ব্যাকরণ, প্রবাদ থেকে নতুন অর্থদান, রাস্তাঘাটের নখদর্পণী নিয়ে নিজেকে এবং সবাইকে ব্যস্ত রাখতেন।

অন্যের লেখা তো পড়তেনই। পড়ে তাকে গিয়ে বলেও আসতেন। আবার বিয়ের পাত্রী দেখে এলেন নিজে থেকেই। কাননের বিয়েতে সাক্ষী হবেন ঠিক হল। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে গিয়ে আমি রাস্তার দুই অপরিচিত লোককে দিয়ে সাক্ষী সেরে ফেলি। জানতে পেরে কী গালাগালি আমায়।

আমি ক্ষেপে গিয়ে রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। পরদিন সকালে কাননের সঙ্গে দেখি অফিসের একখানা চিঠি। খাম খুলে অবাক। গতকাল বিকেলে আমি রিজাইন দেবার পর আমায় প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে।

এই হলেন সন্তোষদা। অক্টোবরে ওঁকে একখানা নতুন উপন্যাস উৎসর্গ করেছি। প্রায় ছ'মাস পরে পড়ে দোলের সকালবেলা হাতরিকশায় চড়ে আমার বাড়ি এসে হাজির। সারা গায়ে রং। সেই অবস্থায় আমার লেখার প্রশস্তি।

খবরের হেডিং করা থেকে ভালবাসা, প্রশংসা করা থেকে গালাগালি করা, ইটপাটকেল বর্ষিত অফিসের ভেতরে বসে ঠাণ্ডা মাথায় পনেরো দিনের কাগজ প্ল্যান

করা—এসবই তো আমরা সন্তোষদাকে দেখে শেখার চেষ্টা করেছি।

সত্যজিৎ রায়ের দেবী, সমরেশ বসুর বিবর নিয়ে কোমর বেঁধে চিঠি লিখে গেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠতে ওঁর দেরি হয়নি কোনওদিন।

ওঁর ভালবাসায় ছিল কষ। ডিপ টিউবয়েলের জলে যেমন আয়রন বেশি থাকে। কাপড় কাচলে ফেনা কম। চান করলে মাথার চুল উঠে যায়। বালতিতে রাখলে দাগ পড়ে। এসব পার হয়ে ওঁকে ভালবাসতে পারলে বোঝা যেত—সন্তোষদা চাইতেন—আমরা যেন সবাই ওঁর মনোমত হই। আমরা মনোমত হতে পারছি না বলেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছিল ওঁর পছন্দ।

রাত আড়াইটেয় আমারই কাঁধে ভর দিয়ে অফিসের তেতলায় উঠেছেন। পায়ে ব্যান্ডেজ। আমাকেই গালাগালি দিতে দিতে। আবার দিনদুপুরে সন্তোষদা সিরাজকে নিয়ে আমার পুকুরে নামলেন। সাবান মেখে চান করবেন। বার বার তলিয়ে যাচ্ছেন। আমি ডুব দিয়ে খুঁজে আনছি। আমার হাতের ভেতর সাবান মাখানো সন্তোষকুমার ঘোষ বারবার পিছলে তলিয়ে যাচ্ছেন।

ভাদ্র মাসের দুপুরে নতুন গাড়ি চালাতে গিয়ে কলকাতার বাইরে আমার বাড়িতে এসে হাজির। দূর থেকে দেখেছি—একটা মাতাল অ্যামবাসাডার খালপাড়ের ওপর দিয়ে টলতে টলতে আসছে। যে কোনও সময় গাড়িটা খালে পড়ে যেতে পারে। সন্তোষদা দরজা খুলে রাখলেন। গাড়ির সিটে আমার জন্য এককাঁদি ডাব। কয়েকদিন হল আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। গায়ের বিদেশি গেঞ্জিটা আমাকে খুলে দিয়ে খালি গায়ে গাড়ি চালিয়ে কলকাতা ফিরে গেলেন।

আমাদের সামনে ওঁর দাঁত পড়ল। চুলে পাক ধরল। চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট পেরিয়ে গেলেন। ওঁর নতুন ছবি দেখলাম। রবীন্দ্রসঙ্গীত। গল্প লিখছেন একসময়—যা কিনা আজও বিস্ময়—আশ্চর্য। আমার দুই জামাই নতুন কালের কবি। ওঁরা যখন সন্তোষদার 'জল দাও' উপন্যাসের উচ্ছ্বসিত সশ্রদ্ধ প্রশংসা করে—তখন মনে মনে বলি—ভুল করিনি—ভুল করিনি—সন্তোষদাকে বুঝতে আমাদের ভুল হয়নি। মনে হয়—বুঝিবা 'জল দাও' আমি কিংবা গৌরদা কিংবা মতি বা সুনীলই লিখেছি।

প্রায় পনেরো বছর আগে সন্তোষদা আমাদের কয়েকজনের গল্প সংগ্রহের ভূমিকা লিখেছিলেন। আজও দেখছি আমার সম্পর্কে তাঁর কথাগুলো অভ্রান্ত।

অফিসের মনান্তর ওঁকে কখনো ছুঁতে পারেনি। আমি তখন অন্য অফিসে। বর্ষাকাল, সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ আমার টেবিলের সামনে দেখি সন্তোষদা দাঁড়িয়ে। নিজের একটা গল্প সংগ্রহ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—এটা তোদের ওখানে রিভিউ করে দিবি। উনি কদাচিৎ 'তুই' বলতেন। খুব ভালবাসলে 'তুই' কথাটা বেরিয়ে আসত। আমি তো অস্থির। কী করে যেন বুঝতে পেরেছিলেন—আমি ওই সময় বাড়ি আছি। তাই রাস্তা থেকে সিধে আমার ঘরে।

অফিসে যখন তালগোল অবস্থা যাচ্ছে—তখন একদিন বাড়িতে এসে ইতিকে

বললেন—জিরে দিয়ে মাংস রাঁধো। তোমার হাতে ওটা খুব ভাল হয়।

আমি হয়তো ঠিক করলাম খুব ভালবাসব সন্তোষদাকে। কিন্তু অবস্থা বিপাকে ভণ্ডুল হয়ে যেত। দোলনের বিয়ের দিন আমারই সবার আগে গিয়ে রিসেপশনে দাঁড়াবার কথা। আমি পূর্ণেন্দুর সঙ্গে সারাদিন মেলামিশির পর আনন্দ পাবলিশার্সের বাথরুমে গিয়ে আটকা পড়লাম। সেদিন ছিল শনিবার। দারোয়ান তালাবন্ধ করে চলে গেছে। খুলবে সেই সোমবার। বেশি রাতে পুরনো বাড়ির পাইপ বেয়ে নামতে গিয়ে শার্ট ছিঁড়ে গেল। তখন কলকাতার বাইরে থাকি। ইতি বিয়েতে আসবে বলে সেজে বসেছিল। আমি ছেঁড়া শার্ট—ছড়ে যাওয়া গা হাত পা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সন্তোষদা চটল। ইতি চটল।

১৯৫৮ থেকে ১৯৭৬—প্রায় ১৯ বছর খুব কাছাকাছি—আর তারপরেও প্রায় ৭ বছর কিছু শিথিল যোগাযোগের ভেতর দিয়ে সন্তোষদাকে যতবারই দেখেছি বিস্মিত হয়েছি। ১৯৫৮-র আগে তাঁকে ছাপার হরফে লেখক হিসেবে জেনেছি। সব মিলিয়ে তাঁকে মনে হয়েছে—জীবনের সঙ্গে তিনি রক্তমাংসে মুড়ে রয়েছেন। সব সময় টগবগ করে ফুটছেন। একদম জিন পরানো।

তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা অপমান, নিন্দা প্রশংসা সবই পেয়েছি। তবে ভালবাসা, প্রশংসাই বেশি।

আমরাও তাঁকে তাঁর যথার্থ পাওনা সব সময় দিতে পারিনি। হয় কম দিয়েছি। নয় বেশি দিয়েছি। ঠিক-ঠিক দিইনি। সে নিন্দা-প্রশংসা দুই বেলাতেই।

২.

সন্তোষকুমার ঘোষকে প্রায় দেখি ছবিতে। মহাবীরোজ্যোতি প্রকাশন থেকে তাঁর একখানি গল্পগ্রন্থ বেরয়। মলাটে সন্তোষকুমারের মুখের ছবি ছিল। সম্ভবত তিন-চার বন্ধুর নামের মুখটুকু নিয়ে মহাবীরোজ্যোতি—যাদের ভেতর একজনকে চিনতাম--বীরেশ্বর সরকার--যিনি এম সি সরকারদের বাড়ির ছেলে--পরে সিনেমার গান লিখে সুর দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন—বোধহয় সিনেমাও তুলতেন। এসব অন্তত ৪৫/৪৬ বছর আগের কথা।

সেই ছবিতে সন্তোষকুমারের নাকের নীচে পুরু সরু করে গোঁফ আঁকা। বড় বড় চোখ। মুখখানি তৃপ্ত। মাথায় কালো চুল। ঠোঁটে চাপা হাসি। এই গোঁফ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেতর যাঁরা যুবক হয়ে ওঠেন তাঁদের অনেকেই রাখতেন। ঠিক আমাদের চেয়ে দশ-বারো বছর আগেরকার যুবকের দল।

ওঁর লেখার কথা আমরা শুনতে পাই কিন্তু তারও বেশ আগে। উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সন থেকেই সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকি। পরে ফিরে তাকিয়ে বুঝেছি—ওই সময়টায় সন্তোষকুমারের বয়স ছিল ২৯/৩০। আমাদের ছিল ১৭/১৮/১৯।

তখন পড়া সন্তোষকুমারের লেখার নাম আজ মনে নেই। কিন্তু এটুকু মনে আছে—আমি তো বটেই—আমাদের ভেতর যারা গল্প, উপন্যাস পড়তাম—লেখার কথা ভাবতাম—তারা সবাই সন্তোষকুমারের লেখায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতাম—তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে লেখক ভাবতাম। তখন অব্দি উপন্যাস বলতে শুধুই কিনু গোয়ালার গলি বেরিয়েছে। এই উপন্যাসটি নিয়ে আমরা নিজেদের ভেতর একসময় তর্ক করেছি—বুঁদ হয়ে আলোচনা করেছি। পরে, অনেক পরে তিনি চারু অ্যাভিনিউ দিয়ে টালিগঞ্জ রোড ক্রস করে নিউ আলিপুর থেকে, ঠিক আদি গঙ্গা পার হওয়ার রাস্তায় একটি বাড়ি দেখিয়ে বলেছিলেন, এখানেই কিনু গোয়ালার গলির বীজ মাথায় এসেছিল।

মাঝে মাঝে শুনতাম—সন্তোষকুমার দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করেন—এই তো সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন। ওঁর বন্ধুমহলের ভেতর পড়ি না। দেখা হওয়ার কথা নয়। আলাপ হওয়ার কথা তো দূর। কিন্তু শারদীয় সংখ্যায় ওঁর লেখা গল্প পড়ি আর গুম হয়ে থাকি। কী করে এমন লেখেন তাই ভাবি। ভাষায় বিশিষ্ট। দেখায় বিশিষ্ট। কোনওদিনই গালগল্প তিনি লিখতে বসেননি। বরং জীবনকে দেখার একটি দার্শনিক সত্যের দিকে তিনি সব সময় যাত্রা করতেন। পড়ে আমার মনের ভেতরকার গল্প লেখার জায়গাটা—মনে হত—কাল রাতে ঘুমোবার পর কে এসে খুঁড়ে রেখে গেছে। এবার বীজ ফেললেই চারা বেরুবে। ওঁর লেখা এতটাই উসকে দিত আমাকে।

তখন বিশেষ করে পড়েছি সন্তোষকুমার। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এর আগে পড়েছি তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়ে যাচ্ছি। পড়ছি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, মনোজ বসু। সন্তোষকুমারদের কয়েক বছর পরে পড়লাম—সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর। এঁরা সবাই কোনও না কোনও ভাবে আমাদের মনোভূমিতে মাটি দিয়েছেন। কিন্তু সন্তোষকুমারকে যখন পড়তাম বারবার মনে হত—এইসব অবস্থার ভেতর দিয়ে তো যাই—কিন্তু আমি তো লিখতে পারি না। দুর্ভাগ্য, হাতের কাছে ওঁর গল্পগ্রন্থ নেই। তাহলে গল্পগুলোকে নাম দিয়ে বলতে পারতাম। তা পারছি না। কিন্তু সেই বোধের স্মৃতি আজও আমার আছে। সাহিত্যে কেউ কারো মত নয়। যে যার মত। তবু এক একজন তাঁর লেখা দিয়ে আমাদের এক এক বয়সে মনের ভেতরকার মাটি কুপিয়ে দিয়ে গেছেন। সন্তোষকুমার সেই কাজটি করেছিলেন। বিশেষ করে আমরা যারা ১৯৫১-৫২ সন থেকে ১৯৫৯-৬০ অব্দি জুড়ে যুবক হচ্ছিলাম—তাদের বেলায়—যাদের স্মৃতির পেটিতে ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধভরা বালক বয়স, কৈশোর জুড়ে দেশ ভাগ—যার পরিণাম যৌবন জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেও তো প্রায় উনচল্লিশ বছর। হরিশ চ্যাটার্জি রোডে প্রেমেন্দ্র মিত্রর বাড়ি গেছি। আমার একটি গল্প ভাল লাগায় তিনি কাকে দিয়ে খবর দিয়েছিলেন। যেতে সংকোচ ছিল। খবর পাওয়ার অনেক পরে গেছি। একতলায় উঠোনের গায়ের ঘরটিতে দেখি একজন ঝকঝকে মানুষ বসে। ধুতি পাঞ্জাবি। চনমনে হাসিহাসি। এর আগে প্রেমেন্দ্র

মিত্রকে দেখেছি। পড়েছি। আমার নাম বলতে তিনি সেই ঝকঝকে মানুষটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সন্তোষকুমার ঘোষ। তখন কী জানতাম এই মানুষটির সঙ্গে আমার জীবন, জীবিকা, লেখালেখি জড়িয়ে যাবে! তখন কী জানি—ওঁকে ভালবাসব, ওঁর ওপর রাগ হবে, ঝগড়া করব, আবার ভাব হবে, ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাব! তখনও জানি না—সন্তোষকুমার আমাকে ভালবাসবেন, ঝগড়া করবেন, অপমান করবেন, দোষ স্বীকার করতে লজ্জা পাবেন! আবারও ভালবাসবেন, একদিন এমন সময় আসবে যখন দু'জন দু'জনের কোনও মানে করতে পারব না—কোনও থই পাব না।

সে বড় সুখের সময়। সে বড় দুঃখের সময়। আমার পঁচিশ প্লাস। ওঁর সাঁইত্রিশ প্লাস। আমায় বললেন, আপনি কোথাও কাজ করছেন?

বললাম, কয়েকদিন হল আনন্দবাজারে কাজ করছি।

আমিও তো দিল্লি অফিস থেকে বদলি হয়ে এলাম আনন্দবাজারে কাজ করব বলে—দেখা হবে অফিসে।

দেখা হয়ে গেল অল্পদিনের ভেতর। তখনও আনন্দবাজারে বার্তা বিভাগে এমন অনেকেই কাজ করতেন—যাঁরা পরাধীন আমলে কেউ কেউ জেলও খেটেছেন—সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, গান্ধীজির খুব কাছে গেছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে মোটে বছর দশেক। খুব কম মানুষই সময়ের পরিবর্তন সহজভাবে মেনে নিতে পারেন। আনন্দবাজারেও আশু পরিবর্তন সেদিন জরুরি ছিল। দেশভাগ, উদ্বাস্তু শিবির, কংগ্রেস ছাড়াও অন্য সব রাজনৈতিক দলের উঠে আসা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, ছবি আঁকার জগতে যেমন অনেক কিছু ঘটছিল—তেমনই বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র—নানান দিকে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছিল। আমি তখন সামান্য কাজে ডুবেছিলাম। সন্তোষকুমার ঘোষ নামে বাংলা ভাষার গল্পলেখক একজন লেখককে এই সময় বদলের ঢল আনন্দবাজারের পাতায় নামিয়ে আনার জন্য দিল্লি থেকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। ইচ্ছে করলেই এই ঢল নামানো যায় না। এটা একটা বড় রকমের ঝুঁকি। পরীক্ষা।

আমি আজও তখনকার সন্তোষকুমারকে দেখতে পাই। ধুতি, পাঞ্জাবি, পায়ে কাবলি। খুব চেষ্টা করছেন। নিজের গল্প লেখার সময় পাচ্ছেন না উদয়াস্ত। বেলা দশটায় অফিসে চলে আসতেন। যদি কাগজটা বদলায়। একদিকে তাঁকে তখন আগেকার সাংবাদিকতায় অভ্যস্ত প্রবীণ সহকর্মীদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে—আবার অন্যদিকে তিনি যেভাবে সাংবাদিকতার ছবিটি মনে মনে গড়ে তুলছেন—সেরকম সহকর্মী তাঁকে আনকোরা অনভিজ্ঞ কর্মীদের ভেতর থেকে বানিয়ে নিতে হচ্ছে। কতদিন তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি রাত আড়াইটায়।

দেশের রাজনীতি তখন খুব কুচুটে হয়ে উঠেছে। আনন্দবাজারে গল্প লিখলে তা দেখতে শিয়াখালা যেতে হত। কলকাতায় তাকে তখন দেখা যেত না।

এই সময় সন্তোষকুমার রাস্তা খুঁজছেন। দশটা ঢিল ছোঁড়েন তো দু'টো ঠিক জায়গায়

লাগে। ওঁর তখনকার চেহারার কথা আমি বলতে চাই। চওড়া কাঁধ। ধুতি পাঞ্জাবি। লম্বা ছিলেন না। নাকের নীচে মোটা গোঁফ। পেছনে তাঁর নেশন, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, স্টেটসম্যানে কাজ করার অভিজ্ঞতা। ধুতির কোচা লুটোচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে এলেন। নিজেই নিউজে বসে কপি স্পাইক করতে বসলেন। আধঘণ্টার ভেতর টেবিল থেকে টেলিপ্রিন্টারের জমা কপি বেছে বেছে বাকিটা ফেলে দিলেন। আমাদের লেখা কপি একটু আধটু বদলে দিয়ে একদম অন্যরকম করে দিলেন। হেডিং কেটে ছোট আর ধারালো করে তুললেন। সে সময় একটি কথা তিনি একদিন বলেছিলেন—যা আমি আজও ভুলিনি। কোনও পরিচিত প্রবাদকে সামান্য ভেঙে তাকে নতুন এক অর্থ দেওয়া। এ কাজ তিনি হামেশাই করতেন। লক্ষ করেছি—এরকম করলে সামান্য একটি হেডিং সারাদিন পাঠকের মনে বিঁধে থাকত।

সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগের বাঁধানো প্রবাসীতে পড়েছিলাম—কৃষ্ণকুমার মিত্র মারা গেলে রবীন্দ্রনাথ বড় করে লিখেছিলেন—কৃষ্ণকুমার কত বড় সাংবাদিক ছিলেন। কৃষ্ণকুমারের সময়কাল আমরা জানি না। ১৯৫৮ থেকে প্রায় ১৯৭৬ অব্দি আমি সন্তোষকুমারের কনিষ্ঠ সাংবাদিক সহকর্মী ছিলাম। আজও আমি তাঁর অনুজ গল্পলেখক। সবার উপরে আমি তাঁর একজন অনুজ সমসাময়িক মানুষও বটে। সন্তোষকুমারকে আমি সাংবাদিক, লেখক তো বটেই—মাথার ওপরে একজন দিশারি স্নেহময় মানুষ হিসাবেও পেয়েছি।

এই প্রাণচঞ্চল, গভীর মেধার পথে হেঁটে চলা মানুষটি আমাদের বারবার বিস্মিত করেছে। স্নেহময় মানুষ হিসাবে তাঁর কাছ থেকে গভীর ভালবাসা পেয়েছি। আবার রূঢ় অপমানও তিনি করেছেন। কখনো কখনো মনে হয়েছে—এমন কেন? এ কি তাঁর ভেসে বেড়ানো ছেলেবেলা কিংবা অনিশ্চিত যৌবনযাপনের পরিণাম—যেখানে নিরাপত্তার অভাব ছিল? সম্পর্কগুলো ছিল না যথেষ্ট মজবুত?

বহু ব্যাপারে তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী—অনুসন্ধানী। সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলো, দেশের ইতিহাস, জাতীয়তাবাদ, মানবসম্পর্ক—সব কিছুতেই তিনি ডুব দিতে পারতেন। গভীরে চলে যেতেন। মননে ছিলেন ক্ষিপ্র। কিন্তু লক্ষ করেছি তাঁর মনোভূমি ছিল বিক্ষিপ্ত—অস্থির। এসব সত্ত্বেও আমি বলব এমন আশ্চর্য মানুষ কমই দেখেছি। সময়ের দূরত্বে বসে এমন একজন মানুষের মৃত্যুর বারো বছর পরে তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখে তাঁর চুলচেরা বিচার করার চেয়ে তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি সেজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করা—তাঁকে ভালবাসা—তাঁর ভালবাসার কথা মনে করা আমার কাছে অনেক শ্রেয়।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পেছনে তাকিয়ে এখন বুঝতে পারি—শুধুই আনন্দবাজারে কিছু কৃতী সাংবাদিক তৈরি করা নয়—তাঁর সমসাময়িকদের ভেতরে যেমন—তেমনই আমাদের মত অনুজদের ভেতর থেকেও তিনি লেখক হয়ে ওঠার মত কয়েকজনকে বেছে নিয়েছিলেন। লেখার সঙ্গে তিনি জাগিয়ে দিতেন আমাদের লেখা পড়ে—সে লেখা বিচার

করে—তার প্রশংসা করে—তার সমালোচনা করে। এজন্যে তাঁকে কোনও চেষ্টা করতে হত না। তাঁর স্বভাবের ভেতরেই এটা ছিল। কারও একটি লেখা ভাল লাগলে তিনি সে লেখার চারগুণ তারিফ করতেন। এক দোলের সকালে দেখি সারা গায়ে রং মেখে হাতে টানা রিকশায় চড়ে আমার বাড়ি চলে এসেছেন। ১৯৬২-র অক্টোবর মাসে তাঁকে আমার যে বই দিয়েছি—১৯৬৩-র মার্চে একরাতে বইটি পড়ে ফেলে সকালবেলা দোলের রং ভ্রূক্ষেপ না করে নানা রঙের সন্তোষকুমার এসে হাজির। এটা শুধু আমার বেলায় নয়, এটা শুধু আমাদের বেলায় নয়, আমাদের চেয়ে যারা ১০/১২ বছরের ছোট ছিলেন—তাঁদের বেলাতেও এমনটি ঘটেছে। অনেকবার।

শুধু কি লেখার মানুষ? গানের জগৎ। কতদিন ওঁর সঙ্গে কত গায়ক-গায়িকার কাছে গেছি। ওঁর উপস্থিতি বুঝিয়ে দিত সঙ্গীতের ভেতরকার কথাটিতে ওঁর সমঝদারি। বাণীর মর্ম। গায়কীর বিশেষত্ব। মনে আছে—একদিন সন্ধ্যায়—তখন ইডেনে আকাশবাণীর বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। সে সময় লাইভ ব্রডকাস্ট হত। এই বর্ষা আসছে। যাচ্ছে। দু'খানি গান গেয়ে কণিকা এসে আমাদের সঙ্গে ইডেনের ভিজে মাঠে বসলেন। একটু আগে ওঁর গান আকাশবাণীর বসবার ঘরে বসে সন্তোষকুমারের সঙ্গে শুনেছি। এখন কণিকাকে সেই শোনার কথা বললেন তিনি। গান যেমন ভাল লেগেছিল তেমনই লেগেছিল সন্তোষকুমারের বলা কথাগুলো। গান ছিল ওঁর আরেক জীবন। প্যাশন। ফাঁক দিয়ে আবার গান ছিল কণিকার। যে-গানটি গাইবেন সেটি তিনি আমাদের খালি গলায় আগাম শোনালেন।

আমাদের সামাজিক জীবনে—পারিবারিক জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে--পরিচিতির পরিধি বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছবিটা বড় হয়ে ওঠে। লোকে যেভাবে আমাদের দেখতে অভ্যস্ত—বাড়ির সবাই, পাঠকরা, অফিসের সহকর্মীরা, যেভাবে আমাদের দেখতে অভ্যস্ত--নিজের সেই ছবির সমান সমান থাকার জনে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। আমাদের জীবনটাই যেন এই তাল রাখতে গিয়ে—নিজের নিজের ছবির উপযুক্ত করে তুলতে গিয়ে আমরা মরে যায়। সন্তোষকুমার মাঝে-মধ্যে এই দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে তাঁর স্বরূপে বেরিয়ে পড়তেন। তখন জীবন জগৎ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতেন। তাঁরও একটা খোলাখুলি ভালবাসার জগৎ ছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হিসাবে তিনি মধ্যবয়সের নতুন ভালবাসায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেননি। পারেননি মানবিক কারণেই। তিনি যে কয়েকজন নতুন মানুষকে পৃথিবীতে এনে ফেলেছেন। মধ্যবয়সে পৌঁছে একই দশায় নিজেকে ফেলে আমি সেদিনকার সন্তোষকুমারকে বুঝতে পারি। সেদিন স্বীকারোক্তির মত নিজের কথা নিজেকে শোনাতে গিয়ে আমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছিলেন। কুশীলব সবাইকে জানি। সবার গণ্ডি জানি। পরিচয় আমিই তো করিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ বলা যায় সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি সাহিত্য চেয়েছিলেন। পুরনোরা ব্যাপারটা ঠাট্টা করতেন। নতুনরা সাবধানে পা ফেলতাম। এত লোকের রুজি-রোজগার নিয়ে

একজন ৩৭ বছর বয়স্ক লোক কোনও ভুল করছেন না তো? সন্তোষকুমারের সেদিনকার সব আয়োজন—চেষ্টা বিফলে যায়নি। বরং বলা যায় তাঁর অনেক কিছুই এখন সাংবাদিকতায় চলে এসেছে। কোনও কোনও দিন তো সকালবেলা কাগজ পড়ে মনে হয় তিনজন সন্তোষকুমার এখনও কাজ করছেন। একজন আনন্দবাজারে। অন্যজন বর্তমানে। আরেকজন আজকালে। আমার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু আজকের চার চারজন বিশিষ্ট বাঙালি লেখককে তাদের যৌবনকালে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। সুনীল, মতি, সিরাজ, শীর্ষেন্দুর কথা বলছি। তাঁর তো ভুল হয়নি। এরা তো খারাপ লেখেনি। ওরা বন্ধু বলে আর চন্দ্রবিন্দু দিলাম না।

শীতকালে কখনো সখনো সুট পরতেন। নয়তো বেশির ভাগ দিনেই ধুতি পাঞ্জাবি। ফার্স্ট আওয়ারে সুবিন্যস্ত। সন্ধ্যায় অবিন্যস্ত। তবুও ভাল লাগত। শীতকালে গরম শাল নয়তো পাঞ্জাবির ওপর জহর কোট। কথাটা পোশাকের নয়। কথাটা হল তাঁর হাসিহাসি আনন্দময় উপস্থিতি নিয়ে। শুধুই তাই নয়। নিজের ভেতরকার জিজ্ঞাসাটা তিনি এমন করেই তুলে ধরতেন—যা কিনা অন্যেরও জিজ্ঞাসা হয়ে পড়ত। তখন আর পোশাকের সন্তোষকুমার নয়—জিজ্ঞাসার সন্তোষকুমারের দৃষ্টিই মনে বিঁধে থাকত। সেদিন এসব জিজ্ঞাসা ছিল সাহিত্য নিয়ে, জীবন নিয়ে, মানবসম্পর্ক নিয়ে।

তাঁর পরে তো আর একটি লোক পেলাম না—যিনি নিজেই বলেন, কাকে বিয়ে করছ শ্যামল?—চলো তো দেখে আসি—।

সন্ধেবেলায় সালকিয়ার বাসাবাড়িতে চারদিককার কয়লার উনুনের দমবন্ধ ধোঁয়া। তার ভেতর মাদুর পেতে ক্রাম্পড হয়ে বসে শ্যামলের স্থির করে ফেলা কনে দেখা। কথা ছিল সন্তোষদা আমার বিয়েতে সাক্ষী দেবেন। কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি। তাড়া ছিল। রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে শুনে খুব চটলেন। ঝগড়া করলেন। আমি রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। মন খারাপ। পরদিন খবরের কাগজের সঙ্গে একটি মুখবন্ধ পেলাম। অফিস থেকে কাগজের সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছে। খুলে দেখি—আমার পদোন্নতি হয়েছে। এই ছিলেন সন্তোষদা।

শ্যামল কলকাতার বাইরে এক খালপাড়ে কোম্পানি বাঁধের গায়ে বাড়ি করেছে। নতুন গাড়ি কিনেছেন সন্তোষকুমার। নতুন চালাতে শিখেছেন। ডিকিতে এককাঁদি ডাব নিয়ে দুপুরে রোদে শ্যামলের বাড়ি আসছেন। শ্যামল দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটি যদি এক হাত ডাইনে যায় তো গড়িয়ে দশ ফুট নীচে খালে গিয়ে পড়বে। গাড়িটা ডাইনে বাঁয়ে টলতে টলতে আসছে। বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে সন্তোষকুমার নামলেন। নিজেই চালাচ্ছিলেন। দুপুর রোদ। চড়া গরম। ঘেমে গেছেন। বেশ খানিকটা খেয়েছেন। একমুখ হাসি। বললেন, পেছন থেকে ডাবের কাঁদিটা নামাও। গলা শুকিয়ে গেছে। তোমাকে দেখতে এলাম।

ভাল করে চালাতে শেখেননি। এই কাঠফাটা রোদে ২৫/৩০ কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি চালিয়ে এলেন কী করে?

খেলাঘরের বাড়ি শিশু বারবার ভাঙতে পারে। গড়তে পারে। শ্যামলকে বললেন, আমাকে একটা বাড়ি করে দাও। তখন ইটের হাজার একশো টাকা। সিমেন্টের বস্তা দশ টাকা চার আনা। বাড়ি আরম্ভ করলাম। দু'খানা ঘরের ছাদ ঢালাই হয়ে গেল। সামনে সিমেন্টের একটি মোটিফ। একদিন এসে শ্যামলকে বললেন, বদলাও। এই জায়গাটা পাল্টাও।

কিন্তু বাড়ি যে বালি সিমেন্টের। জমে একবার শক্ত হয়ে গেলে তো বদলানো যায় না। এ তো খবরের হেডিং নয়। কেটে পালটে দেব! এই নিয়ে শ্যামলের সঙ্গে মতের অমিল। ক্ষোভ। দু'জনেরই কিন্তু সেসবে কিছু আসে যায়নি। কারণ শ্যামলের সঙ্গে সন্তোষকুমারের ভালবাসা সিমেন্টে বালিতে স্টোনচিপে জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তা আর বদলানো যায় না।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে সন্তোষকুমার ভালবাসার গ্রেডেশন করতেন। ফিশ নয়তো ব্রেস্ট কাটলেট আনিয়েছেন। আজ অমুকের লেখাটি ভাল হয়েছে। ওকে কাটলেট কেটে বড় টুকরো দিলেন। আজ তমুকের লেখাটি মাঝারি ভাল হয়েছে। তাকে দিলেন কিছু ছোট টুকরো। কারও লেখা খারাপ হয়েছে। সে আজ কিছুই পাবে না। অথচ গতকালই ভাল লেখার জন্য সে পেয়েছিল সবচেয়ে বড় টুকরো। এই ভাবেই কাটলেটের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ হত।

সপ্তাহের সাতটি দিনে রকমারি জিনিস দিয়ে পাতা ভরিয়ে দিতেন। খেলাধুলো, দেশেদেশে কী ঘটছে, সাহিত্য, যাত্রা-নাটক (সেজন্যে তো যাত্রা এসে গেল বড় বিজ্ঞাপনে) কত কী। তার আগে কি যাত্রা নিয়ে এই মাতামাতি ছিল? সম্ভবত নয়। নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসবের সূচনা। সেজন্যে আমাদের বন্ধু প্রবোধবন্ধু হয়ে গেলেন যাত্রাবন্ধু। তারপর সবচেয়ে বড় কাণ্ড—চলিত বাংলায় চলে এল বাংলা কাগজ। আনন্দবাজারকে দিয়ে শুরু। তাতে অমিতদারও (অমিতাভ চৌধুরী) ভূমিকা ছিল।

কাগজ যত বড় হচ্ছিল—ওঁর সাহিত্যের কলম ততই সময় কম পাচ্ছিল—ভেতরে ভেতরে তিনি প্রতিভার উসকানি ততই হারাচ্ছিলেন। আর সেজন্যেই ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। না লিখতে পারার। কিন্তু সেই সময়েও তিনি অন্যের লেখার তারিফদারিতে কারও চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। সমসাময়িকদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক আগেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গেও শিথিল হতে থাকল। তবু ওঁর সম্পর্কের পরিধি কোনওদিন ছোট হয়নি। বরং আরও বড় হয়েছে। লেখকদের অবিরাম ধারার সঙ্গে সব সময়েই তিনি যুক্ত থাকতে পেরেছেন। যাঁরা ওঁর চেয়ে তিরিশ বছরেরও বেশি ছোট ছিল—তাদের সঙ্গেও সন্তোষকুমার যুক্ত থাকতে পেরেছেন। তাদের লেখায় স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পেরেছেন। এ এক অতি বড় ক্ষমতা।

সফল সাংবাদিক হয়েও তাঁর বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাংলা সাহিত্য আমাকে স্বীকার করুক। অনেকদিন আগেই তিনি সেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সন্তোষকুমার এই ব্যাপারে দ্বিধায় ভুগতেন। অনিশ্চিত ছিলেন। যে কোনও বিবেকী শিল্পীই এই দ্বিধায়

ভুগে থাকেন। 'জল দাও' সবার চেয়ে ভিন্ন—সন্তোষকুমারের নিজের ছাপ দেওয়া লেখা। সেদিনও পড়ে দেখি একটুও পুরনো হয়নি। আমাদের হৃদয়ে তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন বহু আগে। অসম্ভব ভাল সব গল্প লিখে। এইসব গল্পে ধরা রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিককার বাঙালি জীবন। নারী যখন জানতে পারে সে তত সুন্দরী নয়-- তার তখনকার মন তিনি একটি গল্পে এঁকেছিলেন। পাইকপাড়ায় থাকতে একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পটির নাম--শোক। সেখানে যেন নিজের মৃত্যুর সামনেই পাঠককে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতার পরেকার যেসব মানুষকে 'সাফারার অব ইনসিগনিফিকান্স' বলা যায়--তাদের অসামান্য হয়ে ওঠার কথা তিনি গল্পে গল্পে বারবার এঁকেছেন। কখনও মনে হয়েছে একই জীবনের একদিক ধরা পড়েছে তাঁর চোখে-- আরেকটি দিক ধরা দিয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চোখে।

এখন আর সন্তোষকুমারকে নিয়ে কোনও কোলাহল নেই। এই নিভৃতিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষ। লেখক। সাংবাদিক। সবটা যেন এবার দেখতে পাচ্ছি। প্রেমিক। মেধার অলৌকিক বনবীথি ধরে তিনি হেঁটে চলেছেন। হাসি হাসি মুখ। সর্বদাই অন্বেষার অভিযানে মগ্ন। স্নেহশীল। আবার বিক্ষিপ্ত। রূঢ়। সঙ্গীতে সাহিত্যে অনন্য তারিফদারি। একটি সংবাদপত্রকে ওপরের দিকে তুলে আনছেন। অনেকটা এই ধরনের আরেক জনকে দেখেছি কিছুদিন। আমাদের চেয়ে অনেক ছোট। তার কথা এখন নয়। এখানে নয়।

মতির 'বেহুলার ভেলা' গল্পটি ভাল লাগল। তাকে নিয়ে দীঘা চলে গেলেন। সুনীল আমেরিকা থেকে ইনল্যান্ডে চিঠি লিখেছে। সে-চিঠি বারবার সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছেন। দোলের সকালে হাত-রিকশায় করে বলতে চলে আসা--দারুণ লিখেছ উপন্যাসটা শ্যামল।

ওঁর সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনায় অফিসে যেতে পারছি না। অথচ তখন তিনি আমারই বাড়িতে। খাবেন সেদিন। আমার স্ত্রীকে বলছেন, কী কী কীভাবে রাঁধতে হবে। আমি ওঁর পছন্দের রেকর্ড বাজাচ্ছি।

আমার রাগ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কোনও বিদ্বেষ ছিল না। সব তিনি মুছিয়ে দিয়েছিলেন। বরং বলা উচিত—বুঝতে পারতাম না—সন্তোষদাকে নিয়ে কী করব? ফেলতে পারি না। কষ্ট হয়। কোথায় যাবেন? রাখতে পারি না। কষ্ট হয়। সে এক অসহ্য ভালবাসা। কোথায়? এমন লোক তো আর দেখি না।

অনেকদিন আগে। তখনও লাইনো কম্পোজ ছিল। একদিন খুব খবরের চাপ। সে সময় রাত তিনটে সওয়া তিনটে অব্দি খবর ধরানো হত। সন্তোষদা রাত একটা-দেড়টা নাগাদ খানিকটা রিলিফের জন্যে গাড়িতে আমাকে নিয়ে রেড রোডে চক্কর দিচ্ছেন। সেই সময় ওঁর পা মচকে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে। একটু খেয়েছেনও । কী নিয়ে যেন আমার ওপর রেগে উঠলেন। কারণটা একদম জানি না। গাড়ি থেকে রাত দু'টো-আড়াইটে নাগাদ অফিসের সামনে নামলেন। হাঁটতে পারেন না ঠিকমত। আমার কাঁধে

ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। অত রাতে লিফট নেই। তেতলায় উঠতে হবে ভেঙে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। এক ধাপ উঠছেন আমার কাঁধে ভর দিয়ে। একটু থামছেন। আর আমাকেই গালাগাল করছেন।

সরে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি চললাম।

দেওয়াল ধরে সন্তোষদা দাঁড়ালেন। তখনও আমরা দোতলায় উঠিনি। বললেন, তা হবে না শ্যামল। দিস ইজ গ্রস ইনসাবোর্ডিনেশন!

এমন লোককে কী বলব। এক পা মচকানো। দুই পা-ই একটু টালমাটাল। তেতলায় নিউজরুমে উঠে শেষ খবর অনুযায়ী পয়লা পাতা কিছু পালটাতে হতে পারে। ফের কাঁধ এগিয়ে দিলাম। সন্তোষদা আমার কাঁধে ভর দিয়ে ফের ওপরে উঠতে লাগলেন। গালাগালিও দিতে লাগলেন। আমাকে। আবার নিজেকেও। নিজের অসমর্থ দশার জন্য।

প্রায় তিরিশ বছর আগে। কলকাতার বাইরে থাকি। আমার বাড়িতে সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন। পুকুরে অল্প জলে ঘাটলায় বসে বললেন, পিঠে সাবান লাগিয়ে দাও। দিলাম। সাঁতার জানেন না সেকথা বলেননি। আগে থেকেই অল্প তরফে ছিলেন। তারপর এক সিঁড়ি আর নামতেই দিব্যি একটা আধুলির মত তলিয়ে যেতে লাগলেন। আমি ভাবছি এখুনি হাত তুলে সাঁতার কাটবেন। ঘাটের পেছনে বৌদি, ওঁর মেয়েরা আমার বাড়িতে। রান্না প্রায় শেষ। খেতে বসার জোগাড়যন্ত্র চলছে। সাঁতার আর কাটেন না সন্তোষদা। কোনও হুশ নেই। কী সর্বনাশ! পাগলের মত ডুব দিয়ে টেনে তুলি। খানিকটা জল খেয়েছেন। সেটা বের করে দিয়ে হেসে উঠলেন। তুলতে গিয়ে দেখি পিছলে যাচ্ছেন। গায়ে যে সাবান মাখানো ছিল। তুলতে কী পারি! ভাগ্যিস পেরেছিলাম। এই ছিলেন সন্তোষদা। পাগল। এবং বালক। আদেশ করতেন। গালাগালি করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন—আমি তো ভালবেসেছি। তারপর যা ইচ্ছে তাই করব।

পঁচিশ বছর আগে মতি, সুনীল, শীর্ষেন্দু আর আমার—আমাদের চারজনের একটি করে গল্পসংগ্রহ এক প্রকাশক বের করেছিলেন। সেই চারটি গল্পসংগ্রহেরই ভূমিকা লিখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। আমার গল্পগুলির ওপর তাঁর সেই ভূমিকা আজও আমার পক্ষে সবচেয়ে অভ্রান্ত। পরে আমার কোনও একটি গল্পসমগ্রে সেই ভূমিকাটি দিয়েছি।

সন্তোষদা সাহিত্যের ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল চিনতেন বাঙালি নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবন। এই জীবন থেকে তিনি উঠে এসেছেন। আমরাও এসেছি। অনেকেই। এই জীবনের কথা তিনি এত নিপুণভাবে লিখে গেছেন যার তুলনা মেলা ভার। সম্প্রতি সন্তোষকুমারের তেমন একটি গল্প মাসিক কথাসাহিত্য ছেপেছিল। পড়ে আমি মুগ্ধ। একটি অধিক কথা নেই। ব্যথায় সারা গল্পটি টনটন করছে। দারিদ্র্য, দুর্দশা, নিরুপায় দশা, আর কোনও পথ নেই, মূল্যবোধ হারানোর যন্ত্রণা সারা গল্পটিতে ছেয়ে আছে।

রূঢ় অপমানকর ব্যবহার অবশ্যই করেছেন। সিরাজ যে লিখেছে—একজন মেরে হাত

ভেঙে দিয়েছিল—কথাটা ঠিক নয়। একজনকে সোয়াইন বলেছিলেন। আরেকজন পরে রেগে গিয়ে একটি চড় মেরেছিল। তাতে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যায়। তখন সেই আরেকজন সাবধানে তুলে নিয়ে গিয়ে ইজিচেয়ারে তাকে শুইয়ে দিয়েছিল। জল এনে খাইয়ে দিয়েছিল। আয়োডেক্স এনে ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এসব কথা সিরাজের জানার কথা নয়। তখনও সিরাজ সেই অফিসে যোগ দেয়নি। অপ্রীতিকর ঘটনার সময় সেখানে সুনীল ছিল। সুনীলের তখন করার কিছু ছিল না। তবু আমি বলব—দোষ আমারই। তাঁর কাছে আমি কাজ শিখেছি। ভালবাসাও পেয়েছি।

অফিসে, আইনের ভাষায়, একটি domestic enquiry হয়েছিল। সারা প্রতিষ্ঠানের কেউ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেননি। আমাকে সাসপেন্ড করা হয়। সাসপেনশনের নিয়ম ছ'মাস হাফ পে। তারপর নিষ্পত্তি না হওয়া অব্দি আমাকে চাকরির মেয়াদ আরও প্রায় ১৮ বছর শতকরা ৭৫ ভাগ মাইনে দিয়ে যেতে হত। বসিয়ে বসিয়ে। ইনক্রিমেন্ট সমেত। ডোমেসটিক এনকোয়ারিতে আমাকে দোষী প্রমাণ করা গেল না। এই সময় সমরেশ বসু আমার খোঁজ নিয়েছেন। অন্যত্র আমার লেখা প্রকাশে সাহায্য করেছেন। সম্পাদক হিসাবে মধুসূদন মজুমদার, মণীন্দ্র রায় লেখা চেয়েছেন। এই প্রকাশই তখন আমার একমাত্র ভরসা ছিল। অভীকবাবু অনুরোধ করেন আমাকে। ফিরে আসুন। সন্তোষদা বললেন, তুমি কষ্ট পাও তা আমি চাই না। প্রতিষ্ঠান বলল, আপনি আর সন্তোষবাবু letter of regret নিজেদের ভেতর বিনিময় করুন।

আমি আর সন্তোষদা এলফিনে গেলাম। উনি নিলেন জিন। আমি নিলাম হুইস্কি। দুপুরবেলা। ভেতরটা ঠাণ্ডা বাইরে কড়া রোদ্দুর। আমার তেতাল্লিশ। ওঁর পঞ্চান্ন। খাওয়া-দাওয়া হল। চিঠি বিনিময় হল। দু'জন দুঃখপ্রকাশ করে দু'জনকে চিঠি লিখলাম। আমার চিঠি ওঁকে দিলাম। ওঁর চিঠি উনি আমাকে দিলেন। সেদিন বোধহয় আমরা সিজিনিং চিকেন খেয়েছিলাম সঙ্গে। শব্দ তোলা—ধোঁয়া ওড়ানো।

ওঠার সময় সন্তোষদা বললেন, আমার চিঠিখানা দাও শ্যামল। সব তো মিটে গেল। আর ও চিঠি রেখে কী করবে!

মিটেই যখন গেছে—তখন ও চিঠি দিয়ে আর কী করব। সন্তোষদার চিঠি সন্তোষদাকে দিয়ে দিলাম। আমার দুঃখপ্রকাশ করে লেখা চিঠিখানি সন্তোষদার কাছ থেকে নেবার দরকার মনে হয়নি সেদিন।

ওঃ! একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ওই অপ্রীতিকর ঘটনার মাসখানেক আগে সন্তোষদার কথায় শরৎচন্দ্র ও পতিতাদের বিষয়ে তিন কিস্তিতে একটি লেখালেখি আনন্দবাজারে। সে বছর সম্ভবত শরৎ শতবার্ষিকী ছিল। সন্তোষদা লেখাগুলোর ল্যাজামুড়ো কেটে ছেপেছিলেন। সেখানেই ক্ষোভের শুরু। তার ২০/২২ দিন পরে—যতদূর মনে পড়ছে জানুয়ারির শেষদিকে—ভুবনেশ্বরে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি সম্মেলন ছিল। সন্তোষদা গিয়েছিলেন। আমি সে সভা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাই। এবং কিছু লিখি না।

আমি কোনারককে চলে যাই। সেখানেই রাগারাগির কারণ আরও জোরালো হয়েছিল। তার কয়েকদিন পরেই তো ওই ঘটনা।

যাক গিয়ে। সন্তোষদার চিঠি সন্তোষদা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। আমার দুঃখ প্রকাশের চিঠি সন্তোষদার কাছে থেকে গেল। প্রতিষ্ঠান আমাকে চিঠি দিল : আপনি সন্তোষবাবুর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। সে চিঠি আমরা পেয়েছি। আপনাকে ক্ষমা করে শাস্তি তুলে নেওয়া হল। আপনার কাটা বেতন ফেরত দেওয়া হচ্ছে। আপনি কাজে যোগ দিন। অবিলম্বে। প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে আমাকে 'ক্ষমা' করার কথাটি আমার ভাল লাগল না। অপমানকর মনে হল। তাছাড়া সন্তোষদা যে আমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন—সে কথা তো প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে নেই।

সন্তোষদাকে বললাম, কী ব্যাপার? এরকম হল কেন? আমাকে লেখা আপনার দুঃখপ্রকাশের চিঠি অফিসকে দেননি? যে-চিঠি আমার কাছ থেকে চেয়ে সন্তোষদা বলেছিলেন, ভুলে যাও শ্যামল।

অভীকবাবুকে বললাম। তিনিও বললেন, ভুলে যান। কয়েকটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে আমাকে প্রোমোশন দেওয়া হল। এর কয়েকমাস আগে শীর্ষেন্দু ও সিরাজ কাজে যোগ দিয়েছিল।

আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি। 'ক্ষমা' কথাটি আমার ভাল লাগেনি। এই সময় আমার বাবা মারা যান। শ্রাদ্ধে অভীকবাবু এসে অনেকক্ষণ ছিলেন। এর কিছুদিন পরে আমি পদত্যাগের চিঠি দিই। আমার পরের ভাই তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে। তাকে অভীকবাবু বলেছিলেন, আপনার দাদাকে আটকান। পদত্যাগের চিঠি বেশ কিছুদিন ওঁরা রেখে দিয়েছিলেন। যাতে আমি না যাই। অভীকবাবুকে আমার আগাগোড়াই আন্তরিক লেগেছিল।

কিন্তু তখন আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। 'ক্ষমা' কথাটির জন্যে। আর নিজের দুঃখ প্রকাশের চিঠি সন্তোষদা অফিসকে না দেওয়ায়। কিংবা, অফিস সে চিঠির কথা উল্লেখ না করায়।

চাকরি ছেড়ে আমি একটি সাহিত্য-সাপ্তাহিকে যাই। সেখানে কয়েকমাসের ভেতর সন্তোষদার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। যত্ন করে ছেপেছিলাম। সন্তোষদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটগল্পের ওপর তিনটি বক্তৃতা দেন। তাতে আমার এতই প্রশংসা করেন যে আমি খুব লজ্জা পাই।

এরপর সন্তোষদা এসেছেন। আমি গেছি। সব মুছে গেছে। সন্তোষদার ছোট মেয়ে এখন সম্পাদক হিসাবে আমার লেখা চায়। আসে। বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে সে আমার সঙ্গে নিজের কাকার মত ব্যবহার করে। আমি যে ওদের ছোট থাকতে স্কুলে ভর্তি করেছিলাম।

যে বয়সে সন্তোষদা চলে গেছেন—সেই বয়সে আমি এখন পৌঁছে গেছি। রোগভোগের সময় ওঁর কষ্টের কথা শুনে ভীষণ কষ্টবোধ হয়েছে। ২১/২২ বছর

আগের একটি ঘটনার জন্যে আমাদের ভেতরকার ভালবাসা কোনওদিন নষ্ট হয়নি। এত কথা লিখলাম—এ জন্যে যে অনেকে না জেনে অনেক ভুল কথা লেখেন।

কিছুকাল আগে শ্রীমতী কাকলি চক্রবর্তীর (সন্তোষদার ছোট মেয়ে মিলু—বিশিষ্ট অধ্যাপক সমালোচক শ্রী কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর স্ত্রী) হাতে শারদীয় বর্তমানের পুজোর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিতে গেছি। শ্রীমতী কাকলি কথায় কথায় বলল, বাবা যে নেই—বিশ্বাসই হয় না।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে মিলুর কথাটিই বললাম—সন্তোষদা যে নেই—বিশ্বাসই হয় না। এখুনি হয়তো বলে উঠবেন—চলো শ্যামল—দেখে আসি কাকে তুমি বিয়ে করছ। কিংবা খুব রূঢ় ভাষায় হয়তো কোনও কঠিন অপমান করবেন। ভালবাসবেন। ঝগড়া করবেন। কাজ শেখাবেন। লেখার প্রশংসা করবেন। সমালোচনা করবেন।

আমরা সবাই মিলে এরকমই ছিলাম। সে কথা নীরেনদা জানেন। গৌরদা জানেন। অমিতদা জানেন। সুনীল জানে। মতি জানে। সিরাজ জানে। শরৎ ঠিক বুঝতে পারেনি।

এক বিচিত্র মোলাকাত

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

গত বছর অন্য একটি লেখায় সন্তোষকুমার ঘোষকে স্বেচ্ছাচারী বলেছিলাম। স্বেচ্ছাচারী এবং ছেলেমানুষ। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালকের পক্ষে এই দুটি গুণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় না অবশ্য। জীবনে আমি কতিপয় ধূর্ত হোমরাচোমরা মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি—বাঙালি, অবাঙালি নির্বিশেষে—তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং মিষ্টভাষিতা। গণতন্ত্রের যুগে তাই তো স্বাভাবিক। বিচক্ষণ মানুষ সমাজের নেতৃত্বে থাকবে, স্বেচ্ছাচারী নয়।

এই লোকটি কাজের জায়গায় নেতৃত্ব দিতে জন্মাননি, আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাঁকে সেখানে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এই রেগে যান, এই হেসে ফেলেন, একটু তোষামোদ করলে অনেক দিনের জমানো অভিমান, ক্ষোভ, মুহূর্তে ধুয়ে যায়, কথায় কথায় মানুষকে গেট আউট করে দেন--এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমানুষি কোনও বড় মানুষকে মানায় না। তাঁকে সহনশীল হতে হয়। খামখেয়ালিপনা শিল্পীকে সাজে, কারণ সে যা কিছু ভুল, সব নিজের হাতে ঠিক করে দিতে এসেছে। কারুর সাহায্য সে চায় না।

ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। বাতানুকূল ঘর। বিশাল টেবিল। টেবিলের উলটো দিকে অনেকগুলো চেয়ার, সম্ভবত একটা সোফাও। মোটা মেয়েমানুষের কোলের মত এক গদিওলা ঘোরানো চেয়ার, সন্তোষকুমার ঘোষ সেই চেয়ারের এক কোণে পিছন ঠেকিয়ে বসতেন। ছোটখাটো মানুষ, কোনও রকমে ছুঁয়ে থাকা আর কি। আর ডাইনে বাঁয়ে সুইং করা মাঝে-মাঝে। ওইভাবে হয়তো তিনি তাঁর ক্ষমতার স্বাদ নিতে পছন্দ করতেন।

অনেকদিন আগের কথা। তা কুড়ি বছর তো হবেই! আমার একটি কবিতার বই বেরিয়েছে। নাম 'আহত ভ্রূবিলাস।' খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে এগারো খানা বাটিকের শাড়ি কিনে দপ্তরিকে দিয়ে এসেছি, বইয়ের মলাট হবে। মলাটের উপর সিল্কস্ক্রিনে নাম। তখন তো সবই নিজের খরচে হত। বই বেরবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দশ কপি নিয়ে আনন্দবাজারে যেতেই হবে। না, রিভিউয়ের তদ্বির করতে না। ওখানে আমাদের অগ্রজ কয়েকজন আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে একখানা করে বই দিতে হবে না? সন্তোষদা, সাগরদা, অমিতাভ চৌধুরী, গৌরদা, বিমল কর, নিখিল সরকার, নীরেনদা, রমাপদবাবু,

দুই শান্তিদা মানে, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তিকুমার মিত্র। এই তো দশ জন হয়ে গেল—আনন্দবাজার বলতে এঁরাই।

একদিন বই দিয়ে এলাম। হাতে হাতে। সন্তোষদা ঘরে ছিলেন না, টেবিলে রেখে এলাম বইটা। ব্যস, কর্তব্য শেষ।

দিন কয়েক পরে একদিন কফি হাউসে গেছি সন্ধেবেলা। কে যেন বলল, "শরৎ, আপনাকে সন্তোষদা খুঁজছে। খুব আরজেন্ট দরকার।" শুনে অবাক হই। আমাকে খুঁজবেন কেন? আমি তো সাংবাদিকতা করি না। আমি তাঁর কোন কাজে লাগব? ভাবলাম, আপিস থেকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করব, কী দরকার। আবার কী মনে হল, বাবা, মুমূর্ষু মানুষ, খুঁজছেন যখন, যাই একদিন মোলাকাত করে আসি। গালাগালি যদি শুনতে হয়, সামনাসামনি শোনাই ভাল।

দুপুরের দিকে গেছি। দরোজা ফাঁক করে ঘরে উঁকি দিলাম। আমাকে দেখলেন, হাত তুলে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। একটু পরে তাঁর ঘর থেকে আমার অপরিচিত এক ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে, ভেতরে ডাকলেন।

—"বোসো। আমার সামনের চেয়ারটায় বোসো।"

—"আমার বই রেখে গেছিলাম, পেয়েছেন তো?"

—"পড়েছি। তোমার মত শয়তান আমি খুব কম দেখেছি।"

এইভাবে অভ্যর্থনার সূচনা। তারপর বেয়ারাকে ডাকলেন। চা দিতে বললেন। চা খাওয়া হল। তারপর হঠাৎ কী মনে হল, হুকুম দিলেন, অমুক এসেছে? ডাকো। অমুক আছে? এখুনি আসতে বলো। অমুক কী করছে? যাই করুক বলো, আমি ডাকছি। অমুক যদি নিজের সিটে না থাকে, ওকে দেশ-এর ঘরে পাবে, একটু যেন দেখা করেন। বলবে বিশেষ দরকার।

দেখতে দেখতে এসে পড়লেন সবাই। কেউ বসলেন, কেউ দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্ভবত নির্দেশ পাবার অপেক্ষায়। আমাকে দেখে অস্বস্তি বোধ করলেন কেউ কেউ। সত্যি তো, দরকারি মিটিং-এর সময় আমি একটা বাইরের লোক তাঁর সময় নষ্ট করছি।

মুখের একদিক টিপে তাঁর টিপিকাল হাসিটি হাসলেন সন্তোষদা। তারপর বললেন, "এখন শরতের কবিতা পড়া হবে। যেগুলো দাগ দিয়ে রেখেছি সেই কটা পড়ে যাও পরপর। আমরা তোমার নিজের গলায় শুনতে চাই।"

'আমরা' টা ভদ্রতা। আসলে 'আমি'। প্রথমে গলা কাঁপছিল আমার, তারপর ঠিক হয়ে গেল। অন্তত, পনেরোটা কবিতা পড়ে দম ফেলি।

"এই হল কবিতা।" বলে সন্তোষদা তাঁদের ফিরে যেতে বললেন। তাঁরাও আমার কবিতার প্রশংসা করলেন।

কিন্তু আমি স্থির জানি, সেই সময় অমনভাবে আমার কবিতা শোনার জন্য তাঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। জানি না, সেই দিন আমি সন্তোষদার জন্যে এই কয়েক জন মূল্যবান পাঠক চিরতরে হারালাম কিনা।

সন্তোষকুমার ঘোষ

বিজিতকুমার দত্ত

কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের স্থপতিবিদরা কলকাতার উন্নতির জন্যে পুরনো বাড়িঘর অলিগলি ভাঙতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা কি জানতেন কলকাতার এই বাড়িঘরে অলিতেগলিতে কত স্মৃতি কত রহস্য দীর্ঘকাল ধরে বাসা বেঁধে আছে? সেই স্মৃতি আর রহস্যকে তাঁরা জেনে অথবা না জেনে দূর করে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেও। সন্তোষকুমার এইরকম একজন সাহিত্যের স্থপতি। তাঁর অন্বিষ্ট মানুষ। এই মানুষের ভাঙচুরকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

বহুদিনের লালিত সংসারযাত্রার ফাঁকফোকরগুলিকে তিনি টেনে বার করেন। রুদ্ধশ্বাসে গলিঘুঁজির প্রাণান্তকর জীবনযাত্রার গ্লানি তাঁকে পীড়িত করেছিল। নৈতিক চেতনার অবক্ষয় তাঁকে আক্রান্ত করেছিল। সন্তোষকুমার হরিপদ কেরানির দীর্ঘশ্বাসকে তাঁর লেখায় বিছিয়ে দেন। যা নিয়তির মত দুঃসহ তাকে যে অতিক্রম করতে হবে সন্তোষকুমারের ভাবনায় তাই চেপে বসেছিল। একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের নীতি-দুর্নীতি প্রেম-ভালবাসার তাপ এবং বিলীয়মান সূর্যাস্ত সন্তোষকুমার আঁকলেন, তাঁর লেখায়! মেনে নিলেন স্থপতিবিদের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে হাতুড়ি ছেনিকে। পুরনো রীতির ইমারত গড়ার রূপটিকে কারিগর ঝেটিয়ে দেন। শিল্পী অত সহজে ঝাঁটা নিতে পারেন না, তিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে চোখের জলে স্বীকার করেন। কিন্তু 'কিনু গোয়ালার গলি'তে আমরা সেই চোখের জলেরও সন্ধান পাই।

আবার সন্তোষকুমারকে সাংবাদিক জগতেও এই ভূমিকায় যখন দেখি তখন বিস্মিত হই না। সেখানেও তিনি 'মিথ'-কে ভাঙতে চাইলেন। সংবাদকেও সাংবাদিকের চোখের জলের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন সন্তোষকুমার। এ ভাল কি মন্দ সে বিচার করতে চাই না। মহাকাল তার ভার নেবেন। কিন্তু একথা মানতেই হবে সন্তোষকুমার এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। তরুণ গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে তিনি নতুন হতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহে-শাসনে আমরা নাগরিক হয়ে উঠেছিলাম। সন্তোষকুমার এই নাগরিকতাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন—কথায় আর কাজে।

মানুষটির নিভৃতে ছিল একটি দরবারি চালের মানুষ। হতেই পারে। মানুষকে তিনি তার বহিরঙ্গ রূপ দিয়ে বিচার করতে চাননি। অন্তরের মানুষকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন বরাবর। আর যাঁরাই তাঁর কাছাকাছি এসেছেন তাঁদেরই শিখিয়েছেন অভিজাত মানুষ

হয়ে উঠতে। নিজেকে ছাড়িয়ে ওঠার মধ্যেই যে সার্থকতা এবং জীবনের পরম সত্য--সেকথা সন্তোষকুমার বারেবারেই বলেছেন। এই সত্য তো সহজে কেনা যায় না। সন্তোষকুমার তা জানতেন। সেজন্য মাঝে-মাঝে কঠোর হতে দেখেছি তাঁকে। আপোষ তিনি করতে পারতেন না, চাইতেনও না।

অথচ যাকে তিনি পছন্দ করতেন তাকে যেন একটু বেশি করেই পছন্দ করতেন। অর্থাৎ পছন্দসই মানুষটিকে ভালবাসতে আরম্ভ করতেন। কোনও কোনও বিষয়ে তার ওপর আস্থাও স্থাপন করতেন। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার মুখে তাঁর মৃত্যু ঘটল। যাই হোক একদিন তিনি আমার ওপর কিছু ভাল বই বাছাইয়ের নির্দেশ দিলেন। বাছাই বইগুলির নাম সম্পাদকের বাছাই রূপে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। আমি সাতটি বই-এর নাম দিয়েছিলাম। চারটিকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। বাকি তিনটি তাঁর পছন্দ হয়নি। আমি একটু ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলাম।

সেইদিনই আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে তাঁর ঘরে বসে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার নবরূপায়ণের কথা আমাকে কিছু বলেছিলেন। এইটি বুঝেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার প্রসঙ্গ তাঁর অত্যন্ত তৃপ্তিকর। তাঁর যেন ধ্যানজ্ঞান ওই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ঘুরত। আনন্দবাজারের খেলার পাতাটির কথা তুললেন। খেলার সংবাদের গতানুগতিক রচনা সন্তোষকুমারের পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি ডেকে আনলেন শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন শঙ্করীকে দিয়ে ক্রিকেট খেলার বিবরণ লেখালুম, মুহূর্তের মধ্যে খেলার পাতাটিতে চাঞ্চল্য এল। পাঠক যেন দর্শকের ভূমিকায় নেমে পড়ল। সাংবাদিকের লেখার মধ্যে পাঠক-দর্শক খেলার উত্তাপ-উত্তেজনা অনুভব করল। সেই ধাঁচে পরে লিখেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বহুদিন আগের ব্যাপার হলেও সন্তোষকুমারের কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। কারণ আর কিছুই নয় যখন খেলার পাতায় সেই চমকপ্রদ বিবরণ পড়েছিলাম তখন তো মনে হয়নি এর লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বটে কিন্তু লেখকটিকে গড়ে তুলেছিলেন সন্তোষকুমার। সাংবাদিক গড়ার কারিগরই ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। সন্তোষকুমার সংবাদপত্র পাঠকের হাড়হদ্দ বুঝতেন।

সন্তোষকুমার ঘোষের আরও কাছে এলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবের ঘরে বসে একদিন অনেকক্ষণ কথা হল। 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার 'সুকুমার সেন সম্বর্ধনা সংখ্যাটি' তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন দেখলাম। কারও কারও লেখার খুব প্রশংসাও করলেন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি রবীন্দ্রনাথে চলে এলেন--তাঁর প্রথম ভালবাসার ক্ষেত্রটিতে। সুকুমার সেনের রবীন্দ্রনাথের গানের বিশ্লেষণ অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের পাঠে এবং কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গানে রবীন্দ্রসদনে পরিবেশিত হয়েছিল। শ্রোতা হিসাবে সন্তোষকুমার সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সন্তোষকুমারের তন্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবের ঘরে বসে বললেন, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ বলেছে যাব যাব রাত বলেছে যাই'--এই গানটির মধ্যে

এমন গূঢ় অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে তা সুকুমার সেন না বলে দিলে তিনি কোনওদিনই জানতে পারতেন না। সুকুমার সেনের ব্যাখ্যা তাঁকে যে খুবই উত্তেজিত করেছিল তা বুঝতে পেরেছিলাম হঠাৎ তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। ওই গানটিই যেন তখন তাঁর চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল। একটু পরে হেসে বললেন, "আমি রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, সারাজীবনই পড়ছি। আমার চাইতে রবীন্দ্রনাথকে আর দুইজন বেশি জানে—একজন সুকুমার সেন আর একজন শঙ্খ ঘোষ। তারপরেই কিন্তু আমি।" বাংলাদেশে খুঁজলে আরও কয়েকজন রবীন্দ্রনাথ পড়া মানুষ পাওয়া যাবে তবু সেদিন সন্তোষকুমারের কথা শুনে আর তাঁর স্মিত হাসি দেখে আমার মনে হয়েছিল এ বিষয়ে তাঁর একটু গর্ব আছে। যাঁকে ভালবাসি তিনি আমার, আমারই এ কথা বলার মধ্যে এক ধরনের গভীর তৃপ্তি পাওয়া যায়। সে তৃপ্তিতে মগ্ন ছিলেন সন্তোষকুমার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সন্তোষকুমার রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের বিশ্লেষণ করছিলেন তখনও তিনি ভেবেছেন সেই বনস্পতির ছায়ায় বসে তিনিও গল্প লিখবেন। লিখেছিলেনও।

হঠাৎ সন্তোষকুমার ঘোষের একটি বই 'কুসুমাদপি', দেশ পত্রিকায় সমালোচনার জন্যে পাই। সমালোচনাটি যথাসময়ে জমা দিয়েছিলাম। আমার সমালোচনাটি আকারে খুবই ছোট ছিল। বইটি পড়ে আমার কোনও কোনও জায়গায় কিছু সংশয় জেগেছিল। সেকথা লিখেছিলাম। তখনও সমালোচনাটি ছাপা হয়নি। এমন সময় শুনলাম সন্তোষকুমার গুরুতর অসুস্থ। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। একবার মনে হল লেখাটা ফেরত নিই। অসুস্থ সন্তোষকুমার লেখাটি পড়লে হয়তো আঘাত পাবেন। কিন্তু ফেরত নিইনি। ভরসা ছিল তাঁকে যতটুকু জেনেছি তাতে তিনি আমার সংশয়ের উত্তর নিশ্চয়ই দেবেন। দিন যায়। সমালোচনাটি ছাপা হল। ঠিক মনে নেই তিনি তখন বোম্বাই না কলকাতার হাসপাতালে। আমি দ্বিধা নিয়ে চলি। শেষে একদিন তাঁরই এক আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি লেখাটি পড়ে ক্ষুণ্ণ হননি তো?' আত্মীয়টি হেসে বললেন, 'না ক্ষুণ্ণ হননি, খুশিই হয়েছেন।' সন্তোষকুমার পরে তাঁর গল্পের শাঁসটি কোথায় সেই আত্মীয়কে বুঝিয়ে বলেছিলেন। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। এটা লিখলাম এইজন্যে যে সন্তোষকুমারের চিত্ত ছিল উদার এবং যথার্থই বড় মাপের।

সন্তোষকুমারের দিনান্তবেলায় আমার সঙ্গে পরিচয়। বেলভিউ হাসপাতালে গিয়েছি কয়েকবার। প্রথমে তিনি বুঝতেই পারেননি তাঁর গুরুতর রোগের ব্যাপারটা। কেবল বলেছিলেন গলায় একটু কষ্ট হচ্ছে। তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই একটু অস্থির হয়ে কৃষ্ণকলিকে বলেছিলেন আমাকে ডেকে নিয়ে আসতে। কাছে বসিয়ে গল্প করতে লাগলেন। গল্প মানেই রবীন্দ্রনাথ। কোনও কোনও রবীন্দ্র-সমালোচকের প্রতি তাঁর বিরূপতার কথা জানালেন। তিনি নিজে আরও কিছু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখবেন, ভাবছিলেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ একটু সজল হয়ে এসেছিল। জানি না আবেগে না রোগের জন্যে। নাকি রবীন্দ্রচর্চায় ছেদ পড়বে এই আশঙ্কায়? যাত্রাভঙ্গের ইশারা তো তিনি পাচ্ছিলেন।

দু-তিন দিন পরেই বোম্বাই চলে গেলেন সন্তোষকুমার। বোম্বাই থেকে সুকুমার সেনকে লেখা চিঠিতে আমার সংবাদ নিয়েছিলেন তিনি। স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও তিনি যে আমাকে মনে রেখেছিলেন তা জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম।

বোম্বাই থেকে ফিরে আসার পর যখন তিনি আবার বেলভিউ-তে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কথা বন্ধ হয়ে গেছে তখন। সংগ্রামক্লান্ত সন্তোষকুমার হেঁটে এসে সোফায় বসলেন। আমি সেদিন প্যান্টশার্ট পরে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'চিনতে পারছেন তো?' সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষকুমার মেয়েকে কাগজকলম দিতে ইশারা করলেন। লিখে দিলেন 'একটা মানুষ কি শুধু তার পরিচ্ছদের? নিজস্ব সত্তা আছে নিশ্চয়ই। সেই গুপ্ত পরিচয়টি আসল।' শিল্পীর জীবন ছিল সন্তোষকুমারের। এই তিনটি মিতকথায় আমি তাঁর শিল্পীসত্তার উদ্ভাস দেখতে পাই। সন্তোষকুমারের রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা বিফলে যায়নি।

প্রিয় সন্তোষদা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সন্তোষদার সঙ্গে প্রথম কখন পরিচয় হয়েছিল, তা আমার এখনও মনে আছে। অন্তর্ভারতীয় কবিতা-উৎসবের সময়ে, যার উদ্যোক্তা ছিলেন সতীকান্ত গুহ, আশিস সান্যাল ও আরও অনেকে। সালটা ঠিক মনে নেই। ১৯৬৭-৬৮ হবে, কিংবা তারও আগে। দ্বিতীয় দিন আমার কবিতা পড়বার কথা ছিল--হয়তো প্রথম দিন সন্তোষদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিংবা দ্বিতীয় দিন সকালে। জন্মান্তরের সুহৃদের মত আমার হাত ধরে সন্তোষদা বললেন, "তুমি প্রণবেন্দু?" আর ঠিক পাশে দাঁড়ানো আমার অর্ধাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "You must be Marry Ann"। তারপরে গাড়ি করে আমরা কোথায় এলাম সে জায়গাটা আমার শুধু অস্পষ্টভাবে মনে আছে। লালরঙের বাড়ি, সিঁড়ি, দোতলায় ছোট ছোট অতিথি-ঘর, আলো, আর খানিকটা অন্ধকার। প্রভাকর মাচওয়ে ছিলেন সেখানে? আরও কেউ কেউ। আড্ডার মধ্যমণি শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। তর্ক জমেছিল সাহিত্যের অশ্লীলতা নিয়ে। সম্ভবত সমরেশ বসুর কোনও বিতর্কিত উপন্যাস প্রসঙ্গে। আমি আর সন্তোষদা মাচওয়েজিকে বোঝাতে চাইছিলাম যে অশ্লীলতা একটি আপেক্ষিক শব্দ, Sex আর morality ঠিক এক জিনিস নয়, বোঝাতে চাইছিলাম Vulgarity সর্বত্র পরিত্যাজ্য, কিন্তু যৌবনকালের কথা লেখা অশ্লীল নয়। কালিদাসের কথা উঠল, ভারতচন্দ্রের, তারপর সেই সূত্র ধরে শেকসপিয়ার, রাব্‌লে, ডি এইচ লরেন্স, এবং অন্য কোনও কোনও প্রসঙ্গ। প্রভাকর মাচওয়ে-ও সমানে তর্ক চালিয়ে গেলেন। কিন্তু জিতলাম আমরা। সেই থেকে, বিখ্যাত লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং আমি খুব কাছে চলে এলাম, যে গ্রন্থি এখন পর্যন্তও শিথিল হয়নি। শুধু তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছি না, তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে পারছি না, এই যা দুঃখ।

কবি সম্মেলনে আমি ইংরেজিতে লেখকদের নামধাম ঘোষণা করছিলাম। সন্তোষদা জীবনানন্দর কবিতা পড়লেন--প্রথমে বাংলায়, তারপরে ইংরেজিতে। এর আগেই, যখন সন্তোষদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, তখন সুনীল একদিন জানিয়েছিল যে আমার "সদর স্ট্রীটের বারান্দা" (যা কারো হাত দিয়ে সন্তোষদার হাতে আনন্দবাজারে পাঠিয়েছিলাম) সন্তোষকুমার ঘোষের খুব ভাল লেগেছে। সুনীল জানিয়েছিল, সন্তোষদার মতে, আমার কবিতা খুব নরম, কিন্তু শক্ত। আমি অসাধারণ কবি নই, কিন্তু সন্তোষদা "একশো কবিতায়" (যা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে) লিখে গেছেন সুনীল, শক্তি আর

আমি অসাধারণ—এবং আমি একটু নরম গলায় কথা বলি।

সন্তোষদার কী স্মৃতিচারণ করব আমি? অজস্রবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে—কখনো তাঁর বাড়িতে, কখনো বা আমার বাড়িতে, ক্বচিৎ কখনো যখন আনন্দবাজারে গেছি সেখানে, কলকাতার নানা রেস্তোরাঁয়, হোটেলে। সন্তোষদার প্রধান গুণ ছিল তাঁর গুণগ্রাহিতা। জীবনানন্দ যেমন তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন, তেমনি তাঁর প্রিয় কবি ও বন্ধু ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটু অস্থির চিত্ত ছিল হয়তো বা, বেশ একটু moody, এবং আমার মতে, সহস্র বন্ধু ও অনুরাগীর ভিড়ের মধ্যে থেকেও, নিঃসঙ্গ। টেলিফোনে একদিন বিশেষ কোনও প্রৌঢ় কবিকে তাঁর বন্ধু বলায় আমি হয়তো ঈষৎ চমকে গিয়েছিলাম, আমার গলার স্বর বুঝতে পেরেই উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "transplantation of heart বুঝলে, নইলে আমি বাঁচতে পারতাম না, কখনো এর প্রতি আমি হৃদয় অর্পণ করি, তার দুদিন পরে অন্য কারো প্রতি। ঠকতে ঠকতে আমাকে শিখতে হয়েছে।" আমি বলেছিলাম, "কাকে হয়নি, সন্তোষদা?"

সন্তোষদা রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন, ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগী, কণিকা-সুচিত্রা সবাই ছিলেন তাঁর বান্ধবী। রমণীদের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা গল্প করতেন অননুকরণীয় ভঙ্গিতে—কখনো সুন্দরী রমণীদের সামনে, কখনো বা ঈর্ষান্বিত পুরুষসভায়। নবনীতাকে খুব স্নেহ করতেন সন্তোষদা, নবনীতার বন্ধুবান্ধবদের যাঁদের উনি নবনীতার প্রেমিক বা প্রাক্তন প্রেমিক ভাবতেন তাঁদের ঠাট্টা করতেন কখনো কখনো। পুরুষ ও রমণীর সম্পর্ক কী? যাকে স্নেহ বা ভালবাসা বা শ্রদ্ধা বলি, তার মধ্যেও থাকে একটা থির্‌থিরানো আলাদিনের আলো। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, অন্যদিকে জীবনযাপনে বিলাসী—এই ছিলেন আমাদের সন্তোষদা। ধার্মিক শীর্ষেন্দুকে স্নেহ করতেন, নাস্তিক সুনীল ও নীরেনদাকেও খুব পছন্দ করতেন। বেলভিউতে যখন তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর পাশে ছিলেন বৌদি। তাঁর সহধর্মিণী, যাঁকে তিনি ভালবাসতেন সবচেয়ে বেশি।

অনিন্দ্যসুন্দর শিশু

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সন্তোষদা'র মধ্যে একটা নিষ্পাপ শিশু সব সময় খেলা করত। খুব চেষ্টা করে যে এটা তাঁকে করতে হত তা কিন্তু নয়। কী কথায়, কী মনোভাবে, কী ভাবভালবাসায়। শিশুর মত একটা হাসিও সর্বক্ষণ তাঁর দখলে থাকত, এবং সামান্য প্ররোচনায় যা হা হা, হো হো অট্টরোলে ভেঙে পড়ত। শিশুসুলভ কিছু মান-অভিমানও তাঁর ছিল, এবং সমস্ত শিশুর মতই সন্তোষদা'র কাণ্ডকারখানাকে শিশুর কাণ্ড বললেই তিনি চটে যেতেন।

এই ক্ষমতাটা ছিল বলেই কোনও বয়সের লোকের সঙ্গে মেশামিশিতে তাঁর কোনও বাধা, কোনও সমস্যা ছিল না। শিশুর মতন অকপটেই কাউকে বলে দিতে পারতেন, তোমার ওই লেখাট কিস্‌সু হয়নি। আবার ভাল লাগলে শুধু সেই লোকটিকেই নয়, অফিসের সহকর্মী থেকে শুরু করে পাড়াপ্রতিবেশী পর্যন্ত যাকে যখন যেখানে পাচ্ছেন বলে দিতেন, অমুকের ওই লেখাটা পড়ে নিও। অসাধারণ। নিজে একজন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়ে যাওয়ার পরও যে এটা তিনি পারতেন তার কারণ তিনি স্বীয় স্বভাবের সেই শিশুটিকে কখনও অবজ্ঞা বা পরিত্যাগ করেননি।

এমনিতে লেখক সম্প্রদায় খুব হিসেবি এবং সতর্ক প্রকৃতির হয়, নিজের লেখার বাইরে তাঁরা খুব বেশি লোকের লেখা নিয়ে কিছু বলতে-কইতে চান না। তার ওপর অন্য লেখকটি যদি হন তরুণ এবং প্রতিভাধর। সন্তোষদা কিন্তু এই নিয়মটি খুব দর্পের সঙ্গে ভেঙেছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের বহু উদারতা তিনি নিজের মধ্যে জিইয়ে রাখতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যুর দিন অবধি।

আমার গর্ব এই যে, এরকম একটি মানুষকে আমি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ছোটদের জন্য লেখা বই পড়তে দিয়েছিলাম। আঁতোয়ান দ্য স্যাতেক্সুপেরির 'দ্য লিটল্ প্রিন্স।' তাতে এক জায়গায় কিশোর নায়ক বলছে কেন বয়স্কদের সঙ্গে তার বনিবনা হয় না। হয় না, কারণ অধিকাংশ বড়দের মধ্যে কোনও শিশু থাকে না। তাদের যদি বলা হয়, 'আমার একটা সুন্দর বাড়ি আছে' তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করবে, 'সেটার কি আট হাজার পাউণ্ড দাম?' কিন্তু তারা জিজ্ঞেস করবে না, 'সেই বাড়িটার রং কী?' তার সঙ্গে কি একটা ছোট্ট বাগান আছে?' এরকম নানান সুন্দর সুন্দর পর্যবেক্ষণ ভর্তি সেই বই। সন্তোষদা'র পড়ে খুব ভাল লেগেছিল সেটা এবং আমায় ডেকে বলেছিলেন, কতই

তো শিশুসাহিত্য লেখা হচ্ছে বাংলায়, কিন্তু কেউ তো এমন সহজ করে শিশুদের সুখ-দুঃখ-দর্শনের কথা লেখে না। সবাই-ই যেন গল্প শোনাতেই ব্যস্ত ছোটদের। তোমার উচিত এই বইটা অনুবাদ করা।

তখন বিনীতভাবে কবুল করলাম যে, ইতিমধ্যেই খুব যোগ্য হাতে বইটির বঙ্গানুবাদ হয়ে গেছে। ফাদার দতিয়েন করেছেন। তখন সন্তোষদা বললেন, তাহলে নিজের ছোটবেলার স্মৃতি দিয়ে একটা কাহিনী লেখো। যেখানে শিশুদের পূর্ণ, প্রাপ্তবয়স্ক চিন্তা ও অভিজ্ঞান থাকবে। তখন ভয়ে ভয়ে বললাম, সে লেখার ক্ষমতা কি আমার আছে, সন্তোষদা? সন্তোষদা তখন বললেন, তুমি যেভাবে এই বইয়ের প্রশংসা করেছিলে আমার কাছে তাতে মনে হয় এমন কোনও কাহিনী তোমার ভেতর দানা বেঁধে বসে আছে।

বলা যেতে পারে সন্তোষদার সেদিনের কথাতেই খুব সাহস পেয়ে আমার শৈশবের স্মৃতি দিয়ে লিখে ফেলি 'পাবকের বাবা, মুঙ্গীর পাহাড়', সে কাহিনী খুব ভাল লেগেছিল তৎকালের আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি সেই লেখা নিয়ে 'আনন্দমেলা'য় ধারাবাহিক ছেপে দিলেন। কিন্তু সেই লেখার পিছনে যে কতখানি সন্তোষদা আছেন আজ তা জানতে পেরে নিজেকে সুখী লাগছে। বলা বাহুল্য, 'লিটল প্রিন্স' বইটা অসম্ভব ভাল লেগেছিল বলে সন্তোষদা তাঁর শিশুসুলভ প্রবৃত্তিতে সেটি আর আমাকে ফেরত দেননি।

সন্তোষদা আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সম্পাদকীয় রচয়িতা ছিলেন। নিজের লেখা ছাপা অবস্থায় যে কত-কতবার পড়তেন তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। শিশুরা বালুকাবেলায় বালির দুর্গ তৈরি করে যেমন মুগ্ধ হয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে সেটির দিকে, সন্তোষদারও সেই দম্ভ ছিল নিজের রচনা নিয়ে। সেই সব লেখা খুব মন দিয়ে পড়ে তার আলোচনা বা সমালোচনা করলে দারুণ খুশি হতেন ভদ্রলোক। আমি তাই প্রায় রুটিন করে তাঁর যাবতীয় লেখা পড়ে ফেলতাম আর নিজের যা ধ্যানধারণা জানিয়ে দিতাম সাক্ষাতে। তখন দেখেছি যে, যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁর লেখার সমালোচনা করলেও তিনি ব্যথা পেতেন না। এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত তিনি শিশুর মতন একবগ্‌গা, অসহিষ্ণু হতে পারতেন না।

এ তো গেল লেখা ছেপে বেরুনোর পরের ঘটনা। ছেপে বেরুবার আগেও একটা শৈশব-অধ্যায় থাকত। হয়তো দেখা গেল সন্তোষদার সম্পাদকীয় দৈর্ঘ্যে খুব হয়ে গেছে, না কাটলে অন্যজনের সম্পাদকীয়কে বিশ্রীভাবে ছোট করতে হবে। তখন নিয়ে গেলাম তাঁর লেখা তাঁর নিজের হাতে কাটাতে। সন্তোষদা 'হ্যাঁ, দাও। কেটে দিচ্ছি' বলে লেখাটির জায়গায় জায়গায় কাটতে শুরু করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আরও দু-চার লাইন জুড়তে লাগলেন লেখাটির শ্রী বজায় রাখতে। এভাবে হয়তো আধ ঘণ্টাটাক চলল এবং অবশেষে দেখা গেল সন্তেযদা তাঁর লেখার চোদ্দ লাইন কেটে তাতে বিশ লাইন যোগ করে ফেলেছেন। কিন্তু ততক্ষণে পাতা বসানোর সময় হয়ে গেছে, তাই তাড়াহুড়ো করে দীর্ঘাকৃতি সম্পাদকীয়টি নিয়েই প্রেসে ছুটলাম।

সাজপোশাক, সুগন্ধ, সুখাদ্য এবং সুসঙ্গীতের ওপরও প্রবল আকর্ষণ ছিল সন্তোষদার। ভাল সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এসে একদিন আমাকে বললেন, 'তুমি কি ভেবেছ ভাল জামাকাপড় শুধু ছেলেছোকরাদেরই মানায়? দেখো তো আমাকে। কে বলবে এখন তোমার ডবল বয়স আমার? এরপর যদি গায়ে ভাল পারফিউম লাগাই তাহলে তোমাদের দিকে কেউ তাকাবেই না।' এই বলেই একটা ভাল গন্ধ মাখতে লাগলেন সন্তোষদা।

শিশুসুলভ একটা বিস্ময়বোধও কখনও ছেড়ে যায়নি সন্তোষদাকে। আমি প্যারিস থেকে ফেরার পর, দিনের পর দিন ওর ঘরে বসে প্রশ্ন করে করে জেনে নিতেন প্যারিসের হালচাল। তিনি নিজেও বার কয়েক গিয়েছিলেন সেখানে এবং শহরটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাও ছিল তাঁর। কাজেই আমি যখন কিছু বলতাম উনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্মৃতির কোনও কথাও জুড়ে দিতেন। আর প্রত্যেকদিনই আলোচনার শেষে বলতেন, আমার হিংসে হয় তোমার বয়সটাকে। আমার তো আর প্যারিস যাবার বয়স নেই। কিন্তু এটা কোনও আফসোস ছিল না ওঁর, আমার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাব মাধ্যমে উনি নতুন করে প্যারিসকে খুঁজে নিতেন, উপভোগ করতেন।

এরকম একটা অনিন্দ্যসুন্দর পরিণতবয়স্ক শিশু আমি আর কোথায় পাব?

ঘুমের দেশে গেল যে মহান

সুনীল বসু

ঘুমের দেশে চলে গেলেন। ঘোমটা পরা ওই ছায়া। অস্তিত্বে কে যেন আমার হিমানী স্রোত ঢেলে দিল। নেই। প্রকাণ্ড, দিগন্তব্যাপী এক বিশাল 'না'-এর মধ্যে আস্তে আস্তে একটি মানুষ মিলিয়ে গেলেন। আর তাঁকে পাব না। এই কি সেই? সেই মহামহিম নিদারুণ! এই পৃথিবীতে—এই মর্ত্যকায়ায় যেন কতবার কত কথা কত দিন বলেছি। এখন শুধু না বলা বাণীর ঘন অন্ধকার যামিনী। বড় ক্লান্ত, স্মৃতির পাথর ক্লান্ত, মুখ নিচু করে সেই পাথরে ন্যুব্জ ভঙ্গিতে উল্টে উল্টে অতীতের মোহর খোঁজা, বুকের গভীরে যাদের বহুকাল লুকিয়ে রেখেছি। আমিও চিনতাম। বেশ একটু কাছ থেকে চেনা। গভীর সখ্যের, স্নেহের রঙিন ফাঁসে বাঁধা ছিলাম। বড় মধুর, বড় তাপ-ঋদ্ধ সেই সান্নিধ্য। কত বার শুনেছি অনেকের মাঝখানে বলা—আমা হেন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লেখককে বলা, দারুণ লিখেছ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। এত দূরান্বেষী খোঁজ, খবর কেউ রাখতেন না। চাকরির শুরুর সেই প্রথম দিন। এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন মুরুব্বির ঘরে উনি বসেছিলেন। দিল্লি থেকে সবে এসে হরিপদ মহলানবিশের জায়গায় একবেলা করে বসছেন। বলেছিলেন, দেখেছি, দেখেছি ; তোমায় খুব চেনা-চেনা লাগছে। আমি বলেছিলাম, আপনার খুব ধারালো স্মৃতি ; আমরা গিয়েছিলাম বহুদিন আগে কয়েকজন আপনার কাছে আমাদের কাগজের একটি ছোটগল্পের জন্যে, এক বন্ধুকে দিয়েছিলেন সদ্য বেরুনো 'কিনু গোয়ালার গলি'। তখন। সেই কতকাল আগের সেই অ-সাহেব ধুতি-পাঞ্জাবি পরা রক্তে-রক্তে বাঙালি লেখক। আমার চাকরির সেই প্রথম দিন। হাসিমুখে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন দু'তলা থেকে তিনতলায়। খুব আনন্দ হয়েছিল ওঁর অধীনে কাজ করব ভেবে,—যেমন আনন্দ হয় ছোট চারাগাছের বটগাছের আওতায় এলে। দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমার বসবার জায়গাটি। ষাট কি উনষাট সাল। বিকেলবেলায় অফিসে কাজ করছি। উসখুস করছি। কাছে ডাকলেন। কী? সন্ধেবেলায় কবি-সম্মেলনে যাচ্ছ না? আমার যে ডিউটি! বললেন, যাও যাও, বেরিয়ে পড়ো। কবিদের আসরে যাও। আমি তোমাকে ছুটি দিচ্ছি! চাকরির প্রথমে চুক্তি ছিল, নো ওয়ার্ক নো পে। এক ঘোরতর বর্ষাকালে, পাইকপাড়ায় এক জলে ডোবা খোঁদলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু। বাড়ি ফিরলাম আপাদমস্তক চান-করা। পায়েও কেটে গেল। অফিস কামাই হল। যতীনবাবুর আমলে। পুরো গোটা একদিনের মাইনে ছাঁটাই। না না, তাই

কি হয়! দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। ওই মহানুভবের একটি স্বাক্ষরই আমার মাইনে রদ না করতে সাহায্য করেছিল। কতরকম ভাবে, কত স্মৃতিতে, কত স্নেহ-সম্ভাষণে আমি বাঁধা ছিলুম সঙ্গে, যখন যবনিকার অন্তরালে উনি, আমার চোখ ঝাপসা হয়ে বুক উজাড় করে শ্রাবণ নামতে চায়। মনে হয় নির্জন ফাঁকা মাঠে গিয়ে একটা অসহায় নরম নদীর ধারে গিয়ে বসি, জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির কথা, নানা রঙের দিনগুলির কথা ভাবি, এইরকম একটি প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে যিনি এসেছিলেন,—তার চলে যাওয়াকে যে বিজ্ঞান থামাতে পারল না,—তাহলে বিজ্ঞানের কী এমন ক্ষমতা! ছার। ধিক! না না, লক্ষ্মীছাড়া বিজ্ঞান মৃত্যুকে জয় করতে পারেনি, পারে না! আমি সেই মহানুভবকে ভালবাসতুম। তাঁর প্রশংসার প্রেরণায় বহুবার জ্বলে উঠেছি। গর্বিত হয়েছি। আর আজ,—কী বিশ্রী এই না-চাওয়া শূন্যতা? আমি এখনও আছি মর্ত্যকায়ায়, আর সেই মহানুভব মিশে গিয়েছেন মর্ত্যের ধূলিতে, ধূলিকণায়,—সেই ধূলিকণায় আমার আনত অশ্রুময় প্রণাম।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

১. বেদনায় অঞ্জলি

সন্তোষদার সম্বন্ধে মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখার ব্যাপারটা খুবই দুঃখের, খুব কষ্টের। তার কারণ সন্তোষদা ভীষণ রকমের একজন জীবন্ত মানুষ। তিনি রাগ করেন, ভালবাসেন, আনন্দ করেন, সবই অত্যন্ত সজীব ভাবে। সন্তোষদা সব সময় ভবিষ্যতের লোক। কখনোই অতীতের নন।

সন্তোষদার সঙ্গে দেখা হলেই বেশ একটা উত্তেজক ব্যাপার হয়। সন্তোষদা ভীষণ খুশি আছেন। একটু বাড়িয়ে ভাল বলছেন কারুর সম্বন্ধে। সন্তোষদা ভীষণ রেগে আছেন, কাউকে ধুইয়ে দিচ্ছেন। সন্তোষদার সঙ্গে আমার পরিচয়ে এই রূপটাই প্রথমে মনে পড়ে। তবে অনেক মুহূর্ত কাটিয়েছি যখন সন্তোষদা নিজেকে মেলে ধরেছেন। নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অন্যের লেখা (নিজের লেখা নিয়ে কথা বলতেন খুব কম) নিয়ে সাহিত্য নিয়ে।

লেখা নিয়ে কথা উঠলেই কথা হত রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথে ঠিক চলে আসতেন সন্তোষদা। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙালি কীরকম হত সে ব্যাপারে মাঝে-মাঝে আমরা কথা বলতাম। সন্তোষদা খুব উত্তেজিত হয়ে যেতেন। বলতেন, মাছ জল ছাড়া কেমন হয় সে বিষয়ে কি কথা চলে। বাঙালি মধ্যবিত্তর কাছে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তার অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। জিয়া হায়দরের কবিতার পঙ্‌ক্তি 'আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মত' তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। তাঁর নিজের লেখায় বার বার রবীন্দ্রনাথ এসে পড়ত।

অথচ তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই থাকেননি। পড়েছেন অজস্র বই। দেশি-বিদেশি সমস্ত রকম লেখক সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। মারকুইজের হানড্রেড ইয়ারস অব সলিচুড ডকট্রোর র‍্যাগটাইস, ম্যালকম এক্সের আত্মজীবনী সবরকম বই সম্বন্ধে ওঁর আগ্রহ ছিল।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি একলা ছিলেন। যাঁরা দলবদ্ধ ভাবে থাকেন তাঁদের অনেক সুবিধা। সে সুবিধা তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু রাজনৈতিক বিসংবাদ থাকলেও ব্যক্তি হিসাবে কাউকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতেন না। ওঁর বিপক্ষমতাবলম্বীদের কতজনের জন্যে যে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন তার ঠিক নেই।

সন্তোষদা সম্বন্ধে আমার একটা কথা মনে হত। সন্তোষদা কলকাতায় থেকেছেন

দিল্লিতে থেকেছেন। দু'জায়গাতেই তাঁর প্রচুর পরিচিত লোক, বন্ধু ছিল। দু'জায়গাতেই তাঁকে চিনত মানত প্রচুর লোক। তবু তিনি পুরোপুরি বড় শহরকে গ্রহণ করেছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্তোষদাদের প্রজন্মের বেশির ভাগ লোক পূর্ববঙ্গের অবারিত মাঠঘাট নদীনালা খালবিলের মধ্যে বড় হয়েছিলেন। সেই পারিপার্শ্বিক মানুষকে যে উদারতা দান করে সেই উদারতার প্রতীক ছিলেন সন্তোষদা। কলকাতার সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে তিনি ঠিক মানিয়ে নিতে পারেননি।

সন্তোষদা চলে গেছেন এক বছর হতে চলল। কলকাতায় বহুলোকের সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় না। তারপর একদিন দেখা হয়ে যায়। আড্ডা যেখানে মুলতুবি রেখে শেষ বার চলে এসেছিলাম সেইখান থেকেই আড্ডা আবার শুরু হয়। কতবারই তো এরকম হয়েছে। কিন্তু এবার আর হচ্ছে না। সন্তোষদাকে টেলিফোনে ডাকা যাচ্ছে না। তাঁর কাছে কপট নিন্দা শোনা যাচ্ছে না। মন মেনে নিতে চায় না।

২. সন্তোষদা সম্বন্ধে

সন্তোষদা মারা যাবার পর অনেকগুলো শোকসভা হয়েছে। এইসব শোকসভায় অনেক নামি মানুষরা সন্তোষদার সম্বন্ধে অনেক দামি কথা বলেছেন। তবে সবগুলি কথার মধ্যেই তাঁদের নিজেদের সম্বন্ধে প্রচার অনেক বেশি থেকেছে। সন্তোষদা কতটা প্রশংসা করতেন বক্তার লেখা, বা পাণ্ডিত্য বা সম্পাদনা বা রসবোধ, সে সব সবিস্তারে শ্রোতারা শুনেছেন। শ্রোতারা আরো শুনেছেন ঠিক কোন সময় বক্তার সঙ্গে সন্তোষদার পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় বক্তার কীরকম সুনাম হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কথাও শ্রোতাদের কানে গিয়েছে। দিশাহারা হয়ে তারা বুঝতে পারেনি সভাটা কার সম্বন্ধে।

আসলে সমস্ত শোকসভাই এইরকম হয়। রবীন্দ্রনাথ একটা কবিতায় লিখেছিলেন যাবার দিকের পথিক ঠিকই বুঝতে পারে, যে চলে যায় তাকে মানুষ ভুলে যায়। যারা বেঁচে থাকে তারা এ উহাকে খোঁজে। তবু মানুষ শোকসভা করে, মানুষ সেইজন্য শোকসভায় নিজের কথা বলে। স্মৃতিচারণ করতে গেলে কিছুটা আত্মকথন তো থাকবেই। তবে বেশি হয়ে গেলেই মুশকিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া একটা মানুষ চলে গেলে ব্যক্তিগত ক্ষতি তো হয়ই। আত্মীয়স্বজনদের হয়, বন্ধুবান্ধবদের হয়, সহকর্মীদের হয়। বৃহত্তর সংসারেও হয় কোনও কোনও মানুষের ক্ষেত্রে।

সন্তোষ ঘোষ তেমনি একটি মানুষ। তিনি চলে যাওয়াতে বেশ কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে। যেমন ধরুন, সাহসের ক্ষেত্রে একটা ঘাটতি পড়ে গেছে। সন্তোষ ঘোষ দারুণ সাহসী মানুষ ছিলেন। এই সাহসের সর্বোত্তম পরিচয় মিলেছে তাঁর শেষ অসুখের সময়। এত প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে তো বোঝবার কোনও অন্তরায় ছিল না কী অসুখ তাঁর হয়েছে। প্রচণ্ড শারীরিক কষ্টের সঙ্গে লড়াই করেছেন। হারেননি। রসবোধ হারাননি।

কিন্তু অসুখটা তো অনেক পরের কথা। তার আগে কি লড়াই কম করেছেন? কুৎসার বিরুদ্ধে, অপমানের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গের চালু ধারা হল শেয়ালের ধারা। প্রথম শেয়াল হুক্কাহুয়া করলেই সকলে সমস্বরে হুক্কাহুয়া বলে চেঁচায়। তেমনি বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সবাই প্রথম শেয়ালের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। একবার সুরটা শুনলেই সবাই মিলে সমস্বরে ধরে। অহো কী বিচিত্র আমাদের বুদ্ধিজীবীদের লীলা। সব ব্যাপারে তাদের একটা 'রা' থাকে। সব শেয়ালের এক রা যাকে বলে তাই। সন্তোষদা এ দলে নাম লেখাতে চাননি। লেখানওনি। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তখন একসঙ্গে ছি-ছি করেছেন। উত্তম কাজ করেছেন। ভাবা যায় লোকটা নিজে ভেবে-চিন্তে একটা সিদ্ধান্তে আসছে তারপর তার সেই সিদ্ধান্ত সাহসভরে সবাইকে জানাবার জন্য কলম ধরছে! একে ছি-ছি করবে না তো কাকে করবে? বড় বড় শক্তির কারো তাঁবেদারি না করে ভারতবর্ষের মত একটা নিকৃষ্ট দেশের কীসে ভাল হয় সে কথা ভাবছে বলছে। ভাবা যায়! তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা তাই তাঁর প্রাপ্য ছিল। কারা কুৎসা করেছে? অবশ্যই যারা তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে তারাই। সন্তোষ ঘোষ লোকটা বড় অদ্ভুত ছিল। কুৎসা করার আগে সাহায্য করেছে, কুৎসা করার পরেও সাহায্য করেছে।

শুধু সাহসে ঘাটতি হবে? উৎসাহদাতা কমে গেল যে সেটার কথা বলা হবে না? কোথাকার কোন অখ্যাত লেখক কোন কাগজে কী লিখেছে সেটা পড়বে কে আর? আর টেলিফোন করে কে করবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা? কে বলবে—কিন্তু দ্যাখো লেখাটার ওই জায়গায় খামতি হয়ে গেল। শুধু কি মুখে বলা? টেলিফোন যে অর্ধেক সময় চলে না। সুতরাং কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে যাও। পাঠিয়ে দাও সে চিঠি। নতুন যারা লিখতে শুরু করল তাদের বড্ড লোকসান হয়ে গেল। শুধু নতুন কেন পুরনোরাই কি বাদ? লেখক হয়ে অন্যের লেখা পড়ার মত পাপকার্য কোনও পাপাত্মা আর করবে? পড়া মানে কি যে সে পড়া? একদম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। অথচ যাঁরা পুণ্যাত্মা তাঁরা কিন্তু ভুল করেননি। অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সন্তোষকুমার ঘোষ যে লিখতে জানেন না, শুধুমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকার অনুগ্রহে তাঁর অখাদ্য কলম বেরোয় একথা বলে গেছেন। আর অন্যরা যাঁরা আরো বেশি পুণ্যাত্মা তাঁরা খুব দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, 'কিনু গোয়ালার গলি' পড়ে যে আশা জেগেছিল তা ফলবতী হতে পারল না, কারণ লোকটা যে একদম সাংবাদিক বনে গেল। নইলে ওঁর হত।

সাংবাদিকতার জগতেও একটা ফাঁক হয়ে গেছে। বিশেষ করে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। বাংলা সাংবাদিকতার ব্যাপারে তো উনি খোলনলচে সব বদলে দিয়েছেন। আজ তো প্রায় প্রত্যেকটা ভাল বাংলা কাগজ যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা সবাই সন্তোষদার কাছে কাজ শিখেছেন। 'বর্তমান' পত্রিকার বরুণ সেনগুপ্ত একটু গোলমেলে মানুষ তিনি অকপটে লিখিতভাবে সেটা স্বীকার করেছেন। এগুলো সাধারণত চেপে যেতে হয়। সমস্ত সফল মানুষই স্বয়ম্ভু। সেখানে আগে বাড়িয়ে ঋণ স্বীকার আশ্চর্য ব্যাপার। আনন্দবাজার পত্রিকার কোন সম্পাদকীয় সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা সেগুলি বুঝতে

পাঠকের খুব বেশি সময় লাগত না। একদম প্রথমেই ধরা যেত। আক্রমণ প্রশংসা দুটোই খুব সোজাসুজি হত। আজ যে বাংলা কাগজ বলতেই আনন্দবাজার বোঝায় সে তো সন্তোষকুমার ঘোষেরই কৃতিত্ব। অথচ তিনি যখন দিল্লি থেকে এখানে এসে কাগজের হাল ধরলেন সেদিন আনন্দবাজারের সঙ্গে অন্য বাংলা কাগজের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। এক একটা বিরাট ঘটনা ঘটেছে—বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু, চীনা যুদ্ধ, কেনেডির মৃত্যু, জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু, মানুষের চাঁদে যাওয়া, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান—সমস্ত ব্যাপারে বাঙালি উদ্বেলিত হয়েছে আর তখন সবাই আনন্দবাজারকে তাদের সঙ্গী করেছে। সাধারণ মানুষের অন্তরে পৌঁছবার যন্ত্রটা তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন আনন্দবাজারকে। যেদিন ধর্মঘট করে কাগজকে বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল সেদিনও ওই সন্তোষকুমার ঘোষ বিনা দ্বিধায় রাস্তায় নেমেছিলেন। যেটা তিনি শুভ বলে ভেবেছিলেন তার জন্যই লড়াই করেছিলেন। 'সহজ পাঠ' নিয়ে আন্দোলনেরও পুরোভাগে সেই কারণেই তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

অসাধারণ কর্তব্যবোধ ছিল। পরিবারের প্রতিটি লোকের প্রতি নজর ছিল। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, কন্যা, শ্বশুর, পুত্রবধূ, জামাতা প্রতিটি সম্পর্ককে সুন্দর করে তোলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বন্ধুদের প্রতি তাঁর আনুগত্যের সাক্ষী তাঁর বন্ধুরা। এত উচ্চকোমল সহৃদয় বন্ধু খুব কম হয়। যখন যেখানে প্রয়োজন ঠিক দেখা গেছে। কাজ করতেন রাজকীয়ভাবে। যাঁরা বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলতে পারবেন তিনি কীভাবে একজন দিক্‌পাল সাহিত্যিককে বিদায় জানিয়ে ছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যাতে তাঁর পারিবারিক ব্যাপারের সুরাহা হয় সেইজন্য গৌরকিশোর ঘোষকে নিয়ে ছুটেছিলেন মধ্যমগ্রাম। সে বৃত্তান্ত যদি গৌরকিশোর দয়া করে বলেন তাহলে খুব মনোজ্ঞ গল্প হবে। বন্ধু শান্তিরঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি কতটা ভেঙে পড়েছিলেন তার কথাও সকলেই জানেন। এই উষ্ণতাকে অনেকেই দুর্বলতার নামান্তর বলে মনে করেছে। জুয়াচোরেরা সমস্ত সময় সুযোগ নিয়েছে। সন্তোষ ঘোষের একটা দুর্ভাগ্য এই যে—তাঁর প্রাপ্যের বেশি ধান্দাবাজরা তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। আনন্দবাজারে চাকরি, গানের একটু ভাল সমালোচনা, লেখা প্রকাশে সহযোগিতা, আরো হাজারো ধান্দা....নিয়ে লোক তাঁর কাছে আসত। যারা আসত তারা জানত তাঁর সাময়িক ক্রোধ কটুকাটব্য সব ছাড়িয়ে সত্য তাঁর কোমল প্রাণ!

বেচারি রবীন্দ্রনাথেরও বড্ড অবস্থা খারাপ হল। বুড়ো ১২৪ বছর ধরে রমরম করে রাজত্ব চালিয়ে শেষে এখন খুব দুর্দশাগ্রস্ত। তাঁর ভক্তরা সবাই জেনে গিয়েছে তিনি তাঁর বৌদির সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেন। আরো সব নারী তাঁর জীবনে এসেছিল তাদের নিয়েও ভাল ভাল কল্পকাহিনী শিগগিরই রবীন্দ্র-গবেষকরা বার করবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার ওপর লোকটা এক নম্বরের ইংরেজ ভক্ত ছিল। ইংরেজ শাসকের উদ্দেশে রাজ্যের বর্ণমালা সাজিয়ে একটা গান লিখেছিল। আমাদের দেশনেতাদের বিশেষ করে জওহরলাল নেহরুর ভীমরতিতে সেই গানটাকেই ফট করে

জাতীয় সংগীত করে দেওয়া হল। এসবে তিতিবিরক্ত হয়ে আজকাল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অন্যরকম গবেষণা শুরু হয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ কী স্বপ্ন দেখতেন, কী খেতেন, কাকে কখন গালমন্দ করেছেন, কোন কোন পাগল কখন কেন তাঁর কাছে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে "র" অক্ষরটা কবার ব্যবহার হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্যদিকে সন্তোষকুমার ঘোষ ছিলেন তদগত প্রাণ রবীন্দ্রনাথ ভক্ত। তিনি বলতেন, রবীন্দ্রনাথ না হলে আজকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ অন্যরকম হত। আজকে আমরা এতটাই রবীন্দ্রনাথ দ্বারা আচ্ছন্ন যে আমাদের পক্ষে আর বোঝা সম্ভব নয়, বলা সম্ভব নয়, রবীন্দ্রনাথ যদি না জন্মাতেন, যদি কবিতা না লিখতেন, গান না লিখতেন আমরা কী হতাম। রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের সৌন্দর্যবোধ না শেখাতেন তাহলেই বা আমাদের সৌন্দর্যবোধ কীরকম হত। তাঁর মতে ভাল হত না। সন্তোষকুমার ঘোষ অনেক পড়াশোনা করেছিলেন, অনেক জিনিস আত্মস্থ করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল তাঁর প্রথম গুরু। রবীন্দ্র-সাহিত্যের, রবীন্দ্রনাথের গানের তিনি সত্যিকারের ভাণ্ডারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোনও একটা উক্তি, কোনও একটা লাইন কোথায় থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের মীমাংসা তিনি করতে পারতেন সহজেই। আর রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাপারে তিনি তো স্বপ্নের শ্রোতা। এমন শ্রোতা সত্যিই হয় না। তাঁর সুখে, তাঁর দুঃখে, তাঁর আনন্দে, তাঁর নৈরাশ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতই ছিল তাঁর আশ্রয়স্থল। তাঁর জন্মদিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমারোহ হত। কত সঙ্গীতশিল্পী তাঁকে গান শুনিয়ে আনন্দ পেত। তাঁর অসুখের সময় আরোগ্যশালা রবীন্দ্রসঙ্গীত-কক্ষ হয়ে যেত। সেখানে গেলে জগতের আনন্দযজ্ঞে যে সবার নিমন্ত্রণ খুব বোঝা যেত। বই পড়া আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা তিনি শেষদিন অবধি ছাড়েননি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-আত্মীয়া ছিলেন। তাঁদের গানের আসরে সন্তোষকুমার সব সময় উপস্থিত থেকেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁরাও সন্তোষদাকে খুব ভালবেসেছেন। এ সম্বন্ধে দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে একটা দারুণ ঝড় তুলেছিলেন সন্তোষদা। রবীন্দ্রনাথের গান যে কেউ সুর বসিয়ে গাইতে পারেন কিনা এ প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন। নজরুলের গানে আজ যে চরম অরাজকতা রয়েছে সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীতেও আসুক এটা সন্তোষদা চাননি। তার ফলে দেবব্রত বিশ্বাসের গান বন্ধ করার ষড়যন্ত্র আনন্দবাজার তথা সন্তোষকুমার ঘোষের চাল এমন একটা রব উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টা সত্ত্বেও ঝগড়াটা পাকাপাকিভাবে বাধেনি। কারণ সন্তোষকুমার ঘোষ কখনোই চাননি দেবব্রত বিশ্বাস গান বন্ধ করুন। তিনি দেবব্রত বিশ্বাসের গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দুটি মানুষকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা জানেন দু'জনের প্রকৃতিতেই একটা ছেলেমানুষি ছিল।

সন্তোষকুমার ঘোষ শেষদিন পর্যন্ত সেই সরল বিস্ময়বোধ রাখতে পেরেছিলেন। এত ব্যাপারে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, অনেক আনন্দ, অনেক তিক্ততা সত্ত্বেও সন্তোষদা ছেলেমানুষের মত খুশি হবার ক্ষমতা রেখেছিলেন। যে-কোনও ব্যাপারেই তিনি

অসাধারণ উৎসাহ পাবার এবং দেবার ক্ষমতায় ছিলেন। আবার অল্পতেই রেগে যাবার দুঃখ পাবারও ক্ষমতা তাঁর ছিল। দুঃখের কথা এই ছেলেমানুষের ব্যাপারটা সকলের বোধগম্য হত না।

আজ সন্তোষকুমার ঘোষ নেই। তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্য আর কেউ কখনো পাবে না। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়বান লোকেদের সংখ্যা সব সময়েই কম। এই যুগে যেন আরও একটু বেশি কম। আমাদের চেনা পৃথিবী একটু দীনতর হল।

বন্ধ ঘর, মুক্ত স্বর

অরুণ বাগচী

অফিসে সন্তোষবাবুর ঘরটা অনেকদিন বন্ধ ছিল। দিনের মধ্যে কতবার করিডর দিয়ে হেঁটে গেছি। মাঝে-মাঝে লোভ হত দরজায় টোকা দিতে। ভাবতে চেয়েছি যে ভালবাসার ওই বন্ধ দরজাটা খুলে গেলে দেখব উজ্জ্বল মানুষটি ঠিক বসে আছেন টেবিলের সামনে বাতি জ্বেলে। মুখের একটা অংশ অন্ধকারে। ভারী চশমা, এলোমেলো চুল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত, বিরক্তি কেটে গিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠছে, আসুন, বলে কোনও ব্যাপারে অভিমান প্রকাশ করবেন। আসুন, বলে কোনও আকর্ষক আলোচনা শুরু করে দেবেন। অথবা দেখব ঘরের এক কোণে, পা ভাল করে মেলা যায় না এমন শোবার জায়গায় তিনি আধঘুমে। বুকের ওপর আধখোলা বই, চশমা নেমে এসেছে নাক বরাবর।

সেদিন হঠাৎ দেখলাম চীনা মিস্ত্রি তাঁর ঘরটা ভাঙচুর করতে লেগেছে। তাঁর টেবিলটা বের করে দেওয়া হয়েছে বারান্দায়। কাচ কয়েক জায়গায় ভাঙা--সেটা সন্তোষবাবুর কীর্তি কিনা মনে পড়ল না। হয়তো মিস্ত্রিদের বর্বর হস্তক্ষেপের ফল। কাচের নিচে রবীন্দ্রনাথের ছবি, হস্তাক্ষর শিল্প। বড়ই বৃদ্ধ ঠেকল রবীন্দ্রনাথকে। হাতের লেখা সেই তুলনায় কত তরতাজা। কাচের নিচে রাখা ছাপানো রসিকতা : সাইলেন্স। জিনিয়াস অ্যাট ওয়ার্ক। আমরা, অকৃতজ্ঞের দল, আমরা তো নীরব হয়েই গেছি। কিন্তু পৃথিবীর কোন উপকার তাতে হল? আপনি তো সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দিব্য চলে গেছেন সন্তোষবাবু। কোন মহৎ কর্ম তাতে কি হচ্ছে বলুন তো! নির্বিকার আকাশের সমুখ দিয়ে মেঘের মত ভেসে চলে যাওয়াই আমাদের সবাইকার বিধিলিপি।

সন্তোষবাবু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আসল চেলা। আত্ম-অবনয়নে দুজনেরই জুড়ি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান ব্যক্তি, আপন দেশবাসীকে যিনি খুব ভাল করে চিনেছিলেন দীর্ঘ জীবন ধরে, তিনি যে কী করে বারে বারে বলতেন—আমি ইংরেজি জানি না, আমি যে ছাই ওই ভাষাটাকে ঠিক আয়ত্ত করতে পারিনি—আমার বুদ্ধিতে আজও তার ব্যাখ্যা মেলে না। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথের হাজার উক্তিকে প্রতিদিন নস্যাৎ করতে ব্যস্ত, অথচ তাঁর ওই 'ইংরেজি জানি না' বক্তব্যকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিতে তাঁদের এক মুহূর্ত সময় লাগে না। রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেকে আকাট মূর্খ বলে ঘোষণা করতেন তো সেটাও তাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কোট করে

সর্বত্র বলে বেড়াতেন। সন্তোষবাবুও একই দোষে দোষী। তিনি ঠিকই বুঝতেন যে ঈর্ষাকাতর একদল মানুষ তাঁকে নানাভাবে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এমন সব কথা নিজের সম্বন্ধে বলতেন যা তৎক্ষণাৎ ওই সব মতলবী 'ভক্ত'রা কাজে লাগাবার সুযোগ পেত।

যেমন তাঁর জীবনের শেষ দশক ধরে একদল সমালোচক বলে বেড়াতেন, "সন্তোষদার সব গ্লোরি হচ্ছে পাস্ট টেন্সে।" অর্থাৎ (লেখক হিসাবে) তিনি আর কিছু করে উঠতে পারছেন না। সন্তোষবাবুও ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলতেন—ঠিক কথা, আমার লেখা কিছু হচ্ছে না। আমি ফিনিশড ইত্যাদি। থেকে থেকেই ঘোষণা করে দিতেন—আমি লেখা থেকে অবসর নিচ্ছি। যখন 'মুখের রেখা' উপন্যাস দেশে ধারাবাহিক বের হচ্ছে তখনও বিদেশে বসে তাঁর চিঠি পেয়েছি—'আই কান্ট গিভ মাই বেস্ট দিজ ডেজ। ইটস আ ফ্লপ।' কী ভয়ঙ্কর মিথ্যা মূল্যায়ন। 'শ্রীচরণেষু মাকে'র বেলাতেও তাই। একই ধরনের কথা কলকাতা থেকে বহুদূরে বসে আমাকে বলেছেন! 'জল দাও' বই সম্পর্কে সামনেই তাঁর এক স্নেহভাজন ব্যক্তি যা খুশি তাই বলে গেলেন। অবাক হয়ে শুনলাম সন্তোষবাবু লোকটির কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আহূত এক সভায় সন্তোষবাবু বলেই ফেললেন যে, তাঁর বহু লেখাই হচ্ছে 'আ মিস্টেক।'

একথা সত্য যে শিল্পীমাত্রই, যথার্থ লেখক মাত্রই হচ্ছেন খুঁতখুঁতে মানুষ। তাঁরা নিজেদের লেখা সম্বন্ধে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। লেখার সামান্য ত্রুটি, অনেক ক্ষেত্রেই যা মনের মত করে বলতে পারিনি এরকম একট ধারণাপ্রসূত, তাঁরা অযথা বড় করে দেখতে চান। নিজের লেখার সত্যকার সমালোচক হওয়া সহজ কর্ম নয়। প্রায় সবাই মনে করি, যা লিখলাম তার প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তিতে যুগান্তর ঘটে যাবে। আবার সন্তোষবাবুর মত বিরল কিছু মানুষ, যাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব তিলমাত্র ছিল না, নিজেদের ভাল লেখাকেও দলে পড়ে খারাপ বলে বসেন। ব্যাপারটা বড়ই বিচিত্র, অন্তত তাঁর মুখের কথাকেই সার ধরে নেবার মত সমালোচক বিস্তর ছিলেন, আজও আছেন।

আমার মত সামান্য মানুষ কারও উকিল সাজতে গেলে সেটা হাস্যকর হবে। অন্তত সন্তোষবাবুর কোনও উকিলের দরকার নেই। একমাত্র মহাকাল পারেন সর্বগ্রাহ্য কোনও বিচারের ব্যবস্থা করতে। সেই রায়ই স্থির করে দেবে সাহিত্যের দরবারে সন্তোষবাবুর আসন কোথায়। সেদিন আজকের আমরা অনেকেই থাকব না। বাংলা সাহিত্য ও পাঠকবৃন্দ তো থাকবেন।

দুলেন্দ্র ভৌমিক

১. শ্রীচরণেষু — সন্তোষদাকে

আমার চতুর্থ উপন্যাস 'ঠিকানা' আমি উৎসর্গ করেছি সন্তোষদাকে। সেই কথাটা বেলভিউ ক্লিনিকে দেখা করতে গিয়ে ওঁকে বললাম। পরের দিনই ওঁর বোম্বে চলে যাওয়ার কথা। কথা বলতে ওঁর কষ্ট হচ্ছিল। তবু হাসলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন, 'কবে বেরুবে?'

আমি সঠিক জানতাম না। তবু আন্দাজে বললাম, '১লা বৈশাখের মধ্যেই বেরুবে।'

সন্তোষদা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। জানলার ওপারে মেঘলা আকাশ। আমি বললাম, 'আপনি বোম্বে থেকে ভাল হয়ে আসুন। ততদিনে বেরিয়ে যাবে।'

সন্তোষদা চোখ ফিরিয়ে এনে বললেন, 'আমায় ব্লাফ দিও না। আমার রোগটা কী তা আমি জানি। এর পরিণতিও আমার চাইতে তুমি বেশি জানো না।'

আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সন্তোষদা সেটা টের পেয়ে আমার হাতের ওপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে আমার কাঁধে রাখলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ভয় নেই, তদ্দিন টেনে-টুনে থেকে যাব--তোমাদের আরও কিছুদিন জ্বালাতে হবে ; জ্বলতেও হবে নিজেকে। তোমার বই দেখে যাব--যাবই।'

শুধু একবার, একবারই সন্তোষদা কথা রাখলেন না।

২. সন্তোষদা

কোনও কোনও মানুষ বা ব্যক্তিত্ব এমনই যে, যাঁরা নিছক চোখের আড়ালে চলে গেলেই মনে হয় না তাঁরা আর নেই। সন্তোষদা চলে গেছেন বেশ কয়েকদিন আগে, আর কখনোই তিনি ফিরে আসবেন না--এই চূড়ান্ত সত্যটি জানা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ভুলে যাই তিনি নেই। অফিসে চারতলার করিডোর দিয়ে যখন হাঁটি কিংবা ওঁর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে যাই, তখন কখনো কখনো মনে হয়, যাই একবার দেখা করে আসি। ঠিক তখনই ধক করে ওঠে বুকের ভেতরটা, টের পাই আমি ভুল করছি।

সন্তোষদার সঙ্গে প্রথম আলাপ যাট দশকের গোড়ায়। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছি। ঘনিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারটা বেশ মজার। তখন সন্তোষ ঘোষ আনন্দবাজারের প্রাণপুরুষদের অন্যতম। সবাই তখন তাঁর মেজাজ-মর্জি বুঝে চলেন। আমি একটা জিনিস তখন খুব পারতাম। তা হল, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের কথা বলার ধরন হুবহু

নকল করে দেখাতে পারতাম। বিশেষ করে যাঁদের আচরণে ও কথা বলার ভঙ্গিতে কোনও না কোনও ম্যানারিজম থাকত। সন্তোষদারও তেমন ম্যানারিজম ছিল। অফিসের অনেকেই দেখেছে আমি সন্তোষদার স্টাইলে দিব্যি কথা বলতে পারি। কথাটা উনি শুনে থাকবেন। হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকেই দেখি উনি বেজায় গম্ভীর। ঘরের মধ্যে আরও দু-চারজন ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতেই উনি বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দাও।'

আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বেয়ারাকে বললেন, 'এটা যেন পালাতে না পারে।'

আমার অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। ঠিক এইভাবে একবার আমার বাবা ঘরের দরজা বন্ধ করে আমাকে পেটাবার উদ্যোগ করেছিলেন। তাঁর হাতে বেত দেখেই আমি এমন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলাম যে, আমার বাবাও ঘাবড়ে গিয়ে ভেবেছিলেন, ব্যাপারটা কী? বেত না পড়তেই এত কান্না কীসের। সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম। এবার আমাকে কে বাঁচাবে? ঘরের মধ্যে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মুখ দেখে অনুমান করা মুশকিল আমার বিপদে কে কতখানি এগিয়ে আসবেন। সন্তোষদার হাতে অবশ্য বেত ছিল না। কিন্তু তাতে কী যায় আসে। টেবিলে বিস্তর পেপারওয়েট। তার একটিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি পেপারওয়েটগুলোর দিকে চোখ রেখে স্থির বসে রইলাম। সন্তোষদা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'তুমি নাকি আমাকে নিয়ে মিমিক্রি করছ?'

আমি এরকম আশঙ্কাই করছিলাম। ঢোঁক গিলে বললাম, 'আপনাকে কে বলল?' সন্তোষদা চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমার কাছ থেকে প্রশ্ন শুনতে চাই না, জবাব চাই। কে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, কথাটা সত্যি না মিথ্যে।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

সন্তোষদা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার মানে আরও কঠিন কোন শাস্তির জন্য আমাকে তৈরি হতে হল। সন্তোষদা টেবিল থেকে একটি সুদৃশ্য পেপারওয়েট নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা আমাকে একবার দেখাও।'

এমন কঠিন পরীক্ষায় ইতিপূর্বে কখনও পড়িনি। তখন তো আর উপায় নেই। অতএব দেখাতে হল। দেখতে দেখতেই হাসতে আরম্ভ করলেন। সবার শেষে বললেন, 'আমি সত্যি এইরকম করি? ও বোধহয় একটু বাড়িয়ে দেখাচ্ছে।'

সেইদিনই সন্তোষদা আমাকে তাঁর গাড়ি করে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। তখন তিনি থাকতেন পূর্ণ সিনেমার কাছে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বৌদিকে ডাকলেন। বললেন, 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। দেখে বলবে ঠিক আছে কিনা।'

আবার বৌদির সামনে দেখাতে হল। বৌদি বললেন, 'একেবারে তোমার মত।'

ব্যস, আমি ক্ষমা পেয়ে গেলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল, 'আর কখনো এ জিনিস কাউকে দেখাবে না, স্রেফ আমি দেখব। এটার কপিরাইট আমার।' এই কপিরাইট পরবর্তীকালে অনেকবার ভেঙেছি। কিন্তু এখন আর ভাঙতে পারি না। বুকের মধ্যে

কোথায় যেন কাঁটা বেঁধে।

সন্তোষদার মত মানুষের ভালবাসা পাওয়া দুর্লভ ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি এ ব্যাপারে অনেককেই ভাগ্যবান করে গেছেন। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কখনোই, কোনওদিন অফিসের সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। উনি যখন-তখন ডাকতেন, কখনো ভাল কথা বলতেন, কখনো বা নির্ভেজাল গালমন্দ। এই সন্তোষকুমার ঘোষই একদিন আমাকে ডেকে কোনও একটি অখ্যাত কাগজে প্রকাশিত আমার একটি বড় গল্পের চুলচেরা সমালোচনা করেছিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। সবার শেষে উনি বলেছিলেন, 'তোমার মধ্যে সম্ভাবনা প্রচুর। ক্ষমতাও আছে। কেবল পড়াশোনার চর্চাটা বাড়াতে হবে।'

সন্তোষদার নানা বিচিত্র স্বভাব এবং মতির কথা সবাই জানেন। আমিও কিছু কিছু জানি। একবার উনি গেলেন আমার পাড়ায় একটি স্কুলের রজতজয়ন্তী উৎসবে প্রধান অতিথি হয়ে। আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেতে পারিনি। ওই স্কুলে আমার মেয়েও পড়ে। অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'তুমি একটা অতিশয় নীচ। তুমি কীটদের চাইতে নিকৃষ্ট। আমাকে ভিড়িয়ে দিয়ে তুমি কেটে পড়লে। এবার বাড়ি গেলে সব টের পাবে। তোমার বারো বাজিয়ে দিয়ে এসেছি।'

আমি বললাম, 'ওটা তো একদিন বাজতই, না হয় একটু আগে বাজালেন।'

সন্তোষদা বললেন, 'তোমার বৌয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। খুব ভাল মেয়ে। ওকে আমি বলে এসেছি ও যেন এক হপ্তার মধ্যে তোমাকে ডিভোর্স করে। আমি উকিল ঠিক করে দেব। তোমার বৌকে কনভিনসড করে ফেলেছি।'

বাড়ি গিয়ে শুনলাম, আমার বৌকে তিনি ঠিক উল্টো কথাটাই বলে এসেছেন। আমার সম্পর্কে নানাবিধ প্রশংসা। আমার লেখা ও স্বভাব নিয়ে আলোচনা।

সন্তোষদা যখনই যে আসরে থাকতেন আমরা টের পেতাম। ওঁর আসা এবং যাওয়া দুটোই চোখে পড়বার মত। কিন্তু জীবন থেকে যেদিন, যে মুহূর্তে উনি চিরদিনের মত চলে গেলেন সেই মহাপ্রস্থানটা ঘটল নিঃশব্দে, সকলের অজান্তে। এটা ওঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

অথচ, কেন জানি না, এখনও মাঝে মাঝে ভুল করে ভেবে বসি, যাই একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। বিজয়া দশমীর পর উনি অফিসে থাকলে ফোন করে বলতেন, খুব তালেবর হয়েছ। দশমীর দু'দিন হয়ে গেল, প্রণাম করতে আসার কথা মনে পড়ল না।

আবার দশমী আসবে। কিন্তু কেউ ফোন করবে না। কোনওদিনও না!

সন্তোষদা

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসেই আমি প্রথমবার সন্তোষদাকে দেখি। প্রায় কুড়ি বছর আগে। রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক রমাপদ চৌধুরীর কাছেই শুধু যেতাম তখন মাঝে-মাঝে। সন্তোষদাকে লিফট-এ অথবা করিডরে দেখেছি কখনও কখনও কিন্তু আলাপ হয়নি।

আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যা তখন দোলের একদিন আগে বেরুত, রমাপদবাবুই সম্পাদনা করতেন। হলুদ বসন্ত শিরোনামে আমার লেখা একটি বড় গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ওই সংখ্যাতে। প্রথম অ-লিকার সংক্রান্ত লেখা। রাত দেড়টার সময় সন্তোষদা ফোন করে বললেন, নমস্কার। আপনি আমাকে চেনেন না, আমার নাম সন্তোষকুমার ঘোষ। নীলাঙ্গুরীয়র পরে আমি এত ভাল প্রেমের গল্প আর পড়িনি। আমার অভিনন্দন জানবেন।

জবাবে কিছু বলার মত অবস্থা ছিল না। অভিভূত হয়ে গেছিলাম। উত্তরে কিছু বলার আগেই উনি ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তারপরে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। কখন, কবে, কী করে সন্তোষকুমার ঘোষ যে সন্তোষদা হয়ে উঠলেন স্পষ্ট মনে নেই। উনি তাঁরই বাড়ি থেকে ফোন করতেন সাম্প্রতিক অতীতে। রেডিওতে অথবা কোনও অনুষ্ঠানে ঋতু গুহর গান শুনে। আমাকে ফোনে প্রথমেই বলতেন, তুমি একটি অত্যন্ত গর্বিত অদ্ভুত মানুষ, অথচ বাজে লেখক। তোমার স্ত্রী তোমার চেয়ে অনেক বেশি গুণী। আমি হেসে বলতাম, আপনার সঙ্গে একমত।

মাঝে-মাঝে আমাকে ফোন করে বলতেন, চলো একদিন আড্ডা মারি। ছুটির দিনে কখনও কখনও ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে অথবা ক্যালকাটা ক্লাবে ডাকতাম ওঁকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন উনি। তবে ওঁর কথা শুনতে ক্লান্তি লাগত না। সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ ছিল। আমি যখন বলতাম যে, আপনার এই ছটফটানি, হঠাৎ রেগে ওঠা, হঠাৎ বিষণ্ণতা, এই সবই হতাশা থেকে। সাংবাদিক সন্তোষকুমার সম্পাদকের শিরোমণি হয়েও সাহিত্যিক সন্তোষকুমারের প্রতি ঈর্ষায় জ্বলেন সবসময়। আপনার সাংবাদিক জীবন, সাহিত্য-জীবনকে পরিপূর্ণতায় ফুটে উঠতে দিল না যে, এই কল্পনায় সব প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে দিল। ভিতরে ভিতরে কেঁদে মরেন আপনি।

সন্তোষদা হাসতেন। বলতেন, তোমাকে যত বোকা ভাবি তত বোকা তুমি নও

দেখছি। তখন জানতাম না যে হতাশার চেয়েও তীব্রতর কোনও জ্বালায় ভিতরে ভিতরে জ্বলছেন তিনি।

অসুস্থতার কিছুদিন আগে টেলিফোনে সন্তোষদাকে আমি বকি। আমার অফিসে বেরবার খুব তাড়া ছিল একদিন, ওই সময়ে উনি ফোন করে যেমন ঢিলে-ঢালা অদরকারি কথা সাধারণত বলতেন তেমন করে কথা শুরু করেন। আমি বলেছিলাম, কাজের কথা থাকলে বলুন, বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই এখন।

সন্তোষদাকে কেউ এমন করে বলতে পারে তা ওঁর ধারণারও বাইরে ছিল। আহত হয়ে উনি ফোন রেখে দেন। তারপরে আর ফোন করেননি বহুদিন। আমিও বড় বদরাগী। হয়তো সন্তোষদার চেয়েও। তাই-ই পরে অনুতপ্ত হয়েছি।

যখনই দেখা হত সন্তোষদার সঙ্গে তখনই আমি হেসে কথা বলতাম। পান অথবা জর্দা চেয়ে খেতাম, উনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে পকেট থেকে বের করে তা এগিয়ে দিতেন। হেসে বলতাম, রাগ কি এখনও পড়েনি? উনি বলতেন, তুমি বিরাট লোক, বড়লোক, আমার মত আজেবাজে লোকের সাধ্য কি রাগ করে তোমার ওপর। আমি হাত ধরতাম হেসে, উনি হাত ছাড়িয়ে নিতেন।

আগে আগে কোথাও আমার কোনও লেখা বেরলেই সন্তোষদা ফোন করে প্রশংসা অথবা গালাগালি করতেন। গালাগালি আজকাল কেউই আর কাউকে করেন না। প্রশংসা যা করেন, তাও হয় পিঠ চাপড়ানোর জন্যে নয়তো চাটুকারিতার জন্যে। আন্তরিকতা এবং সততা হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। সন্তোষদা আন্তরিকতা ও সততার প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন।

অসুস্থতার আগে শেষ দেখা হয়েছিল সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের বৌভাতে। আমি বললাম, আমার লেখা কি পড়ছেন? মুখ ঘুরিয়ে বললেন, ট্র্যাস লেখা পড়ি না আমি!

বললাম, নাই বা পড়লেন, জর্দা দিন।

মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে, জর্দার কৌটো এগিয়ে দিলেন।

বললাম, আপনার বেয়াই মশাইকে দেব একটু?

সন্তোষদার বেয়াই মশাই নীরেনদার (কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আনন্দমেলার সম্পাদক) সঙ্গে সন্তোষদার বাক্যালাপ বন্ধ ছিল বহুদিন। আমি চেষ্টা চালিয়ে যেতাম, জর্দা চালাচালি করে যাতে কথা চালাচালিটা আরম্ভ করতে পারি। নীরেনদা বলতেন, সন্তোষদা আমার বাল্যবন্ধু এবং বেয়াই যদিও ; তবু একটা যাচ্ছেতাই লোক। ওর ব্যালান্স বলতে কিছুমাত্র নেই। সন্তোষদা বলতেন, পান চিবুতে চিবুতে ; নীরেন? ওর কথা আর বোলো না। শাস্ত্রে আছে, কালো ব্রাহ্মণ, সাংঘাতিক।

অথচ ফল্গু নদীর জলরেখারই মত ভিতরে ভিতরে দুজনেরই প্রতি দুজনের এক ধরনের গভীর ভালবাসাও ছিল।

সন্তোষদার বাহ্যিক চরিত্রকে বোঝা যেত না। যাকে ভালবাসতেন তাকেই মুখের ওপর বলতেন, তোকে আমি ঘেন্না করি। যাকে বাসতেন না, তাঁর ধারেকাছেই যেতেন

না। ভণ্ডামি ব্যাপারটা সন্তোষ ঘোষের চরিত্রানুগ ছিল না। এবং সেই কারণেই এই সমাজ এবং এই সময় তাঁকে শুধু অপমান আর অসম্মানই দিয়েছে।

আনন্দবাজারের কর্তৃপক্ষর প্রতি এবং সাম্প্রতিক অতীতে অভীককুমার সরকার ও অরূপকুমার সরকারের প্রতি ওঁর গভীর স্নেহমিশ্রিত সম্মান আমার কাছে প্রকাশ করতেন সবসময়ই নির্দ্বিধায়। আবেগের সঙ্গে বলতেন, "ওই ছেলেগুলো বাবার সব গুণই পেয়েছে। বড় ভাল ছেলে হয়েছে, বুঝলে। শুধু ভালই নয়, কাজের ছেলে। এমন ছেলে দেশে দশটা থাকলে পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটাই বদল হয়ে যেতে পারত।"

প্রশংসা, বাঙালি করতে জানে না। প্রশংসা করতে গেলেই তার শ্বাসকষ্ট বোধ হয়, মুখের চেহারা কালো হয়ে আসে, তার অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্রতা ভেতরের গভীর থেকে উঠে এসে চোখে ফুটে ওঠে। কিন্তু সন্তোষদা ব্যতিক্রম ছিলেন। প্রশংসা যেখানে প্রাপ্য সেখানে প্রশংসার ঘাটতি থাকত না বিন্দুমাত্রও।

বম্বে থেকে ফিরে যেদিন ওঁর অসুখের খবর পেলাম, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। শুনতাম উনি নাকি তাজমহল হোটেলে ছিলেন। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে। আমিও ওই হোটেলেই ছিলাম, অথচ জানতাম না। চিঠি লিখলাম ওঁকে একটা। অন্য অনেক কথার মধ্যে এইটুকুই জানিয়ে যে সন্তোষকুমার ঘোষের বহিরঙ্গ রূপে যাই-ই থাক না কেন, আসল মানুষটাকে চিনতে আমার কোনওই ভুল হয়নি। ভাল মানুষের কোনও বিকল্প নেই। তার গুণ, রূপ, মেধা যাই-ই থাক না কেন, মানুষ যদি ভাল না হয়, আমার বিচারে সে-মানুষের পাঁচ পয়সাও দাম নেই। ঝগড়া করেছি আপনার সঙ্গে কিন্তু অশ্রদ্ধা করিনি। প্রাপ্তবয়স্ক, অন্যমনস্ক মানুষদের মধ্যে মতবিরোধ থাকতেই পারে, তার মানে দ্বন্দ্ব নয়।

অফিসে বসে কাজ করছি। একটি চিঠি এল। বম্বে থেকে সন্তোষদার লেখা চিঠি। চিঠিটি পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। অপারেটরকে বললাম, পনেরো মিনিট কোনও ফোন না দিতে, কাউকে আমার কাছে না পাঠাতে। সন্তোষদার জন্যে একটু একা থেকে, ঝাপসা চোখে বাইরে চেয়ে, নিজেকে ক্ষুব্ধ এবং সন্তোষদার ভালবাসার চিঠির যোগ্য করে তোলার প্রয়োজন ছিল।

কলকাতা ফিরলেন। সরস্বতী পূজার দিন বেলভিউতে গেলাম ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার পর। মেয়ে মিলু ছিল সঙ্গে। হাত ধরে অনেক গল্প করলেন। মুখটা ওষুধে লাল হয়ে আছে, পানে নয়। ফিসফিস করে কথা বললেও টং টং করে গলা থেকে একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। বড় কষ্ট হচ্ছিল আমার কিন্তু সেটা ঢাকবার জন্যে খুব হাসিঠাট্টা করলাম। গান শোনালাম সন্তোষদাকে। খুবই খুশি হলেন। হাত ধরে বললেন, 'তোমাকে পাজি ভাবতাম, আসলে তুমি পাজি নও। আবার এসো।'

আমি তো জানতামই, হয়তো উনিও জানতেন যে, এ শুধু কথারই কথা। কিছু কিছু সময়, স্থান এবং সম্পর্ক সব মানুষের জীবনেই আসে, যখন দুবার আসা আর সম্ভব হয় না। তবুও, আমরা অন্যর হাতে হাত রেখে বলি : আবার এসো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিচু মুখে নিরুচ্চারে বললাম, যাওয়া নেই ; এসো।

২

১৯৬৪-৬৫ তে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যাতে আমি একটি বড় গল্প লিখি, তার নাম ছিল 'হলুদ বসন্ত'। গল্পটি প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরই প্রায় মাঝরাতে এক ভদ্রলোক আমাকে টেলিফোন করে বলেন, 'আপনি আমাকে চিনবেন না, আমার নাম সন্তোষকুমার ঘোষ। এইমাত্র আপনার বড় গল্পটি পড়ে শেষ করলাম। হলুদ বসন্ত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়র' পর এত ভাল প্রেমের গল্প আর পড়িনি।

আমি কিছু বলার আগেই—নমস্কার, কখনও দেখা হবে বলেই ফোনটা ছেড়ে দিলেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ তখন একজন প্রবাদপুরুষ। আনন্দবাজারের সুতারকিন স্ট্রিটের বাড়িতে কখনও রিসেপশনে কখনও বা লিফটে একজন ছোটখাটো একটু অগোছালো কিন্তু দামি ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোককে দেখতাম, মুখে কখনও বা সিগারেট।

জানতাম যে উনিই সন্তোষকুমার ঘোষ কিন্তু কখনো আলাপ করার মত সাহস বা সৌভাগ্য হয়নি।

শুধুমাত্র বেশ-ভূষাই নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও বোধহয় এক ধরনের বিশ্বস্ততা নিহিত ছিল।

যে সব মানুষেরা নিজেরা এক বিশেষ স্তরে নিজেদের উত্তীর্ণ করতে পারেন শুধুমাত্র তাঁদের পক্ষেই বোধহয় নবীন এবং হয়তো নীচু স্তরেরও সাহিত্যিক বা কবিকে এইভাবে সম্মান এবং উৎসাহ প্রদর্শন করা সম্ভব। সন্তোষদা এবং গৌরদার দেওয়া সেই উৎসাহ যতদিন বাঁচব ততদিন পাথেয় হয়ে থাকবে।

তারপর বছরের পর বছর গড়িয়ে গেছে। আনন্দবাজারের বাড়িতে আমার যাতায়াত বেড়েছে।

প্রতি সপ্তাহের শনিবারে রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক রমাপদ চৌধুরীর ঘরে একটি আড্ডা বসত, সেখানেই অনেক বাঘা বাঘা কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ যেমন, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্তোষদা খুব বেশি একটা রমাপদবাবুর ঘরে আসতেন না। হয়তো তাঁর ব্যস্ততা এবং তাঁর পদাধিকার দুই-ই তাঁকে তাঁর নিজের ঘরে বেঁধে রাখত। ঠিক কবে কী করে সন্তোষদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলাম তা ঠিক মনে পড়ে না।

চিঠি লিখতে আমার কোনওদিনই ক্লান্তি ছিল না। তাই কখনো কখনো কলকাতার বাইরে থেকেও সন্তোষদাকে চিঠি লিখতাম। একটা কথা বারবার আমার সেই সব চিঠিতে এবং টেলিফোনের কথোপকথনে ঘুরে ঘুরে আসত, তা হচ্ছে এই যে, সাংবাদিকতাই একজন মহান সাহিত্যিকের কবরভূমি হয়েছে। মনে হয় সন্তোষদা এই

কথাটি বার বার বলার জন্যই বিশেষ এক চোখে দেখতেন আমাকে। যশ প্রতিপত্তি অর্থ সব কিছু পাওয়া সত্ত্বেও মানুষটির মধ্যে গ্রীষ্ম দুপুরের তিতিরের মত এক ছটফটানি লক্ষ করতাম। তখন মনে হত সফলতার মধ্যেই প্রত্যেক মানুষের ব্যর্থতাও ওতপ্রোতভাবেই নিহিত থাকে। সন্তোষদার সমস্ত প্রাপ্তি যেন মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল তাঁর লেখনী-সত্তার রুদ্ধতাতে। এই যন্ত্রণার নীরব আর্তি তাঁর চোখের মণিতে কাঁপত। জানি না কজন এই কাঁপুনি লক্ষ করেছেন।

সন্তোষদার মত বিরাট মনের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। শুধু আমাকেই নয়, আমার আগের এবং পরের দিনের অগণ্য কবি-সাহিত্যিকের লেখা বিখ্যাত অখ্যাত এমনকি কুখ্যাত কাগজে পড়ে উনি যে ব্যক্তিগতভাবে কত প্রশংসা করেছেন তার কোনও হিসেব নেই। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কী করে যে সময় বার করতেন এটা ভেবেই আশ্চর্য হতাম। পেছন ফিরে তাকালে এখন মনে হয় যে, নিজের মধ্যের লেখককে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন বলেই এবং পরে সেই সত্তাকেই আবার পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েও বিফল হয়েছিলেন বলেই হয়তো যাঁরা লেখেন তাঁদের লেখা পড়ে এবং তাঁদের কাছ থেকে তিনি সন্তানহীনা রমণীর মত অন্যের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে খুশি হতে চাইতেন।

তবে বিফল যে হয়েছিলেন তা বলার মত ধৃষ্টতা অবশ্য আমার নেই। ওঁর নিজের গোষ্ঠীর কাগজের সম্পাদকরাই ওঁকে লিখতে বলতেন না বলে ওঁর মনে হয়তো গভীর অভিমান জমা ছিল। আমার মনে হত। তবে এ কথাও ঠিক যে, হয়তো না লিখে লিখেই এবং সব সময়ই এই কষ্টে-ক্লিষ্টে থেকে থেকে তাঁর কথনভঙ্গির মতই তাঁর লেখনভঙ্গিও এক বিশেষ ধরনের হয়ে উঠেছিল, একটু ঘোরনো পেঁচানোই বলব তাকে। তবে তা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত জানা ছিল না। তবে প্রচলিত গদ্যরীতিকে ভেঙে তিনি কমলকুমার মজুমদারেরই মত তাঁর নিজস্ব মূল এক রীতিতে থিতু হয়েছিলেন। কে বলতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকারা তাঁর ওই গদ্যরীতিকেই হয়তো বেশি দাম দেবে।

সন্তোষদা অন্য দশজনের মত ছিলেন না। একেবারে স্বতন্ত্র ছিলেন।

কিন্তু সন্তোষদার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অনেক বিপদও ছিল। তিনি এত বেশিমাত্রায় অভিমানী এবং ভাবাবেগসম্পন্ন ছিলেন যে কোনও অবুঝ নারীকেও তেমন দেখিনি। একটুতেই ক্ষুব্ধ হতেন। অন্য লোকের কথায় তৃতীয়জন সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ হতেন। ভারি কান-পাতলা লোক ছিলেন এবং তার সুযোগ-সন্ধান লোকে নিতে কসুর করত না।

তাঁর জীবিতাবস্থায় এবং বিশেষ করে শেষ জীবনে তাঁর অন্যতম নিকট বলে যারা দাবি করতেন তাঁর শ্রাদ্ধেও তাদের সকলকে দেখতে পাইনি।

সন্তোষদার বেয়াই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে এক সময়ে কোনও কারণে সন্তোষদার মনোমালিন্য ঘটে, হয়তো কারণটা খুব তুচ্ছও ছিল কিন্তু কারণটা যে কী আমি জানতাম না। যখনই আমার দুজনের সঙ্গে দেখা হত একসঙ্গে কোনও জায়গায়, যেমন কোনও বিয়েবাড়িতে অথবা আনন্দবাজারের কোনও অনুষ্ঠানে, তখনই আমি

চাইতাম যে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে যাক। এর জর্দার কৌটো নিয়ে ওঁকে দিতাম, ওঁর পান নিয়ে এঁকে কিন্তু সন্তোষদা মোটেই ভাব করতে চাইতেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন—ছোটলোকের সঙ্গে আমি কথা বলি না।

নীরেন হাসতেন অবশ্য আমার কাছেই। বলতেন, তুই জানিস না আমি চাই তো কী হবে? ও করবে না। সন্তোষদা একটা যাচ্ছেতাই লোক।

মাঝে-মাঝেই উনি সকালে আমার বাড়িতে ফোন করতেন মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে থেকে, অনেক সময়ই ঋতুর কোনও অনুষ্ঠান শুনে প্রশংসা করারই জন্যে। এবং জিজ্ঞাসা করতেন আমার সময় আছে কিনা। কোনও ছুটির দিনে, সময় থাকলে হয় ক্যালকাটা ক্লাবে, নয় ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে আড্ডা মারতাম। সেই সব আড্ডা সাধারণ বিষয়ে আড্ডা ছিল না। সন্তোষদাকে একেবারে একা অনেকক্ষণ ধরে পেয়ে মানুষটার মনের গভীরতার স্বরূপ, অপরিসীম সারল্য, শিশুসুলভ আন্তরিকতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হতাম। এই সব ছাড়াও এ কথা বুঝে চমৎকৃত হলাম যে সন্তোষদা একজন ওরিজিন্যাল মানুষ। এই বর্তমান যুগের চারপাশের অসংখ্য মেকি মানুষের ভিড়ের মধ্যে তাঁকে আলাদা করে চোখে পড়ত।

একদিন সকালে উনি যখন আমাকে টেলিফোন করলেন আমি তখন অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছি। যেমন প্রায়ই করতেন, টেলিফোন করে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেই যাচ্ছিলেন।

বাড়িতে যতটুকু সময় জেগে থাকি সবসময় আমাকে লেখাপড়া নিয়ে থাকতে হয়। আমার পড়াশুনার ঘরে ফোনও নেই। বাড়ি থেকে বড় একটা ফোন করিও না কাউকে অত্যন্ত জরুরি বা নিতান্তই ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপারের ফোন ধরিও না তাছাড়া, আমার খারাপ মেজাজেরও অত্যন্ত কুখ্যতি আছে। এবং সেটা মিথ্যাও নয়। হঠাৎই আমি বিরক্ত হয়ে সেদিন সন্তোষদাকে বলেছিলাম যে কাজের কথা থাকলে বলুন, আমার বাজে কথা বলার সময় নেই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে উনি ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তারপর থেকেই সন্তোষদা ন্যায্য কারণেই আমার ওপর অভিমানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি অনেকদিন। দুর্ভাগ্যবশত আমার অফিসের এবং লেখার ব্যস্ততার কারণে এবং এত ঘন ঘন সেই সময়টাতে অফিসের কাজে কলকাতার বাইরেও যেতে হত তাই গিয়ে যে তাঁর মান ভাঙাব, সেই সময়টুকু করে উঠতে পারিনি। শুধু সন্তোষদা কেন, কারো মন ভাঙানোর সময়ই আমার ছিল না এবং নেই। অনেক বছরই হল।

কাজে গেছিলাম বোম্বেতে। সেখান থেকে কলকাতা ফিরেই শুনলাম সন্তোষদার অসুখ করেছে এবং ডাক্তার ক্যানসার বলে সন্দেহ করছেন। অভীকবাবু এবং অরূপবাবু (সরকার) তাঁকে বোম্বেতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি তাজমহল হোটেলেই রয়েছেন। একদিন পরে ভর্তি হবেন ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। তখনই জানা গেল, আমি ঠিক যে সময়ে সেই হোটেলেই ছিলাম সন্তোষদাও ঠিক সেই সময়েই সেই হোটেলেই ছিলেন।

অথচ না জানার কারণে দেখা করা সম্ভব হয়নি। বোম্বের তাজমহল হোটেলটাও অবশ্য একটি ছোটখাটো শহরই বিশেষ। না জানলে দেখা না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

সন্তোষদার অসুখের খবরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন যে এতদিন গিয়ে মান ভাঙাইনি সেই কথা ভেবেই খুবই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত বোধ করি। নতুন করে মনে হয় যে কর্তব্য কোনও করণীয় থাকলে সময় একটুও নষ্ট করতে নেই। পরে করার সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। খবরটা জেনে সন্তোষদাকে একটা চিঠি লিখি বোম্বের হাসপাতালের ঠিকানাতে। তাতে অনেক অন্য কথার সঙ্গে তাঁকে লিখি যে আমি তাঁকে কী চোখে দেখতাম। আমার খারাপ মেজাজ, ব্যস্ততা সবকিছু সত্ত্বেও তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের উষ্ণতা এবং শ্রদ্ধার কোনও অভাব কোনওদিনও ঘটেনি এই কথা জেনে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।

অফিসে কাজ করছি। সকালের দিকেই একটি চিঠি এল বোম্বের ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিট্যাল থেকে। চিঠিটা খুলে দেখলাম, সন্তোষদার লেখা। চিঠিটির প্রথম দু'লাইন পড়েই, অপারেটরকে বলতে হল আমাকে এখন কোনও টেলিফোন দেবেন না। চিঠিটি পড়তে পড়তে চোখ জলে ভরে এল। আমার পড়া হয়ে গেলে অফিসের শ্রী আশিসকুমার বসুকে আমি আমার ঘরে ডেকে, চিঠিটা পড়তে দিলাম। সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর কাছে একটি নামই মাত্র। তিনি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন না। আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে চিঠিটি পড়তে পড়তে তিনিও কেঁদে ফেললেন। তখন নতুন করে বুঝলাম যে মানুষের হৃদয়ের উষ্ণতা, উত্তাপ এবং আর্তি, যদি তাতে সততার অভাব না থাকে, এবং প্রাপক যদি খলচরিত্রের মানুষ না হন, তাহলে একজন অপরিচিত মানুষকেও বোধহয় সমানভাবে ছুঁতে পারে।

এই চিঠিটিই তাঁর মৃত্যুর পরে 'দেশ'-এ ছাপা হয়েছিল। আমার নিজের ধারণা, ওই চিঠিটির মধ্যে দিয়েই সন্তোষদা তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করে গেলেন। নেভার আগে দারুণভাবে জ্বলে গেলেন। কে অভিমানী, কে রাগী, কার কান-পাতলা, কে মদ্যপায়ী, কার ভারসাম্য কম এই সমস্ত ব্যাপারই অর্থহীন এবং অজরুরি বলে মনে হয় যদি এইসব তুচ্ছ কুহেলিকার আড়ালে যে মানুষটি থাকেন তিনি প্রকৃতার্থেই হৃদয়বান এবং ভাল মানুষ হন।

অনেকেই নামিদামি দীর্ঘদেহী মানুষের কথা আমি জানি, যাঁদের যশের বিস্তৃতি অথবা শরীরের দৈর্ঘ্যই তাঁদের অন্তর্নিহিত সততার এবং ভালত্বর আনুপাতিক পরিমাণ নয়।

মৃত্যু অবিসংবাদী সত্য। সব মানুষকেই একদিন চলে যেতে হবেই। কিন্তু যাঁরা প্রকৃতার্থেই ভাল মানুষ, তাঁরাই সন্তোষদার মত দ্বিজ হয়ে ওঠেন। আর অন্যরা হারিয়ে যান বিস্মৃতির অতলে।

বোম্বে থেকে কলকাতায় এসে বেলভিউতে থাকার সময় একদিন দেখা করতে গেছিলাম। ওঁর কন্যা ও নীরেনদার পুত্রবধূ মিলু তখন ঘরে ছিল। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এ কে ঘোষ এলেন পরীক্ষার জন্য।

অনেক গল্প করলাম। নির্ধারিত সময়ের অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত। পান-জর্দাতে নয়, ঠোঁট দুটি কোনও ওষুধে লাল হয়েছিল। কথা বললে, মুখের মধ্যে থেকে। টং টং করে একরকম ধাতব শব্দ উঠছিল। কিন্তু মুখে হাসির কমতি ছিল না। গানও শোনালাম।

হেসে বললেন, তোমাকে যত খারাপ বলে মনে করেছিলাম, তুমি আসলে তত খারাপ নও।

আমিও হেসে বলেছিলাম, ভাল হয়ে উঠুন তখন বুঝিয়ে দেব খারাপত্ব কাকে বলে। ভাল আপনাকে হতেই হবে। নইলে, আপনার "ছোট লোক" বেয়াই-এর সঙ্গে ঝগড়াটা জমবে কেন?

নাঃ। নীরেন আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তবে, অনেক বদলে গেছে এই-ই যা। মানুষ ও খারাপ নয়।

বদলে তো আপনিও গেছেন। বদলের আরেক নামই তো জীবন। বদলানোই তো ভাল।

আমার কাছে বসে থাকা আর চলা এখন একই।

তারপর একসময় বলেছিলাম, চলি সন্তোষদা।

আবার এসো।

হেসে বলেছিলেন।

আসব।

লিফট-এ করে তখন নামাবে না লিফটম্যান। তাই হেঁটেই নামছিলাম।

নামতে নামতে ভাবছিলাম ; হয়তো মিথ্যেই বললাম। আসা কি আর হবে? সময় থাকবে কি?

নিচে পৌঁছতেই আমার এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। তার স্বামীর হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে। বসে আছে নিচের ওয়েটিং রুম-এ।

কেমন আছেন তোমার স্বামী?

ভালই তো ছিল। আজ সকাল থেকেই অবস্থা বদলে গেছে।

তাই?

মৌখিক সহানুভূতি দেখালাম আমি। ভদ্রলোককে চোখেও দেখিনি।

তুমি?

সন্তোষকুমার ঘোষকে দেখতে এসেছিলাম।

কী হয়েছে?

ক্যানসার।

উঃ বাবাঃ!

গাড়িতে পৌঁছে চাবি খুলতে খুলতে মনে হল একটু আগে সন্তোষদাকে বলে এলাম বদলের আর এক নামই তো জীবন। কিন্তু এখন আমি জানি যে জীবনেরই মত বদলের আর এক নাম বোধহয় মৃত্যুও।

হঠাৎ দেখা

পরিচয় গুপ্ত

সেদিন কত তারিখ ছিল মনে নেই। তবে আকাশে শরতের মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। চারপাশে এক সাজ সাজ রব।

বাসটা এসে যখন হ্যারিসন রোডের মুখে থামল, রাস্তাঘাটে আর অন্ধকার নেই। ঝলমলিয়ে উঠেছে সবকিছু।

সামনেই সর্পিল কলেজ রো। দুই পাশে রকমারি দোকান। কোনওটা আলো ঝলমলে কোনওটা টিমটিমে।

বাঁকের মুখেই পক্ষিরাজ অফিস। খোলা জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে রাস্তায়। ঢোকার মুখেই অনিলবাবুর সঙ্গে দেখা। সেই মাপা হাসি। সেই কথা...বসুন। মনোজবাবু আসবেন।

আমার কিছু কাজ আছে। বসে তখন সেইটুকুতেই মনোনিবেশ করি।

কতক্ষণই বা কেটেছে হঠাৎ সেই ঢাউস গাড়িটা ঢুকল গেটের ভিতরে। কেউ না কেউ এসেছেন। তবে আলোর স্বল্পতা হেতু দেখতে পাইনি আরোহীকে। নিম্নকণ্ঠে ক'টা অস্পষ্ট কথা ভেসে এল মাত্র।

মনের টানাপোড়েনের কাছে নতি স্বীকার না করে আবার আমার কাজে আমি ডুবে যাই।

সামনেই পার্টিসান ওয়াল। ওধারে যেন কেউ এসেছেন।

আমার কৌতূহলটা পার্টিসানে ধাক্কা খাওয়ার পরমুহূর্তেই একটা স্নেহপ্রবণ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল...'প্রয়োজনে পক্ষিরাজকে আমি বুদ্ধি উজাড় করে দিতে পারি, কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে অক্ষম।'

এতবড় কথা কে বললেন? পরে জানলাম তিনিই সন্তোষকুমার ঘোষ।

তাঁর পরিচয় আমার অজানা নয়। তাঁর কথা শুনেছি অনেকের মুখে, কিন্তু এত কাছে আসার সুযোগ ইতিপূর্বে ঘটেনি।

পরবর্তী ঘটনা আরও অপ্রত্যাশিত। পার্টিসানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তিনিই আমারই বিপরীত প্রান্তে বসলেন। এবং একটু হাসলেনও।

তিনি অন্য কিছু খেতে নারাজ। মনোজ দত্ত ওরফে মনোজবাবু ব্যবস্থা করলেন কাটলেট-এর। বেশ তৃপ্তি করেই খেলেন সেটা। তারপরই ফোন করলেন বাড়িতে।

যথারীতি যোগাযোগ হল। সম্ভবত স্ত্রীকে ডেকেই বললেন, এইমাত্র এডিটোরিয়ালটা

লিখে এলাম। খুব ভাল হয়েছে। আমি খুশি। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আজ আর ফিরছি না। মনোজের বাড়ি যাচ্ছি। পুজোসংখ্যা পক্ষিরাজের লেখা আজ রাতেই আমাকে শেষ করতে হবে। তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

সেদিন হঠাৎ যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম, দুঃখ পেয়েছি। সেদিনের সেই কথাটাই কানের কাছে বাজতে লাগল—'আজ আর ফি—র—ছি না।'

মনের মানুষ

বরুণ মজুমদার

মাঝে-মাঝে পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, যাদের বয়স বাড়লেও মনের দিক থেকে তারা ছেলেমানুষ থাকেন। আর এই ছেলে-মানুষী মনের জন্য তাঁরা অনায়াসে ছেলেমানুষদের সঙ্গে গল্প করে কাটাতে পারেন। তাদের কাছে আপনজন হয়ে ওঠেন। আর এটা নিঃসন্দেহে মানুষের একটা বড় গুণ। এই গুণের অধিকারী ছিলেন আমাদের সন্তোষদা--সন্তোষকুমার ঘোষ। যিনি সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে সন্তোষকুমার ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় সন্তোষ ঘোষের কলম যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা কিন্তু এই সন্তোষ ঘোষকে আবিষ্কার করতে পারবেন না। যাঁরা তার সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই জানেন এ সন্তোষ ঘোষ সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ। তাই অনায়াসে তিনি বলতে পারেন--পিকু, তোমার সঙ্গে আড়ি, মালতী তুমি বড় দুষ্টু মেয়ে। বনভোজনের আসরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হইহল্লোড় করতে দেখে সন্তোষদা তাদের সঙ্গে ছোটদের মত মিশে যেতেন, আর এসব মন্তব্যগুলো তাদের কাছে খুব সহজভাবেই ছুড়ে দিতেন।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সাহিত্য প্রয়াসীর মহোৎসবে এসে সন্তোষদা যেমন সাহিত্যিকদের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতেন, তেমনি সাহিত্যরসিক পাঠক এমনকি অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও হাসিঠাট্টায় মেতে উঠতেন। তখন সেই সন্তোষদাকে দেখে মনে হত না যে তিনি বাংলা সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তাঁকে দেখে মনে হত না, তিনি একজন উঁচুদরের সাহিত্যসেবী, তাঁকে দেখে মনে হত না যে তিনি একজন বিদগ্ধ মানুষ। সব কিছুর খোলস থেকে বেরিয়ে তিনি তখন একজন সাধারণ মানুষ। তাই দুপুরে খেতে বসতেন অন্য সকলের সঙ্গে মাটিতে আসন পেতে। শালপাতায় করে ভাত খাওয়া, মাছের ঝোলটা ভাল হয়েছে, আরো এক টুকরো মাছ নেওয়া--এসব দেখে সন্তোষদাকে ভাল লাগত। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে সাহিত্য নিয়ে আড্ডা। সবকিছুর মধ্যেই সন্তোষদার একটা রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যেত। কবিতা পড়তেন গড়গড় করে, গল্প বলতেন রসিয়ে রসিয়ে। শ্রোতা হিসাবেও তিনি তন্ময় হয়ে সব শুনতেন। মাঝে-মাঝে দু-একটা রসিকতাসুলভ মন্তব্যও করতেন। যেমন একদিন মন্তব্য করেছিলেন ওই সাহিত্যবাসরে সমরেশ মজুমদারের গল্প নিয়ে। আমিও সেই আসরে কবিতা পড়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কবিতাটা শুনে সন্তোষদা মন্তব্য

করলেন বড় সিরিয়াস কবিতা। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, গলা শুনে মনে হচ্ছিল, বরুণ খবর পড়ছে। হ্যাঁ, সন্তোষদা জানতেন আমি রেডিওতে খবর পড়ি। এই সন্তোষদাকে আমি আমাদের আকাশবাণী ভবনে দেখেছিলাম অন্য এক মূর্তিতে। একজন সঙ্গীতশিল্পী মারা গেছেন। দুপুরবেলা তার সেই মৃত্যুসংবাদটা একটা কাগজে লিখে এনে দিলেন সন্তোষদা। ভাই একটু বলে দেবেন। আমি সেদিন আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। একজন শিল্পীর মৃত্যুসংবাদ জানাতে ছুটে এসেছেন আর একজন শিল্পী। হ্যাঁ, সন্তোষদাকে শিল্পীই বলব। কারণ একজন শিল্পীর মধ্যে যে সুকুমার মনোবৃত্তি থাকে তাঁর মধ্যে সেই মনোবৃত্তিই ছিল। আর শিল্পী যেমন তার শিল্প সৃষ্টি করেন তেমনি সন্তোষদা তো সাংবাদিক শিল্পী। তিনি নিজেও অনেক সাংবাদিক সৃষ্টি করেছেন। আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ক্লাসের ছাত্র, তখন একদিন সন্তোষদার কাছে গিয়ে আলাপ করলাম। তিনি প্রথমটা কেমন যেন দু-একটা ধাক্কা মারার মত কথা বললেন, তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। আমার কাছে তাই কেমন যেন মনে হয়েছিল যে সন্তোষদার কথার প্রথম ধাক্কা যে সামলাতে পেরেছে সে পরবর্তীকালে তাঁর খুব কাছের মানুষ হয়েছে। এমনি করে তিনি বহু সাংবাদিক ও সাহিত্যিককে তুলেও ধরেছেন।

মাঝে-মাঝে টেলিফোন করে খবর নিতাম সন্তোষদা কেমন আছেন। উত্তর আসত খুব ভাল আছি। কোনওদিন তাঁকে বলতে শুনিনি শরীরটা ভাল নেই।

সন্তোষদা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন। তাই যেখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর বসত, আমন্ত্রিত হলেও সেখানে তিনি ছুটে যেতেন। গানের সুরে মশগুল হয়ে যেতেন। আর তারই সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীদের প্রতি ছিল তাঁর এক প্রগাঢ় ভালবাসা। আবেগ ভরে তাই অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতেন, তুমি অমুক গানটা গাও, তমুক গানটা গাও। রবীন্দ্রসদনে একবার রবীন্দ্র ও নজরুল সন্ধ্যা হচ্ছে। আমি তার পরিচালনার ভার পেয়েছিলাম। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের গান হচ্ছে, আর সন্তোষদা চেয়ারে বসে মাথা নাড়ছেন এক মনে। কোনও দিকে তাঁর কোনও কিছু খেয়াল নেই।

কোনও মানুষকে দেখে পুরনো হয়। কিন্তু সন্তোষদাকে যতবারই দেখেছি ততবারই মনে হয়েছে আগের থেকে তিনি যেন অন্য মানুষ। তাই সন্তোষদা পুরনো হননি। কী সাহিত্য কী সাংবাদিকতা সব ক্ষেত্রেই তিনি যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি নিছক আড্ডার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন চিরযুবক। সেই মানুষটিকে হারিয়ে আমরা হারালাম এক যুগোত্তীর্ণ মানুষকে। আমরা হারালাম কিশোরদের প্রিয়, যুবকদের প্রিয়, বৃদ্ধদের প্রিয় এক প্রিয়জনকে।

খালি পায়েই চলে গেলেন

রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী

আমার ছেলেবেলা থেকেই সন্তোষকুমার ঘোষকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার বাবা বিমল রায়চৌধুরীর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। তাই আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আমি তখন খুবই ছোট। আমার মা কবিতা সিংহ ও আরো অনেক কবি-সাহিত্যিক আমাদের বাড়িতে প্রায়ই সাহিত্যের আড্ডা বসাতেন। অনেকেই আসতেন তবুও সেই ছেলেবেলাতেই সন্তোষ-মামাকে সবার চেয়ে কেমন যেন আলাদা মনে হত। আমরা মানে ভাই-বোনেরা ওঁকে 'সন্তোষ-মামা' বলেই ডাকতাম। সেই বয়সেই বুঝতাম, ছোটদের খুব কাছে তিনি টানতেন না, তবুও সন্তোষ-মামাকে আমার বেশি ভাল লাগত। কেন? জানতাম না। তখন হয়তো ছেলেবেলার অল্প বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারিনি। তবে আজ অনেকটাই বুঝতে পেরেছি, যে কারণে ওঁকে আপনজন মনে হত, সেটা ওঁর শিশুসুলভ আচরণ। সন্তোষমামার মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটি শিশু লুকিয়ে থাকত। অল্পে রেগে যেতেন, নিজের কথা বলতে ভালবাসতেন, মাঝে-মাঝে এলোমেলো কথা বলতেন। এমন ছটফটে স্বভাব ছিল ঠিক যেন একটি ছোট ছেলে। একটা তচনচে ভাব, শিশুদের মত চালচলন।

একবার আনন্দবাজারে সন্তোষ-মামার সঙ্গে দেখা করতে গেছি। সন্তোষ-মামা একটি দরকারি লেখা লিখছিলেন। আমাদের দেখে লেখা বন্ধ করে গল্প করতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে পানের পিচ ঠোঁট দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, অথচ তিনি তা সামলাতে পারছেন না! হঠাৎ একটা কাগজ হাত দিয়ে দুমরে মুচড়ে থুতু দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর আবার গল্প করতে লাগলেন। চা খাওয়ালেন। হঠাৎ কী মনে হল তাঁর—ঘেঁটে ঘেঁটে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। তারপর সেই মোচড়ানো কাগজটা বের করলেন। সেটাকে আবার সোজা করে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আগে মনে হয়েছিল দরকার নেই। কিন্তু না এখন মনে হচ্ছে দরকারি বলে নিজেই ছেলেমানুষের মত সরল হাসি হাসলেন।

আর একটি ঘটনা : সন্তোষ-মামা দাবা খেলতে খুব ভালবাসতেন। আমার বাবাও ভাল দাবা খেলতে পারতেন। দুজনে প্রায়ই দাবা খেলতেন এবং ঝগড়া-ও করতেন। বাবার কাছ থেকে আমিও দাবা খেলা শিখেছিলাম। একদিন বাবা আর সন্তোষ-মামা দাবা খেলছিলেন। বাবার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে, মানে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমি খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ আমার একটা চাল মনে এল, বাবার হয়ে আমি চালটা দিলাম। সন্তোষ-

মামার রাজা আর মন্ত্রী ঘোড়ার চালে একসঙ্গে ধরলাম। সন্তোষ-মামা কিছুতেই আমার চালটা বাবাকে দিতে দেবেন না। আর বাবাও ছাড়বেন না। চালটা নেবেনই। বাবা বলছেন "চালটা ধরুন আমিই দিয়েছি। আমারও তো মনে হতে পারত।" সন্তোষ-মামা কিছুতেই মানবেন না। বাবাও ছাড়বেন না। ১৫ মিনিট ধরে ঝগড়া চলতে লাগল। দেখেশুনে আমি হতবাক। মনে হল যেন দুটি কিশোর খেলা নিয়ে ঝগড়া করছেন। শেষে সন্তোষ-মামা বাচ্চাদের মত 'আমি আর খেলব না" বলে বোর্ড উল্টে উঠে পড়লেন। তখন আমি তাঁর পায়ের চটি লুকিয়ে রাখলাম। তিনি এত ছেলেমানুষ যে রাগ করে খালি পায়েই চলে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম—একজন প্রায় প্রৌঢ় মানুষ কোঁচা দুলিয়ে রাস্তা দিয়ে একটি শিশু হয়ে অভিমানে হেঁটে যাচ্ছেন। ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, আরেকজন ছেলেমানুষ গুম হয়ে বসে উল্টোনো দাবার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

আজ জানি না, ইহলোক পেরিয়ে অন্য কোনও লোকে, আবার তাঁরা দাবার বোর্ডে বসে ছেলেমানুষি করছেন কিনা। ওঁরা তো দুজনেই এখন আমাদের ধরাছোঁয়া আর দৃষ্টির বাইরে।

একজন মানুষ যতদিন কাছে কাছে থাকে, ততদিন আমরা তার দিকে নজর দিই না। কিন্তু যেই সে চোখের আড়াল হয়ে যায়, অমনি তার হিসাব কষতে বসি।

সন্তোষকুমার ঘোষ বলে এই যে মানুষটিকে আমরা হারালাম, সাধারণ হিসাবে আরো দশ পনেরো বছর ধরে, তাঁর কাছে আমাদের, তার চেয়েও বেশি পক্ষিরাজ-এর নবীন পাঠকদের আশা করবার ছিল। পক্ষিরাজ পত্রিকার সঙ্গে গোড়া থেকেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এমনকি বলা যায় পক্ষিরাজ-এর নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাতে তাঁর অনেক অবদান ছিল। তাঁর কথা এবার একটু ভেবে দেখো।

আসলে তিনি বড়দের জন্যই লিখতেন এবং সার্থকভাবেই লিখতেন। এ সব তাঁর কাছে পাওয়া ফাউ। তোমরা ছোট বলে তাঁর কাছে বিশেষভাবে আলাদা করে কী পেয়েছ একবার চিন্তা করে দেখো, যা আর কারো কাছে পাওনি। অন্তত তেমন করে পাওনি। আমি বলি কী বড়দের তিনি দিয়েছিলেন সুচিন্তিত এবং সচেতনভাবে জিনিস। তিনি ছিলেন সাংবাদিক এবং গল্পকার। এদের মনগড়া সবচেয়ে বড় কাজ হল পাঠকদের দুনিয়া চিনিয়ে দেওয়া এবং সংসারের প্রত্যেকটি দিক লোকচক্ষুর সামনে খুলে ধরে দেওয়া, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। হাজার ভাল হোক, সে একরকম সচেতন কাজ। কিন্তু ছোটদের বেলায় তিনি অকপট চিত্তে নিজেকেই তুলে ধরে দিয়েছেন।

সবরকম জ্ঞানেরই কাজ হল যা দেখা ছিল না, তাকে দেখিয়ে দেওয়া ; যা জানা ছিল না, তা জানিয়ে দেওয়া ; যা বোঝা যাচ্ছিল না, তা বুঝিয়ে দেওয়া! চিন্তারাজ্যের সবকিছুই এর মধ্যে পড়ে যায়। বড়দের গল্পে-প্রবন্ধে সন্তোষকুমার এ কাজ খুব ভালভাবেই সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু তোমাদের দিয়েছেন তার চেয়েও অনেক বেশি। নিজেকে দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। সব জ্ঞানের পরম জ্ঞান হল নিজেকে চেনা। সন্তোষকুমার এইভাবে তোমাদের তারই পাঠ দিয়েছেন।

মানুষ সংসারে একা আসে, একা যায়। কিন্তু সুখের বিষয়, এই দুইয়ের মধ্যিখানের সময়টা একা কাটে না। মা-বাবা, গুরু-শিক্ষক, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, জন্তু-জানোয়ার আর সবটাকে ঘিরে বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে জীবন কাটে। ছোটরাও কেমন করে সংসারের বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে মিলেমিশে বাস করতে পারে, বারবার সন্তোষকুমার সেই পাঠ দিয়েছেন।

কলকাতার কড়চা

১. এই তো সেদিন

ক'মাস আগে যখন নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন সন্তোষকুমার ঘোষ সেদিন থেকে খাঁ খাঁ করছে আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর উজ্জ্বল, প্রশস্ত চেম্বারটি। গায়ক, লেখক, চিত্রকর, অধ্যাপক, সাংবাদিক, লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, সম্পাদিকা, বড় কোম্পানির অফিসার, থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমার কলাকুশলী ইত্যাদি অসংখ্য পেশা ও নেশার মানুষ এসে ভিড় করত এই ঘরটিতে। হয় আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, নয়তো কেউ তাঁর সমস্যা ডাকসাইটে সাংবাদিককে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কিংবা নতুন একটা আন্দোলনের, কি নমস্য কোনও মানুষের জন্মশতবর্ষ পালনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। যখন এসব কিছুই নেই তখন হয়তো সন্তোষবাবু একা-একা লিখে যাচ্ছেন সুচিন্তিত সম্পাদকীয়। সেরকম সময়ে তাঁর ঘরে ফোনের লাইন পাঠানো নিষিদ্ধ ছিল। এমনিতে অবশ্য সন্তোষবাবু বেশ ভালরকম নির্ভরশীল ছিলেন টেলিফোনের ওপর। কারও লেখা পড়ে ভাল লেগেছে অতএব ফোন করে সেকথা জানানো চাই ; কোনও প্রতিষ্ঠান হয়তো ধরেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করবে তাই ফোন করে বলতেই হচ্ছে, "হেমন্ত, ওদের অনুষ্ঠানে একটু যেও" ; কোনও সহকর্মী হয়তো অসুস্থ তাই খোঁজ নেওয়া চাই, আবার হয়তো প্রাণের টানে কোনও বন্ধুজনকে রিং করে বলা, "এখনও শম্ভুবাবুর নাটকটা দেখা হল না তোমার? তোমাদের মত সংস্কৃতিহীন লোকদের নিয়ে কী করি বলো তো?" সন্তোষবাবুর বেশ বড়, বড় টেবিলটায় চিঠিপত্রের একটা মস্ত ঢিবি সব সময় থাকত, একটা পানের ডিবে, একটা কাচের পদ্মের মতন অ্যাশট্রে (যদিও শেষ দিকে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি), একটা পেতলের এবং অনেকগুলি কাচের পেপারওয়েট, পিন-ক্লিপের কৌটো ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে টেবিলের কাচের নিচেটা আরও লক্ষণীয় কারণ সেখানে রবীন্দ্রনাথের ছবি, হস্তলিপি আর ইংরেজিতে একটা ছোট্ট ঠাট্টা : ইউ আর ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এ জিনিয়াস। এই সতর্কবাণী না থাকলেও সেটা বুঝতে কারোই অসুবিধে হত না, কারণ সন্তোষবাবুর প্রতিভা সর্বক্ষণই কোনও না কোনওভাবে বিকীর্ণ হতই। সন্তোষবাবুর প্রকাণ্ড সুইভেল চেয়ারের ডান পাশেই কতকগুলো টেলিফোন রিসিভার আর একটা বইয়ের তাক। আরাম করার প্রয়োজন হলেই একটা পুস্তক হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণে একটা ছোট্ট ডিভানে এলিয়ে পড়তেন তিনি। পড়তে পড়তে একটু হয়তো ঘুমিয়ে নিলেন, তারপর আবার জেগে উঠে কাজ আর কাজ। সব মিলিয়ে

অফিসঘরটি যেন তাঁর দ্বিতীয় নিবাস যেখানে দিনের একটা বড় সময় এবং কখনো কখনো রাতেরও একটা অংশ তাঁকে কাটাতে হত। সন্তোষবাবুর স্মৃতি ও স্পর্শ অধ্যুষিত সেই ঘরটি এখন শূন্য। সে ঘরে আর ফিরবেন না তিনি। এখন সে ঘরের পাশ দিয়ে যেতেও মনে মনে নিঃশব্দ হাহাকার।

২. দ্বারের চাবি

ঠিক একবছর আগে, ২৬ ফেব্রুয়ারি উল্টোডাঙার সদ্যনির্মিত 'বিধান-নিবাস' ভবনের একশো আঠেরোটি ফ্ল্যাটের চাবি মালিকদের হাতে দেওয়া হবে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠান হল। দ্বিপ্রাহরিক ভোজেরও বন্দোবস্ত ছিল। খাওয়ার পরই ফ্ল্যাটের কর্তা সন্তোষকুমার ঘোষ হইহই করতে লাগলেন, কই, চাবিটা দিন তো। চাবিটা নিয়েই এক্ষুনি পালাতে হবে। দেরি করা যাবে না। আরেক ফ্ল্যাটের সদ্যোতন মালিক, বন্ধু কানাইলাল বসু বোঝাতে লাগলেন, দাঁড়ান। আগে কাগজপত্রে সই করতে হবে। সব খাওয়া-দাওয়া শেষ হোক। একটু সবুর করুন। কিন্তু সন্তোষ ঘোষ বড় অস্থির। দেখি, কীসব কাগজে সই করতে হবে, করে দিচ্ছি। আর চাবিটা দিন। আমার বড্ড তাড়া। বিধানচন্দ্র কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান, সন্তোষকুমারেরও সহকর্মী গৌরকিশোর ঘোষ তখন বললেন, ঠিক আছে ভাই। ওকে চাবিটা দিয়ে দিন। ডকুমেন্টসেও সইসাবুদ করিয়ে নিন। ও চলে যাবেই যখন। সেই একশো আঠেরোটি ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রথম মালিকানা পেলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। ফ্ল্যাটের চাবি প্রথম তিনিই নিলেন। চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে এক চক্কর বারান্দা ঘুরে দেখে বললেন, ঠিক আছে। তারপরেই প্রস্থান। সেই আস্তানায় এক বছর ধরে মালপত্তর এল। সাজানো-গোছানোও হল। শেষতক ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখে খোদ কর্তা এসে কায়েম হলেন। ২৬ তারিখে সাড়ম্বরে 'বিধান-নিবাস' আবাসনের প্রথম বর্ষপূর্তির আয়োজন হয়েছে। সেই ছাব্বিশের মধ্যাহ্নে প্রথম চাবি নিয়েছিলেন যিনি সেই সন্তোষকুমার ঘোষ চাবিটি রেখে চলে গেলেন বরাবরের মত। জানা ছিল না, সেদিনও তাঁর এত তাড়া। সন্তোষকুমার ঘোষের প্রিয় একটি গানের অন্তরা মনে পড়তে পারে যেখানে দ্বারের চাবি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা, ঘরের চাবিও। সেও-ও তো মহাপ্রয়াণের সঙ্গীত।

৩. নানা রঙের দিন

তাঁর বেলা শেষের দিনগুলিও যেন নানা রঙের দিন। ভারী ভারী কথার পিঠে হঠাৎ মুখের রেখায় কোনও রসিকতা ফুটে উঠবে না—সন্তোষকুমার ঘোষকে যেন ভাবাই যায় না। অফুরন্ত জীবনীশক্তিতে ভরপুর—তা তিনি যেখানেই যে অবস্থায় থাকুন না। একেবারে শেষ দিকে তাঁর তিন সহকর্মী গেছেন বেলভিউতে। কথা বলতে পারেন না। কিন্তু হার মানার পাত্র উনি নন। তাড়াতাড়ি কাগজ কলম টেনে নিলেন। হিমানীশ গোস্বামী পড়লেন : কাল রাত বারোটায় সিস্টারকে আলো জ্বেলে দিতে বলি। সিস্টার

বলল, কী করবেন এত রাতে? এবার ঘুমিয়ে পড়ুন। বললাম, একটু বইটই পড়ব। সিস্টারের জবাব, কী আশ্চর্য, আপনার দেখি বইপড়ারও বাতিক আছে।

সহকর্মীরা হেসে উঠলেন। উনিও যোগ দিতে গেলেন। ঠোঁটের কষ বেয়ে হাসিটা গড়িয়ে পড়ল।

৪. চিরযুবা সন্তোষকুমার

প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ-এর অকালমৃত্যুতে আমরা মর্মাহত।

সন্তোষকুমার ঘোষ শুধুমাত্র সভাপতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন, প্রমা-র প্রাণপুরুষ এবং সত্যিকারের সারথি।

সুরসিক, সু-বাচন, বন্ধুবৎসল এই মানুষটির সক্রিয় সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবীদের সুপরিচিত সংস্থা 'প্রমা' সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসারে আজ অগ্রণী ভূমিকায়।

'প্রমা' আগামী দিনেও তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যাবে।

আমরা অনতিবিলম্বে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সাধারণ মানুষ সকলকে নিয়ে একটি মঞ্চে প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষের এক স্মরণসভার আয়োজন করছি, যেখানে তাঁর সকল অনুরাগীদের প্রবেশ থাকবে অবাধ।

সেই সঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বহু বিশিষ্টের কলমে তাঁর বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের। চিরযুবা সন্তোষকুমার।

প্রয়াত সন্তোষকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহকর্মী, আত্মীয়-পরিজন প্রত্যেকের কাছেই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁর বিভিন্ন রচনাদি, চিঠিপত্র, দুষ্প্রাপ্য ছবি ইত্যাদি আমাদের দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

বিনীত

প্রীতিভূষণ চাকী (কার্যনির্বাহী সভাপতি) প্রদীপ ঘোষ (সহ সভাপতি) অশোককুমার চক্রবর্তী (প্রিয়দর্শী সম্পাদক) এবং প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থার সতীর্থবৃন্দ।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ৩৩ / ৪৬ / ১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা—৯।

সন্তোষকুমারের কাছে যা ছিল মন্ত্রোপম

[একটি সংবাদ প্রতিবেদন]

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্বেতবর্ণ চন্দ্রাতপতলে মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল মধু বার্তা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধীর্ন সন্তোষধীঃ। মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত মোহনলাল বাজপেয়ী ; তাঁর পিছনেই মাল্যশোভিত চিত্রে বড় পরিচিত একটি সস্মিত আনন, সন্তোষকুমার ঘোষের। বিধান নিবাস অডিটোরিয়ামের তিনদিক ঘিরে সাদা কাপড়ে আর সাদা ফুলে শোকের শুভ্রতা ; মেঝেয় সাদা চাদরে উপবিষ্ট শুভ্রবসনা নরনারী সন্তোষকুমারের সমবয়সী বন্ধু সহকর্মী সতীর্থ ভক্ত গুণগ্রাহী পাঠক যাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ শিশির বসু, বিমান ঘোষ, শংকর ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, বিমল কর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, বরুণ সেনগুপ্ত, মদন মিত্র, বুদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, আশিস চট্টোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বাজপেয়ীর সুরেলা উচ্চারণে ধ্বনিত হচ্ছিল এই পৃথিবীর ধূলি মধুময়, তুমি যে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছ—পুণ্য সেখানে তোমাকে সঙ্গ দিক আর সন্তোষকুমারের কাছে যা ছিল মন্ত্রোপম সেই সঙ্গীতে বেজে উঠছিল, 'লেগেছিল কত ভাল, এই যে আঁধার আলো খেলা করে সাদা-কালো উদার নভে।' সেখানে ভৈরবীতে 'সোনার থালায় দুখের অশ্রুধার' নিবেদিত হল গানে। গাইছিলেন ঋতু গুহ। কয়েকটি পুরনো ব্রহ্মসঙ্গীত দিয়ে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় গানের দরজাটি খুলে দিলেন এবং সন্তোষকুমারের আবেগমথিত হত যে গানের বাণীকে ঘিরে সেই রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানও শুনিয়েছেন তিনি। তারপর শুধুই গান, রবীন্দ্রনাথের গান, শোনালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা ঘটক, মায়া সেন, অর্ঘ্য সেন প্রমুখ। শেষে শান্তিদেব ঘোষ যিনি কিছুকাল আগেও নার্সিং হোমে গিয়ে অসুস্থ সন্তোষকুমারকে সঙ্গীতে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন, তিনি নিবেদন করলেন কীর্তনাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত, 'ওহে জীবনবল্লভ'। সন্তোষকুমার ঘোষের প্রিয় ছিল যাঁদের কণ্ঠের গান এদিন গান করেননি অথচ উপস্থিত ছিলেন পূরবী মুখোপাধ্যায়, সুপর্ণা চৌধুরী, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, বাণী ঠাকুর, মঞ্জরীলাল, শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সেই শ্রদ্ধাবাসরে সবশেষে টেপে শোনানো হল সন্তোষকুমার ঘোষের কণ্ঠ। অতীব চেনা সেই স্বর, সেই বাক্যভঙ্গি, সেই চেনা বিষয়, 'রবীন্দ্রনাথ'। শ্বেতপুষ্পশোভিত পরিচিত সেই পট মুহূর্তেই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল।

আকস্মিক

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে যতদূর সম্ভব সেটা ১৯৬১ সালের কথা। তখন আমি ঠিক লেখক নই, একটা উপন্যাস বাজারে প্রকাশ পাবার কথা আছে। সেই উপলক্ষে কলকাতায় আসা। থাকি বহরমপুরে। কলকাতায় এলে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় উঠি। আত্মীয়ের মধ্যবিত্ত সংসারে আমি যে বাড়তি মানুষ কলকাতায় এলে এটা আরও বেশি টের পাই। খুব সংকোচের সঙ্গে একটা রাত কাটিয়ে আবার বহরমপুর। এ-ভাবেই একবার কলকাতায় এসে প্রথম সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়।

তখন মানিক স্মৃতি পুরস্কার উপলক্ষে মতির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কলকাতায় এলে মতির বাড়ি সকালের দিকে চলে যাই। সেদিন সকাল সকাল আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছিলাম। মতির বাড়ি কাছেই। হেঁটে যাওয়া যায়। ইচ্ছে ছিল সকালের জলখাবার পর্বটি সেখানে সারব। কিন্তু গিয়ে দেখছি মতি কোথায় বের হবে বলে পোশাক পাল্টাচ্ছে। আমাকে দেখেই বলল, চলো ঘুরে আসি। সেটা কোথায় কার কাছে জিজ্ঞেস করার অবকাশ হয়নি। হয়তো বা কোথাও নিছক আড্ডা মারতে যাওয়া। শ্যামবাজারের কফি-হাউসেও হতে পারে, আবার কলেজ স্ট্রিটের কফি-হাউসে। কাজেই নিছক আড্ডা দেবার জন্যই বের হওয়া যখন, তখন আর বিস্তারিত জেনে কী হবে। কফি-হাউসে বসলে কিছু তো খাওয়া হবেই। মতির সঙ্গে সেই আশায় বের হওয়া গেল। কলকাতায় চলাফেরা করতে হলে যেসব সতর্কতার দরকার মতির কাছেই তখন শিখি—যেমন একদিন মতি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, ট্রামে উঠতে হলে রড বাঁ-হাতে ধরতে নেই। ডান হাতে ধরতে হয়। এ-সব বলার কারণ আমার মধ্যে একটা গ্রাম্য স্বভাব আছে সেটা বুঝেই মতি সর্বত্র আমাকে সাবধান করে দেয়। আমার ব্যবহারে কোনও অস্বস্তির কারণ না ঘটে এটাও ছিল মতির আর একটা চিন্তার বিষয়। যাই হোক মতি আমাকে নিয়ে এসে একটা জায়গায় নামল। নেমে বলল, এটা পাইকপাড়া। কলকাতা সম্পর্কে কীরকম জ্ঞান গম্যি এ-কথাতেই বোঝা যেতে পারে। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপতেই ছোট্ট একটি মেয়ে দরজা খুলে দিয়ে গেল। মতি আমাকে বসতে বললে, বসলাম। দু'জনে বসে আছি। ভিতরে খবর গেছে। এক ভদ্রলোক অমায়িক হাসি নিয়ে মতির দিকে তাকাতেই মতি বলল, এর নাম অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন,

হ্যাঁ হ্যাঁ—তোমার একটা গল্প পড়েছি। গল্পটায় প্ল্যাটফরম না লিখে প্লেটফরম লিখেছ কেন! আমার বানান জ্ঞান খুব প্রখর নয়। কেমন সংকোচে পড়ে গেলাম। মতির সঙ্গে কিছুক্ষণ তাঁর পরিচয়ে প্রকাশিত গল্প নিয়ে আলোচনা হল। আরও কী কী কথা যেন! তবে তিনি মতির গল্পের খুবই যে অনুরাগী আমার বুঝতে কষ্ট হল না। এ-সময় তাঁর জন্য জলখাবার এসেছে, আমাদের জন্য চা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখলেন, কী বুঝলেন জানি না, তাঁর খাবারের প্লেটটি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন—'খাও। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।' এ-সব বিষয়ে আমার একটি নির্বিকার স্বভাব আছে। সহজেই তাঁর প্লেটের খাবার তুলে অসংকোচে খেতে থাকলে মনে হল মতির পছন্দ নয় আমার এ-ভাবে খাওয়া। আমি ঠিক বুঝতেও পারছি না তিনি কে? মতিরই কোনও বর্ষীয়ান বন্ধুবান্ধব ভেবেছি! পেটে খিদে খুব। ভদ্রতার মুখোশও আমার বিশেষ নেই। খাওয়ার পর পরিতৃপ্ত হওয়া গেল। সেটা বড় কথা। বের হয়ে আসার মুখে রাস্তায় বললাম, উনি কে?

মতি আমার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ! তারপর বলল, সন্তোষকুমার ঘোষ।

কী করেন!

মতি যেন আকাশ থেকে পড়ল। তখনকার খ্যাতিমান গল্পকার কিংবা ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে আমার কোনও বিশেষ ধারণা ছিল না। দু-একজনের নাম যে জানি না সেও আবার বলা যায় না। কী করেন বলাতে মতি বলল, তোমাকে নিয়ে সত্যি চলা মুশকিল। উনি আনন্দবাজার পত্রিকার নিউজ-এডিটর।

আমি ফের বললাম, নিউজ এডিটরকে কী করতে হয়!

মতি এককথায় বলল, জানি না। আচ্ছা তুমি সত্যি কী! তুমি ওঁর গল্প পড়োনি।

অকপটে বললাম, পড়িনি।

মতি ফের বলল, লিখতে হলে ওঁর গল্প পেলেই পড়বে।

সেই থেকেই কেন জানি মনে হয়েছিল, তাঁর লেখা আমার পড়া দরকার। তখনও আমার লেখা দেশ পত্রিকা কিংবা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়নি। ঠিক করলাম সংসারে যতই অভাব থাকুক, ওঁর লেখা পড়ার জন্য কাগজ রাখা দরকার। দেশ পত্রিকার নিয়মিত পাঠক আমি সেই থেকে।

এর পরের কথা সামান্য। দেশ পত্রিকায় আমার প্রথম গল্প ছাপা হয় ১৯৬২ সালে। মফঃস্বলে থাকি, সেখান থেকেই পাঠাই, ছাপাও হয়। কলকাতায় পাকাপাকিভাবে আসি ১৯৬৩ সালে। মাঝে-মাঝে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিমলদার কাছে যাই এ-পর্যন্ত। বেশিদূর যেতে সবসময় ভয় করে। অনেককেই চিনি না। কোনও রকমে সংকোচের সঙ্গে গল্পটি দিয়েই সিঁড়ি ধরে নেমে আসি। লিফটে পর্যন্ত নামি না, উঠি না। লিফট কার জন্য রাখা হয়েছে, কে কে উঠতে পারে তার কোনও তালিকা থাকতে পারে। আমি অনেকদিন আনন্দবাজার গেছি কিন্তু লিফটে উঠিনি। সিঁড়ি ধরে উঠতাম, সিঁড়ি

ধরে নেমে আসতাম। কাজেই সন্তোষদার ঘরে ঢোকার প্রশ্নই উঠে না। আর কাজ ছিল, সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা পেলেই পড়ে ফেলা। তাঁর অনেক জটিল গল্পও পড়ে ফেলেছি—যেমন 'মুখের রেখা' পড়ে একবার সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করে যখন বললাম, পড়েছি, তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি এই প্রথম আমাকে তাঁর ঘরে বসতে বললেন। নানা রকম প্রশ্ন। তিনি দুঃখ করে বললেন, অনেকে জানো, না পড়েই আমাকে স্তোক দিয়ে গেছে পড়েছি। তোমার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম সবটাই পড়েছ। তারপরই তিনি আমার সন্তোষদা হয়ে গেলেন। আমার লেখা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। কিছু গল্পের প্রশংসাও করেছেন। তবে প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই বেশি। আমিও তাঁর গল্প পড়ে ভাল না লাগলে সোজা বলে দিতে পারতাম, বাজে লিখেছেন। শেষ দিকে এই নিয়ে তিনি বোধহয় আমার উপর কিছু বিরক্তও হয়েছিলেন। দেশ পত্রিকায় তাঁর লেখা ('তীর্থের কাক' সম্ভবত গল্পটির নাম) পড়ে বন্ধুদের বললাম, সন্তোষদার এই বয়সে এমন লেখা মানায় না। কথাটা ঠিক তাঁর কানে গেছে। একদিন কী কারণে চারতলার ঘরে উঁকি মারতেই তিনি বললেন, এস।

আমি বসেই বললাম, ও রকম গল্প আপনি আর লিখবেন না। বয়েস হয়েছে টের পান না। আমরা আপনার কাছ থেকে এ লেখা পড়ার জন্য অপেক্ষা করে নেই। এ-সব লেখা আমরা লিখতে পারি। বয়সের একটা জায়গা থাকে গল্পে।

তিনি বললেন, শুনেছি। তোমার নিন্দা আমার কানে এসেছে। আর কিছু মন্তব্য না করে বললেন, মাঝে-মাঝে আস এ-বাড়িতে, তবে আমার ঘরে আস না।

এর উত্তরে বলতে পারতাম আপনি ব্যস্ত মানুষ, আপনার উপর উপদ্রব করার মানুষের অভাব নেই। আমি ঢুকলে আবার বাড়তি উপদ্রব হয়ে যাবে মনে করেই আসি না। এর পরের খবর মর্মান্তিক। জানতে পারলাম তিনি অসুস্থ। দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে আক্রান্ত। বেলভিউতে আছেন। খবর পাই, দেখা করতে দেওয়া হয় না। দেখা করতে দেওয়া যখন হয় না তখন গিয়েও লাভ নেই। পরে শুনলাম, বোম্বাইতে। আরও পরে জানলাম, বেলভিউতে। এক কথাই সবাই বলে দেখা করতে দেওয়া হয় না। এরই মধ্যে তিনি বাড়িও ফিরে গেছেন, তাও জানতে পারিনি। তিনি যেদিন মারা যান আমার নাইট ডিউটি চলছে। বাড়িতে ফিরে সারাদিন ঘুমিয়েছি। রাতে অফিসে এসে শুনি তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। আফসোস। ইতিমধ্যে, তাঁর রোগশয্যায় লেখা 'যাত্রাভঙ্গ' গল্প পড়ে বিস্ময়ে চুপ মেরে যাই। তাঁর মৃত্যুর পর এখন আমার শুধু একটা কথাই কেন জানি মনে হয়, যাত্রাভঙ্গ লিখে তিনি যেন আমাদের বলে গেলেন, অতীন আমি তোমাদের মতও লিখতে পারি—আমি আমার মতও লিখতে পারি। এখানেই তাঁর সঙ্গে বোধহয় আমাদের দুস্তর ফারাক।

পাগলাঝোরা

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

সন্তোষকুমার ঘোষ যখন আমাকে প্রথম দেখেন, তখন আমার বয়স একদিনও নয় ; আমি ওঁকে প্রথম জ্ঞানত দেখি তার বেশ কয়েক বছর পর। দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, বাবার সঙ্গে ওঁকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খেলাচ্ছলে আমি, ছয় বছর বয়স, একটি বাটি ছুঁড়ে মারি। ধৈর্যশীল ওপেনিং ব্যাটসম্যানের মতই মুহূর্তে মাথা নামিয়ে 'ডাক' করেছিলেন, তখনও মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। পরের দিন ওঁর কাছ থেকে, সবার অগোচরে ভ্রূকুটি নয়, একটি ব্যাট উপহার পাই, তার বুকের ওপর লেখা ছিল 'শানুকে সন্তোষ-জ্যেঠু।'

মস্ত লেখক ছিলেন তিনি, বিশেষত ছোটগল্পে তো ওঁর জুড়ি বিশেষ নেই। বাস্তবিক গল্পগুচ্ছের কথা ছেড়ে দিলে, ছোটগল্পের বিশেষ লক্ষণ তার কল্পনা, না-বলা-বাণীর ব্যঞ্জনা, ধারালো পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য প্রভৃতি তাঁর ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখায় যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা আগামী বহু বছর বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে থাকবে। ছোটগল্পের ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

জল ছাড়া মাছের যে অবস্থা হয়, নিজস্ব পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হলে সেই দশা হয় লেখকের। দিল্লিবাস তাই ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ভেবেচিন্তে, পরিকল্পনার দুয়ার এঁটে কাজে নামা তাঁর ধাতেই ছিল না, তাই দুম করে পদত্যাগপত্র লিখে কলকাতায় চলে এলেন। করুণ মুখে কিন্তু-কিন্তু করে এলেন কি? একদমই না। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে চড়ে সপরিবারে চলে আসছেন, যেন রাজ্য জয় করতে। লেখায়, সাংবাদিকতায়, ব্যক্তিত্বে আগামী বছরগুলোতে তিনি যে কলকাতা শহরকে, তার মানুষকে ক্রমশ জয় করে নেবেন, তা ওই আত্মবিশ্বাসের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল। তাঁর আত্মবিশ্বাসের উৎসে কোনও মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ছিল না কখনোই, বরং ছিল নিজের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ক্ষমতাকে চিনে নেবার নির্ভুল দৃষ্টি।

আর ভালবাসা। বড় লেখক, সর্বোত্তম সাংবাদিক হয়েও মানুষ হিসাবে তিনি যে ছোটমাপের হলেন না, তার কারণ তাঁর ভালবাসার জন্মগত প্রতিভা। নিজেই বলতেন, "ঈশ্বর আমায় শারীরিক দৈর্ঘ্যে ছোটমাপের করে পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু আর কোনও ব্যাপারে আমি ছোট হইনি কখনো।" ব্যাপারটা আশ্চর্যের ছিল খুবই। আমাদের চারপাশের জগৎ-জীবনে, আর ইঁদুর-দৌড়ে বেশির ভাগ মানুষই তো নর্দমার কাদা

মেখে সর্পিল পিচ্ছিলতায় সফলতার উচ্চে উঠতে চান, যেখানেই বাধা আসে সেখানেই তাঁরা বিষ ঢেলে দেন। সন্তোষকুমারকেও সারাজীবন সেই বিষের জ্বালায় জ্বলতে হয়েছে, জীবনশেষে নীলকণ্ঠের মত সেই বিষ তিনি নিজের গলায় ধারণ করে নিলেন।

মানুষকে ভালবাসতে পারলে তিনি যেন বেঁচে যেতেন, বস্তুত তাঁর দুর্দান্ত জীবনীশক্তির মূলেই ছিল ওই ভালবাসার পাগলা ঝোরা, যা কোনও বাঁধন মানত না, মাপ জানত না। আত্মীয়-স্বজনকে ভালবেসেও তাই সেই ধারা ফুরলো না, খুঁজে নিতে হল নতুন-নতুন পাত্র, নতুন মানুষজন। তাঁর গুণগ্রাহিতার কথা অনেকেই বলেছেন, নতুনের প্রতি ঔৎসুক্য, পরীক্ষা করার অসীম আগ্রহের কথা অনেকেই বলেছেন। এই সমস্ত কিছুর পিছনে ছিল জীবন-প্রেম ও জীবনী-শক্তি,—যা তাঁর দেহে-মনে একত্র হয়ে গিয়েছিল। এর থেকেই জন্মেছিল চূড়ান্ত আসক্তি, আবার মুহূর্তে তাকে অতিক্রম করে-যাওয়া অসামান্য নিস্পৃহতা। ক্রমাগত নতুন পথের বাসনা ও তাকে ছাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে যাবার জন্য জীর্ণ খোলসের মত পরিত্যাগ। এই দ্রুতি ও দ্যুতি তাঁরই অভ্রান্ত চরিত্র-লক্ষণ। মানুষের কাছে তিনি যা চাইতেন, তা শুধু ভালবাসা নয়, বরং কল্পনাশক্তি, গভীর বুদ্ধিমত্তা ও সর্বোপরি নিজস্বতা।

লেখক হিসাবে তিনি কত বড় ছিলেন বা সাংবাদিক চূড়ামণি হিসাবে তাঁর সঠিক অবদান কী, তা এককথায় বলার নয়, বরং গভীর গবেষণার বিষয়। আমি এখানে অন্তরঙ্গ মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন. তারই একটা আলেখ্য টুকরো-টুকরো করে সাজানোর চেষ্টা করছি।

ওঁর সঙ্গে উত্তর ভারত বেড়াতে গেছি সপরিবারে। দিল্লি ও আগ্রার চারপাশের অজস্র স্মৃতিসৌধ দেখতে দেখতে আমার অনভ্যস্ত চোখ পচে যাচ্ছে। গাড়ির সামনের আসনে বসে সন্তোষকুমার ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতির বিভিন্ন সূত্রগুলি ধরিয়ে দিচ্ছিলেন যাতে এই ঝাঁ-চকচকে দিল্লিনগরীর বুকের ওপর চারপাশে, ইতিহাসের ছড়িয়ে-থাকা কঙ্কালগুলির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয় আমার দ্বারা, পটভূমিকাটি যেন সঠিক গ্রহণ করতে পারি।

হঠাৎ কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আধুনিক কবিতার ওপর আমার কাজ কদ্দূর এগোলো। একথা-সেকথার মধ্যে বলে ফেলেছিলাম যে, অনেক কবিতায় দেখেছি, তার প্রথমাংশে যে-ভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পরবর্তী অংশে তাকেই উপমা-যোগে, চিত্রকল্প এঁকে বিস্তৃত করা হয়েছে। মুচকি হেসে বললেন, শুধু কবিতায় কেন, চারপাশের অনেক কিছুতেই কি এই বিন্যাস লক্ষণীয় নয়? রন্ধনশিল্পের কথাই ধরো। বিখ্যাত ভোজসভায় মূল খাদ্য-পরিবেশনের পূর্বে সূচিকাকারে 'অর্স দ্য বর' দেওয়া হয়, যাতে পরবর্তী খাদ্য সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। তেমনি সঙ্গীতে আলাপ ও সঙ্গতের মধ্যে থাকে চূড়ান্ত ঝালার ইঙ্গিত। এই যে চারপাশের সমাধি-গৃহগুলি দেখছ, তাতে প্রবেশ করার আগে পেরিয়ে যেতে হচ্ছে একাধিক খিলান। এই খিলানগুলিতে সংক্ষেপে যে চিত্রাবলী ও খোদাই-কাজ দেখা যাচ্ছে, তাকেই বিস্তৃত করে, বড় করে মূল সৌধগুলির গাত্রে

দেখতে পাওয়া যাবে। এইভাবে খেলাচ্ছলে, কথাবার্তার সূত্রে, আড্ডার ভঙ্গিতে কত যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গভীর অনুভূতির কথা তিনি প্রকাশ করতেন, তা তাঁর সঙ্গে যাঁরাই মিশেছেন, তাঁরাই জানেন।

সন্তোষকুমার ছোটদের ভীষণ ভালবাসতেন। কিন্তু সাধারণভাবে বড়রা যেভাবে ওপর থেকে ছোটদের দেখে ও স্নেহ করে, তাঁর ভালবাসা ঠিক তেমন ছিল না। তাঁর মনের মধ্যে যে এক চিরশিশু ও কিশোর লুকিয়ে ছিল, বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশার সূত্র ধরে সেই মনের ভিতরকার শিশু বা কিশোরটিই আত্মপ্রকাশ করত।

বড়দের ব্যবহারে, তাঁদের কীটে-কাটা নষ্ট স্বভাবে তিনি প্রায়ই ভীষণ আহত হতেন ; তখন অভিমানী মানুষটির জন্য দরকার হত ছোটদের আঘাতের অব্যর্থ মলম। তাছাড়া, যাদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে, নূতনতা আছে, ভবিষ্যৎ আছে,—তাদের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করে দিতে চাইতেন তাঁর চরিত্রের অসফলতা, সৌকুমার্য ও কল্পনাশক্তি।

সন্তোষকুমার কাজের সময় দৈত্যের মতন পরিশ্রম করতেন ; কিন্তু অবসর সময়টিকে নিজের মনের মতন করে সাজিয়ে নিতেও জানতেন। এই দুটি ব্যাপারকে মেলাতে খুবই কম লোকই পারেন।

আগেই বলেছি, তাঁর মনটি ছিল হাঁসের পাখার মত। রোদ-বৃষ্টির স্মৃতি জমে তৈরি হত শিল্পীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, কিন্তু তিনি ব্যবহারিক জীবনে সুখ ও দুঃখকে গেড়ে বসতে দিতেন না তাঁর মনের উপর।

মৃত্যুর আগে মনের এই স্থিতিস্থাপকতা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আশাহীন কর্কট রোগ,—তিনি জানতেন মৃত্যু তাঁর ঘরের চৌকাটে এসে দাঁড়িয়েছে। কিংবা তিনিই তখন 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে'। এই নিদারুণ মুহূর্তেও তিনি সবাইকে ক্ষমা জানিয়ে গেছেন, সমস্ত মোহ, আকর্ষণ ও ঘৃণার পরিধিকে ছাড়িয়ে গিয়ে তৃষ্ণার্ত পরিচিত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে পৌঁছে গেছেন বৃহত্তর জীবনযাত্রার পথে।

এই যুগের যাবতীয় ক্লেদ, গ্লানি ও হিংসার পথেই সন্তোষকুমারকে পথ হাঁটতে হয়েছিল, কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন এগুলির বিপরীত ; ফলে এক ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কুরে-কুরে খাচ্ছিল তাঁর প্রাণকে ; পথের শেষে এসে ও নুতন পথের পাথেয় সংগ্রহের জন্য তাই তিনি আবিষ্কার করে নিলেন মহত্তর চরিত্রকে।

সন্তোষদা

হিমানীশ গোস্বামী

সন্তোষদাকে চিনি সেই কবে থেকে। আমাদের খুব ছোটবেলায় উনি আমাদের গ্রামে আসতেন। উনি ছিলেন ইতিহাস অধ্যাপক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু। আমার বয়স যখন সাত-আট, তখন সন্তোষদার বয়স ছিল বোধহয় বারো তেরো। ওই সময়ই আমার দাদা (শতদল) সন্তোষদার বন্ধু হয়েছিল। সেসব দিনের কথা আমার কিন্তু একটুও মনে নেই। পরে কলকাতায় এসে ওকে তখন দেখেছি আমাদেরই বাড়িতে। কয়েকখানা বই নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর বয়স তখন কত? আমার মনে হয় বছর আঠারো। ওই বয়সেই গল্পের একখানা বই লিখে ফেলেছিলেন। ছাপার অক্ষরে ওঁর বই বেরিয়েছিল, অবিশ্যি বইখানা তাঁর একার লেখা নয়। সঙ্গে ছিলেন তাঁরই আর এক বন্ধু —জগৎ দাশ। পরে তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল।

সব সময়েই তাঁকে দেখেছি অনর্গল কথা বলতে, ছটফট করতে। একেবারে স্থির হয়ে যেন থাকতে পারতেন না তিনি। অথচ স্থির না হলে এত যে লিখেছেন, তা লিখলেন কেমন করে? আমার সঙ্গে ওঁর ছিল অদ্ভুত এক সম্পর্ক। আমার লেখা পেলেই পড়তেন এবং প্রশংসা এবং নিন্দা দুটোই করতেন প্রাণখোলা ভাবে। শেষের দিকে নিন্দেই বেশি। বলতেন, তোমার লেখা একদম হয় না। আবার বলতেন, কথাটা শুনে রাগ করলে? দেখা হলে প্রায়ই দাবা খেলতে বসতে হত। ওঁর সঙ্গে বছর চারেক দিনে অন্তত তিনটে গেম খেলেছি, সপ্তাহে তিন চারদিন। সে এক সময় গেছে। দাবা খেলতে খেলতে শেষে বিরক্ত হয়ে গেলেও উপায় ছিল না। তিনি যদি জিততেন তাহলেও আবার নতুন করে খেলতে হত, আর হেরে গেলেও। ক্রমাগত সিগারেট টানতেন, আর দু-তিন সেকেন্ডেই চাল দিতেন না প্রায় ভেবেই। সর্বদা সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলতেন। চাল ফেরত তো নিতেনই। আর তিনি যখন জিততেন একেবারে নিশ্চিত, তখন আমি পরাজয় স্বীকার করলে চলত না। পুরো খেলে আমাকে মাত করে তবে নিশ্চিন্ত হতেন। ওঁর বাড়িতে গিয়েও আমাকে বেশ কয়েকবার দাবা খেলতে হয়েছে।

সন্তোষদার চরিত্র সহজ সরল ছিল না। তাঁর মনের জটিলতা আমি বুঝতাম না, দরকারও ছিল না। ওঁর সঙ্গে বরাবর আমার সম্পর্ক এক রকম ভাল ছিল তাও নয়। তবু এক সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি সর্বদাই তাঁর অনুরক্ত ছিলাম।

সন্তোষকুমার ছিলেন মূর্তিমান বিংশ শতাব্দী

একটি প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : সন্তোষকুমার ঘোষ ছিলেন মূর্তিমান বিংশ শতাব্দী। বোঝার, খোঁজার ও সংশয়ের শেষ ছিল না তাঁর। অগাধ সংশয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিল তীব্র জীবন পিপাসা। প্রবীণ সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র বুধবার সন্ধ্যায় এক স্মরণসভায় এই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃত মূল্যায়ন হবে বর্তমান প্রজন্মের কাজ।

শিক্ষাসংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি আয়োজিত এই স্মরণসভা হয় 'অবন মহল'-এ। লোডশেডিংয়ের দরুন সভার কাজ বারে বারে ব্যাহত হয়। বিভিন্ন বক্তা সাহিত্যিক-সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের জীবনের ও রচনার বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেন। সভার পক্ষ থেকে এক প্রস্তাবে সন্তোষবাবুর সাহিত্য-সাধনা, মানবিক জীবনবোধ ও নিগূঢ় সংস্কৃতি-চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ডঃ প্রতুল গুপ্ত বলেন, সন্তোষবাবুর সৃজনী প্রতিভার যে কোনও একটি ধারাই তাঁর যশের কারণ হতে পারত।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, সাফল্যের পরও সন্তোষ তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা করে গিয়েছেন। সেখানেই তৃপ্ত বা বদ্ধ হয়ে থাকেননি।

বিমল কর বলেন, তরুণ লেখকদের প্রতি সন্তোষবাবু সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। অরুণ বাগচীর মতে, মনে-প্রাণে রবীন্দ্র-অনুরাগী হলেও তাঁর লেখায় সন্তোষবাবু রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ, অনুসরণ করেননি। তাঁর রচনার ৯৫% ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক।

বরুণ সেনগুপ্ত বলেন, মৃত্যু আসন্ন জেনেও সন্তোষবাবু সাহস ও মানসিক স্থিরতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছেন। হার মানেননি। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বলেন, সন্তোষবাবু একবার যা ঠিক মনে করতেন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। মানিক মুখোপাধ্যায় স্মরণ করেন, কীভাবে নানা কাজের মধ্যেও সন্তোষবাবু ভাষা ও শিক্ষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কানাইলাল সরকার। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষবাবুর প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে শ্রদ্ধা জানান।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৭ মার্চ, ১৯৮৫

শ্রীচরণেষু সন্তোষদাকে : দুটি পত্র

১.

সৌন্দর্য, খরা, দখিনা মলয়, অতি বৃষ্টি কিংবা জ্যোৎস্না বিলোবার ব্যাপারে নিসর্গ যেমন নিরপেক্ষ নির্বিচার—প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষ ভালবাসা, শান্তি, পথ দেখানো, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা গুণগ্রাহিতায় তাই ছিলেন। এসব ব্যাপারে তিনি ভেতরকার প্রবল প্রাকৃতিক শক্তিতে কাজ করতেন। সত্যজিৎ রায়ের দেবী ছবির মহিমা স্বীকারে কিংবা সমরেশ বসুর বিবর-এর গুণকীর্তনে তাঁকে সবেগে এগিয়ে যেতে দেখেছি। আবার নিজের বিশ্বাসমত তিনি ঋত্বিক ঘটকের কোমলগান্ধার কিংবা জর্জ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রবল বেগেই না বলেছেন।

জনগণের ধাত তিনি ভাল বুঝতেন। ১৯৬৬ সনে আন্দোলনের মুখোমুখি তিনি রাতারাতি দৈনিকের পয়লা পাতার শিরোনাম, সংবাদ পরিবেশনের স্টাইল পালটে দিলেন। গভীর নিশীথে তিনি খবর বাছাই, সাজানো শিরোনাম নির্বাচন এবং প্রচলিত প্রবাদকে ভেঙে একদম নতুন অর্থে প্রয়োগের ব্যাপারে ছিলেন স্বয়ং ব্যাসদেব। কনিষ্ঠ সহযোগী ও অনুজ হিসেবে তাঁর পাশে থেকে বারবার বুঝতে পেরেছি—তাঁর সাহিত্যের প্রতিভা খবরের কাগজ কীভাবে আত্মসাৎ করে চলেছে। জীবনকে কীভাবে জীবিকা খাচ্ছে।

আমার বিয়ের পাত্রী দেখে আসা, মায়ের অপারেশনে ছুটি ও টাকার ব্যবস্থা করা, কাগজ থেকে প্রত্যাখ্যাত গল্পের গুণ-অনুসন্ধান, গল্প সংগ্রহের সবচেয়ে সঠিক ভূমিকাটি লেখা, দোলের দিন রিকশা করে এসে একটি উপন্যাসের প্রশংসা করে যাওয়া, নিজের হাতে ধরে খবর লেখানো, সুদূর সানফ্রানসিসকো থেকে একটি পিকচার পোস্টকার্ডে উৎসাহ দেওয়া—এসব ভুলি কী করে? এ শুধু আমার বেলায় নয়—পঞ্চাশের দশকের আজকের লেখকদের জীবন ও জীবিকায় এ-কাজ তিনি কার জন্য করেননি? শুধু পঞ্চাশ কেন? চল্লিশ? ষাট? সত্তর? লেখক, অ-লেখক—সবার জন্যই নির্বিচারে তাঁকে এই ভূমিকায় দেখেছি। অমিত পরাক্রমশালিনী কোনও নিসর্গের মতই তিনি আমাদের আচ্ছন্ন করেছিলেন। আমাদের অনেকেরই আজকে যা-কিছু—তার সবখানির পিছনে—তিনি—শুধু তিনি।

তিনি ছিলেন আমাদের সম্পত্তি—আমাদের উদ্বেগ।

এই প্রাকৃতিক শক্তিকে ভালবাসা ছাড়া আমাদের কোনও গত্যন্তর ছিল না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা-২

২.

২৭ ফেব্রুয়ারি আপনাদের পত্রিকা যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করল স্বর্গত সন্তোষকুমারের শেষ দিনগুলির দিনলিপি প্রকাশ করে। মৃত্যুর মুখোমুখি এই সাহসিকতা, সে কি শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেই। কতটুকুই কথা, কী ব্যঞ্জনা আনতে পারে, কত স্বল্প পরিসরে। ধন্যবাদ আপনাদের, অজস্র ধন্যবাদ—এই মহান মৃত্যুপথগামী সত্তার সঙ্গে সাধারণ পাঠককে পরিচয় করাবার জন্য।

শুধু একটাই মাত্র কথা। সম্পাদকীয় 'শেষ নমস্কারে' একটু খুঁত থেকে গেল না কি? সম্পাদকীয় প্রথম উদ্ধৃতিটি ভুল। 'দীপ একদিন জ্বলে, একদিন নেভে'—ব্যবহারটি ঠিক নয়। 'বিসর্জন' নাটকের যে উক্তিটির ব্যবহারের ইচ্ছা এখানে প্রকট, সেটি হল—'দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে / বারেক নিভিলে তারা চির অন্ধকার'।

সোহিনী ঘোষ

কলকাতা—৫৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি : সন্তোষকুমার ঘোষকে

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সন্তোষ বড় প্রাণবন্ত বড় চঞ্চল বড় ছেলেমানুষ ছিল। ও আমার অনেকদিনের বন্ধু। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুধাংশু সেনগুপ্ত আরো অনেকের সঙ্গে একসঙ্গে সাহিত্যচর্চা করতাম। সেখানেই সন্তোষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর প্রায় প্রতিদিনই আমাদের দেখা হত। মাঝে আমি বম্বে চলে যাওয়ায় অনেকদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে সুভাষের বাড়িতে আবার আমার সন্তোষের সঙ্গে দেখা হয়। তখন সন্তোষ ব্যস্ত লেখক ব্যস্ত সাংবাদিক। সুভাষের বাড়িতে দাবাখেলার আসরে অথবা রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ক আলোচনাসভায় ওর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারতাম।

সন্তোষ সুসাহিত্যিক সে কথা সকলেই জানে। আনন্দবাজারকে তো ঢেলে সাজিয়েছিল। সন্তোষের দান অনেক। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে বড় টাচি ছিল।

অমন লাইভলি, অমন একজন ভালমানুষ বন্ধু অকালে এমনভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় খুব খারাপ লাগছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সন্তোষকুমারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বয়স চল্লিশ বছরেরও বেশি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে ওঁর যে ব্যাপারটা আমার শ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে, তা হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে ওঁর ক্লান্তিহীন উৎসাহ। সন্তোষ খ্যাতি পেয়েছেন, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, কিন্তু কোথাও থেমে থাকেননি। কখনও বলেননি, অনেক হল, আর কেন? বরং সব সময়েই চেষ্টা করেছেন নতুন পথ খুঁজে নিতে। নেননি, তাও তো নয়। এমন অনেক সূত্র ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর ভাষায়, তাঁর আঙ্গিকে যা থেকে যেমন তাঁর সমবয়সীরা, তেমনি তাঁর উত্তরকালের শিল্পীরাও নতুন ভাবনার আভাস পাবেন।

অমিতাভ চৌধুরী

সন্তোষদা নেই। এখন কাকে ভালবাসব, কার উপর অভিমান করব? আর কেইবা আমাকে এমন স্নেহ করবে, আমার উপর অভিমানে দিনের পর দিন কথা বন্ধ করে দেবে? সব শূন্যই পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তাতে আমার দিক থেকে এই

শূন্যতা অনেকদিন থাকবে। আজকের এই যে আমি, তার পিছনে সন্তোষদার দান অনেকখানি। তিনি কত বড় সাহিত্যিক কত বড় সাংবাদিক--এ বিচারের জন্য আমি আজ কলম ধরিনি, আমি শুধু তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছি। কর্মজগতে তাঁর ও আমার গুরু এক এবং কর্মজগতে তিনিই আমার গুরু। তিনি যে আমার মত অভাজনকেও শিষ্য হিসাবে ঠাঁই দিয়েছিলেন তার জন্যে এই বিষণ্ণতার মধ্যেও আমি গর্বিত।

আমার গুরুর পায়ের কাছে
সুবোধ ছেলে ক'জন আছে।
অবোধজনে কোল দিয়েছেন—
তাই আমি তার চেলা।

সমরেশ মজুমদার

এই একটি মানুষ--যাঁকে আমার সম্পূর্ণ জীবিত মানুষ বলে মনে হত। তাঁর কলম, তাঁর কথা, তাঁর রাগ অভিমান--এবং গোপন ভালবাসার সাক্ষী ছিলাম আমি। আমাকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকবারের মতন এবারও ছাত্র নির্বাচনে ভুল করেছিলেন। আমার আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ হয়তো আমার চেয়ে ওঁরই বেশি ছিল।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সন্তোষদার মধ্যে হৃদয় ও মগজের এমন একটা মিলন দেখেছি যা বরাবর বিস্মিত করেছে আমাকে। আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করার এটাই মস্ত সৌভাগ্য আমার যে, এহেন একজন মানুষকে এতদিন কাছে পেলাম। এখন যে তিনি নেই তাতেও মনে হচ্ছে না, মানুষটির সংস্পর্শ থেকে আমি পুরোপুরি বঞ্চিত। একটা মানুষকে ভালবাসতে পারলে এমন কিছু সঞ্চয় ঘটে যায় তাতে পুরোপুরি বাদ সাধতে পারে না মৃত্যুও। আমি চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাব সন্তোষদাকে, শুনতে পাব তাঁর কণ্ঠ, ঘ্রাণ পাব নানান সুগন্ধের (যেমন ইউকালিপ্টাস গোছের কিছু একটা) যা তিনি মেখে শৌখিন হয়ে ভরিয়ে রাখতেন তাঁর ছড়ানো-বিছানো অফিসঘরটি। কতদিন, কত বেলা ওঁর কাজের টেবিলের সামনে বসে হয় তর্ক, নয় আলোচনা করেছি। হয় ওঁর কথা একনাগাড়ে শুনেছি, নয়তো নিজের কথাই একনাগাড়ে বলে গেছি। আর একটিবারের মত কখনো মনে হয়নি, উনি আনন্দবাজারের সংযুক্ত সম্পাদক, কি ওঁর বয়স আমার দ্বিগুণ কিংবা উনি অত খ্যাতিমান আর আমি কেউ না। অনেক সময়েই মনে হয়েছে আমরা দুজনেই বড্ড বাজে বকছি, দু'জনেই দু'জনার সময় নষ্ট করছি ; কিন্তু আজ ঠিক উল্টোটাই মনে হচ্ছে। আমার মনের অ্যালবামে সেইসব স্মৃতি ও দৃশ্য সহসা ম্লান হবার নয়।

সন্তোষদার সঙ্গে সত্যিকারের আলাপ হয় ১৯৭৩ সনে, যখন শারদীয় আনন্দবাজারে আমার 'এই আমি একা অন্য' প্রকাশিত হয়। ওঁর ঘরে ডেকে নিয়ে খুব প্রশংসা করেছিলেন—আর আমার কান লাল হয়ে উঠেছিল। এক

এক সময় মনে হচ্ছিল বুঝিবা উনি আমায় ব্যঙ্গ করছেন। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম এই উচ্ছ্বাস, এই মমতা আর এই উত্তেজনা ইত্যাদি নিয়েই সন্তোষকুমার, সন্তোষকুমার। এতখানি প্রশ্রয়, স্নেহ আমি আর অন্য কোনও লোকের কাছে পাইনি।

বছর দুয়েক আগে ওঁর জন্মদিনে গিয়েছিলাম একটা ছোট্ট উপহার (প্যাট্রিশিয়া হাইস্মিথের একটি গল্প সংকলন) নিয়ে। বইয়ের প্রথম পাতায় ঠাট্টা করে লিখেছিলাম, 'To Santoshda, Friend, Phyloghopher and Misguide. Guide' শব্দটির আগে 'Mis' কথাটা দেখে প্রাণ খুলে হেসেছিলেন সন্তোষদা। এখনও সেই হাসিটা আমি দেখতে পাচ্ছি। সন্তোষদার সঙ্গে ক্রমাগত ঠাট্টা ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথোপকথন চলত আমার। ঠাট্টাচ্ছলে দারুণ দারুণ সব কথাও বলে ফেলতেন ভদ্রলোক। এত eminently recordable কথাবার্তা খুব কমই শুনেছি অন্যত্র।

সন্তোষদা আর আমার বন্ধুত্বের একটা ছোট্ট অগ্নিপরীক্ষা ছিল, দেবব্রত বিশ্বাস বিষয়ক বিতর্ক আমাদের মধ্যে। সন্তোষদা জর্জ বিশ্বাসের প্রবল গুণগ্রাহী, কিন্তু জর্জদার রেকর্ড করা নিয়ে বিশ্বভারতীর আপত্তিকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেই নিয়ে এক সময় আনন্দবাজারে প্রচুর লেখালেখি, চিঠিচাপাঠিও চলেছিল। আমি খুব বিনীতভাবে ছিলাম জর্জদা'র পক্ষে। যা জেনে সন্তোষদা প্রথম প্রথম খুব চটে গিয়েছিলেন আমার ওপর। সংবাদপত্রকে ভিত্তি করে একজন শিল্পীর বিরুদ্ধে এহেন ক্যাম্পেন চালনাকে আমার ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল। সন্তোষদা সে সময় খুব চটেমটে থাকতেন বলে আমি পারতপক্ষে ওঁর ধারেপাশে ঘেঁষতাম না। কিন্তু একদিন হঠাৎ আমাকে লিফটে ধরে বললেন, তুমি দেবব্রতর পক্ষে আমি জানি। তাই বলে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। আমি আর যাই হই, ছোটলোক নই। সেদিন সন্তোষদার ওই কথায় এত লজ্জা পেয়েছিলাম যা কহতব্য নয়। আমি এরকম ভুল আর কখনো করিনি।

আমার বিয়ের বেশ কিছুদিন পর স্ত্রীকে নিয়ে সন্তোষদার আলিপুরের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ঘুরেফিরে সন্তোষদা ফের সেই দেবব্রতর প্রসঙ্গে আসলেন।

আমার যখন অসুখ হয়েছিল মাঝখানে তখন দেবব্রত এসে বহুক্ষণ ছিলেন ঘরের বাইরে। বারণ করেছিলেন আমার ঘুম ভাঙাতে। শুধু বসেই রইলেন একটি ঘণ্টা। শঙ্কর এরকম লোকের সঙ্গে কি আমার বিরোধ থাকতে পারে?

সেইদিনই কথায় কথায় বলছিলেন সন্তোষদা, জানো, আমার অর্থসঞ্চয় কিছুই নেই। আমার সঞ্চয় কিছু বই, কিছু গানের রেকর্ড আর কিছু বন্ধুত্ব।

'বন্ধুত্ব' কথাটার উপর খুব জোর দিতেন সন্তোষদা। কারণ শেষ দিকে মানুষের কাছ থেকে অনেক আঘাতও পেয়েছিলেন তিনি। আমি এই অভিমানী কিছুটা নিঃসঙ্গ সন্তোষদাকেই দেখেছি, ভালবেসেছি। তিনি যখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মধ্যগগনে তখন যে তাঁকে

দেখিনি তাতে কোনওই ক্ষোভ নেই আমার। সূর্যাস্তের সূর্যই সত্য সুন্দর। এই শেষ অভিমানী বছরগুলিই ছিল তার অনন্যসাধারণ শেষ ডায়েরির স্তুতি।

সন্তোষদার মৃত্যু তো বীরের মৃত্যু। নতুন করে তা নিয়ে বলব না। সবাই যা নিয়ে এখন বলাবলি করছে তা নিয়ে আর কিছু বলার ইচ্ছে নেই। শুধু স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে একটা উর্দু কবিতা যা প্রাণ চোপড়া উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন জুলফিকর আলি ভুট্টোর মৃত্যুতে। আমার মনে হচ্ছে ওই কবিতা সন্তোষদার শেষ যাত্রাকে কিছুটা বর্ণনা, কিছুটা ব্যাখ্যা করে।

যিস ধজসে কোই মক্তলকো গয়া
ও সানি শরীরৎ রহেতো হ্যায়।
ইস্ জান তো আনি-জানি হ্যায়
ইস্ জানকো কোই মতলব নেহি।।

যার অর্থ এরকম : যেভাবে কেউ মৃত্যুবরণ করে সেটাই চির শ্রদ্ধাভাজন। জীবন তো আসছে আর যাচ্ছেই, এই জীবনের খুব গূঢ় রহস্য কিছু নেই।

দুর্গা বসু

বছর চারেক আগের কথা। 'মালিনী'র অফিস তখন চোদ্দর ডি রয়েড স্ট্রিটের দোতলায়। সেখানেই বসেছে সন্তোষকুমার ঘোষের সংবর্ধনা সভা। উপলক্ষ্য তাঁর ষাটের কোঠায় পৌঁছানো। জাজিম পেতে সার সার বসে আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও আরো অনেক সাহিত্যের দিকপালেরা। মধ্যিখানে জমিয়ে বসেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁর ভরাট গাল আর মোটা লাইব্রেরি ফ্রেমের সাথে কাঁচাপাকা মাছি গোঁফটা আমার কেমন যেন বেমানান মনে হয়েছিল। কাছে ঘেঁষবার ইচ্ছে ছিল খুবই, শুনেছিলাম উঠতি লেখকদের মেলাই প্রেরণা দেন ভদ্রলোক। কিন্তু নামি-দামিদের ভিড়ে এগোতে সাহস হয়নি। অনেকেই সেদিন কামনা করেছিলেন তাঁর শতবর্ষ আয়ু। শুনে শুনে বিশ্বাস হয়েছিল কিছু না হোক আরো চল্লিশ বছর হাতে আছে। দেখা হয়ে যাবেই এক সময়। কিন্তু সেই আমার প্রথম আর শেষ দেখা প্রয়াত সন্তোষকুমারকে।

বুঝতে পারিনি এতগুলো তাবড় তাবড় সাহিত্যিক মহারথী ভক্তের শুভকামনাকে নির্বাক হাসিতে উড়িয়ে দিয়ে এত তাড়াতাড়ি আলোর দেশে পা বাড়াবেন তিনি।

তাঁর কাছে যাওয়া হয়নি, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে অনেক শুনেছি সব সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে। তাঁর লেখা পড়েও মুগ্ধ হয়েছি। এক 'মালিনী'তেই পাঁচ বছরে কম করেও তাঁর ২০-২৫টি লেখা পড়েছি।

আনন্দবাজার ভবন থেকে হাঁটা পথে মাত্র দশ মিনিটের দূরত্বে একুশ বছর কাটালাম আমি। আলিস্যি এড়িয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা পর্যন্ত করলাম না। এ মৃত্যুতে আমি শোক করব না তো কে করবে?

দেবকুমার মৈত্র

২৭ শে ফেব্রুয়ারির সমস্ত পত্রপত্রিকায় দেখলাম, সন্তোষদা আর নেই। ভাবতেই পারিনি, তিনি এত

তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। এই তো সেদিন দেখে এলাম। সুস্থ হয়ে উঠছেন। আশা ছিল, উত্তরোত্তর আরো সুস্থ হয়ে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করবেন।

বাংলা সাহিত্য কী হারালো—এক সময়ই তা বলতে পারবে। তাঁর অপূর্ব স্টাইল, যা অননুকরণীয়—অসাধারণ ধী-শক্তি এবং ভাষা নিয়ে, শব্দ নিয়ে যে অনন্য কারুকার্য তাঁর সর্ব রচনায় ব্যাপ্ত—সবকিছু মিলে যেন এক হাজার বাতির ঝাড়—সেই দ্যুতিমান, উজ্জ্বল আলোকের উৎসটি নিভে গেল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে 'হিরো' মনে করতাম। গুরু কথাটি বলব না। অবিশ্রান্ত ব্যবহারে শব্দটি তার তাৎপর্য হারিয়েছে।

আমার বা আমাদের নীরবে এই শোক বহন করতে হবে। গোলে হরিবোল দিয়ে শোকসভায় হয়তো অনেক কথাই বলা হয়েছে বা আরো হবে। কিন্তু সত্যিকারের শোক সর্বদা নীরব।

অনুরাগ সিদ্ধার্থ

অনেক বড়মাপের কাউকে খুব তাড়াতাড়ি ছুঁতে গেলে তাঁর প্রেমের নাগাল পেতে হয় বা তাঁর দাক্ষিণ্যের। সন্তোষদা প্রথমটিতে এত বেশি ছাপিয়ে থাকতেন যে দ্বিতীয়টির নাগাল পাবার জন্য কোনও চেষ্টার প্রয়োজন হত না। স্নেভাজনকে অপরিচিতজনকে ভালবেসেই তিনি বাঁচার রসদ নয়, আনন্দ আহরণ করতেন। তাঁর এই চারিত্রিক প্রসাদেই খুব অল্পদিনে তাঁর স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠার অসীম সৌভাগ্য অর্জন করা গিয়েছিল। কিন্তু হায় অনায়াসলভ্য সে সম্পদ যে এত তাড়াতাড়ি হারাতে হবে তা কে জানত।

শূন্যতা ভাষা দিয়ে ভরানো যায় না। ক্যানভাস যেমন ভরে না শুধু তুলি আর রঙে। শূন্যতার গভীরতা অনুভূতি দিয়ে মাপার। যত দিন যাবে আমরা সেই হৃদয়বান দিলদরিয়া পানের রঙে ঠোঁট রাঙানো রাজাপ্রতীম ব্যক্তিটিকে অনুভূতি দিয়ে অনুভব করব, তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে ছুঁতে চাইব। আর যত তাতে সফল হব তত বেশি করে শূন্যতার নাগপাশ আমাদের সারা শরীরে শীত হয়ে কাঁপিয়ে দেবে। আপনজনকে হারিয়ে আপনজনদের যেমনটি হয়।

নিজের লেখার প্রতি শেষদিকে বড় উদাসীন ছিলেন সন্তোষদা, অনুযোগ ছিল তাঁর প্রতি আমাদের। আমাদের সবার সামান্যতম লেখা নিয়ে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ির ঘাটতি ছিল না, কিন্তু নিজের বাগানে ফুল ফোটাতে অন্যমনস্ক ছিলেন। জানি না কত সে অভিমান। সারাজীবন যে সাহিত্য সংবাদপত্র-প্রেয়সীকে মনের মত করে সাজাবার কাজে নিজেকে পরিপূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন, শেষ জীবনে ভাবতেন, সে প্রেয়সী কই তেমন করে তো তাকে কোনও প্রেমোপহার দেয়নি। এ আমাদেরও অন্যমনস্কতা : সূর্যের মত প্রখর দীপ্তিমান ব্যক্তিটির অনুরাগের উত্তাপ আমরা সারা শরীরে জড়িয়ে আমেজ ভোগ করেছি কিন্তু তাঁর ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণে উদাসীন থেকেছি।

সন্তোষদা জন্ম অভিমানী ছিলেন।

জানি না সে অভিমান বুকে রেখে তিনি আমাদের দৈহিক ছেড়ে গিয়েও মানসিকভাবে ছাড়তে পেরেছেন কি না। হয়তো পারবেন না কোনওদিনও।

তৃপ্তি মিত্র

দু-লাইনে সন্তোষবাবু সম্পর্কে কিছু বলা বড় শক্ত। উনি একজন বিরাট ব্যক্তি তো বটেই। আর বিরাট হলেই অনেক রকম বা বহু প্রতিভা একই সঙ্গে কাজ করে, যা অনেক সময় ধরা যায় না। অল্পের মধ্যে বলতে হবে, তাই একটি কথাই বলছি যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওঁর যে জ্ঞান এবং এত বেশি জানা যে ওঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে মুখে মুখেই এত কিছু বলতে পারতেন যা আমাকে কাজে অনেক সাহায্য করেছে। সেই সব কারণেই, সেই সাহায্য এক্ষুনি কোথায় পাব বলে—আমি আর ভাবতে পারছি না।

আমার কাছে উনি নমস্য।

বন্দনা সিংহ

কিছু কিছু মানুষ আসেন পৃথিবীতে শুধু দেবার জন্য। আমাদের সন্তোষদা সেই সব বিরল মানুষদের একজন। সব কিছুই তাঁর কাছে ভারি সুন্দর আর প্রিয়। রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই তাঁর আত্মীয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা তাঁর আপনজন। আমার মত একজন অযোগ্য মানুষও তাই, তাঁর কাছে আসার সুযোগ খুব সামান্য দিনের জন্য হলেও পেয়েছিল। তাঁকে নিয়ে লেখার জন্য আছেন বড় বড় মানুষরা।

অসংখ্যবার যাঁর অভিমান অভিযোগ আদর-অত্যাচার ভালবাসায় আকণ্ঠ ডুবে থেকেছি, সেই সন্তোষদাকে নিয়ে মানুলি দু-চারটে কথা সাজিয়ে 'মালিনী'র পাতা ভরাতে মন চাইছে না। তাঁর বিরাটত্বের সিংহাসন থেকে তিনি আমাদের কাছে বসেছিলেন, আমরা তাঁর কাছে। ফুরায় যা, তা, ফুরায় শুধু চোখে কিনা জানি না, এত বড় অনুভব ক্ষমতাও আমার নেই। কিন্তু অন্ধকারের বাঁধন পেরিয়ে, তিনি যে আলোকের পথে পৌঁছেছেন সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তাঁকে আমার প্রণাম, আমার প্রণাম শতবার।

কৃষ্ণা বসু

প্রতিমা বিসর্জন হয়ে যাবার পর পূজামণ্ডপ খাঁ খাঁ করে, তেমনি এক শূন্যতা এখন আমাদের, সন্তোষদা চলে যাবার পর। আর কার অগাধ প্রশ্রয়ে আমাদের লেখালেখিগুলি লালিত হবে? তাঁর মনের সমস্ত জানলাগুলি ছিল শিল্পসাহিত্যের দিকে খোলা, সেই বিরাট হৃদয়ের মানুষটির স্মৃতির পায়ে স্নেহকাঙাল মনের দীন হীন প্রদীপটিকে জ্বেলে দিলাম।

আইভি রাহা

এখনও মনে হয় অন্য অনেকবারের মত কারো ওপর তীব্র অভিমান নিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করে চুপচাপ নির্জনে নিজেকে কোথাও আড়াল করেছেন। রাগ স্তিমিত হলে, অভিমান সরে গেলে অথবা যার উপর অভিমান

তার কোনও লেখা হঠাৎ-ই ওঁকে মুগ্ধ করলে সব ভুলে ছুটে আসবেন তার কাছে। বলবেন, ভালবাসি বলেই তো এই অভিমান। যাকে ভালবাসা দেওয়া—তার কোনও বিচ্যুতি, কোনও ব্যতিক্রম যে সয় না।

ঋষিপ্রতিম, সাহিত্য-প্রাণ, সমুদ্রহৃদয়—এই মানুষ, আঘাত পেয়ে, আহত হয়েও, স্নেহ, প্রেম, মমত্ববোধে কৃপণ হননি কখনো। অনেক বিলিয়ে দেউলেও না।

অন্য অনেকের মত আমারও কিছু পাবার আশাতেই বুঝি কাছে আসা—এ ভুল ভাঙল। মৃত্যু কোলে নিয়ে ওঁর পরম নিশ্চিন্ত মূর্তির কাছে আমার বার বার আকুল ছুটে আসা—এই উপলব্ধি যেদিন ওঁর চোখে জল আনল, সেদিন আমার মাথায় হাত রাখলেন। কোনও কথা না বলে বললেন, তুমি—তোমার হৃদয়-ই শুধু চেয়েছিল দিতে, কেবল নিতে নয়।

ওঁর এই শেষ অনুভব—আমার সমস্ত জীবনের সান্ত্বনা, আমার সম্পদ।

ওঁর যাওয়াটা রাজার মত যাওয়া। রাজা হয়ে যাওয়া। এই বা কজন পারে?

শুক্লা ঘোষাল

কিংবদন্তীর মত যাঁর কথা ছোট থেকে শুনেছি তাঁকে—সন্তোষকুমার ঘোষকে আমি কাছ থেকে দেখেছি ১৩ই আগস্ট, '৮৪ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে। সুচিত্রা মিত্রের একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে। ঘটনাটি এরকম—ওই দিনই দুপুরে সম্পাদিকা (মায়া সিদ্ধান্ত) বললেন, সন্তোষদার সঙ্গে তোমাকে সুচিত্রা মিত্রের প্রোগ্রামে পাঠাব। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সন্ধে সাড়ে ছটা। রবীন্দ্রসদনের প্রথম সারির আসনে আমি সন্তোষকুমার ঘোষের পাশে। তখনও ওঁকে আমি কী বলে সম্বোধন করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সন্তোষদা বলা কি উচিত? না সন্তোষবাবু বলতে হয়? পাশে বসে প্রোগ্রামের রিভিউ করার জন্য কী কী নোট করার দরকার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কখনও গানে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলেন।

দুদিন পর সন্তোষদার বাড়িতে গেলাম। 'মালিনী'র জন্য অনুষ্ঠানের উপর লেখা তৈরি করে। আমাকে নানাভাবে বোঝাচ্ছিলেন। এক প্রসঙ্গ থেকে শাখাপ্রশাখায় সহস্র প্রসঙ্গে অনায়াস যাতায়াত করছিলেন। এ বিশাল পাণ্ডিত্যের কাছে আমি ছিলাম গালে হাত দিয়ে একান্ত মনোযোগী এক ছাত্রীর মত বসে।

কিছুক্ষণ পর প্রসঙ্গ বদল হল। কথা হল কাজের। ঠিক হল, আমি সপ্তাহে দু-তিন দিন সকালে সন্তোষদার বাড়ি যাব। সন্তোষদা ডিকটেশন দেবেন আমি লিখব। কথা প্রসঙ্গে বললেন, আজকাল আর লিখতে ভাল লাগে না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আত্মজীবনীমূলক লেখা কি? এক রহস্যময় হাসিও হেসেছিলেন যার অর্থ আমার মনে হয়েছিল—ওই ধরনেরই কিছু, এখন বলব না।

তারপর—পুজোর দিন পনেরো আগে ওঁর কথামত ডিকটেশন নেবার জন্য সন্তোষদার বাড়ি গিয়েছিলাম। বললেন, এখন আমার শরীর খারাপ। তুমি পুজোর

পর এস। পুজোর পর কাজ শুরু করব।

খুব ক্লান্ত। পুজোর পর যাবার প্রস্তুতির মুখে খবর পেলাম সন্তোষদা অসুস্থ। কথা ছিল কাজ শুরু হবে—আশা ছিল কিছু শিখব—অপেক্ষা ছিল—নতুন কিছু জানব। কাজ শুরু হয়নি। সন্তোষদার কাছে যা শিখতে পারতাম তেমনটি কি আর কারো কাছে শিখতে পারব?

মায়া সিদ্ধান্ত

সন্তোষদা আমাকে যা দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, ক্ষুদ্র আমি—আমার মত ছোট একটি পত্রিকা সম্পাদকের কাছে তা যে কতখানি তা কেমন করে প্রকাশ করতে হয় জানি না। একজন মানুষের ভাণ্ডারে কত থাকলে যে তিনি এমন অকৃপণভাবে সকলের জন্য অকাতরে তা বিলোতে পারেন, সন্তোষদাকে না দেখলে তা অজানা থেকে যেত।

সন্তোষদা আমার সম্পাদনা জগতের গুরু ছিলেন। কখনো তাঁর বাড়িতে কখনো আনন্দবাজারে তাঁর অফিসঘরে অথবা কখনো 'মালিনী' দপ্তরে বসে তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিয়েছি। 'মালিনী'কে তিনি তাঁর শিশু-সন্তান বলে ভাবতেন। তাই এর উন্নতির জন্য তিনি সদাই আমাকে নানাভাবে উপদেশ দিতেন। 'মালিনী'র জন্মলগ্ন থেকেই প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই তাঁর বাছাই করা গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা দিয়ে 'মালিনী'কে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন।

অভিমানী, সদা হাস্যময়, সভাসমিতিতে সম্রাটের মত মধ্যমণি হয়ে বসবার ভঙ্গি, তাঁর ব্যক্তিত্ব সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর সেই কথা বলবার, ভাষা তৈরি করবার অসীম ক্ষমতা—এসব কিছুই আজ শুধুই স্মৃতি। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। নমস্কার জানাই তাঁর পবিত্র আত্মার উদ্দেশে।

চেনা লেখক, অচেনা মানুষ

সুব্রত নিয়োগী

আমার তরুণ বয়স ধরে সন্তোষদা আমার অনেক দিনের চেনা।

সবার ওপরে আমাকে আকর্ষণ করেছে মানুষ সন্তোষকুমার ঘোষ। মানুষটি কি অভিমানী ছিলেন? হবে হয়তো। বয়সে বেশ বড় হওয়ার পর যখন আমি নিজের গল্প লেখার ব্যাপারে কিছুটা ভাবনা-চিন্তা করছি, তখন সন্তোষদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হতে ছোটবেলার স্মৃতি ধরে সন্তোষদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ছেলেবেলায় আপনাকে প্রায়ই সকালবেলায় দেখতাম মিত্র ইন্সটিটিউশানের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে। কোথায় যেতেন আপনি?'

সন্তোষদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস যেতে দেখেছ, আসতে দেখোনি তো!'

এমনই পরিহাসপ্রিয় ছিলেন সন্তোষদা। যে কোনও কথা কত সহজে সরস করে বলতে পারতেন!

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। সেদিন বুদ্ধদেব বসুর নাটক আকাদেমিতে অভিনীত হচ্ছে। নাটকের নাম 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'। পরিচালক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্তোষকুমার ছিলেন প্রধান অতিথি। সামনের সারিতে বসে সন্তোষদা। সঙ্গে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র আর সন্তোষদার মেজো মেয়ে। সে তখন সদ্য তরুণী। তার পাশে সন্তোষদার আর এক সঙ্গী আমি।

নাটকের বিরতির সময় সন্তোষকুমার হাসতে হাসতে মেয়েকে বললেন, 'অন্ধকারে সাবধানে থাকিস কিন্তু, সবাই ঋষ্যশৃঙ্গ নয়।'

আসলে ঋষ্যশৃঙ্গ ভোগসুখ ও নারী সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কৌশিকী নদীর ওপরে পিতার তপোবনে নিঃসঙ্গভাবে ব্রহ্মচর্য তপস্যা ও বেদ অধ্যয়নে কাল কাটাতেন।

আমি সন্তোষদার ওই কথায় অপ্রস্তুত, বিব্রত। কী বলব সহসা বুঝতে পারি না।

এমনই সহজ, অকৃত্রিম, সপ্রতিভ, পরিহাসপ্রিয় ছিলেন মানুষটি।

মনে পড়ে হঠাৎ-ই একদিন সন্ধেয় আমার বাড়িতে টেলিফোন বেজে ওঠার ঘটনা। ফোন আসে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস থেকে। সন্তোষকুমার ঘোষ আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। ফোন ধরে আছি, সন্তোষদার গলা।

প্রসঙ্গ হল, একটা লিটল ম্যাগাজিনে আমার লেখা 'নরখাদক' নামে একটা গল্প বেরিয়েছে। পড়ে খুশি হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। এবং সেদিনই সন্ধেয়। কথার মধ্যে বললেন, 'যদিও তুমি সমস্ত গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছ, তবুও প্রথম হওয়া গল্প আমার ভাল লাগেনি।' এমনভাবে কথা বলা সন্তোষদার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

যাই হোক, আমি সেই মুহূর্তে কী কথা বলব বুঝতে পারছিলাম না। আমার নিজের ছোট দু'ঘরের ফ্ল্যাটের যা দৈন্যদশা--আমি ওঁর মত মানুষকে বসাব কোথায়। অস্বস্তি আর সঙ্কোচে ওঁকে নানাভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'আমার বাড়িতে কি আসবেন? আমি নেহাতই ছাপোষা মানুষ। আমার স্ত্রী আর একমাত্র সন্তান নিয়ে থাকি। দিন আনি দিন খাই বলতে পারেন।' সন্তোষদা আমাকে বললেন, 'আমাকে দারিদ্র্য দেখিও না সুব্রত। আমার মত দারিদ্র্য অনেকেই দেখেনি।'

শৈশব আর কৈশোরের অভাব ও দারিদ্র্যই হয়তো তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে, এক ধরনের অভাববোধ হয়তো তাঁকে অভিমানী করে তুলেছিল। কখনো-সখনো রাগীও। সন্তোষদার সঙ্গে নানান কথায় বুঝতে পারতাম, তাঁর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ কোনও কোনও মানুষ সম্পর্কে ক্ষোভ ও অভিমান আছে। একাধিক মানুষকে তিনি চাকরির সুযোগ করে দিয়েছেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ উদার মানসিকতায়। পরে তিনি দেখেছেন তাঁরই বিরুদ্ধে তাদের গোপন কলকাঠি নাড়ার নিচুমানের সক্রিয়তা। এমনও দেখা গেছে, একালের একজন বলিষ্ঠ গল্পকারের গল্প কোনও পত্রিকা দপ্তর থেকে ফেরত আসার পর তিনি আবার সেই গল্প নিয়ে সম্পাদকের দপ্তরে ছাপার জন্য দিয়ে এসেছেন। সে গল্প যথারীতি পত্রিকায় ছাপাও হয়। সে লেখক আজ স্ব-নামে খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সন্তোষদা লেখকসত্তায় একজন জাত-জহুরি। তাই যথার্থ লেখক চিনতে ভুল করতেন না।

আর এক দিনের একটা ছোট স্মৃতি আমাকে এখনও ব্যক্তি-মানুষ সন্তোষদার সান্নিধ্যের উত্তাপ অনুভব করায়। বরাবরের এক শীতের সকাল। গাড়ি করে লঙ ড্রাইভে বেরিয়েছিলাম আমরা। সন্তোষদা ছিলেন আমাদের মধ্যমণি। অনর্গল কথা বলতে পারতেন তিনি। কত যে কথা! ফেরার পথে ইস্টার্ন বাইপাসে তাঁর গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। মানে টায়ার পাংচার। সন্তোষদা গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। সঙ্গে আমরাও; সন্তোষদার গায়ে একটা প্রায় নতুন সাদা শাল জড়ানো ছিল। সন্তোষদা পান খাচ্ছিলেন। হঠাৎ পানের পিক লেগে যায় শালে। শালে বিচ্ছিরি দাগ স্পষ্ট। সন্তোষদা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যেন। বললেন, 'জানো, নীহার আমাকে বকবে। জামাটার গায়ে দাগ লেগে গেল।' আমি তাড়াতাড়ি একটু চুন জোগাড় করে লাগিয়ে দিই লালচে জায়গায়। কিন্তু বার বার উনি বলতে থাকেন 'দাগটা বোঝা যাবে না তো সুব্রত?' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনি এই বয়সেও বউদিকে ভয় পান নাকি?' বললেন, 'বউকে কে ভয় পায় না সুব্রত? আমিও পাই।'

সমকালের সাহিত্যের বিষয়, সমস্যা নিয়ে সন্তোষদার বেশ কিছু ছোট ছোট কথা আমার মনে এক শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগাত। তিনি বলতেন, 'ইদানীং আমরা বড় বেশি

সমস্যা সচেতন হয়েছি। সাহিত্যে তার প্রতিফলন না দেখলে আমরা হতাশ হই। এটাও একধরনের সংস্কারের দাসত্ব। সাহিত্যের ইতিহাস সৃজনধর্মী টেনশনের ইতিহাস। লেখক তাঁর পাঠককে চ্যালেঞ্জ করবেন ভাবনা আর উপলব্ধির নতুন নতুন দিগন্ত অতিক্রম করতে। লেখকের হাত ধরে পাঠক এগোতে চেষ্টা করবেন।' বলেছিলেন, 'শিল্প-সাহিত্যের একটা তির্যক তাৎপর্য থাকে। যে শিল্প তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয়, তার শিল্পগুণ নেই বলা যেতে পারে।'

মৃত্যুর কয়েকমাস আগেই হঠাৎ-ই একদিন বললেন, 'আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা নতুন হাউস জার্নালের দায়িত্ব দিয়েছে। একেবারে অন্য ধরনের পত্রিকা। মূলত ফিচারধর্মী কাগজ। তুমিও লিখবে। একেবারে নতুন টাটকা পরীক্ষামূলক গল্প। নতুনদের জন্য কিছু পাতা বরাদ্দ থাকছে। পত্রিকার নাম দিয়েছি 'সানন্দা।' যে কোনও পরিকল্পনার জটিলতায় সন্তোষদা সে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি শেষমেশ। এখন সে পত্রিকার নামই 'সানন্দা।'

আর একটা প্রসঙ্গ দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আমি একসময় নাটক লেখার দিকে ঝুঁকেছিলাম। সন্তোষদার একটা কথায় আমি তা থেকে বিরত হই চিরকালের জন্যই বলতে গেলে। সে সময় নাটক সম্পর্কে সন্তোষদার মৌলিক নিপুণ মন্তব্য আজও ভুলতে পারিনি। তাঁর কথা, 'নাটকের সব কথাই সংলাপের মধ্য দিয়ে জানাতে হয়। এটা নাটকের সীমাবদ্ধতা। আর তাছাড়া, দৈনন্দিন বাস্তবতার ক্ষেত্রে মানুষের মুখের কথা অধিকাংশই অসার ও অর্থহীন। আমাদের মনের ভেতর যে কথাগুলো সব গুঞ্জন তোলে সেগুলো আমরা কখনোই মুখে উচ্চারণ করি না। অথচ নাটকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে কথাই মানুষকে শুনিয়ে দিতে হয়। বাস্তব জীবনে ঠিক এমন ঘটে না। তাই নাটক কৃত্রিম আর অতিনাটকীয় দোষে দুষ্ট। মানুষ সেটা মেনে নেয় যখন নাটকের বক্তব্য রূপকের মোড়কে পরিবেশিত হয়। সেটা রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। কোনও কোনও নাট্যকার ফিরিয়ে এনেছিলেন স্বগতোক্তির ভঙ্গি। বার্নার্ড শ তো সরাসরি নাটকের সঙ্গে মিশেল দিয়েছিলেন উপন্যাসের।

লেখক-সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের চিন্তা-ভাবনার সমস্তরকম মৌলিকতার দিক বুঝিবা চিরকালের অননুকরণীয়।

সন্তোষকুমার ঘোষের এক আশ্চর্য সরলতা ছিল। শিশুর মত অবাক হবার গভীর মন ছিল তাঁর। স্বভাব ছিল উৎসাহ দেবারও। আমার মনে হয় যার জন্য অনেকেই করে-কম্মে খাচ্ছেন। স্বীকার করার ভয় থেকেই মানুষ তাঁকে অহেতুক আক্রমণ করে মাঝে-মাঝে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন চারপাশে রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক কোলাহল চলছে তখন অনেক লেখক নিজেদের লেখায় সাংবাদিকতার রঙ এনে ফেলেছিলেন। কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ নিজে সাংবাদিক হয়েও নিজেকে সময় দিয়েও চিহ্নিত করেননি। কালের করাল গ্রাসে তাঁর সাহিত্য বিলীন হবে না। যেমন মহাভারতকে বেঁধে

ফেলতে পারেনি সময়।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, একজন প্রকৃত লেখককে কেন এত লড়াই করতে হবে? শূন্যগর্ভ আস্ফালনের সামনে পড়তে হবে বার বার? মৃত্যুর পরেও অক্ষমদের বোধের হাত থেকে কেন রেহাই হবে না তাঁর? তার থেকে আরো ভালো নয় কি একজন প্রেমিক হয়ে, স্বামী হয়ে, কেরানি হয়ে কিংবা কেবলমাত্র পিতা বা বন্ধু হয়ে বেঁচে থাকা!

একটা পুরনো গ্রুপ ফটো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফটোটা ছিল হেমন্তের কাছে। পরে সেটা ছাপাও হয়েছিল।

সেটা ছিল বোধহয় সাঁইত্রিশ সাল। তোলা হয়েছিল হেমন্তর সম্পর্কে দাদা অরুণবাবুদের বাড়ির ছাদে।

দেবেন ঘোষ রোড আর বেণীনন্দন লেনের মোড়ে বাঁড়ুয্যেদের বিরাট বনেদি বাড়ি। পশ্চিমে দু-পা এগোলেই কল্যাণ সঙঘ।

ছবিতে কে কে ছিলাম? যতদূর মনে পড়ছে—

সন্তোষকুমার ঘোষ। জগৎ দাশ। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রমাকৃষ্ণ মৈত্র। জগদীশ বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আমি। আর কেউ?

অনেকদিন আগের কথা তো। সব ঠিক মনে পড়ে না।

সৌমেন ঠাকুরের দলের ডাকসাইটে ছাত্রনেতা হিসেবে অরুণ বাঁড়ুয্যের তখন খুব নাম। সেই সঙ্গে সাহিত্য বলতে পাগল।

কল্যাণ সঙ্ঘে আমাকে রমাকৃষ্ণই প্রথম টেনে নিয়ে যায়। হেমন্ত হয়েছিল এই লাইব্রেরির সাহিত্য শাখার সম্পাদক।

গদ্য ছেড়ে আমি তখন কবিতায় নেশাগ্রস্ত। হেমন্তর গানের গলা যেমনই হোক, ওর মনোগত ইচ্ছে গল্পলেখক হওয়ার। রমা তখন লিখছে কন্টিনেন্টাল সাহিত্য গুলে খেয়ে কম বয়সে পাকা পাকা গল্প। শনিবারের চিঠি ওকে তুলো-ধোনা করছে।

জগদীশ এখন মস্ত লোক। মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা।

আমরা যারা তখন কলম চালানোর ক্ষেত্রে মুগুর ভাঁজছি, সদ্য-চেনা জগৎ দাশ আমাদের কেন্দ্রবিন্দু।

তখন আমাদের আড্ডা বলতে স্যাঙ্গুভ্যালি রেস্টুরেন্ট আর নেপাল ভট্টাচার্যি লেনে জগৎ দাশের মেস।

আর ছিল রাস্তায় রাস্তায় হাঁটা।

সন্তোষ গল্প পড়ত কখনও কল্যাণ সঙ্ঘে, কখনও দুর্বার সঙ্ঘে। বেশির ভাগই রোমান্টিক গল্প।

গল্পের বাইরে সন্তোষ যা কিছু বলত তারও বেশির ভাগ মেয়েদের নিয়ে। শুনে মনে হয় প্রমীলার রাজ্যেই ওর বাস। রমাকৃষ্ণর সঙ্গে এদিক দিয়ে ওর বেশি বনত। রমার বিদ্যেটা ছিল একটু বেশি রকম বই-পড়া।

বয়সে এগিয়ে থাকলেও মনের দিক থেকে আমি ছিলাম ওদের চেয়ে পিছিয়ে। গল্প উপন্যাসের ওপর এমনিতেই আমার টান কম ছিল। ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ আর বেলুড়মঠের যে ছাপ মনের মধ্যে পড়েছিল, তার ওপরে পড়তে আরম্ভ করেছিল রাজনৈতিক আদর্শের এখটা পলস্তারা।

এসব সত্ত্বেও একটা কোনও জায়গায় নিশ্চয়ই আমাদের মিল ছিল। নইলে আমাদের মধ্যে সেসময় অতটা ভাবই বা হয়েছিল কেমন করে।

আরপুলি লেন দিয়ে সন্তোষদের রাধানাথ মল্লিক লেনের বাড়িতে যেতাম আসতাম।

পরে ওর কথা শুনে মনে হত ছেলেবেলার দারিদ্র্যে ও যেন একটু বেশি রং চড়াচ্ছে। বাড়ির ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাতে পারত না, এ নিয়ে ওর ক্ষোভ ছিল। কিন্তু আমরাই কি পেরেছি ওকে বাড়ির ভেতরে বসার জায়গা দিতে? যৌথ পরিবার সে সময়ে যে কেমন ছিল, সংসারে অভাব অনটন মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে কতটা সর্বজনীন ছিল—পরে বড় হয়ে এসব অনেকেই ভুলে গিয়েছিল।

সন্তোষ যখন সাহিত্যে জাঁকিয়ে বসেছে, আমাকে তখন নাকে ফুল শুঁকিয়ে রাজনীতি তার থলির মধ্যে পুরে ফেলেছে।

এরপর আমরা দুজন দুদিকে ছিটকে গিয়েছিলাম।

জেলে থাকার সময় সন্তোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' পড়ে কী যে মুগ্ধ হয়েছিলাম বলার নয়।

নতুন করে ওর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে দিল্লিতে ও যখন আমার সহপাঠী শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে একযোগে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের স্থানীয় সংস্করণ চালাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল নতুন করে বাঁধা সেই যোগসূত্র। রাজনীতি সাহিত্য ধর্ম দর্শন--সব ব্যাপারেই মিলের চেয়ে অমিলই ছিল আমাদের বেশি।

আনন্দবাজারের 'ডাকবাংলার ডায়রি' বার হওয়ার সময় ও যে কী উৎসাহ দিয়েছিল বলার নয়। সম্পাদকীয় লেখায় কমিউনিস্টদের যেভাবে ও ঠুকত, সেটা অবশ্যই আমার বরদাস্ত হত না। সন্তোষ ভালভাবেই তা জানত। আবার কমিউনিস্টদের কাগজে যে ভাষায় ওর মুণ্ডপাত করা হত, তার প্রতিবাদ করে গালমন্দও আমাকে খেতে হয়েছে।

আমরা সবচেয়ে কাছাকাছি আসি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পর্বে।

কিন্তু এসব কথা এভাবে হেলাফেলা করে বলার নয়।

বিশেষ করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সন্তোষ স্বগতোক্তির মত যা লিখে গেছে-- সেসব পড়ার পর একটা শুধু বলা যায় : সন্তোষকে চিনতাম, কিন্তু তাকে যে জানতাম সে কথা আজ আর বলতে স্পর্ধা হয় না।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমরেশ মজুমদার

তাঁকে আমি দেখেছি।

কিন্তু এমনও তো বলা যেতে পারত আমি আর তিনি পরিচিত ছিলাম। পরিচয় মানে যদি চেনাজানা তাহলে যে ফাঁক ছিল তাঁর সঙ্গে, সেটা এ চোখের সঙ্গে ও চোখের। জন্ম ইস্তক তো দুই চোখের আড়ি, মরণেও কেউ কাউকে দেখতে পায় না। কাছাকাছি, কিন্তু দুনিয়া দেখলেও দু'জনে অদেখা থেকে যায় শেষতক। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের মাত্রাটাও সেইরকম। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি এমনকী জানতেও। কিন্তু এই লেখা, যা কিনা অতি-অনুরোধে লেখা, সসঙ্কোচে লিখতে পারি আমি তাঁকে শুধু দেখেছিলাম।

আমি জন্মেছি যে সময়ে সেই সময়ে চোখ মেলে দেখবার মত মানুষের বড় অভাব। কতবার ভেবেছি আমি যদি আরও কিছুকাল আগে জন্মাতাম তাহলে—। উনবিংশ শতাব্দী থেকে একচল্লিশ পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষ বেঁচে ছিলেন তাঁদের দেখার সুযোগ পাব না কোনওদিন। তাঁর চলে যাওয়ার দিন আমি দিল্লিতে। সে-রাতে তাঁকে নিয়েই ছিলাম কিছুক্ষণ। তিনি কি মহৎ লেখক ছিলেন? তিনি কি অত্যন্ত উদার মানুষ ছিলেন যাঁর মনে কোনও ঈর্ষা ছিল না? তিনি কি শান্ত স্থির মনে সিদ্ধান্ত নিতেন? তাঁর লেখা কি সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করত? বুদ্ধিমান পাঠকেরা এই প্রশ্নে একটু হোঁচট খেলেন। উত্তরটায় মিশেও আছে, অন্তত আমার কাছে। কিন্তু বাকি প্রশ্ন ঠিক উত্তর পেয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল তিনি আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালির জীবন যাপন করতেন না। নিজেকে পরোয়া করতেন না। এই পর্যন্ত তো হল, কিন্তু তিনি মানুষ হিসেবে কীরকম ছিলেন? না, আমি তাকে জানি না। আমি শুধু দেখেছি। তাঁর মৃত্যুর আগের আড়াই বছর, প্রায় প্রতিদিন, হয় দুপুর নয় বিকেল অথবা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। এবং সেই দেখাটা বলে দিয়েছিল একচল্লিশের বাইশে শ্রাবণই মানুষের মৃত্যুদিন নয়। তাঁকে আমি দেখেছি এবং সেই দেখার পর অনেক অদেখা মানুষের জন্যে আমার কোনও আফসোস নেই।

'কিনু গোয়ালার গলি', 'মোমের পুতুল' অথবা 'পরমায়ু' আমি পড়েছিলাম যখন তখন সাহিত্যের সঙ্গে আমার সংযোগের দাবি পাঠক হিসেবেই। লেখার ধারেকাছে উঁকি মারিনি তখনও। কিন্তু পড়তে পড়তে মোচড় জমছিল বুকে। একটু অন্যরকম কিন্তু কীরকম? তারপর কলকাতায় এসে যখন সত্যি বলতে চলতে শিখলাম, তখন হাতে এল

শ্রীচরণেষু। পরে লক্ষ করেছি কেউ এসে পরিচিত হবার চেষ্টায় যখন বলত আমি আপনার 'কিনু গোয়ালার গলি' পড়েছি তখনই তাঁর মুখে রক্ত জমত। প্রচণ্ড চটে যেতেন। এবং তার প্রকাশ চাপা থাকত না। সেই সুদূর অতীতে লেখা একটি উপন্যাস তাঁর পরিচয় বহন করছে এটা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর পাঠক এখনও তাঁকে অতীতে রেখেছে এটা ভীষণ চাপ সৃষ্টি করত তাঁর ওপর।

অথচ মানুষটি ছিলেন খুবই, বলতে পারা যায় নিপাট শিশু। প্রশংসায় বিগলিত হতেন কিন্তু প্রশংসা করার কিছু পেলে সবাইকে না জানিয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। প্রথম ব্যাপারটি থেকে মুক্ত মানুষ পৃথিবীতে ক'জন আছেন জানি না। মুখে প্রকাশ না করলেও নিন্দে শুনতে ভালবাসেন এমন কাউকে দেখিনি। কিন্তু দ্বিতীয়টি? কোন ভাল লেখা পড়লে অথবা লেখা পড়ে ভাল লাগলে পাঁচ লিটার তেল পুড়িয়ে সেটা লেখককে জানিয়ে আসতে তিনি স্বচ্ছন্দে পারতেন। কিন্তু চাটুকাররা যখন তাঁর অতিসাধারণ লেখাকেও স্তুতিতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলত, তখন, সেই মুহূর্তে, তাঁর অদেয় কিছুই ছিল না।

কিন্তু ক'দিন গেলেই, যখন ফেনা মরত, তখন ঠোঁট কামড়াতেন। স্পষ্ট গলায় বলতেন এদের চিনে নেওয়া উচিত। একদা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সবই বোঝেন তাহলে ওইসময় অত উচ্ছ্বসিত হন কেন? তাঁর সরাসরি জবাব ছিল, 'হতে ভাল লাগে। ইদানীং আমি লিখি না। লিখতে সব সময় ইচ্ছে করে না। আমি মনে করি সাংবাদিকতার চাপ আমার লেখাকে মেরে ফেলেনি। আসলে তেমনভাবে আমার আর লেখা হবে না। অথচ আমার গায়ে লেখকের তকমা আঁটা আছে। তাই সামান্য কিছুকেই যখন কেউ ফুলিয়ে দেখায় তখন ভারি ভাল লাগে। ভাবতে ভাল লাগে।

সত্যি কথা আজ স্বীকার করা ভাল, তাঁর এই ব্যাপারটা আমি বুঝেছিলাম। ধৈর্য জিনিসটা তাঁর ইদানীং লেখার ক্ষেত্রে চলে গিয়েছিল। এইটেই হয়েছিল কাল। 'শ্রীচরণেষু' লেখার পর থেকে অন্য ধরনের লেখার নেশা তাকে পেয়ে বসল। সেইসব রচনার মূল্য হয়তো বিদগ্ধজনের কাছে আছে কিন্তু সাধারণ পাঠকের পছন্দ ছিল না। অনাবশ্যক ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানো, শব্দের মায়ায় জড়িয়ে জড়িয়ে পেঁয়াজের পরত চাপানো, একটা তত্ত্বকে বলতে চাওয়া মাটির ওপর না দাঁড়িয়ে। ফলে লেখক হিসেবে দ্রুত সরে গেলেন তিনি পাঠকের সামনে থেকে। কিন্তু গদ্য হিসেবে যা অসাধারণ, স্টাইলের চাকচিক্য যেখানে স্মরণীয় সেখানে খোলস ছাড়িয়ে কোনও প্রাপ্তি হচ্ছিল না। এইটেই তিনি সে সময় বুঝছিলেন না। কবিতার প্রায়ের মত সেসব লেখা গল্পের প্রায় অথবা উপন্যাসের প্রায়। কিন্তু প্রায় কখনোই আসল নয়। ফলে সম্পাদকের কাছ থেকে তেমন ডাক আসা বন্ধ হল, প্রকাশকদের অবহেলা তাঁকে স্পর্শ করল। আর তিনি অভিমানে খোলস এঁটে বসলেন। কলম ছেড়ে কথায় ঝুঁকলেন। রবীন্দ্রনাথ যাঁর রক্তে, রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁর হৃদয়ে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল এ-মঞ্চে সে-মঞ্চে। কথা বলতে পারতেন, বলতে ভালবাসতেন। সেইসব বক্তৃতার সময় মুগ্ধ শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে তিনি হয়তো ভাবতেন এখন বেশ বেঁচে আছেন। লেখক হিসেবে যে সম্মান

তিনি প্রথমার্ধে পেয়েছেন, প্রতি সন্ধ্যায় দর্শকরা তাঁকে সেই আসনেই বসিয়ে রেখেছে। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা এই পর্বে।

তাঁর সঙ্গে চোখের দেখা ছিল বহুকাল আগেই। কিন্তু ভাব জমেনি। যখন জমল তখন তিনি হাত বাড়ালেন। আমার একটি উপন্যাসের শতমুখী প্রশংসার পর বললেন, 'তবু অগোছালো। সংসারী না হলে—।' তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আমার লেখা পড়ে তাঁর মনে হত যখন ভাল তখন রাতবিরেতে ফোনে প্রশংসা পেতাম, নিন্দে হলে চূড়ান্ত শুনতাম। একদিন তিনি শাস্ত্রবিরোধিতার যে আন্দোলনের চলন শুরু হয়েছে সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় তার সম্পর্কে কটু কথা বললেন, 'ভেবেছিলাম এরা কিছু একটা করবে। কিন্তু এদের বেশির ভাগই নিটোল একটা গল্প লিখতে পারে না। তো কী করে সেই গল্পের বিরোধিতা করে অন্য ধরনের গল্প লিখব সবাই সস্তায় বাজি মাত করে যেতে চায়। পাঠকদের যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গিয়েছে।' সেইদিন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বলেছিলাম, 'অপরের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য।' তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ ছোট হল। ঠোঁট কামড়ালেন। বুঝলাম তিনি আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চান, 'আপনি গল্পের নামে যা লিখছেন তা কি গল্প হচ্ছে? ওদের সঙ্গে আপনার পার্থক্য—ওরা গল্প না লিখতে শিখে গল্পের বিরোধিতা করে যে গল্প লিখছে তা না হচ্ছে ঘাটকা না ঘরকা, আপনি বাংলা গল্পের মাস্টার হয়েও সেই ধারায় গা ভাসিয়েছেন যা আলটিমেটলি কিছু পে করছে না। আপনি কেন লিখছেন? যা লিখছেন তাতে শুধু ভাষায় কুস্তি হয়। বাইরের চাকচিক্যের খোলস তুললে, ভেতরটায় পা রাখার জায়গা না পাওয়া যায় তো সে লেখা লিখে কী লাভ?'

খুবই স্পর্ধা, অত্যন্ত স্পর্ধা, তবু না বলে পারিনি। আসলে একটি ক্ষমতার অপমৃত্যু সহ্য করা বড় কষ্টের ছিল। আমার কোনও যোগ্যতা ছিল না ওইসব শব্দ উচ্চারণ করার কিন্তু কখনো কখনো অভিমান মানুষকে উদ্ধত করে। এও তেমন। তিনি কিছু সময় চুপচাপ শুনলেন। তারপর আচমকা রেগে উঠলেন। আমাদের প্রথাসম্মত লেখালেখির সমালোচনা করতে করতে বললেন, আচমকাই বললেন, 'আমি লিখতে পারি না তাই এগুলো লিখি। এই নিয়ে আমি বেশ আছি।'

কিন্তু তার পরের দিন ওঁর নিজস্ব ঘরানার তৈরি লেখা পড়ে শোনালেন। সাগ্রহে জানতে চাইলেন কেমন হয়েছে। আমি ভাল লাগছে না বলায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আমার অশিক্ষা নিয়ে নানান বিদ্রূপ করতে লাগলেন। তার কিছুদিন পরেই 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর দ্বিতীয় পর্বের বিখ্যাত গল্পগুলো বেরুতে লাগল। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও সেইসব গল্পে তিনি দুটো ধারাকে মিশিয়ে প্রমাণ করেছিলেন বুদ্ধি এবং বোধের সংমিশ্রণে বাংলা ছোটগল্প কতটা উন্নত হতে পারে। কিন্তু তবু বলি, তাঁর কুণ্ঠা ছিল। মাঝরাতে ফোন করে বলতেন, 'তুমি আমাকে টেনে আনলে গল্পে, বেশ ছিলাম নিজের ফাঁপানো জগতে, সেখানে কেউ আমায় বিরক্ত করত না।' এই পর্বের লেখা পড়ে কেউ নীরব থাকলে আঙুল তুলে বলতেন, 'এই আমার জাত নষ্ট করল।'

যখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন তখন মানুষজন যেত তাঁর কাছে। তিনি বলতেন, 'দুইতে আসত, পছন্দ হলে দুইতে দিতাম। তুমি কেন আসো? আমি তো এখন নখদন্তহীন।' আমি কেন যেতাম? কেন দুপুর পার হলেই তাঁর সেই ছোট্ট অফিসঘর আমাকে টানত? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা শুনে শুনে টইটম্বুর হয়ে ফিরতাম। এসব কথা আমি কারও মুখে শুনিনি, জানি না শুনব কিনা।

জীবন এবং মানুষকে নানান দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করতেন তিনি। এবং তার এক একটা টুকরো আমাকে গল্প দিয়ে দিত। হয়তো সারা দিনরাত মাথায় কোনও গল্প আসছে না। তাঁর কাছে বসে যেতাম। এবং অবশ্যই একটা গল্প পেয়ে যেতাম। এরকম গল্প আমি দেশ-আনন্দবাজারে প্রচুর লিখেছি। শেষতক হঠাৎ স্পর্ধা বাড়ল। ওঁর ভাষা-ভঙ্গি এবং শব্দ নকল করে ওরই কথার সূত্র থেকে বীজ নিয়ে দুটি গল্প লিখলাম। 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' এবং 'চার-দেওয়াল ও একটি খাট।' খুব প্রশংসা পেল লেখা দুটো। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করতে আমার সাহস হচ্ছিল না। যদি রেগে যান। রাতে টেলিফোন পেলাম। বললেন, 'আমি যা বলতে পারি, লিখতে পারি না তুমি লিখে ফেল কী করে? সাবাস। কালকে এস, আর একটা ঘটনা বলব। তবে এটা তুমি লিখবে না, আমি লিখব।'

আজকাল তো আমরা কেউ কারো লেখা পড়ি না। কবিদের কথা জানি না, লেখকরা নিজেদের লেখা পড়েন কিনা সেইটেই সন্দেহের। তিনি পড়তেন। শুনেছি নারায়ণ গাঙ্গুলি এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্তের এই অভ্যাস ছিল। তিনি কিন্তু কোনও বাচবিচার করতেন না। যেসব পত্রপত্রিকা তাঁর হাতে আসত তার কোনও লেখা বাদ যেত না। এবং সেগুলো মনে রাখতে পারতেন। কোনও তরুণ লেখক যদি নিজের পরিচয় দিত তাহলে দেখতাম স্বচ্ছন্দে তাঁর রচনা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করতেন। এই গুণ, কনিষ্ঠদের কাছে যা কিনা অমৃতসম উৎসাহ, তা আর কার আছে?

এখনকার দু'জন বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে তাঁর ছিল বিরোধ। ও পক্ষ যতটা বিরাগ দেখাত তিনি তার দশগুণ। কারণ যাই হোক তিনি পাঁচজনের সামনে সেই বিরাগ সোচ্চারে প্রচার করতেন। আপত্তি জানালে ক্ষিপ্ত হতেন। আবার সেই তিনি ওই লেখকদের কোনও লেখা ভাল লাগলে ছেলেমানুষের মত আপ্লুত হতেন। এ কেমন লোক?

তাঁর জানার পরিধি আমার জানা ছিল না। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির মোড় থেকে একটা রাস্তা যদি ধূপগুড়ির দিকে অন্যটি লাটাগুড়ির, এ তথ্য কটি মানুষের জানা? আবার সেই মানুষ রামপুরহাটের পথে কোথায় কী পাওয়া যায়, দিল্লি থেকে আগ্রা যাওয়ার পথে কোন গ্রাম আছে কিংবা নিউইয়র্কের কুইন্স থেকে নিউজার্সি যেতে কী কী ব্রিজ পার হতে হয় এক গলায় বলে যেতে পারেন। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু থেকে উডহাউসের জিভস অথবা পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত কোনও মার্কিন নোবেল অথবা জার্মান ভাষায় রচিত প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে তর্ক জুড়তে পারেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করতে পারেন। এবং

রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়স্থ করেও যখন দ্বিমত প্রকাশ করতেন তখন তাঁর মত বিনয়ী কোনও মানুষ আমি দেখিনি। তাঁর বিখ্যাত একটি কথা, 'পূজায় যদি প্রেম না থাকে এবং প্রেমে যদি পূজা না আসে তাহলে ও দুটোই বৃথা। গীতবিতানের দুটি পর্ব তাই আলাদা নয়। পূজায় প্রেম একাকার হয়ে গেছে।' মাঝে মাঝে খেলায় মাততাম। গীতবিতানের অজস্র গানের কোনও একটি লাইন বলে শুধোতাম প্রথম লাইনটি কী? কোনওদিন হেরে যাননি।

ওঁর কষ্ট ছিল। ইদানীং একটি বড় লেখার কথা ভাবতেন। কিন্তু যে মানুষের মন থেকে ধৈর্য উধাও, আট পাতায় যিনি উপন্যাস শেষ করেন, 'আনন্দলোকে' তিনি কী করে নিজেকে গুছিয়ে তুলবেন? বারংবার মনে হয়েছে, সংবাদপত্রের কাজ, স্তাবকের প্রশংসা, এবং খামখেয়ালিপনা একটু একটু করে তাঁর লেখকসত্তাকে অসাড় করে দিয়েছিল নিজের অজান্তে। জীবনের শেষ দুই বছরে তিনি চেষ্টা করেছিলেন হাত-পা ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। আজ ভাবি, কেবলই অভিযোগ করতাম, 'কেন আপনি হৃদয়ের কথা বলবেন না, কেন শুধু বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবেন?'

শেষ শয্যায় শুয়ে যে দিনলিপি লিখে গেছেন তিনি, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে প্রমাণ করে গেলেন তিনি নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন এতকাল, কী জ্বালায়—কী হতাশায়। একালের সবচেয়ে শিক্ষিত প্রতিভাবান লেখক শুধু আত্মহননে কাল কাটিয়ে শেষবার জানিয়ে গেলেন তাঁর হৃদয়ে অফুরান ভালবাসা রক্ত হয়ে জমেছিল। এত কান্না এত সুখ আমি কোনও লেখায় পাইনি।

মনে পড়ে, 'কালবেলা' যখন বই হয়ে বের হল তখন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। বইটি হাতে নিয়ে মলাট দেখে খুব প্রশংসা করলেন কিন্তু বইটি খুললেন না। আমি চাইছিলাম তিনি খুলুন। বললেন, 'রাত্রে পড়ব'। কিন্তু ধারাবাহিক প্রকাশের সময় প্রতি সপ্তাহে প্রশংসা এবং নিজের ঝড় তুলতেন। ওঁর পুরোটাই পড়া ছিল। বিদায় নেবার সময় আমি সেদিন প্রণাম করেছিলাম। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমার বইতে আছি?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিলাম। তিনি করুণ গলায় বলেছিলেন, 'এ কী করলে, এত ভাল বই, আমার নাম রাখলে। এ বই তো বিক্রি হবে না। আমার নাম যে বইতে থাকে সে বই বিক্রি হয় না।' আমি বলেছিলাম, 'কেন, শ্রীচরণেষু?'

তিনি উৎসর্গপত্র দেখে বুকে জড়িয়েছিলেন। আকাদেমি পেয়ে নার্সিং হোমে ছুটেছিলাম। দুর্বল শরীর নিয়ে দু'হাত তুলে আমায় ধরলেন। আমি দ্বিতীয়বার আকাদেমি পেলাম। 'আমি তোমার মধ্যে বাঁচব। পিতা তো পুত্রের মাঝেই জীবন পায়।' তখন তাঁর গলায় মৃত্যুর থাবা। নিঃশ্বাসে মৃত্যুর গন্ধ। আমি জানলাম, তিনি আমাকে জীবন দিয়ে গেলেন।

তাঁকে আমি এখনও চিনি না, জানি না। আকাশ কিংবা সমুদ্রকে কেউ জানতে পারে না। আমি শুধু আমৃত্যু বলতে পারব, 'তাঁকে আমি দেখেছি।'

সফলতার শেষ কথা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি মনে করি, সব মানুষই একশো বছর আয়ু নিয়ে জন্মায়। তারপর জীবনের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যে যেমন পারে, যে যেমন চায়, নিজের আয়ু ক্ষয় করে নিতে পারে। নেয়। তাই আমরা মানুষকে নানা বয়সে মৃত্যুবরণ করতে দেখি। লেখক-সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করে প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের আয়ু পেয়েছিলেন।

১৯৮৪ সালের পুজোর ছুটিতে তিনি সপরিবার উত্তর-ভারতে বেড়াতে যান। বেড়াবার আনন্দ বারবারই ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল গলার মধ্যে একটা খচখচ অস্বস্তিতে। মনে হচ্ছিল, মাছের কাঁটা ফুটে আছে। বাড়ি ফিরে এসে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে তাঁর ক্যানসার হয়েছে।

তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার যুক্ত সম্পাদক। বস্তুত দৈনিক পত্রিকাটির সম্পাদকই। মালিকানায় অংশ নেই, বেতনভোগী, কিন্তু ক্ষমতায় ও দায়িত্বে যাকে বলে সর্বেসর্বা। ইতিমধ্যে তিনি পত্রিকাটির প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, পাশাপাশি ভোল ফিরিয়ে দিয়েছেন বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও।

এমন একজন প্রতিভাবান উচ্চপদস্থ কর্মীর অসুস্থতায় উপযুক্ত চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা যে হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানই করেছিল উদারভাবে, তাতে আমরা অবাক হইনি। কোনও ত্রুটিই তাঁরা ঘটতে দেননি। রাজরোগের রাজকীয় চিকিৎসায় প্রভূত অর্থব্যয় হয়েছে। কিন্তু চারমাসের বেশি বাঁচানো যায়নি রুগীকে। মাঝে মাঝে ভাল হয়ে ওঠার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, তখন রুগীর মনে হচ্ছিল কণ্ঠস্বর-বঞ্চিত জীবন অভিপ্রেত কিনা। কিন্তু সে ছিল কর্কট কুচক্রীর লুকোচুরি খেলা। দ্বিগুণ পরাক্রমে জেগে ওঠার আগে কিছুকাল ঘুমিয়ে থাকা। মনে আশা জাগানো। অবশেষে অপরাজেয় এই মানুষটি রোগের কাছে পরাস্ত হলেন। ১৯৮৫ সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি।

আমার ডাক্তার বন্ধু শান্তনুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন এমন হয়? কেন ঠিক সময়ে ক্যানসার রোগ ধরা পড়ে না? রুগী আপনার সামনে বসে সরল মনে হাঁ করে আলজিভ দেখানোর সময় টর্চ ফেলে আপনি কী করে বোঝেন। এ ফ্যারেঞ্জাইটিস নয়, টনসিলাইটিস নয়, আক্কেল দাঁত ওঠার ব্যথা নয়, এ হল ক্যানসার?

শান্তনু বলে, গ্রোথ। দেখতে পাই, জায়গাটার কোষ গজিয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে

পেইনলেস থাকে। যখন পেইন হতে শুরু করে, তখন সে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তাই সারানো হয়ে যায় দুঃসাধ্য। বায়াপসি করাতে হয়। সে কতখানি ছড়িয়েছে জানার জন্যে। আক্রান্ত জায়গাটা কেটে ফেলে নিয়ে, তারপর নানা প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে আমরা ক্যানসারকে নিরস্ত করার চেষ্টা করি। আমরা যাকে সাধারণ ভাষায় অসুখ বলি, এ তা নয়, এ হল শরীরযন্ত্রের সঙ্গতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র।

আর সব সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের মত শরীরেরও নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা তাকে সতত সঞ্চারমান আততায়ীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। বয়স বাড়লে তা দুর্বল হয়। তখন শরীরের ধারককে অনিয়মিত ও পীড়াদায়ক জীবনযাপন থেকে সরে আসতে হয়—একথা সবাই জানে। ক্যানসার কেন হয়। এর উত্তরে অন্টারিও, কানাডার বিশেষজ্ঞ বাঙালি গবেষক ডাক্তার পীযূষ লালা বলেছেন, বংশগতি, ধূমপান, পরিবেশ দূষণ, এসব তো আছেই, আর একটি বড় কারণ হল সূক্ষ্ম মানসিক পীড়ন বা স্ট্রেস। এ থেকে বাঁচতে মনকে শান্ত রাখতে হয়, ছোটখাটো নিত্য উৎপাত অগ্রাহ্য করতে শিখতে হয় আর এমন কাজে লিপ্ত থাকতে নেই যার মধ্যে অযথা উত্তেজনা আর হিংস্রতা আছে। যাতে বিশ্রামের সময়ও মনকে আলগা রাখা যায় না ঘুম গভীর হয় না। যার মধ্যে কোনও মুক্ত আনন্দ নেই। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে ডাক্তার লালা জানাচ্ছেন যে, আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে একটি অতিক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। তা থেকে 'মেলাটোনিন' নামের হরমোন নিঃসৃত হয়। মানুষ যখন শান্ত বা প্রসন্ন বা ঘুমন্ত থাকে তখন এর নিঃসরণ বিঘ্নিত বা বন্ধ হলে ক্যানসার হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। বিশৃংখল পরিবারে চোর ঢোকার মত।

সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করার আগে এই খবরগুলি দরকার। কার্যকারণ ব্যতীত পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না।

তিনি যত বড় সাংবাদিকই হোন, আমরা যারা সেই ১৯৬০-৭০ সালে যুবক ছিলাম তারা তাঁকে একজন দুর্ধর্ষ গল্পকার হিসাবে সম্মান করেছি। সর্বসাকুল্যে হয়তো দেড়শোটি গল্প লিখেছেন। আর তিরিশ বছর বয়সে 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসটি—এই দিয়েই তাঁকে আমরা চিনি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর যখন দাবি করা হচ্ছিল, একজন দিকপাল সাংবাদিক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তখন আমিই প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম, সাংবাদিকতা একটা বৃত্তি। অর্থের বিনিময়ে লোকে আর সব বৃত্তির মত, ডাক্তারি বা ব্যারিস্টারির মত, এই কাজে নিয়োজিত হয়। গণমাধ্যমের সেবা করে। যেমন যেমন দক্ষতা, সাফল্য দেখায়, তেমন সুনাম ও অর্থ উপার্জন করে। জীবিতকালে তুখোড় সাংবাদিকের যে আভা আমরা দেখি, তা ক্ষণস্থায়ী। চিরস্মরণীয় হলে সন্তোষকুমার তাঁর সাহিত্য রচনার জন্য হবেন। সাংবাদিকতার জন্য নয়। পরে দেখলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রও এই কথাই বলেছেন।

শিল্প সাহিত্যের স্তিমিত জনপ্রিয়তা থেকে ক্রমে পূর্ণকালীন সাংবাদিকতা ও দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার উত্তেজক কাজে সরে এসেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তখন তাঁর দাপট আমরা দেখেছি। মানুষের স্বভাব, ক্ষমতা হাতে পেলে সে তার অপব্যবহার করবেই।

তিনিও করেছেন। সুযোগ পেলেই সাহিত্যিক সহকর্মীদের হেনস্থা করেছেন। শুনতে পাই, তাঁর অনুমোদন না থাকায় মুখচোরা মানুষ নরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্মক্ষেত্রে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ; প্রভূত খ্যাতি-প্রতিপত্তি পাওয়া সত্ত্বেও সমরেশ বসুর বিদেশ যাওয়া হয়নি তাঁর প্রতিবন্ধকতায়। এক সময় সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) তাঁর লৌহ আলিঙ্গন থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। তাঁর অকথ্য গালিগালাজ অন্য চাটুকারদের মত সহ্য করতে না পারার ফলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি যায়। তাঁর সমর্থন ছাড়া কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকা প্রতিষ্ঠা পেতেন না। দেবব্রত বিশ্বাসকেও তাঁর উষ্মা সহ্য করতে হয়েছে। শেষমেশ রবীন্দ্রবিশারদ হয়ে নানা সভায় বক্তৃতা দিতে পেরে, তাঁর অহংকৃত মনে কিছু তৃপ্তি এসে থাকবে। তাছাড়া উচ্চপদের বেতন তো ছিলই। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তিনি আর একজনকে বলছেন, 'আমি রাষ্ট্রপতির চেয়ে বেশি মাইনে পাই।'

মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে এসে তাঁর স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, আমরা লক্ষ করি। ১৯৮৩ সালে দেখি তিনি অকপটে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (তখন প্রয়াত) গল্প বলার জাদুশক্তি বিষয়ে প্রশংসা করছেন। বলছেন তিনি মপাসাঁ, ও-হেনরি, চেখভ কি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে। আমাদের কারুর একটা ভাল কবিতা প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে টেলিফোন সংবর্ধনা পাওয়া যেত। শীর্ষে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে তাঁর মনে কিঞ্চিৎ করুণার ভাব এসেছিল।

বারো বছর পার হয়ে গেল সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। এখনও প্রেসক্লাবে তাঁর আবক্ষ মর্মরমূর্তি তো স্থাপিত হয়নি। কিন্তু তাঁর গল্পগুলির নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে তিন খণ্ডে। বর্তমান প্রজন্ম তাঁর রচনায় ভাবাবেগবর্জিত পর্যবেক্ষণ ও শৈলীর মৌলিকতা উপভোগ করে। বাংলা সাহিত্যে যা বিরল।

'চলার পথে' কিন্তু অন্য ধরনের বই।

বইটা খুলে প্রথমেই মনে হয়—এ যেন একটা ঢাউশ 'সহজ পাঠ'। বড় বড় দানায় ছাপা, ফাঁক-ফাঁক লাইন। দশ দশটা পাতাভরা ছবি। খানিকটা ডায়েরি। একগুচ্ছ চিঠি, আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্বিগ্ন চিঠির উত্তরে লেখা। আর, একটা গল্প। সেই 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পটা। রোগশয্যায় বসে একটু একটু করে বুনেছিলেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো একজন বয়স্ক মানুষের প্রেম ও বিষাদ নিয়ে লেখা। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তখন পড়ে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। লক্ষ করেছি সব লেখার রচনাকালই তাঁর জীবনের শেষ চার মাসের। ডায়েরিটাও আগে পড়েছি। বারো বছরের দূরত্ব থেকে আবার পড়লাম। ১১১ পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত এই রচনা ৫০ পৃষ্ঠায় আঁটানো যেত কিন্তু তা হলে বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবিগুলির মূল্য কমে যেত অবশ্যই।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ, বেশির ভাগ মানুষই, থতমত খেয়ে যায়। যারা বিশেষ সময় পায় না ভাবনাচিন্তা করার, তাদের কথা আলাদা। এক্ষেত্রে লেখক চার মাস সময় পেয়েছিলেন তাঁর জীবনদর্শনকে ঝালিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করতে। তাঁর সাহিত্যরচনার প্রধান গুণ ছিল নিরাবেগ ও প্রখর নৈর্ব্যক্তিকতা, দৃশ্যের অন্তর্গত রূঢ়

সত্যের দিকে যাবার নিষ্ঠা। সমস্ত প্রতিবন্ধ কাটিয়ে, মোহ ছিঁড়ে, মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছার প্রতি জোর। আর মিতকথন। কাটা-কাটা বাক্য আর সংলাপ। অভূতপূর্ব উপমার আকস্মিকতা। ব্যঙ্গের মৃদুহাস্যও আছে অনেক লেখায়। যে হাসির বক্রতা তাঁর মুখেও ছিল। সাংবাদিকের সফলতা তাঁর তৎপরতা, তাঁর বাক্‌চাতুর্যে। জনপ্রিয়তায় জয়লাভ করা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কোনও শাশ্বত মূল্যবোধে তাঁর আস্থা নেই।

ছোটখাটো মানুষ ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। গদি আর মোটা হাতলে মোড়া তাঁর সম্পাদকীয় আসনের এক কোণ ঘেঁষে বসতেন। তাতে চেয়ারটা একদিকে, ডানদিকে, হেলে থাকত। সামনে একটা বিশাল টেবিল। বাতানুকূল আপিসঘর। টেবিলের নিচে কলিং বেলের বোতাম। বাইরে সতত সন্ত্রস্ত প্রহরী। ডানদিকের ড্রয়ারে সম্ভবত পানীয়ের সরঞ্জাম থাকত। ডিকটেশন দিতেন। বেল দিয়ে কোনও অধস্তন সহকর্মীকে ডেকে পাঠালে সে ঘরে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে থাকত। বসতে না বললে বসত না। ঢ্যাঙা মানুষকে অপদস্থ করে আনন্দ পেতেন।

এই ডায়েরির পাতায় পাতায় দেখছি তাঁর আহত অভিমান খুব স্পষ্ট। আর আসন্ন মৃত্যুতে তিনি বিচলিত নন। কেবল, বড় বেশি দেরি হচ্ছে বলে বেদনাবোধ। প্রশ্ন করছেন, এত যন্ত্রণা কেন? অতীত জীবনের স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে অনুশোচনাও আছে। ৩০/১০/৮৪ তারিখে প্রথম অংশে লিখছেন, "সবাইকে ক্ষমা করে যাচ্ছি। বিনিময়ে সবার ক্ষমা যেন পাই। আমার জীবনভর এরই বড় অভাব ছিল।" তখন তিনি যশলোক হাসপাতালে। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ৯/১১/৮৪ তারিখের নোটেও সেই ক্ষমা পাওয়া, ক্ষমা চাওয়ার কথা। প্রথম দিকে তাঁকে রে দেওয়া হয়েছিল। নিজের বিছানায় ফিরে এসে লিখছেন, "সুনীল আয়ুর অংশ দিয়ে দিয়েছে, লিখেছে। তা কি দেওয়া যায়! দিলেও আমার নিতে বয়ে গেছে।" এই অংশটি পড়ে আমার হাসি পেল। সত্যি, সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) ভারি রোমান্টিক। তবে আয়ুর অংশ না দিয়ে যদি রয়্যালটির অংশ তাঁকে দিতে চাইত তা হলে বেশি উপকার হত অসুস্থ মানুষটার। কিন্তু তা-ও সন্তোষকুমার প্রত্যাখ্যান করতেন। অমন উদার মনিব থাকতে আর কারুর কাছে হাত পাতবেন কেন?

আয়ু ও সফলতা বিষয়ে আর এক লিখন : ৩১/১০/৮৪ সকাল ৭-৪৫। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল : "রবীন্দ্রনাথ চৌষট্টি থেকে আশি, এই বয়েস অবধি অপেক্ষা করেছেন। তবে তাঁর চূড়ান্ত প্রাপ্তি দেখে গেছেন। আমি অত সময় পাব না। পেতে চাইও না। এত দিন এত লিখেও যদি কিছু না হয়ে থাকে। আর গুচ্ছের লিখলেই বা কী হবে?"

"পাব না"—এই কথায় হতাশা বোঝায়। কিন্তু পরেই যখন বলেন "চাইও না।" তখন মনে হয়, আসলে চাই। বাসনা আছে। সম্ভাবনা নেই বলে তা ত্যাগ করছেন। এরকম মেয়েলি উক্তির আরও দৃষ্টান্ত আছে।

৭।২।৮৫ তারিখে লেখা একটি চিঠি শুরু হচ্ছে এইভাবে : "কত মেজাজ দেখিয়েছি। গালমন্দ করেছি...." এই লিখিত স্বীকৃতি আমার আগের অনুভাবনার সমর্থক। তাঁর এই স্বভাব পেশাদার ম্যানেজার সুলভ ছিল না। ফিউডাল। তাই ক্রোধ সংবরণ করতে না পারার

ফলে মানসিক চাপ নিশ্চয় বেড়ে থাকত। তারপর, দিনে আশি-নব্বুইটা সিগারেট খেতেন—পরে আবার জরদা-পান, নিত্যি দুটো-তিনটে করে বক্তৃতা। এই মানুষের ক্যানসার হবে না তো কার হবে? আমার এক-এক সময় মনে হয়, তাঁর জীবিকালব্ধ অস্থিরতা এই রোগের আসল কারণ। নইলে আপনারা আর একজনকে পাশাপাশি মিলিয়ে দেখুন। এম জে আকবর। ওই একই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি সাংবাদিকতার ভোল ফিরিয়ে দেননি? প্রথমে একটি সাপ্তাহিক, পরে একেবারে নতুন মেজাজের একটি দৈনিককে কোথায় তুলে দিয়ে গেছেন। তারপর প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি করেছেন। সেখানে হাত পুড়িয়ে এসে আবার একটা নতুন দৈনিক পত্রিকা নিয়ে লেগে আছেন। কই, তাঁর তো ক্যানসার হয়নি। কারণ তিনি পেশাদার ম্যানেজার। পেশাদার ম্যানেজার হল সেই ব্যক্তি, সেনাধ্যক্ষর মত যে সন্ধেবেলা হুকুম দিয়ে যায়। রাত্রে ব্রিজ বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে তাতে নিজেদের সৈন্য কিছু মরে মরুক, শত্রুপক্ষ এগোতে পারবে না ; তারপর শিবিরে ফিরে গিয়ে ডিনার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত কেন, না সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর যা ঘটবে দেখে আবার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। তার মনে দ্বিধা নেই, তার মাথা ঠাণ্ডা, তার মনে অনুশোচনার দংশনও নেই।

সন্তোষকুমার ঘোষের চরিত্রে পেশাদারি গুণ ছিল না। কাজ নিয়ে তাঁর গর্ববোধ ছিল। বিরাট কিছু করছেন এই ভাবনা থেকে আত্মতুষ্টি পেয়েছেন। মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। পরে নিশ্চয় ভেবেছেন—"এখানে, এই স্টেশনে আমার তো আসার কথা ছিল না। এসে কি ভুল করেছি?"

তাঁর ডায়েরি আর চিঠিপত্রে কর্তৃপক্ষের অকৃপণ সহায়তা পাওয়ায় কৃতজ্ঞতার ছড়াছড়ি। কেন? তিনি কি এই দাক্ষিণ্যের যোগ্য পাত্র ছিলেন না? নাকি, জানতেন এই লেখাগুলি একদিন ছাপা হবে। কর্তৃপক্ষকে খুশি করবে? এ-ও পেশাদারি মনোভাব নয়।

আমার এ-ও মনে হয়, পশ্চিমি আধুনিকতা দীক্ষিত এই মানুষটির নিঃসঙ্গতা, নিস্পৃহতা, নিরাসক্তি, তিক্ততা—এইসব বোধ, যা তাঁর জীবনযাপনে ও সাহিত্যকাজে প্রতিফলিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রদর্শনে মিশতে গিয়ে শিকড়ে আর উপযুক্ত মাটি পায়নি। তাই সার্ত্র বা কাফকার সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে পারি না। মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এত পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন। কিন্তু অস্তিত্বের বোঝা বহন থেকে মৃত্যু তাঁকে মুক্তি দিচ্ছে, এমন কথা তার মনে আসছে না। হা-হুতাশ করছেন মাঝে-মাঝে। আবার আশা করছেন, কোনওখানে স্নেহে-প্রেমে-শ্রদ্ধায় একটি 'সংরক্ষিত' আসন তাঁর জন্য থাকবে।

এক জায়গায় বলতে দেখি—"মানুষ মাত্রেই মরণশীল। কিছু কিছু মানুষ তবুও অমর। আমিও কি না একদিন ওই অমরত্বেই উমেদার ছিলাম। হায়-রে!" এই খেদোক্তি সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিক। যেন সন্তোষকুমার ঘোষের মুখে মানায় না।

একবার আগে পড়েছি। বারো বছর পরে আবার পড়লাম। আপাত কাঠিন্যের আড়ালে সমুদ্রতীরে শয্যাশায়ী একজন স্পর্শকাতর মানুষকে আবিষ্কার করে কষ্ট হচ্ছে। ভালবাসার জোরে স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট পার হবার সাহস তো তিনি দেখিয়েছিলেন।

চলার পথে—সন্তোষকুমার ঘোষ / বিকাশ ভট্টাচার্য চিত্রিত / আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা—৯, / ২৫০.০০।

চমৎকার, মনে রাখবার মতন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতার প্রায়। সন্তোষকুমার ঘোষ। দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩। দাম ৬ টাকা।

তিন বন্ধুর একজন লিখতেন ছোট গল্প, একজন গাইতেন গান, আর একজন কবি। ছোট গল্প লেখকের নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সেই গায়কের নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আর কবি ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। না, নামগুলো উল্টেপাল্টে যায়নি, এইভাবেই শিল্পের জগতে প্রবেশ করেছিলেন সেই তিন যুবা। তারপর তাঁদের নিয়তি তাঁদের অন্য শাখায় নিয়ে গেছে।

কবি সন্তোষকুমার ঘোষ অচিরেই আত্মপ্রকাশ করলেন দুর্ধর্ষ ছোটগল্পকার হিসাবে, তারপর ঔপন্যাসিক। আরও অন্যান্য গদ্য রচনার রূঢ় জগৎ তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল কবিতার এলাকা থেকে। কিন্তু কবিতার ছোঁয়াচ একবার লাগলে তা সারিয়ে দেবার মতন কোনও ওষুধ আজও পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি, সারা জীবনে ছাড়ে না। সন্তোষকুমার ঘোষের এই নতুনতম বইটি পড়লেই বোঝা যায়, কবিতার রসায়ন তাঁর মনের মধ্যে বরাবরই কাজ করেছে। মুখবন্ধের কৈফিয়ত হিসেবে তিনি উল্টোপাল্টা যাই বলুন, আলোচ্য বইটি একটি চমৎকার, বার বার পড়বার এবং মনে রাখবার মতন সৃষ্টি। উনি বলেছেন, এগুলো কবিতা নয়। তা হলে পাল্টা প্রশ্ন করতে হয় কবিতা কী? কেউ দিতে পেরেছে আজ অবধি—এর উত্তর? সেই জন্যই ঋষিরা সুন্দরভাবে পাশ কাটিয়ে বলে গেছেন, কাব্য হচ্ছে ব্রহ্ম স্বাদ সহোদর এবং অনুদ্দিষ্ট অর্থাৎ কারুর মুখ দিয়ে এর সংজ্ঞা উচ্চারিত হয়ে এঁটো হয়ে যায়নি। কবিতা কী, এর সঠিক উত্তর আসলে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। কবিতা কী? কবিতা অনেক রকম। সুতরাং সন্তোষকুমার ঘোষও লিখেছেন সেই অনেক রকমের এক রকম।

কবিতা লিখছি না, এটা ভেবে নেবার ফলে তাঁর অনেকটা সুবিধেও হয়েছে, তাঁকে মানানসই জামাকাপড়ের কথা চিন্তা করতে হয়নি। আর যেহেতু সুরটা প্রায় সময়ই নিজের সঙ্গে স্বগত সংলাপ, তাই সেই নিভৃতি এই রচনাগুলিতে দিয়েছে সাবলীল অকৃত্রিমতা। অবশ্য একেবারে কৃত্রিমতা বর্জিত কোনও শিল্প হয় না, যে-কোনও সৃষ্টিই সজাগ-সচেতন চিন্তার ফসল, ভাষা-ব্যবহার তো বটেই। এবং সন্তোষকুমার ঘোষের মতন শব্দ সম্পর্কে অতিশয় খুঁতখুঁতে লেখক, যার প্রমাণ তাঁর গদ্য রচনাতেও পাওয়া

যায়, এই লেখাগুলিতেও তাঁর ভাষা ব্যবহারের বারংবার চিন্তার চিহ্ন আছে। তবে একথাও ঠিক, তাঁর এই গ্রন্থটির ভাষা তাঁর অন্যান্য রচনার চেয়ে বেশ আলাদা, স্বাদ অন্যরকম। স্বচ্ছতার মধ্যে রহস্য সৃষ্টিও যে সম্ভব, তার প্রমাণ তিনি অনেকবার দিয়েছেন।

কোনও কোনও রচনা সরাসরি গদ্যে, কোথাও বা কিছুটা ছন্দের ঝোঁক, কোথাও বা সংলাপযুক্ত। ফরাসি কবি আঁরি মিশো-র একধরনের গদ্য কবিতা আছে, একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি সেই কবিতাগুলি লিখেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষের টুকরো গদ্যগুলি পড়লে সেই কবিতার কথা মনে পড়ে। মিল শুধু এইটুকুই, একটি চরিত্রকে নিয়ে একাধিক কবিতা। এখানে সেই একটি চরিত্র কে? বলে দিতে হবে কি যে সেটি স্বয়ং তিনিই। "আমি দুঃখের দেখি মুখ কিন্তু সুখের--শুধু শরীর।" এই কথা যিনি বলেন, তিনিই অন্য কবিতায় বলেন, "আমার মৃত্যু হলে এই পৃথিবী বিধবা হবেই"...এবং একটু পরে "কিন্তু সেই পৃথিবীকে পুনর্বার বিবাহের অনুমতিপত্র দিয়ে যাবো।" উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়, শুধু কয়েকটি নিরাভরণ সুন্দর লাইন এখানে উদ্ধার করছি :

লজ্জা কী।	এখন শীত,
এখন রাত্রি।	চারদিকে ধবধবে
বিধবা কুয়াশা।	তাছাড়া বিজন বয়স
তো!	কেউ চেয়ে নেই, কেউ দেখছে না।

এই বইতে মৃত্যু-চিন্তা একটু যেন বেশি। রিল্‌কে বলেছিলেন, ৩৫ বছর বয়সের পর যে মানুষ মাঝে-মাঝে মৃত্যুচিন্তা করে না, সে নির্বোধ। সেই হিসেবেই ওই লাইনগুলিকে মানা যায়। আবার বলছি, এটি একটি আলাদা স্বাদের চমৎকার বই, বারবার পড়বার এবং মনে রাখবার মতন। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যাদের মনে ভীতির ভাব আছে, তারাও এই গ্রন্থের সহজ-সুন্দর ভাষায় অনেক মৌলিক চিন্তার স্বাদ পাবেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

আনন্দবাজার পত্রিকা / ৫১ বর্ষ/৩০২ সংখ্যা / সোমবাব / ৫ই মাঘ / ১৩৮৭/ ১৯ জানুয়ারি / ১৯৮১

'শ্রীচরণেষু মা-কে' : স্বীকারোক্তিমূলক মনোবিশ্লেষণ

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

এক

তার প্রথম চিঠি 'শ্রীচরণেষু মা'। প্রথম চিঠি, শেষ চিঠিও : শেষ নমস্কার সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে' বইটিকে 'কলাকৈবল্য' বা 'বস্তুতন্ত্রবাদ' সাহিত্যবিচারের এরকম কোনও প্রচলিত মানদণ্ডের সাহায্যে বিচার করতে গেলে একদম ঠকে যেতে হয়। কিছুদূর এগিয়েই বোঝা যাবে, কী নিরর্থক ও হাস্যকর ব্যাপারটা। প্রণামের কোনও বিচার কিংবা বিশ্লেষণ হয় নাকি?

এবং সাধারণ কোনও প্রণাম ঠোকা তো নয়, 'শেষ নমস্কার'। জীবনের মধ্যবিন্দু পেরিয়ে গেছে যে-লোক, সে যখন ফিরে তাকাচ্ছে উৎসের দিকে, ডুবছে আত্মঅবগাহনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায়, তখন তার শেষ নমস্কার তো দায়সারা নিতান্ত একটি ভঙ্গি নয়, বরং নিমজ্জমান ব্যক্তির আর্ত সঙ্কেতের নামান্তর। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

'মধ্যবয়সের মধ্যরাত্রি কী ভীষণ, এখন মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি মা! শাস্তি প্রায়শ্চিত্ত? জানি না। এই মধ্যরাত্রিগুলি হঠাৎ হঠাৎ এক-একদিন জেগে উঠে কোলাহল করে ঠেলে ঠেলে জাগিয়ে দেয় ঘুমন্তকে, তারপর শুধু পুড়েই চলে চোখের পাতা, স্মৃতি, মরা পাতা আর ইতিহাস, কুঁজো উপুড় করে ঢকঢক জলের গ্লাস, অবশেষে গ্লাস ঠনঠন, ঘনঘন ক্রমান্বয় সিগারেট। হরিধ্বনি দিতে দিতে যে শববাহীরা পালকি-কাহারের মত ছুটে যায়, তারা এত কর্কশ ত্রাহি ত্রাহি চেঁচায় কেন? আসলে ওরা ভয় পায়, মৃত্যুভয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভয়টা তাড়াতে চায়। আজ আমি জানি, পথ-চলতি ট্যাক্সি অযথা ক্রমাগত ভেঁপু বাজায় কেন....এইসব আমি এখন জানি, জানতে থাকি। নিঃসাড় নিশীথে প্রতিটি সূচিপতন শুনি। আজ মুখহীন, কিন্তু কোনদিন জানা নানা মানুষ ভিড় করে আসে। পাগল হয়ে যাব? পাগল হওয়াও তো সহজ না। যারা হয়, তাদের আজ ঈর্ষা করি। ওরা অস্তিত্বের অন্যতর একটা ছায়ায় জুড়োচ্ছে, স্থান-কালের খড়ি-আঁকা গণ্ডির বাইরে।'

সন্তোষকুমারের অধিকাংশ রচনাই, আমার মনে হয়, একরকম নির্মম আত্মশুদ্ধির করুণাভেজা প্রণতি। আলোচ্য বইয়ের ভূমিকাতেও লেখক সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন : 'আসলে আমার ধারণা, সব লেখকই সারা জীবন একটা লেখাই লিখতে চায়, লিখতে থাকে, ক্রমাগত চেষ্টা করে। আমিও করেছি। পারিনি। "নানা রঙের দিন", "মুখের

রেখা", "জল দাও", "স্বয়ং নায়ক"। —মৃত অথবা শুধুই স্মৃত গ্রন্থ, একটির পর একটি। অবশেষে আমার সেই না-পারার কাছে এই শেষ নমস্কার রেখে ছুটি নিতে চাইছি।'

'সব লেখক'-এর সঙ্গে সন্তোষকুমারের অবশ্য এ বিষয়ে কিছু পার্থক্যও স্বভাবতই আছে। অন্যেরা অনেকেই যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-নাট্যের রূপ দিতে গিয়ে নিত্য-নতুন বেশ পাল্টান, সন্তোষকুমারের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের কাহিনীবলয়ও সেক্ষেত্রে প্রায়শ একরঙা। যে-অনুভব, চিন্তা, ধ্যানের নিবেশে তিনি পৌঁছন, তার গাঢ়ত্ব বিভিন্ন-বিচিত্র কাহিনীকেও একই রঙে ছুপিয়ে তোলে।

শৈশব থেকে বেড়ে উঠছে একটি মানুষ, কৈশোরের সন্ধিলগ্নে সে পথ হারালো। লজ্জিত, অবগুণ্ঠিত, নিষ্পাপ একটি কিশোর ক্রমশ নির্লজ্জ, বেপরোয়া, পাপে-তপ্ত হয়ে উঠছে। এই জীবন-কাহিনীকেই লেখক তাঁর পূর্বের উপন্যাসগুলিতে স্থান দিয়েছেন। 'নানা রঙের দিন', 'মুখের রেখা', 'জল দাও' ও 'স্বয়ং নায়ক'-এর পথপরিক্রমা সেরে 'শেষ নমস্কার'-এ তার পূর্ণ-পরিণতি।

তবে 'নানা রঙের দিন'-এ স্মৃতিচিহ্ন কিছু বিষণ্ন, মেঘমেদুর—তেমন তীব্র তপ্ত বা সংরক্ত নয়। অন্যদিকে 'জল দাও' ও 'শেষ নমস্কার'-এ পিছন ফিরে, উজান-বেয়ে দেখা যেন এক অপরাধবোধের অনিবার্য ফল। যেন মনে হয়, কোনও গল্প লেখক বানাচ্ছেন না ; এবং ভাবছেনও সেইটুকুই নিজেকে যথাসম্ভব প্রকাশ করতে যেটুকু না-ভাবলেই নয়। যেন মনে হয় ঘটনা ও অনুভূতির তুমুল স্রোতের মধ্য দিয়ে তিনি ভেসে যাচ্ছেন, আকুল নয়নে তীরের দিকে তাকাচ্ছেন, হাত-পা ছুঁড়ছেন। সেই গতি ও প্রতিরোধের চিত্র তুমুলভাবে, অনিবার্যভাবে এসে পড়ছে তাঁর রচনায়। 'শেষ নমস্কার' না হয়ে অনায়াসেই এই উপন্যাসের নাম হতে পারত 'সন্তোষকুমার ঘোষের জীবনযাপন'। এ-বই তাঁর আত্মশুদ্ধিমূলক রচনার যথার্থ পরিণতি।

আধুনিক সাহিত্যের পাঠক জানেন, সাহিত্য এখন অনেকখানিই স্বীকারোক্তিমূলক। জগৎ জীবনের অনিবার্য গতিবেগে ব্যক্তির বিবর্তন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান চরিত্রের ভিতর-বদলের কাহিনী। চরিত্রের সেই অন্দরমহলে লেখক একসময় নিজেকেও প্রতিষ্ঠিত করেন। উপন্যাসে নায়ককে তখন তিনি আত্মচরিত্রের আদলে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রচনা করেন।

কিন্তু লিরিক কবিতায় যে-অর্থে, যে-ভাবে লেখক হাজির হতে পারেন, উপন্যাস বা কাহিনীতে সেই অর্থে বা সেভাবে পারেন না। ঔপন্যাসিককে একটা কাহিনীবলয়ের দূরত্ব ঘিরে রাখেই,—এই বৃত্তকে তিনি নিজেই গড়েছেন, এখন কীভাবে ভাঙবেন গল্পের সেই সাজানো বাগানকে? আঙ্গিকের এই বাধাকে অনায়াসে যথাসম্ভব অতিক্রম করেছেন 'শেষ নমস্কার'-এর লেখক। এ-বিষয়ে পরে উদাহরণসহ আলোচনা করব।

বিশ্বাস ও সরলতা যে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে, তাকে ফিরে পাবার জন্য লেখক হাত বাড়িয়েছেন শৈশবের দিকে। শৈশব এক কল্পতরু।

অথচ গ্রাম, শৈশব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সরলতা থেকে বিদায় নিতে তাঁর কোনও

নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণা হয়নি। যন্ত্রণা কেন, বরং কৌতূহল ছিল পর্দা সরিয়ে উলুক-ঝুলুক বড়দের আঁশটে জগৎটাকে দেখে নেওয়ার, এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার, মাকে ছেড়ে প্রেয়সীর আস্বাদ নেওয়ার।

এবং কিছু জ্বালাও ছিল। গ্রহণীয় না হবার জ্বালা। 'এক-একটা গাড়ি চলে যায়, আমার চোখের পাতা কাঁপে ঈর্ষায়, আমি দেখি। কামরার বাইরে কাঠের তক্তায় লেখা এক-একটা নাম...এই ট্রেনগুলো কখনও সোজা, কখনও সর্পিল পথ ধরে উধাও হয়ে যায়, কোথায় যায়? যেখানেই যাক, আমার কাছে সেসব শুধু ফলকে লেখা নাম, তারা কোথায় কতদূরে আমি জানি না, সেসব স্থানে আমার যাওয়া হবে না।' এবং অনধিকার চর্চার মত গাড়িতে চেপে বসলে,...'চেকার। পাদানি বেয়ে বেয়ে কী অবলীলায় যে আমাদের কামরায় এসে উঠল।...একসময়ে আমার পালা। 'টিকিট?' মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন করেছেন স্যার, উত্তর দিতে পারছি না।....'নেই?' কলার চেপে আমার প্রায় টুঁটি টিপে ধরেছিল সে, আমার চোখ আপনা থেকেই উছলে উঠতে চাইছিল।....অপমান অপমান, এই ফুলকিগুলো অপমান। অপমান এই ইস্টিশনের গরম হাওয়ার হলকায়।'

সুতরাং যাত্রা। দারিদ্র্য থেকে অসম্মান থেকে যাত্রার স্বপ্ন। অর্থের দিকে, প্রতিপত্তির দিকে। কিন্তু অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে যখন সেই সাফল্য করায়ত্ত, তখনই লোকটির মনে হয়েছে—এ তার প্রার্থিত ছিল না। এই ভয়ঙ্কর উপলব্ধিজাত শূন্যতা পাঠককে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। গ্রামের মাটি থেকে উঠে আসা এক কিশোর নানা মানুষের বিচিত্র মিছিল ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের সত্যটিকে খুঁটে খুঁজে নিতে চেয়েছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে ক্ষুরধার অন্বেষণের অক্লান্ত চেষ্টায়। কিন্তু যাকে সে জীবনের মর্মমূল বলে এতকাল চিনে এসেছিল, বিক্ষত হয়েছিল যাকে লাভ করার জন্য,—পেয়ে দেখল তা জীবনের খোসামাত্র। ফলে 'যে ছেলেটা তাকে দেখেছিল, যাকে সে ভয় দেখাত, সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে কবে, দু পয়সা বাঁচাতে দিনদুপুরে যে দু-মাইল রাস্তা চষে ফিরত তাকে তো আমি আজ ডেকেও পাব না। আজ আমি কথায় কথায় একে-ওকে দু টাকা থেকে দশ টাকা শুধু বখশিশ করে থাকি, করতে পারি,—সে আর এমন কী শক্ত—সেটা ফশ করে দেশলাই জ্বালানোর মত।'

কিন্তু 'শ্রীচরণেষু মা-কে' 'শেষ নমস্কার' জানাতে আজ সেই ছেলেটাকে বড় প্রয়োজন, যে অপরিবর্তিত পোশাকেই রয়ে গেছে দূর অতীতে, স্মৃতির ধূসরে। আর প্রৌঢ় এই লেখক যেন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ছদ্মবেশ খোলার চেষ্টা করে চলেছেন, মুখোশকে টেনে ছিঁড়ে নামাচ্ছেন।

কে এই বিচারক? 'কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে' কাকে তাঁর এই সাশ্রু প্রণতি? অবশ্যই 'শ্রীচরণষু মা'। পূর্বেই বলেছি লেখকের আত্মশুদ্ধিমূলক রচনার পরিণতি 'শেষ নমস্কার', এইজন্য বলেছিলাম।

কেন মা? কেন বাবা নন? কিংবা অন্য কেউ? কোন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নন

কেন? কারণ অনিবার্য বিচারক আর কেউ নন যে? হতে পারেন না কেউ। আর কারুর প্রতি এত অনায়াসে অবিচার করি না আমরা। আর সব সম্পর্কেই, যেহেতু দেওয়া আর নেওয়ার প্রশ্নটা থেকেই যায়। অন্তত অবচেতনে বা অর্ধ-চেতনে।

প্রথমে স্বামী ও পরে পুত্রের অপমানে, অবহেলায়, অবিচারে, অন্যমনস্কতায় সর্বংসহা মার রূপটি কেমন থাকে, না সবই ওই একধারা বিষণ্ণ, গম্ভীর, ভীতু ভীতু। 'হয়তো অনেক ঘা খেয়েছিলে বলে একটা ভয়ই হয়ে গিয়েছিল তোমার মুখমণ্ডলের প্রসাধন-চর্চিত মুখে যেমন স্নো-ক্রিম, তোমার মুখেও তেমনি একটা আতঙ্ক লেপা থাকত।'

মা-ছেলের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের সাহিত্যে মস্ত একটা ঐতিহ্য আছে। এই মুহূর্তেই 'প্রসাদী' গানের অভিমান-ভরা একাধিক শাক্তসঙ্গীতের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সেসব তো চরিত্রের দিক দিয়ে শিশুসন্তানের অভিমান ভরা কথা : 'মা মা বলে আর ডাকব না / দিয়েছ দিতেছ কতই যাতনা'। এতে অপরাধবোধের জটিলতা নেই, প্রায়শ্চিত্তের জন্য অসহ্য অঙ্গীকার নেই।

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।' সুতরাং যে-প্রতিজ্ঞায় এই উপন্যাসের শুরু, তা রক্ষিত হয়নি। তার বদলে এসেছে অন্য প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা না পরিণতি? স্ফুরিত অভিমানের উত্তেজনায় গ্রন্থসূচনায় লেখক জানিয়েছিলেন 'যাঁদের প্রতি পাপ করেছি, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।...আর যারা অন্যায় করেছে আমার প্রতি, তাদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে চুল ছিঁড়ে অভিশাপ দেব।...একে আমার সওয়াল বলতে চান বলুন, জবাব বলতে চান বলুন, কাউকে অভিযোগ, কাউকে নালিশ—এই আমার শেষ টেস্টামেন্ট, আখেরী বোঝাপড়া।'

কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই লেখক বলছেন 'এত কথা বলার আছে, কাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার কাতরতা, কাদের ক্ষমা করতে না-পারার লজ্জা আর অক্ষমতা—সেদিন অনুধ্যায়ী কোনও সুহৃদ বলে দিল যে শ্রদ্ধায় যাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পার না, তাদের সঙ্গে ঘৃণাতেই বা যুক্ত থাকবে কেন? এইসব কথা লেখাটার ধাঁচ ধরন সব বদলে দিচ্ছে।'

শেষ বয়সের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তাঁর অস্তিত্বও যদি কারুর আনন্দসংহারক হয়, তবে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। এ কোনও রীতিমাফিক বৈষ্ণবী বিনয় নয়, এই সাংঘাতিক ভাষাবরণের অন্তরালে যেন অবরুদ্ধ কান্নার স্রোত ঝরে ঝরে পড়ছে। 'শেষ নমস্কার'-এর কাহিনীর বলয় ছিন্ন করেও যেন লেখকের অভিমানস্ফুরিত অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।

জবরদস্ত সমালোচকের আসনে বসে যে আলোচ্যগ্রন্থের বিচার সম্ভব হয় না, আলোচনার একেবারে গোড়ায় সেকথা বলেছিলাম। এর গদ্যবন্ধেরও অন্য নিরপেক্ষ আলোচনা বোধকরি অসম্ভব। এই বইয়ের ভাষার দুটি আশ্চর্য বহন ক্ষমতার উল্লেখ করব। এক, এ-ভাষা বক্ষ-বিদারক, রক্ত-রঙিন। 'একটা রুপোর টাকা লুকিয়ে গলছে, গলগল তরল, টকটকে আলতার মতো। পাতা দুটি পেতে রেখেছ তুমি, শাড়ির কোণ

একটু সরিয়ে, আমি উপুড় করে আলতা ঢালছি তোমার পায়ে। আলতাই তো। নাকি রক্ত, আমার অপরাধের ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে উঠে আসা রক্ত, দুটি পা ধুইয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইছে।'

এবং আশ্চর্য জাদুময় এই ভাষা। এক মমতাময় উষ্ণতা যেন এ-থেকে দুধের মত উৎসারিত হয়। জীবনের এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে ছাদে দাঁড়িয়ে আত্মকথন করছে বুলা নামক চরিত্রটি, ভয়ঙ্কর এক প্রতিজ্ঞায় নিজেকে বেঁধে নিচ্ছে—যা থেকে উদ্ধারের কোনও উত্তরণ নেই, কেবলই সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলা। 'বুলা থামল।...আস্তে আস্তে ও অপসৃত হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর একটি একটি পা ফেলে ফেলে, তখন থেকেই চলার গতিতে নৃত্য রপ্ত করে নিতে চাইছে যেন, নেমে যাচ্ছে সিঁড়িটার হাতলটা একবারও স্পর্শ না করে। প্রথমে ওর পা, ক্রমশ জানু, পিঠ, গ্রীবা, কবরীসমেত বুলা অস্ত গেল।'

এই ভাষা যেন যাদুকরের হাতের তাস। যখন যে-শব্দটা দরকার, তখনই তা হাজির হচ্ছে অনুগত ভৃত্যের মত। পৃথক শব্দের কোনও মহিমা নেই, মহিমা আছে শব্দবন্ধের এই ডৌলটিতে। আবার পৃথক গদ্যবন্ধের কোনও মানে নেই, যদি না তা প্রকাশ করতে পারে লেখকের তথা চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে। 'শেষ নমস্কার'-এর ভাষা এতই ব্যক্তিগত, প্রায় ডায়েরির মত, যে মনে হয়, এই ভাষা ছাড়া বুঝি প্রায় স্বগতোক্তির ঢং-এ বলা, এই আত্মকথন ও স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসটি মানাত না।

সাহিত্য ব্যক্তি-অনুভূতিকে বিশ্বজনীন ও ক্ষণকালিকতাকে চিরকালীন করে তোলে। 'শ্রীচরণেষু মা'-এর রূপমূর্তিও প্রত্যেক সন্তানেরই চোখের সামনে ভাসে। জীবনের তথ্যসামগ্রীতে না-হলেও কল্পনায়। একদা গর্বিত, নিষ্ঠুর এক তরুণ যুবা আঁধার ঘনালে উৎসের দিকে ফিরে তাকায়, প্রায়শ্চিত্ত করে তার দেবতা বা দেবীর বেদিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে। সন্তোষকুমার সেই বক্ষরক্তের অক্ষরে নির্মাণ করেছেন 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে'। তাঁর কথা, ভাষা যেন যে-কোনও সন্তানের লেখা খোলা চিঠি। তার মায়ের কাছে।

দুই

ভাবগত ও আঙ্গিকগত বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে' উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ভণিতাকারে ১ম স্তরের আলোচনাংশে আমরা তাদের ধরার চেষ্টাও করেছি। এবার বিশেষ করে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে নেব।

প্রথমেই বলেছি যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসাবে 'শেষ নমস্কার'-এর গুরুত্ব ভুলে যাওয়ার নয়। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটু পূর্বসূত্র অনুসন্ধানেরও দরকার আছে। আমরা 'রজনী' উপন্যাসে অমরনাথ চরিত্র ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর নামচরিত্রটির মধ্যে ব্যক্তি তথা শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ খুঁজে পেয়েছি। 'এ জীবন লইয়া কী করিব',—এই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত তরুণ বঙ্কিমের সঙ্গে জগৎ-জীবনের মানে

খোঁজার প্রচেষ্টায় হন্যে হওয়া বিষণ্ণ ও একাকী অমরনাথের কিংবা আগ্রহ ও উদাসীন নৈর্ব্যক্তিকতায় গাঁথা কমলাকান্ত চরিত্রটির মিল খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এতটাই আত্মমগ্ন ছিলেন যে সন্দীপকে বাংলা উপন্যাসের 'নিঃসঙ্গ ভিলেন'(৪র্থ খণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে ডঃ সুকুমার সেন) করে ফেলেছেন বোধহয় নিজের অজান্তেই। আবার 'শ্রীকান্তের' নাম চরিত্রের সঙ্গে লেখক শরৎচন্দ্র নিজের দার্শনিকতা ও স্বার্থহীন জীবনচিন্তাকে এত প্রগাঢ়রূপে ঘোষণা করেছিলেন যে তার মধ্যে আত্মজীবনের বিভিন্ন টুকরো অংশ ঢুকে গেছে অনায়াসে। এইসব কাহিনী বা উপন্যাসের মধ্যে যে-অর্থে লেখকের আত্মজীবনী লুকিয়ে আছে 'শেষ নমস্কারে' তার থেকে অনেক প্রগাঢ়ভাবে ও বিশিষ্টভাবে তার আয়োজন লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, আলোচ্য উপন্যাসের আত্ম-চরিত্রটির সঙ্গে লেখকের জীবনের তথ্যগত মিলের দিকটি সতর্ক পাঠকের নজর এড়ায় না। উদাসীন বাবা, সচেতন ও ব্যক্তিত্ববতী মা, বাল্যেই অনেক বড় দাদার মৃত্যু, দাদুর কাছে বড় হওয়া, দারিদ্র্যের কাঁটাতার ভেদ করে আর্থিক-সামাজিক অর্থেও সফল হওয়া, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত লেখকের পিছন ফিরে জীবনযুদ্ধ জয়ের পরেও শূন্যতাবোধ,—এসবই জীবনে ও উপন্যাসে সত্যরূপে একাকার।

দ্বিতীয়ত, এই উপন্যাসে আত্মজীবন প্রতিফলনের ঝোঁক লেখকের তরফে এতটাই যে শুধু 'আত্মজীবনীমূলক' না-বলে একে 'স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস' বলা যায়। বরং সেই অর্থে, উপযুক্ত বাংলা উপন্যাসগুলি অপেক্ষা কাম্যু ('দ্য আউটসাইডার'), সাঁর্ত্র (দ্য এজ অব রিজন্') বা কাফকার সঙ্গে এর আত্মিক বন্ধন। ব্যক্তিচরিত্রের তথ্যগত উপাদান অপেক্ষা এইসব বিদেশি নভেলে অবশ্য লেখকদের দার্শনিক অনুভূতির নিবিড়তম প্রকাশই মুখ্য হয়ে ওঠে। যেন নিজের ভিতরের নিজেকে (যা তাঁদের জীবনচরিতে মিলবে না) এইসব লেখায় মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। 'শেষ নমস্কারে'র মধ্যেও জৈবনিক তথ্য অপেক্ষা লেখকের আত্মিক চরিত্রের ক্ষুরধার আত্মবিশ্লেষণ, জটিলতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিমান, পরিপার্শ্বের তীব্র পর্যবেক্ষণ ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া স্থান পেয়েছে।

এইরূপ ভাবাবেগকে যেরকম আঙ্গিকে মুক্তি দেওয়া যায়, এখানে ঠিক তারই উপস্থিতি মরমী পাঠককে আশ্বস্ত করে। এই আঙ্গিক স্বগতোক্তির ঢং-কে বেছে নিয়ে আত্ম-অনুসন্ধানের গভীর তলদেশে পৌঁছতে পেরেছে। তথাকথিত অবজেকটিভ প্রকাশভঙ্গির বহুধা-বিস্তারে বোধের ও আত্ম-অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া অনেকটাই লঘুতর হয়ে যেত। গেলাসের জলকে থালায় ছড়িয়ে দিলে যেমন হয়।

ফলে স্বগতোক্তির ঢংটিকে আশ্রয় হিসেবে নিতে হয়েছে লেখককে, আত্ম-চরিত্রকে অন্যরূপে কল্পনা করে সামনে রেখেও। যেমন : 'মনে মনে ডাকল সে অনেককে একে একে, যারা জীবিত : যাদের জীবদ্দশায় সব খুলে বলে ফেলা অসম্ভব বলে সে এতকাল জানত। ডাকল তাদেরও, যারা মৃত। হ্যাঁ, মৃতদের কাছেও নতজানু হয়ে স্বীকারোক্তি পেশ করবে, তবে সে মুক্ত। তাই কাগজ-কলম টেনে, ব্যথায় অস্থির সে মাঝে-মাঝে

থেমে, শিরোনামায় লিখলেন শ্রীচরণেষু মা।...'

এখানে লক্ষণীয় 'সে' সর্বনামের প্রয়োগ। 'আমি' নয়, 'সে'। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই উপন্যাসটির গুরুত্ব ও ওজন। যদিও নিজেকে ভেঙে নানা খানা করে পূজার উপাচারের মত দান করেছেন লেখক, যদিও আত্ম-অবচেতনের সুড়ঙ্গ-খোঁড়ায় প্রবৃত্ত তিনি, তথাপি সেই 'আত্ম' বা 'আমি'কে সচেতনভাবে সামনে রেখে 'সে' রূপে হাজির করে বিশ্লেষণ করছেন সন্তোষবাবু। যেন নিজেই নিজেকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে ডিসেক্ট করছেন : অন্য কোনও ডাক্তারের হাতে, নিরুপায়, ছেড়ে।

এইজন্যেই দরকার হচ্ছে সচেতনভাবে পাঠকের সঙ্গে কথা বলার। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিম যেভাবে বয়স্যের মত রঙ্গ-তামাসা করেছেন পাঠকের সঙ্গে, এ কিন্তু তেমন ব্যাপার নয়। এখানে লেখক ও পাঠকের মধ্যে সচেতন 'দ্বৈত' রচনার জন্যই এই আদান-প্রদানের প্রয়োজন হচ্ছে। নিজেকে দেখতে ও দেখাতে গিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে তিনি যে সচেতনতা, বিচারবোধ ও নৈর্ব্যক্তিকতাও হারাচ্ছেন না, এতে তা প্রমাণিত। ('আমার জন্মকালে যে-মেয়েরা যুবতী ছিল, তাদের আর দেখা যায় না। তারা নেই। আর তখন যারা জন্মাল? হাহাকারের মত টের পাচ্ছি, তাদেরও কেউ আর যুবতী নেই, কেউ বিগত, কেউ জরতী। আজ তাদের বয়স দিয়ে আমার বয়সটাকে মাপি, কুনকো দিয়ে চাল মাপার মত')।

'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে' উপন্যাসটির আর-একটি বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি নিহিত রয়েছে এবং প্রধান দুটি-চরিত্রের একটি রচনার ক্ষেত্রেই। যাকে উদ্দেশ করে এই পত্র-(একটিই না-পাঠানো চিঠি হল উপন্যাসটির আপাত-রূপ)-উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে, সেই 'মা'-কে এখানে যুবতী নারী হিসাবেও একটা স্তরে দেখা হয়েছে। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের বিচারে ব্যাপারটি শুধু অভিনব নয়, সাংঘাতিক।

অভিনবত্বের কারণ আমাদের মধ্যেই নিহিত। পিতাপুত্রের সম্পর্ক যেমন এদেশে সহযোগিতামূলক, বিদেশের মত প্রতিযোগিতামূলক নয়, মায়ে-পোয়ের সম্পর্কও তেমনি। এই কারণেই 'ব্রাদার্স কারামাঝভ' আমাদের দেশে লেখা হয়নি, হয়েছে ড্রস্টয়েভস্কির হাত দিয়ে বিপ্লবপূর্ব ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের রাশিয়ায়। সেই উপন্যাসে, আপনারা জানেন, একটি নারীকে নিয়ে পিতা-পুত্রের (জ্যেষ্ঠ) দ্বন্দ্বও দেখানো হয়েছে। সেই দৃশ্যটিও হয়তো ভুলে যাননি আপনারা, যেখানে পার্কের অন্ধকারে বসে বড়ছেলে তাকিয়ে আছে দূরে আলো জ্বলা একটি ঘরের দিকে যেখানে হয়তো তার প্রেয়সী ও পিতা মিলিত হয়েছে।

এখন, এই সম্পর্ক এ যাবৎ আমাদের সাহিত্যে রচিত হয়নি, কারণ এদেশে পিতাপুত্রের সম্পর্ক এখনও মূলত সহযোগিতামূলক। ফলে এ জিনিস এখানে রচিত হলে তা সত্যচিত্র হত না। ফলে প্রকৃত অশ্লীল বলে বিবেচিত হতে পারত। কারণ তাকে তখন 'মোটিভেটেড' বলে মনে হত, লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনাজাত মনে হত না।

অথচ সমাজ তো একই রকম অজর, অমর থাকে না। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গিয়ে, ভেঙে গিয়ে সে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। যখন ক্ষয়ে যাচ্ছে তখন সেই আড়ালে থাকে ; যখন সত্য-সত্যই পাড় ভেঙে পড়ে একদিন, তখন বুঝতে পারি, জলের চোরাস্রোত বহুদিন ধরেই ধাক্কা দিচ্ছিল ওই নিশ্চিন্ত কন্সেপ্ট বা 'পাড়' বা মানবিক সম্পর্কসূত্রের মধ্যে। আজ ছিঁড়ে গেছে।

বড় লেখক ছিঁড়ে যাওয়ার পর হাহাকার করেন না, ছিন্ন হওয়ার আগেই সচেতন করেন আমাদের। যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ল্যাবরেটরি' গল্পে, যেখানে যৌবনের কন্সেপ্টটি নিয়ে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করেছে মা ও মেয়ে : সোহিনী নীলা। একজনের বিদায়গামী যৌবন অন্যজনের উল্লসিত, তীব্র ও অহঙ্কারী যৌবনকে সহ্য করতে পারেনি। অন্যদিকে খর দ্বিপ্রহরের তাপ অবজ্ঞা করেছে সন্ধ্যাশ্রীকে। তথাকথিত প্রথাবদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ মা-মেয়ের সম্পর্কের মধ্যেও যে ওই চোরাস্রোত ভাঙনের আবহাওয়া গড়তে শুরু করেছে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার অ্যান্টেনায় তা পঞ্চাশ বছর আগেই ধরা পড়েছিল।

'শেষ নমস্কার' তো মায়ের প্রতি পুত্রের পাপবোধের স্বীকারোক্তিই কাহিনীর ভাববস্তু তথা বিষয়বস্তুর স্তরপরম্পরা গড়ে তুলেছে। এই পাপবোধেরও অবচেতনে লুকিয়েছিল ওই দৃষ্টিভঙ্গি,—যাকে বিদেশি বুলি ধার করে অনেকে আজকাল বলতে শুরু করেছেন 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'। ফলে বয়স, রূপ ছাড়াই...একেবারে অন্য-নিরপেক্ষ মা-ছেলের প্রশ্নহীন সম্পর্কে আঁশটে গন্ধের ছোঁয়া লাগে। তাকেও অতিক্রম করে সম্পর্কটা একসময় আবছা, দূর হয়ে যায়, কিন্তু পিছন ফিরে তাকালে একটা দ্বন্দ্বও কি চোখে পড়ে না? 'এক সঙ্গে শুতাম, সে-তো শুয়েছি বরাবরই, কিন্তু এত কাছে ঘেঁসে এর আগে আর কখনও কি? নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশিয়ে, গুটিসুটি হয়ে, যতটা পারি পরস্পরকে আঁকড়ে? একটি মৃত্যু ঘটল ঠিকই, কে একজন ছিল সে নিরুদ্দেশ হল, যাবার সময় সে যেন নিশ্চিত একটি অলিখিত চিরকুট রেখে গেছে যে এখন থেকে আমরা দু'জনের জন্যই দু'জন। কুয়োতলায় আমাকে টেনে হিঁচড়ে শীতের সকালেও ঘটি ঘটি জল ঢেলে নাওয়ানো, মা, এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারগুলো কি তুমি শেষদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলে?'

'রেখেছিলে নিশ্চয়। রাখিনি আমি। কারণ গেল বটে, তার বদলে এল আর একজন, না-না বউ-এর কথা বলছি না, ওসব বাইরের ব্যাপার, আসলে মা আর ছেলের সম্পর্কের মধ্যে পা টিপে টিপে যে আসে, তার নাম বয়স। সে-ই বদলে দেয়, সে-ই মূল, আমরা ভুল করে তাকে "বন্ধু", "বউ" এইসব নাম দিই। আদম আর ইভের মধ্যে যেমন ছদ্মবেশী সাপ, মা আর ছেলের সম্পর্কের নন্দনেও তেমনই বয়স।' কিংবা :

'একবার সুধীর মামা কোথায় গিয়ে জ্বরে পড়ে দিন সাতেক আটকে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন, আরও শীর্ণ, আরও সরলতররেখা হয়ে। মা, তোমাকে সেদিন হঠাৎ হালকা চাপল্যে বিস্তারিত হতে দেখলাম। আঁচল ধরেছ মুখের কাছে, হাসছ, 'আমরা

তো ভাবলাম সুধীরদা, তুমি একেবারে—'

'বিয়ে করে ফিরছি?'

'ঠিক ঠিক। তাই। তোমার দরকারও। এই বয়সে জ্বরে বেঘোরে—'

'তাই বলছ টোপর পরি?'

হাততালি দিয়ে হেসেছ তুমি।.....'

ইচ্ছা করেই উদ্ধৃতির মাপ বড় করলাম। নইলে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্পর্কের মানবিক অন্বয়ের স্বরূপটি উদঘাটন করা যেত না ; সমালোচকের হাতে পড়ে বেদম স্থূল ও বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করত। কিন্তু এও সত্য, 'শেষ নমস্কার'-ই সাহসভরে দেখাল যে বয়সহীন, রূপহীন, অবয়বহীন শুধু স্নেহময় মায়ের অস্তিত্বের অন্যতর যাত্রাও আছে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরাই স্বার্থে, ভয়ে, অন্যমনস্কতায় সেকথা ভেবে দেখার শক্তি পাই না।

আলোচ্য উপন্যাসটির মূল যে-বৈশিষ্ট্য পাঠকের শুধু দৃষ্টি নয়, মন কেড়ে নেয়, তা হল 'মৃত্যুবোধ'। যাবতীয় হাসিখেলার পরে কালো পর্দা পড়ে যাবার পালা যে অপেক্ষা করে আছে, সেই বোধ। মৃত্যুর কালো সাগর থেকে উঠে কয়েক জনের সঙ্গে কয়েক বছরের জন্য অকিঞ্চিৎকর কিছু কথা বলে, কথা শুনে আবার যে ওই কালো সাগরের লোনা ঢেউ-এ মিলিয়ে যেতে হবে, সেই বোধ। পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থলের মত এই খণ্ড জীবনের মধ্যেও যে তিনভাগই দুঃখের অশ্রুজল, সেই বোধ। হাঁটিহাঁটি পা পা করে প্রতি মুহূর্তেই আমরা যে পরজন্ম নেই জেনেও নিশ্চিত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছি, সেই বোধ। একটাই জীবন, ফলে দপদপে হৃৎপিণ্ডের মত তাকে প্রতি মুহূর্তে উত্তেজিত আমোদিত আহ্লাদিত রেখেও শেষপর্যন্ত কিছু না পাওয়ার বেদনাবোধ।

শারীরিক মৃত্যুর এই আলটিমেটাম 'শেষ নমস্কার'-এর পাতায় পাতায় চার্চের ঘণ্টাধ্বনির মত গম্ভীর, বিষণ্ণভাবে বেজে গেছে। প্রতিটি পাওয়া না পাওয়ার যথার্থ প্রেক্ষিত উপলব্ধি করেছেন পাঠক নিজের নিজের মত করে। বসন্তের গোলাপি দিনগুলি যে হু-হু করে বর্ষার অশ্রুধারায় বিলীন হয়ে যাবে, একথা কি আর সন্তোষকুমার ধর্মগুরুর মত মনে করিয়ে দিয়েছেন? তা দেননি। বরং কিশোর-প্রেমের উন্মাদনা, অজানা রহস্য উন্মোচনের জন্য থরোথরো আগ্রহ,—এসবই ঘটনাকারে গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ; কিন্তু আমুদে উচ্ছ্বাসে নয়, বরং একধরনের ডিগনিটির সঙ্গে উপন্যাসের গল্পাংশগুলি গ্রথিত হয়েছে। তখন হাসির মধ্যেও লাগে বিষণ্ণতার ছোঁয়া, শরীরী আলোড়নের জোয়ারও পৌঁছয় ভাটার টানে।

'এই ভয়-ভয় ভাবটা আমি কি তোমার কাছ থেকেই পাই? রাত্রে পেঁচার ডাক শুনে চমকানো, স্বপ্নে আঁতকে ওঠা, সন্ধ্যায় গা-ছমছম, দেয়ালের দাগে নানা না-জানা মানুষের ছাপ খুঁজে পাওয়া, বটগাছের গোড়ায় তেলে-সিন্দুরে মাখামাখি রংটাতে ভয়াবহ রকম, সর্বত্র অশরীরী কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা, কারা যেন কাঁচা মাছের আঁশ চিবোয়, দুপুরে

কুকুরের ককিয়ে কান্না—সব সেই থেকে আমার স্নায়ুতে জড়ো করে করে জমিয়েছি। আজও, এই বেমানান বয়সেও পুষে রেখেছি।

'আমাদের সেই আধা-শহরের বাড়িটার চারপাশে মৃত্যু যেন সততই হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াত। টিনের চালটা মাঝরাতে কেন যে থেকে থেকে কটকট ডেকে উঠত, পেয়ারা গাছে ঝোলা বাদুড়গুলো কাকে যে দেখতে পেয়ে দুদ্দাড় উড়ত আমি কিছুই বুঝতাম না, খালি কাঁথার নিচে আরও গুটিগুটি তোমার গায়ের গন্ধ নিতাম।

'জীবনে প্রথম কবে সজ্ঞানে কাঁদি মনে নেই কিন্তু প্রথম দেখা মৃত্যুটি মনে আছে—আমার দাদার।'

এইভাবেই, যেমন জীবন পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে, 'শেষ নমস্কার' উপন্যাসের শুরুও অমোঘ টানে তার সমাপ্তির দিকে বিবর্তিত হয়েছে। এতে জীবনের খুঁটিনাটি, দিনানুদৈনিকতার প্রতিটি বিবরণ, ঘটনার তুমুল সংঘাত মিলেমিশে গেছে লেখকের জীবনবোধের সঙ্গে। তথ্য বিন্যস্ত হয়েছে দার্শনিকতার সূত্রবদ্ধতায়, হৃদয়াবেগ হাত ধরেছে মননের। সন্তোষকুমারের কোনও গল্প-উপন্যাসই শুধু 'গপ্পো' কাহিনী নয় ; তাঁর প্রথম দিকের গল্প যেমন 'কানাকড়ি', 'একমেব', 'শনি', 'ধাত্রী', 'স্বয়ম্বরা', 'চীনেমাটি', 'পারাবত', 'বসুধৈব' বা 'পনের টাকার বৌ' বা প্রথম দিকের উপন্যাস যথা 'কিনু গোয়ালার গলি', 'মোমের পুতুল', 'নানা রঙের দিন' প্রভৃতির মধ্যে ঘটনার ঘনঘটা কিছু বেশি। আবার শেষদিকের গল্প, যেমন 'ভেবেছিলাম', 'নকল', 'ঠাকুমার ঝুলি', 'শোক', 'দুই রাত্রি', কিংবা 'জল দাও', 'মুখের রেখা', 'স্বয়ং নায়ক'-এর মত শেষদিকের উপন্যাসে ঘটনার পাশে দার্শনিকতার মিশেল কিছু বেশি। কিন্তু কোনওখানেই শুধু গল্পের টানে গল্প রচিত হয়নি।

'শেষ নমস্কার'-এ লেখকের বক্তব্য মুছে যায়নি রসবস্তুর রগরগে আয়োজনে। তাঁর নিজের সম্পর্কে, চারপাশের সমাজ ও সময় সম্পর্কে লেখকের দেখার ভঙ্গিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম দিয়েছে এর কাহিনীকে ও চরিত্রগুলিকে। এই উপন্যাসের স্টাইলও সেইমতই গঠিত হয়েছে, তাকে আর আলাদা করে বানাতে হয়নি। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এইভাবেই কাহিনী, চরিত্র, ভাববস্তু ও উচ্চারণ ভঙ্গিমা মিলে যায়। সন্তোষকুমার কখনোই বহুপ্রসবা লেখক নন, কিছু কথা মাথায় জমলে তাকে তা দিয়ে-দিয়ে প্রস্তুত না করে তিনি লিখতে বসেননি কখনোই। আমাদের মনে পড়ে যায় সুধীন্দ্রনাথের সেই ঘোষণা : 'কখনও যদি লেখবার মতো কথা মানসে জমে, তবে তার উচ্চারণ পদ্ধতিও আপনি যোগাবে ; এবং ততদিন আমি বাক্‌সংবরণ করলে, আর যার ক্ষতি হোক, বঙ্গসাহিত্য রসাতলে যাবে না।' ('অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকা)

কীটে-কাটা ফলের মত আমাদের নষ্ট জীবনের রূপকার সন্তোষবাবু, অলীক, মোহময় আকর্ষক করে তাকে সাজাননি তিনি। সাজালে পূর্বসূরি, সমসাময়িক বা পরবর্তী অনেক লেখকের মতই সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হত না। বস্তুত 'কিনু গোয়ালার গলি'র প্রথম জীবনের অর্জিত জনপ্রিয়তার হাতছানি এড়িয়ে তিনি যে

ক্রমশ 'শেষ নমস্কার'-এর কঠিন পথে গেলেন, এও লেখক হিসেবে তাঁর চরিত্র ও নিয়তি। বারবার বদলেছেন তিনি লেখার ধরনকে, খুঁজে ফিরেছেন সত্যকথনের লক্ষ্যবস্তুকে।

'শেষ নমস্কার'-এ এই কঠিনের সাধনা বা প্রথাবিরুদ্ধতা কতভাবে এসেছে ইতিমধ্যেই সে সম্বন্ধে অবহিত করেছি। মা-ছেলের নিরাপদ স্নেহ-শ্রদ্ধাসমন্বিত ভাবালু সম্পর্কের বদলে এখানে যে জটিল ও সূক্ষ্ম ও বাস্তবিক মনোবিশ্লেষণকে রাখা হয়েছে সে কথা আগেই বলেছি। বুলার ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আগেই। আত্মচরিত্রের সঙ্গে তার কৈশোর-প্রেমের রঙিন চিত্রের বদলে এখানে নিষ্ঠুর ভীতিপ্রদ সত্যকে আঁকা হয়েছে এইভাবে :

'আমি ভয় পেলাম। বললাম, এই! আমি যাই। সন্ধ্যা উৎরে গেল। বিকেল থেকে বাড়ি ফিরিনি।'

'বুলা আমার হাত তো চেপে ধরলই, পাও জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে বলল যা তো দেখি। তুই না ছেলে? তুই পুরুষ, না কাপুরুষ। আমাকে ফেলে পালাবি? এই তোর রীতি?

'(মা, আজ সবই যখন একেবারে হৃদয় খুলে ঢেলে দিচ্ছি...তখন স্বীকার না করে পারছি না বলা প্রগলভ বলা সেদিন কিন্তু ব্রহ্মবাক্য উচ্চারণ করেছিল।...বারেবারে কাপুরুষতার পৌনঃপুনিকতায় কেবলই ফেলে পালিয়েছি।....গা বাঁচাতে। যে পালায় সে বাঁচে।....আমি কি বেঁচেছি?)'

কিংবা বাঁশি চরিত্রটির কথা ধরুন। আজকাল তো বিদেশি সমাজ ও সাহিত্যের ঢেউ আমাদের সমাজ ও সাহিত্যেও লাগতে শুরু করেছে। পুরুষরূপী মেয়ে চরিত্র, দুই পুরুষ বা দুই নারীর সম্পর্ক নিয়েও কানাঘুসা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু প্রায় তিরিশ বছর আগেই আলোচ্য উপন্যাসে এমন একটি চরিত্র এনে হাজির করেছিলেন সন্তোষকুমার। 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে আঙুলের ডগায় ক্রীম তুলে মুখে ঘসছিল। পায়ের সাড়া পেয়ে আমাকে বলল 'এসো'।

'ঠাট্টা করে বললাম 'তুমি এরপর চুলও বাঁধবে বুঝি?' আমার সাহস বাড়ছিল। কিন্তু চাহনি খুব করুণ করে সে তাকাল। লম্বা লম্বা চুলের গোছা মুঠো করে ধরে বলল 'ঠাট্টা করছ? করো। সবাই তো করে।'...এগিয়ে এসে সে তার একটা তুলতুলে হাতে আমার হাত ধরল—'আমাকে দেখলে কার কথা মনে পড়ে?...ঠিক যেন বৃহন্নলা। না?' 'গিন্নী' গল্পটির কথা মনে রেখেও বলতে হবে এই অভিনব সাহসিক চিত্ররচনার জন্য, 'শেষ নমস্কার'-কে চকিতে মনে পড়বে।

এত রকমের প্রথাবিরুদ্ধ অভিনব ভাবনাচিন্তা ও নতুন ধরনের প্রকাশভঙ্গি সত্ত্বেও যে 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে' উপন্যাসটি ইতিমধ্যেই প্রায় কুড়িটি সংস্করণের কঠিন চৌকাঠ পার হয়ে হাজার হাজার পাঠকের দ্বারা নন্দিত হয়েছে, তার দুটি প্রধান কারণ আছে বলে মনে করি।

প্রথম উপন্যাসে জীবনের কতগুলি মৌলিক সমস্যা তথা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন লেখক এবং সার্থকভাবে আমাদেরও দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন তাদের সামনে। জীবন ও মৃত্যু, সাহস ও ভয়, যুদ্ধ ও পলায়ন, মিথ্যা ও সত্যকথন, স্বীকার ও অস্বীকার--এই দ্বৈত বিষয়গুলিকে প্রায় দিন ও রাত্রির অনিবার্যতার মতই হাজির করেছেন তিনি। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে নিজেও যেমন রক্তাক্ত হয়েছেন, পাঠক হিসেবে আমাদেরও সামনে পালাবার পথ রাখেননি। জীবনের একেবারে বেসিক এই স্তরগুলিকে ধরার জন্য লেখক যে-দুটি প্রধান চরিত্র হাজির করেছেন, তাদের সম্পর্কসূত্রও মৌলিকতম : মা ও ছেলে। ফলে প্রায় অনিবার্যভাবে পাঠক এই উপন্যাসের জালে ধরা দিয়েছেন।

বিপুলভাবে গৃহীত হবার দ্বিতীয় কারণ--উপন্যাসটির বাস্তবতা। এর নতুন গহ্বরে রেখে দিয়েছিলাম এতদিন, তাকেই একটানে সচেতনভাবে বার করে এনে আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন লেখক। তখন সেই অবাঞ্ছিত পরমাত্মীয়কে স্বীকার না-করে উপায় থাকে না।

এতদিন অদেখা অথচ চিরচেনা এই সত্যগুলিকে প্রাণ দিয়েছেন লেখক একেবারে মধ্যবিত্ত জীবনের চেনামহল থেকে এনে। বাবা, মা, দাদা, সুধীর, মামা, বুলা, বাঁশি, ভামতী, সতীশ রায়, সব্যসাচীবাবু, গাঙ্গুলী পিসিমা, লীলা মাসী, নলিনী, রজনী--চিত্রবিচিত্র চরিত্রের মিছিল : কেউ মুখ্য, কেউ গৌণ ভূমিকা পালন করেছে এই কাহিনীতে। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত অকিঞ্চিৎকর নয়, প্রত্যেকেরই বিশেষত্বকে আভাসিত করেছেন লেখক। গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যেও সীমাহীন সম্ভাবনা ভরে দিয়েছেন তিনি।

এবং কোনও চরিত্রকেই শুধু কালো বা শুধু সাদা করে আঁকেননি সন্তোষকুমার। যেমন জীবনে তেমনি এই উপন্যাসেও কারুর প্রতি ফোকাস পড়েছে বেশি, কেউ বা রয়ে গেছে তুলনামূলকভাবে অন্ধকারে। ফলে দোষে-গুণে মেশানো এই পারিবারিক চরিত্রগুলিকে দেখা-মাত্র আমাদের মনে হয় 'আরে এ তো ঠিক অমুকের মত', বা 'ওই চরিত্রটির মধ্যে আমাদের পাড়ার অমুকবাবুর আদল এল কী করে?' বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতীতি নির্মাণে 'শেষ নমস্কার'-এর প্রায় সব চরিত্রগুলিই উত্তীর্ণ এবং কে-না জানে, ঔপন্যাসিক বাস্তবতার এটিই প্রথম ও প্রধান শর্ত।

কিন্তু গল্পের টান, চেনা চরিত্রের আকর্ষণ, বিষয়বস্তুর মৌলিকতা এই উপন্যাসকে জনপ্রিয় করে তুললেও সতর্ক পাঠক ভেতরে-ভেতরে একরকম চোরা স্রোতের টানও অনুভব করেন। সহজ গল্পের তলায় তখন লুকিয়ে থাকা ব্যঞ্জনার্থের হাতছানি বড় হয়ে ওঠে, বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে যায়, এই তথাকথিত সহজতার ভেতরেও বয়ে চলেছে দুঃখনদীর অশ্রুধারা। তা-ই এক সময় পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিচারের সন্দিগ্ধ পাড় থেকে গ্রহণের একগলা জলে।

'করকমলেষু' একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস

চতুর্দোলা

মাসিক সহিত্যপত্র : প্রথম বর্ষ

১ম সংখ্যা, ২রা এপ্রিল ১৯৮৪

সন্তোষকুমার ঘোষের নিজস্ব কথা

[করকমলেষু প্রায় একযুগ আগে লেখা "শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে" উপন্যাসটির অনুবৃত্তি। তবে ঘটনাপ্রবাহ এক নয়। চিঠির পর চিঠিতে বিভিন্ন নর-নারী, বিগত, আগত ও অনাগত কালের মুখোমুখি হওয়া। কাহিনীর সূত্র গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। গল্পের টানের সঙ্গে আত্ম-উন্মোচন এবং সুতীব্র জিজ্ঞাসা। চিন্তার মগ্ন গভীরতায়। আত্মার সন্ধান যেখানে, সেখানে আত্মজীবনের ছায়াও এখানে-ওখানে পড়েছে বইকি--তবে তার ছায়াই।]—লেখক

বিগত, আগত, অনাগত সকলকে

১. সম্বোধন, বোধন

একটা তারিখ শুধু, আর একটা নাম। একটাই আপাতত। তা-ও নাম নয়, সম্বোধন কারক, চিঠির সাদামাঠা পাঠ।

করকমলে তোমার। কে? এক, না অনেক? তারা জীবিত, মৃত, না নিরুদ্দিষ্ট? কোন ঠিকানা? যে লিখছে, সে জানে না। আসলে লিখছে যে, সে কি সে নিজেই?

দূরের পেটা ঘড়িটা যেই তৃতীয়বার একই আওয়াজ দিল, তখন চমকে উঠে লোকটা ভাবল, সে স্বয়ং সে স্বয়ং। ভিতরের একটা তাগিদ, লিখিয়ে নিচ্ছে সেই, লোকটার কাজ কেবল হুকুম তামিল, হাতের কলমটা একবার কাগজে রাখছে, তুলছে, ছিঁড়ছে পাতার পর পাতা, তবু লিখছে।

লিখছে মানে লিখতে চাইছে, চেষ্টা করছে। মজবুর। কারুও কাছে দেনা বা খতের দায়ে বন্দি একটা বান্দা বই তো কিছু নয় সে। এই কঠিন কথাটা জানাজানি হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। দিন যায়, আর সে টের পায়, সে তার নিজের নয়, আর কারুর?

কার? সময়ের? যে-সময় আসলে সওয়ার। ঘোড়াকে জোর কদম ছুটিয়ে নেয়, যখন মরজি, যখন দরকার। গরজ নেই তো লাগাম ঢিলে, রেকাব ঢলঢলে। খুরের ঘায়ে

ওড়া ধুলোও নেই, ট্র্যাক সাফ, পরিষ্কার। বেন্‌ড-এর মুখে একটু হুঁশিয়ার থাকলেই ঢের, ঢুলুনি এলেই কাত, হাড়চুরমার ধপাত।

জানান দেওয়ার জন্যে আছে ওই গিরজের পেটা ঘড়িটা। এমনিতে খুব পটু, কর্মঠ, অথচ মাঝে-মাঝে এমন গোল পাকিয়ে দেয়। যেমন, ওই একটা করে আওয়াজ। এগারো কি বারো হলে গোনা মুশকিল, কিন্তু সবচেয়ে শক্ত হল একটা ঢং-শব্দকে বোঝা। ওটা সবই হতে পারে, সাড়ে বারো, এক, কি দেড়।

হিসেব না রাখলে, হুঁশ না থাকলে সময়টাই ঝাপসা হয়ে গেল, ঘুমঘুম মগজে যেমন। অথবা স্লেটের লেখা, ভিজে ন্যাতা মোছার ভুলে গেল ধুয়ে।

এরকম হয়। যে-সময়টা এল, গেল, সে আর নেই। যেন আসেনি, ছিলও না কখনও। টানা ঘুম দিলেও অবশ্য এরকম হয়ে থাকে, হয়। হিসাব-বহির্ভূত টাকার মত বেঘোরে বয়ে-যাওয়া মতিচ্ছন্ন সময়। তবে সে একটু ছাপ রাখে। চোখের কোলের ক্লান্ত কালিতে, ঘষটানিতে খসে পড়া দু-চারটে চুল, বালিশে।

পেটা ঘড়ির রেকর্ডের বালাই নেই। বয়সের দিক থেকে যেমন পঞ্চাশ, এবং বলত কি, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন, তেমনই অবিকল একরকম গলা একটা, দেড়টা আর সাড়ে বারোর।

সেই দিক থেকে মসজিদের আজান কি মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা, শাঁখে ফুঁ, ঢের ভাল। বুঁদ হয়ে যখন, বিভোর, তখনই সুরে ঝংকারে মনে পড়িয়ে দেয়, ভোর হল কিংবা বেলা গেল। তার আগে পাখি থাকে না, নদী থাকে না। আকাশ কি বাতাসও না। ওই আজান অথবা শঙ্খরব সারাদিন যা খোয়া গেছে, তা ফিরিয়ে এনে দেয়। পাই-পয়সা সমেত। তখন আবার আকাশ এবং নীল, গাছের পাতায় পাখির কিচিরমিচির (বাসার দখলি স্বত্ব নিয়ে মামলা কি?) পাখিরা তখন পুনরায় পাখি।

হয়তো উত্তুরে বাতাস ও। শিরশিরে সুড়সুড়ি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, বয়স যায়-যায় অথবা বুঝি একেবারেই গেল। আবার দক্ষিণের হাওয়ার রোমাঞ্চও কি নেই? আছে আজও আছে। সে হয়তো একটু উত্থান বা আশার একঝলক সংবাদ : যায়নি, তবে হয়তো সব যায়নি। কে জানে, জীবনই সম্ভবত নতুন করে ফিরে এল। তবু শীতের বিকেলটায় বড় ভয়। তখন কেমন সিসে-সিসে ঘন কুয়াশা, অমন গনগনে রোদওয়ালা যে সূর্য, সে-ও সাততাড়াতাড়ি দিগন্তের ওপারের দীঘিতে টুপ করে ডুব দেয়।

একটা চিঠির মুসাবিদা করতে টুকরো কাগজে বাজে জিনিসের টুকরি যে ভরিয়ে ফেলেছে, বেশ কিছুদিন থেকে শীতের বিকেলের দিকে চোখে চোখে চাইতে তার বুকে বরফ-হিম ভয়। যেন পরোয়ানা যেন নোটিশ। যা কিছু বেহিসেবি খরচ করেছি এত কাল, তার বিল। চুকিয়ে দাও, চুকিয়ে দাও, শীতের বিকেল ছাই আর সিঁদুরে চোখে ধমক দিয়ে বলে।

পার্কে পার্কে যত থুত্থুড়ে বুড়ি দিনের মাসের ঋতুর এই সময়টাতে। নতুবা বেঞ্চে বেঞ্চে ঝিমুনি। মাথায় পশমি ঢাকনি। কী করবে, কোথায় যাবে? বাড়ি? কার বাড়ি?

কোথায় বাড়ি? ছেলে তো বউ নিয়ে কোম্পানির আলাদা ফ্ল্যাটে। দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে। তৃতীয়টি কোন অফিসের রিসেপশনিস্ট, এখন ডিভোর্সের ধান্দায় ঘন ঘন উকিলের বাড়ি ধরনা দিচ্ছে। তালাক—না চাকরির সঙ্গে নয়। ভালবাসাবাসি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যার সঙ্গে মালাবদল করেছিল না!—তালাক সেই স্বামীর সঙ্গে।

বনিবনা হচ্ছে না নাকি। না রুচিতে, না মেজাজে। বাচ্চা আছে, সুতরাং কষাকষির কারণ কোনও তরফের দৈহিক কোনও ঘাটতি সম্ভবত নয়। হয় নেশা-টেশার বাড়াবাড়ি, সে ব্যাপারে শুচিবাই একালের এদের কম। বরং ছাড়ান-কাটানের ঝোঁকটাকেই নেশা বলা যায়—পান থেকে চুন খসলে কি না খসল, অমনই। পুরুষদের কব্জির জোর তো বরাবরই, ইদানীং শিরদাঁড়া মেয়েদেরও শক্ত। আলাদা, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাই ঠোকাঠুকি—ঠেকানো সাধ্য কী? ক্লাবে নাচের নামে ঘুরপাক খেয়ে, কিংবা সোস্যাল ওয়ার্কের নামে মোটা চেক লিখিয়ে নিয়ে, তবে পলেস্তারা, তবে মেরামতি। কিন্তু স্বামীর মোটা টাকা উপায় হবে, গায়ে-গর্দানায় থপথপে থলথলে মোটা হবে, মোটা চেকে সই আদায় তবে তো! আর কিসে খিটিমিটি? অন্য পুরুষ, অন্য নারী? সে ব্যাপারে মনে হয় না যে, আজকাল খুব খুঁতখুঁতি। মানা, মানিয়ে নেওয়া। ফের সেই রেওয়াজ যা উনিশ শতকি। ঘড়ির কাঁটা পুরনো ঘরে পুনর্বার।

মুশকিল ওই বাচ্চারা বা নাতিপুতি। তারা চোখের সামনে মাকে রাতদুপুর অবধি বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে জুয়া খেলতে দ্যাখে। বাবার তো কোনও-কোনও দিন পার্টিতে রাত কাবার, যদি না মোটা টি-এ ডি-এর ট্যুর থাকে।

এই তো বাড়ি। যায় কোথায় পার্কের বুড়োরা, যাদের হাতে ছড়ি? বাচ্চাদের গোঁফ গজায়, মেয়েরা প্রকৃতির রীতিতে হঠাৎ একদিন মেয়ে হয়। সব জানে, ওদের বাজে বকবকম ভয়ডরও কম। সব পড়েছে ও। খালি বাংলা বাদে। বলতে যদি পারে চিচি ইংরিজির খিচুড়ি মিশিয়ে, পড়তে পারে না।

আর ওই না-পারাটায় লজ্জা নেই, বরং বড়াই। লিখতে তো শেখে না একদম। মা নিজেই যেখানে অন্য মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেমসাহেব হবার জন্যে হন্যে, সেখানে বাচ্চাদের বাঙালি বানানো—ছি-ছি। আর বাচ্চারা যেই তুঁতে পোকা থেকে প্রজাপতি, তাদেরও জ্যাম-সেশন। হুই-হুল্লোড়, ড্রাগস, ড্রিংকস, বিকল্পে (কভু একই সঙ্গে) লম্বাই-চওড়াই ফাঁপাই পলিটিক্স। ফুচকা, ভেলপুরি, চারমিনার। ধোঁয়া, কুড়মুড়ভাজা, বিনি ঝুঁকির হাজারো মজা। সেকালের মুড়ি মুড়কি নকুলদানার চাইতেও শস্তা একেলে পাঁচ-সাতহাজারি মনসবদার বাপ-জ্যাঠার আন্ডাবাচ্চাদের মুখফেরতা বিপ্লবী বুলি। দিনকতক হাত-পা সেঁকে গা গরম। তারপর তদ্বিরে বড় হৌসে এক-লাফে এগজিকিউটিভ। তখনও মুখের বুলি ছাড়ে না, আবার মুখে যা বলে পাব্-টাবে, অফিসের নোট-নথিতে তা কদাচ লেখে না। শ্যাম আর কুল দুইই রক্ষা পায়। প্রগতির ভেক, নামাবলি আর শাঁসালো চাকরি। ওসব তো তাদের ব্যাপার। বুড়োরা করে কী, যতদিন না তাদের জন্যেও গা গরম করা ইলেকট্রিক চুল্লি? রূপকথা নেই—কবেই হাওয়া ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী।

তাছাড়া সে সব বলতে গেলেই বা শোনে কে? সব তো বানানো, আজগুবি। মানুষের টাকা যত বাড়ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়াচ্ছে, ততই সে কি গরিব হচ্ছে কল্পনায়? হায়, চাঁদ যখন পায়ের তলায়, তখন এই ভাবনাও ন্যাপথলিনের আর চামচিকের গন্ধমাখা সাবেক কালের আঙরাখা। থাক, থাক তোরঙের নিচে, কবরচাপা এসব বস্তাপচা যুক্তি। হাসাহাসির আলোয় তাদের টেনে এনে কোন কাজ, সেই আমলে, যে আমল টেকনোলজি অর্থাৎ প্রযুক্তির? রহস্য বলে কিছু নেই, কিছু থাকতে নেই—কী সেক্স, কী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখন না সব উদাম, খোলা, উদলা?

তবু এই লোকটা আর তার সময়ের তারা? কথকতার ভিড়ে গঙ্গার ঘাটে ভিড়বে নাকি? কিন্তু সেই কথকতা এখনও কি আছে, সুরেলা গলার সেই কৃষ্ণলীলা? তার মধ্যে সার কথা কিছু কি আছে, নাকি স্রেফ অবলীলা? হোক। তবু তো গানের আমেজ, নাই বা রইল ভক্তি। নাই-বা মিলল পুজো-আচ্চা শ্রাদ্ধশান্তির পুরুত, তবু মন্ত্রগুলো তো লোপ পায়নি। আর তার জের যতই উড়ুক, যতই খুঁড়ুক, এখন তো মাঝরাতে ঘুম ভাঙে, কাদের যেন খামোখা ভয় দেখায় থমথমে বুদ্ধভুতুম। নারকেল গাছের পাতার আড়ালে শকুন-শিশুর কান্না থামতেই চায় না। নিরালা বাগানে ঘুঘু, ক্লান্ত, কামনার্ত, ডেকেই চলে—ভাগ্যিস। এখনও। কারনিসের কাকটা কাকিনীর ঘাড়ের রোঁয়া ঠোকরায়, পাঁশুটে ডানা মেলে চিল আকাশের নীল ছিঁড়ে যায়—অহেতুক, সব অহেতুক।

আর এই অহেতুক ব্যাপার-স্যাপার আছে বলেই না গোটা দুনিয়ার পাশে আর একটা অজ্ঞান পৃথিবীরও নড়াচড়ার সাড়া মেলে। তাই এবার তার প্রথম সম্ভাষণ পৃথিবীকে। যে-কোনও মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাই কল্যাণ-কামনা, "করকমলেষু" পাঠ সেইজন্যে।

এই মানুষটা, সে এই লেখকের ততটা জানা নয়, যতটা অজানা। তার আগের চিঠি ছিল "শ্রীচরণেষু মা"-কে। যিনি অন্তত তার ইহজন্মে প্রথমা মাতৃপ্রতিমা। আর ধাত্রী-সমা হল ধরিত্রী। মা জগদ্ধাত্রী, আর ধরে রাখে মাটি।

সেই হেতুই এবারের গোড়াতেই উদ্দিষ্টা পৃথিবী। তবে পৃথিবী মানে তো যতেক পুষ্প-পতঙ্গ, শস্য, নদী, প্রান্তর, সংসার, সমাজ, মানব-মানবী? কত সম্পর্ক কত কিছুর সঙ্গে--সম্পর্ক জীবিত, মৃত, নিরুদ্দিষ্ট। সবাইকে কিছু-না কিছু লিখে যেতে হবে। নতুবা এতকাল যে এই বিশ্বের বুকে বসবাস, তার সাফাই কী? মানবী আর মানব, তার দৃষ্টিতে। মানবেরাও আসবে যখন, তখন "কল্যাণীয়া" পাঠিকাকে "কল্যাণীয়" করে দিতে কতক্ষণ? কল্যাণ পাওনা সকলেরই। শ্রদ্ধা, ঘৃণা, স্নেহ প্রভৃতি যা কিছু বৃত্তির সঙ্গে যারাই সংশ্লিষ্ট—কল্যাণের দাবিদার প্রত্যেকে। "কল্যাণীয়াসু তোমাকে" এই কথাটায় ধরার প্রয়াস সবাইকে। একই মানে যা তোমার তাই তোমাদের সর্বনামটা সর্ব অর্থে। আর "করকমলে" লিখলে তো কথাই নেই। সবচেয়ে নিরাপদ।

আবিষ্ট, যেন আদিষ্ট, তাকে লিখতেই হবে, ইশারা অলক্ষ্য কোনও তর্জনীর। স্বয়ংচল রচনা, তবু স্থান, তবু কাল। সময়ের একটা নিশানা থাকা চাই। তাই প্রথম

পৃষ্ঠার কোণে নামের উপরে তারিখটা। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩—বিখ্যাত বিদেশি লেখক-ঘোষিত ভয়ংকর বৎসরের সূচনার ঠিক আগের দিন। কালরাত্রি।

সারথির আসনে বসে "লেখো, লেখো" আদেশ দিচ্ছে সময়, অথচ সেই সময় নিজেই যে যায়-যায়, অথবা এখনই নেই। তাই ঝড়ের মুখে পালকের মত কলম উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। তার সংকল্প : তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি পারি।

তাড়াহুড়ো, এই পাগল-পাগল চিঠির পর চিঠির ওই যা মিল। নইলে কতগুলোর আকার আবার চিঠিরও নয়। হয়তো জাতে তারা ডায়েরি। চিঠি যদি নিগূঢ় মানসের হয় ঝর্নার মত উৎসাহ, ডায়েরিগুলো তবে উদ্‌গার। নানা জায়গার, নানা প্রহরে লেখা, তাই প্রায়শ এদের শৈলীও আলাদা। নতুবা আগলভাঙা প্রায় প্রত্যেকটাই। পাগলের মত পাথর ফাটিয়ে উৎস থেকে আলোয় বেরিয়ে এসেছে। নইলে না তারিখের ধারাবাহিকতা, না পারিপাট্য পরম্পরার—এই সব জোড়াতালি দিয়ে যা দাঁড়ায়, তাকে কি আখ্যায়িকা বলা যায়? যেখানে যৌবনের কথা, সেখানে প্রৌঢ়ত্ব মাঝে-মাঝে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। আবার বৃদ্ধের বুকের পাঁজরের থাকে থাকে সে ফাঁক, উঁকি দিলে হয়তো দেখা যাবে, সেই ফোকরে বসে একটা দুষ্টু শিশু মনের আনন্দে আখ চিবোতে চিবোতে দিব্যি পা নাচাচ্ছে। তার দাঁত উদ্‌গত হয়নি, তবু আখ। পারবে না, তবু চিবোনোর সাধ।

পারুক চাই নাই পারুক, যত ছিবড়েই থাক আর যতই না গাঁট, তবু রস তো আছে। সে জানে। রস সম্পর্কে লালায়িত টান লোকটির চিরদিনের। বিস্তর অভ্যাসের পর অভ্যাসে সে বৃষ্টির দিনে উঠোনে পাতা ইটে পা ফেলার মত করে টপকে টপকে পেরিয়ে গেছে, তবু পায়ের তলায় জল, সেই ছলাৎ, ছলাৎ। যতবার পা ফেলেছে জলটা চলকে উঠেছে।

ওই জল, ওই রস। যতই ইট পাতো ওটা থাকেই। শেষ পর্যন্ত। এমনকি কলসি-কলসি ঢেলে চিতা ধুয়ে সাফ করতেও।

এই যে লেখা, এতে স্বভাবতই নাম থাকবে না একমাত্র এর লেখকের। বেনামি চিঠি-টিঠি তো কতই হয়। ধরা যাক, এ তারই একটা। অন্যান্য যত চরিত্র, যারা দেখা দেবে ঘটনায়, বর্ণনায়, তাদের অবশ্য প্রকৃত, প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত নানা নামের ছাপ থাকবে। সে-সব নামের কিছু ঠিক, কিছুর ক্ষেত্রে সামাজিকতার মুখ চেয়ে কাল্পনিকতা আবশ্যিক।

আর ছত্রে ছত্রে ছড়ানো ব্যস্ততা থেকে মনে হয়, সময় নেই এবং লোকে পাছে না বোঝে, মোষের জোড়া শিং-এর মত এই দুটিকেই লোকটির ভয়।

সাফ হতে গিয়েও সাফ সাফ বলে দেওয়া যায় না যে! আসান নেই এমন মুশকিল সেইখানে।

২. উঁচু আর দূর

তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু আমি চিনি তোমাকে। সেই যে একদিন দেখে ফেলি

আকাশে সবে যখন সবেদা রঙের আলো আর অন্ধকার ফুটতে শুরু করেছে, সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। শুভদৃষ্টি। দৃষ্টি অবশ্য একজনেরই। আমার। তোমার আছে কি না জানি না। থাকলেও চিনিনি। চেনার কথাও নয়। আমার জন্ম তোমার লক্ষ লক্ষ বছর পরে।

গাড়িটা হাঁচকা টানে হঠাৎ থামে। সেটাই শেষ স্টেশন হবে। ঘুম ভাঙে, সেও হঠাৎ। কাচের জানলা, চেয়ে দেখি, বিশাল দেহটা নিয়ে তুমি, হুমড়ি খেয়ে পড়েছ কামরাটার বাইরে। কালো? না। ধূসর-ধূসর। না। সবুজ অথবা গেরুয়া ক্রমে ক্রমে। তোমার সারা গায়ে গাছগাছালি, না নাঙা সন্ন্যাসী তুমি, ঠিক তখনই মালুম হল না।

চা, রোটি, গোস্ত—ভেনডরদের কানে তালা লাগানো চেঁচামেচি কিছু কি শুনতে পাচ্ছি? আমার হাত-পা তখন কাঠ। কৌতূহলী ভাবে আমাকে পরখ করছে যে, সে বিরাট একটা ব্যাপার। একটা কাচের আড়াল খালি মাঝখানে। যদি চোখ থাকে, তবে দেখছ, আর অন্ধ হও যদি, তবে হাত বাড়িয়ে আমার শরীরটাকে পরখ করতে গেলেই গেছি। জানলার কাচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। চামড়ায় ফুটলে রক্ত ফিনকি দেবে।

দাঁতে দাঁত, সেই প্রথম সাক্ষাৎ।

কী করে যে গায়ে গরম চাদরটা জড়াই, কতখানি সাহস আর জোর যে কোন ভাঁড়ার হাতড়ে জোগাড় করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসি, এখন আর ঠিক মনে পড়ে না। দেখলাম তুমি মস্ত। বুঝলাম, তুমিই পাহাড়। সমতলের মানুষ, তার আগে এত উঁচু, এত চওড়া বুকের পাটা আর দেখিনি কিছুর। কেমন ছমছম করে, যদিও আকাশটা ফের ঝলসে উঠতে চাইছে, তখন নরম ঠাণ্ডা ফুলফুল ভোর।

সেই প্রথম পাহাড় দেখা। এই পাহাড় কার? পৃথিবীর। আবার ধান সর্ষে কলাই ছাওয়া আমার চেনা যে জগৎ তাও তার। দুটো মিলেই পৃথিবী।

পরে যখন হিলহিলে সাপের মত রাস্তায় টিকুর টিকুর রেলগাড়িতে চড়ি, তখন আমস্তক কম্বল মুড়ি দেওয়া একটা লোক তার খানিক সোজা খানিক না-বোঝা ভাষায় বাইরের আকাশের দিকে উদাস তাকিয়ে বলে, দূর এ আবার কী পাহাড়! এ তো আসলে পায়ের কাছে পড়ে আছে। আসল পাহাড় আরও ওপরে, ঢের দূরে। তবু কেন্নোর মত গাড়িটা টাল খেয়ে বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে, আর পরতের পর পরত খুলে পাহাড়টার এক একটা অন্দরমহল সদর হয়ে যাচ্ছে, নিচে তাকালেই খাদ, খোলা ফাঁকা খাঁজ (এর নামই কি ভূগোলে বলে উপত্যকা?) সেখানে বড় বড় লোমওয়ালা ছাগল আর বাঁকা শিং গরু চরছে, এখান থেকে সব খুদে খুদে—আর? আবার হঠাৎ? যেখানে দিক শেষ, দৃষ্টি শেষ, সেখানে সাদা চুলে মুকুট-পরা সমুন্নত মহিমা। শির, শিখর, এবং পাহাড় নয়, পর্বত। একটু পরে কুয়াশা, পরক্ষণেই খুশি-হাসি রোদ। চূড়ার পর চূড়ায় খরগোশের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। সোনার জলে মাখামাখি একটু আগেই যা ছিল সাদা-পাথর শক্ত বরফ। রং বদলায় তবে বিশ্বের আভিজাত্যের মধ্যে যা উচ্চতম, সেই অভ্র-ভেদের অহংকারেও?

পৃথিবী, দেখলাম তোমার আর-একটা সত্যকে। শিখলাম। পরে তো শিখেছি আরও। সে অনেক বছর পার হয়ে গেলে। দূরের যাত্রী আকাশ পথে, আমাদের সমতল শহরে যে সব মেঘকে মনে হত নাগাল তো নাগাল, ত্রিসীমানার বাইরে, তারা যেন দলে দলে ভেড়ার মত ভীত, জমাট, একত্রিত। নিচে থেকে আষাঢ়ে শ্রাবণে যা রাগী রাগী মোষ, উপর থেকে তাকালে তারাই নিরীহ মেষ। দুটোই ঠিক, দুটোই রূপ। প্রকৃত, পৃথিবীর।

ওই এক যাত্রায় আরও কত জানা হয়ে গেল। পাহাড় রাস্তায় পাখির মত হালকা পায়ে ওঠানামা করে তারা, যাদের বলি পাহাড়। আমাদের পক্ষে যা দুরারোহ, দুর্গম, তারা স্বচ্ছন্দ। গৃহস্থ। আরও কত কী চোখে পড়ে। প্যাগোডার ছাঁদে বেড়ে ওঠা গাছ (পাইন, না দেবদারু, নাকি দুটোই এক?) মরশুমি ফুল না টুপটাপ বৃষ্টির মত ঝরে পড়া ঝিকমিক তারা?

আর ওই যে, একটার পর একটা তিরতির ঝোরা? যে পাহাড়টা খানিক আগে গাড়ির জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বিপুল ছায়ার ডানা মেলে ভয় দেখায়, যে পাহাড়টায়, খালি পাথর, পাথর, পথ করে নিতে হয় ডিনামাইট ফাটিয়ে, সেই কড়া পাহাড়টাও তবে ভিজে ভিতরে ভিতরে? নইলে অবুঝ খোকাখুকির মত ঝোরার পর ঝোরা তার বুক চিরে কী করে উছলে পড়ে? বোঝা সোজা। তলে তলে তারও রসের ফোয়ারা, থেকে থেকে দেখায় কঠিন, কর্কশ, রুক্ষ, কড়া।

শুধু তখনো আমার কাছে চূড়ান্ত বিস্ময় সেই শ্বেতাঙ্গ চূড়ার পর চূড়া। যার মধ্যে আছি, যেখানে দিয়ে যাচ্ছি, সেটা যত উঁচুই হোক, শেষ নয়। একটার পর একটা ভাঁজ খুলবে, লোকে যত এগিয়ে যাবে। উঁচুরও উঁচু আছে, যা কাছে, অনেক কিছু তারও বাইরে। দূরের পরেও আছে দূরন্ত দূর। সেই দূরটাও তোমার, তোমার—তাই প্রণামান্তে ইতি নয়, তোমার কাছেই সর্বপ্রথম ব্যক্ত করলাম পৃথিবী, প্রাথমিক একটা অনুভূতি। উঁচু-নিচু নারীদেহের মত একই সঙ্গে, একই অর্থে। আর কাছে যেমন, দূরেও তেমন—সেখানেও যেন নারীরই মন। পৃথিবী তুমি শুধু রমণীয় নও, যার অনুভব সত্য আর সত্তাকে এতটুকুও ছুঁয়েছে, সেই জানে, আদি, আবহমান রমণীও তুমি।

৩. ডুব-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার

কী অবাক ব্যাপার দ্যাখো ছোট মাসি, পাহাড়কে লিখছি, পর্বতকে লিখছি, নদী ঝোরা আরও কতকিছুকে চিঠি, তোমাকে কিন্তু এক লাইনও লেখা হয়নি।

অথচ সবচেয়ে আগে অন্তত গোটাকতক ছত্র লেখা উচিত ছিল তোমাকেই।

বিয়ে হয়েছিল তোমার, বাচ্চা হয়নি, মানে হচ্ছিল না বছরের পর বছর। মা-মামিমাদের সঙ্গে দল বেঁধে এ-বাড়ি ও-বাড়ি সাধের নেমন্তন্ন খেতে যেতে। টকটকাটক তেঁতুলের আচারের বাটি নিয়ে বসতে ফিরে এসেই।

মা রাগ করত।

—এই ভরপেট খেয়ে এলি, এই আবার আচার?

দেওয়াল গাঁথা হয়েছে, কিন্তু দরজা জানলা বসানো হয়নি। চারদিক থেকে এলোমেলো হুটোছুটি হাওয়া--এমনই খোলামেলা মন ছিল তোমার।

হেসে কুটিপুটি হতে। যেন গড়িয়ে পড়বে মাটিতে। তোমার সবই একটু বেশিবেশি। কোথাও কিছু ভয়ানক কম বলেই তার দিকে বড্ড বেশি, তবে সেদিকটা পরে বুঝেছি।

মাকে বলতে, খাও না, ও দিদি একটু চেখে দেখো না, দারুণ কিন্তু।

মা রাগ করত, অন্তত করেছে যে, সেটা দেখাতে চাইত।

--ঝালটাকে এত গেলা তোর? তবু যদি পোয়তি হতিস, পেটে একটা আসত যদি!

--আসবে কোত্থেকে। দিবারাত্তির নেশাভাঙে চুরচুর হয়েই যে আছে, আমাকে ছুঁয়ে দেখার সময়ই কি তার আছে? বাচ্চা তবে কি আকাশ থেকে--সেই যে শাস্তরে বলে না পুষ্পবৃষ্টি, তাই? ও দিদি আমাকে ছুঁয়ে বলো না--তাই?

ফের সেই মুখে আঁচলচাপা হি-হি। ওই হাসি যে কান্নার অন্য নাম, বয়সের তুলনায় একটু পাকা হলেও আমি ঢের পরে বুঝেছিলাম।

--খালি সাধ খেয়েই বেড়াবি? তোর নিজের সাধ আহ্লাদ বলে কিছু নেই?

হঠাৎ গম্ভীর হতে। মাসি, তুমিও তোমার চোখের আকাশে মেঘ জমাতে জানতে।

--আছে। ছিল। কিন্তু সন্তুদা, সেই যে তোমার মামাতো দেওর, তার সঙ্গে বিয়ে দাওনি কেন? দিলে কি না পাটগুদামের এক ছোটবাবুর সঙ্গে। অথচ সন্তুদা এম-এ পড়ত, চোখে চশমা।

কোনটা তোমাকে বেশি টানত, এম-এ পড়া, না চোখের রিমলেস চশমা, ঠিক বোঝা যেত না। মাসি, তখন তোমার মুখে-চোখে তো আর হাসিকান্না আড়াল দেওয়ার আঁচল চাপা নেই। তবুও না।

ও ঘনঘন আসে বুঝি তোর শ্বশুরবাড়িতে?

--উঁ-হুঁ। ঘনঘন হবে কেন, মাঝে-মাঝে।

--তবু কতবার?

(মা ইচ্ছে হলেই হতে পারত উকিল কি মোক্তার।)

--কতবার? এই দ্যাখো। দাগে দাগে লেখা আছে।

পিঠের কাপড় সরিয়ে দিতে, অসংকোচে অনায়াসে। কালশিটে, পিঠের উপর থেকে নিচে অবধি টানা।

যতবার সন্তুকাকা মাসির শ্বশুরবাড়ি যেত, ওই কালো দাগ কি ততবার? মার খাওয়া তার যাওয়া-আসার দাম?

মা জানতে চাইত। তখন কী জানি কেন, মাকেও। মনে হত বোকা, বোকা, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই এমন বোকা।

জিভে তেঁতুল ছুঁইয়ে, টকটকাটক মজার আওয়াজ তুলে, মাসি, তুমি চোখ বুজতে। আরামে। অথচ চোখের কোল বেয়ে জল গড়াচ্ছে, দেখতাম। টকের সঙ্গে ঝালও চিবিয়ে ফেলেছ নাকি, কাঁচালঙ্কাও বুঝি মেশানো ছিল তেঁতুলের আচারে? সুখ, আরাম

আর কষকষ রক্তমাখা কষ্ট যে একই সঙ্গে মেশানো, আহা, তখন যদি বুঝতাম!

কয়েতবেল, না তেঁতুল? ভুল লিখছি না তো এতদিন পরে? হতে পারে, তবে তাতে কিছু কি যায় আসে? ঝাল আর টক, আসল কথা তো এইটে?

মা তোমার পিঠের কাপড় সরিয়ে দিত আরও এখানে ওখানে আঙুল রেখে বলত, তোর তো অভাব নেই কিছুর। বরং সবই বেশিবেশি। তবু তোর সোয়ামিকে টানতে পারিসনে?

—দেখছই তো পারছিনে।

—তবু মতি রাখিস। পতি হল পরম গুরু।

—গুরু নয়, গরু (সেই হি-হি)। ঘাস খায়। না, না, গরু নয়, ঘোড়ার ঘাস ফি সপ্তাহে রেসের মাঠে। এসব কথা থাক না দিদি, আচার খাবে?

—তুই মর। মা সরে পড়ত দুপদাপ পা ফেলে।

—মরব।

দাঁতে জিভে আর টকটক ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। মাসি তোমার গলা তখন যেন কেমন, শান দেওয়া ছুরির মত ধারালো।

—মরব। দিদি, তোমার একটা কথা রাখবই। দেখো।

মনে পড়ে!

—তোমার কাছে আর সাঁতার শিখব না আমি।

—কেন রে, তোকে নাকানি-চোবানি খাওয়াই বলে? তা পেটে জল ঢুকবেই, সাঁতার শিখতে হলে।

দিনকতক দেশের বাড়ির পুকুরে আমাকে সাঁতার শেখাতে শুরু করেছিলে, তোমার মনে পড়ে?

—না পেটে জল ঢোকে বলে নয়।

—তবে?

—সাঁতার শেখানোর সময় তোমার কাপড়-চোপড় ঠিক থাকে না, হাঁটুর ওপর শাড়ি উঠে যায়।

—তাতে তোর কী? তুই তো বাচ্চা ছেলে।

—হলামই বা। তবু—তবু মেয়েদের পায়ের কাপড় উঠে গেলে আমার কী রকম লাগে। কলাগাছ, কলাগাছ, থোরের গোছ, গা সিরসির করে।

অবাক, তুমি গালে হাত দিতে। না, আমার গালে চড় মারতে নয়, নিজেরই গালে।

—আমি না তোর মাসি? মায়ের মত। মা-মাসির বেলাতেও ওই দৃষ্টি, এই বয়সেই, তোর সত্যিকারের বয়েস হলে কী হবে রে?

মাথা নিচু করে থাকতাম। কিছু বলতাম না। গাল লাল।

এরই মধ্যে সাঁতার শেখানো বন্ধ হয়ে যায়। নিজে থেকেই। তুমিই বন্ধ করে দিলে।

শুধু আচার না, মাটির সরা খুরিও কুচকুচ করে চিবোচ্ছে, লক্ষ করলাম। কিসের এত নোলা?

কিসের যে, সেটাও জানতে দেরি হল না। বাড়িতে ফিসফিস কথাতেই বুঝে ফেললাম। সন্তুকাকাও এরই মধ্যে দিন তিন-চার কাটিয়ে গেছেন। কোন একটা পুজোর টানা ছুটিতে মেসোমশাইও এই বাড়িতে ঘাঁটি গেড়ে আছেন।

সে যা হোক, তাই হোক, তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে। এত দিনে। এতদিন একা আমিই তোমার ছিলাম।

মানে নেই, তবু মনে হল কোথায় যেন, কে জানে কেন, কেবলই মনে হতে থাকল ঠকলাম।

তুমি বললে সাঁতার শেখানো আর না?

—কেন?

—সে তুই বুঝবি না। আমি এখন বেশ কিছুদিন আর পারব না।

না-পারাটাও চোখে মুখে বুকে ডগমগ খুশি হয়ে ওঠে, দেখলাম।

তবু আমি, বোকা আমি, বললাম, শেখাবে না কেন। তোমার পায়ের কাপড় উঠে যায়, সেমিজটা ফেঁপে ফুলে ওঠে, সেই কথা বলেছি বলে?

—দুর! তুমি পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে।—বলেছিস সে তো তুই সরল বলে। একটু শক্ত, একটু নরম, নদীতে নতুন-জাগা চর যেমন হয়। তাতে কত কাঁটাঝোপ, আগাছা গজায়। মনের কথাটা মুখে বলে ফেলেছিস, সেই জন্যে রাগ করব? বোকা ছেলে।

একটু থামলে তুমি। বললে, সেজন্যে নয়। তোকে নিয়ে আমার অন্য ভয়। মনের কষ্ট তো পাবই, সেটা ক্রমে বাড়বে বয়স বাড়লে। কিন্তু এখনই শরীরের কাপড় সরা দেখছিস, বলছিস শিউরে উঠিস, মন তো মন, শরীর নিয়েও তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে রে। যেমন আমার।

দীর্ঘশ্বাস পড়ত। থামতে। গাছ থেকে পড়ে যাওয়া পাখির ফাটা ডিমটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে।

তুমি জানো, কিন্তু আমি লিখতে ভুলেছি, তোমাকে দুপুর কাটাবার ক-তো ক-তো বই আমি এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনে দিতাম।

গোগ্রাসে গিলতে তুমি। সব।

—প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর লেখা কী চমৎকার রে! আঁচল ভিজিয়ে দেয়। নরেশ সেনগুপ্ত? কী চনমনে, আর-একটু বড় হলে পড়ে দেখিস। আচ্ছা, ডিমটা ফাটল কেন রে?

—বোধহয় আলগা রাখা ছিল, তাই মাটিতে পড়ে—

—উঁহু। আমার মনে হয়, আলাদা মানে। ওই ডিমটা আসল বাবা-পাখির ছিল না হয়তো, তাই বাবাটা রেগে গিয়ে—রাগ হিংসে ওদেরও আছে, সব জীবজন্তু পোকা পাখির। জানিস?

ডিম পাড়া আর ডিমের পড়া নিয়ে যে রহস্য আর বৃত্তান্ত, তার কিছুই আমি তখন পর্যন্ত জানতাম না। বোধহয় তুমিও না। তাই তোমার ব্যাখ্যাটা শুনেও চুপ করে রইলাম।

তুমি ছেড়ে দিলে, কিন্তু মেসোমশাই নিলেন আমাকে সাঁতার শেখানোর ভার। সারা সন্ধে গাঁজা টেনে হুসহাস, রাত্তিরে শোবার ঘরে ধুপধাপ, কিন্তু সকালটা শান্ত, তখন সাঁতার।

—তোর মাসি তোকে কী কায়দায় শেখাত রে?

—বুকের তলায় মাঝে-মাঝে কলসি দিয়ে।

—হুঁ, ওটা মেয়েলি স্টাইল। ডোবার চান্স নেই। মেয়েরা ডুবতে ভয় পায়। জল কম, মেসোমশাই পা ফেলে ফেলে আমাকে নিয়ে যেতেন পুকুরের মাঝজলে। তারপর ফেলে দিয়ে—

—আগে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভেসে থাকা শেখা, তারপর হাত দিয়ে জল কাটানো। এইভাবে শুরু, বুঝলি? তবে না সাঁতার!

জলহস্তীর দাগে যে মানুষটার হাতের দাগে মাসির উদলা পিঠে কালশিটে, দাগের পর দাগ, সেই মানুষটাই এত আলতো হাতে আমাকে জলে ভাসতে শেখাচ্ছে? লেখাজোখা নেই কত যে দিক এক-একটা লোকের! পৃথিবীর তো মোটে দশটি। তবু ভাল করে শেখা কি হল? সন্তুকাকা এলেন একদিন। আরও একটা কালশিটে এঁকে দিয়ে মেসোমশাই কেটে পড়লেন পর দিন। ছুটি ফুরিয়েছিল? নাকি মাসির পিঠে বিড়ির ছ্যাঁকাও—একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল কি সেইবার? মাসির তখন ভরা আটমাস।

না, ঘাটলা থেকে পিছলে পড়েনি মাসির পা। সে যখন শেষবারের মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে তখন পেটের জলের সঙ্গে মেশানো সেঁকো বিষেরও দিশে পায় ডাক্তার। সব শেষ।

সেই মুহূর্তে মনে হয়, সব শেষ আমারও। পায়ের তলার মাটি আর উপরের আকাশ—শূন্য, শূন্য, সমস্ত একাকার।

পায়ে পায়ে হেঁটে মাইল খানেক দূরের রেললাইনে চলে আসি। একটু তফাতে ডিসস্ট্যান্ট সিগন্যাল, তার পাশে মড়াকাটা ঘর, লাইন ঘেঁষে ঘেঁষে বেগনি কচুরিপানায় উৎফুল্ল সরু খালটা, তার ওদিকেই শ্মশান।

সেঁকো বিষ। বেশ তো ছিল নরেশ সেনগুপ্ত, সৌরীন মুখুজ্যে আর চারুবাবু—মাসিকে কেন যে 'বিষবৃক্ষ' এনে দিয়েছিলাম। বঙ্কিমবাবু যে কী লিখেছেন, তখন পর্যন্ত কি জানি ছাই! কুন্দ, মাসির হাতের ধবধবে আঙুলগুলি। পায়েব সিঁদুরলেপা আঙুলগুলো তবে মোরগফুল নাকি?

মনে পড়ল, মনে পড়ল। সাঁতার শেখানোর সময়ে মাসি বলেছিল, নাকানিচোবানি? তো খেতেই হবে। আরও কত খাবি, বাঁচবি তবে তো! বাঁচার আর এক নাম তো সাঁতার!

দুপুর কাটাতে, সময়ে সাঁতার দিত মাসি। বইয়ের পর বই গিলত। গিলে কেতাবি যত কথা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাই তো তরতর করে বলতে পারল, এক ব্যাপার—বাঁচা আর সাঁতার।

সেই মাসিই যখন গেল, তখন কার মুখে আর ঝরবে অমন ফুলঝুরি? শেখাবে কে, কে-ই বা রইল ভালবাসার? কেউ না, কিছু না। আমিই বা থাকব কেন, সব যখন ফাঁকা ধুতরো ফুলের মত? শূন্য, শূন্য, দম বন্ধ হয়ে আসছে। তখনই ঠিক করে ফেলি, অর্থ হয় না, নেই, আমিও বাঁচব না।

এই তো পাতা লাইন। সোজা, রুল টানা। রেল কাম, আসুক না একটা গাড়ি, আমি মাথা পেতে দেব তার চাকার তলায়।

তারপর? কত গাড়ি এল, কত গেল, তার নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়িনি তো! বরং ওই রকম গাড়ির পর গাড়ি চড়ে অগুনতি শহর-বন্দর চক্কর দিয়ে এলাম। আজও আসছি। লাইনের পাশে সরু তিরতিরে খাল। এই রকমই ঘোলা জলে আমাকে তার বৃষবৎ মজবুত কাঁধে তুলে সাঁতার শেখাতে নেমে যেত মেসোমশাই।

শিখছি, সেই থেকে শিখেই চলেছি। মরিনি। মাসিকে জনান্তিকে বলা কথা রাখিনি। ক্রমে ক্রমে এসব কতজনকে বলা কত গাঢ় গদগদ কথাও না। ক্ষমা কোরো মাসি, আমার নিজেকে দেওয়া যত কথা, তা নিজেই কি রেখেছি? রাখলেও, সারা জীবনে, শতাংশের হিসাব গুনে গুনে, মোটমাট কয়টি?

[ক্রমশ]

প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা মে-১৯৮৪
(পূর্ব প্রকাশিতের পরে)

৪. নারী—ধ্রুপদী আর চলতি

পাতাগুলো হলদে। এখানে ওখানে ফাটা ফাটা। এ কোণ ও কোণ এখানে ওখানে ছেঁড়া। বোঝাই যায় লেখাগুলো অনেককালের। মাঝে-মাঝে কাটাকুটি। ধরা পড়ে, লেখকের মধ্যে একটা অস্থিরতা ছিল, অন্তত কী লিখবে আর কাকে, তার মন সে বিষয়ে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিল না।

কী, কী, কী? কাকে, কাকে, কাকে? কস্মৈ দেবায়, কস্মৈ দেব্যৈঃ? নামের পর নাম, কয়েকটা লাইন, তারপর সরু নিবে কাটা—পাতায় বাঁপাশ থেকে ডানপাশ পর্যন্ত, সরাসরি।

ভোঁতা কলমে ছ্যাবড়া কালিতে সে যে কাটেনি, সূক্ষ্ম নিব ব্যবহার করেছে, ওর মধ্যে একটা সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে।

যা লিখেছে তা লোকটি কেটে দিতে চায়, আবার সবটা লেপটে একেবারে মুছে যাক, তাও তার ইচ্ছে নয়। একটু চাপা থাক, আবার সবটা যেন বেমালুম না মোছে।

দুটো বৈরী মনোবৃত্তিকে পরস্পরের মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছি। একটা মোহহীন অবলোপী, আর একটা মায়াবী, লোভী। নিজের সঙ্গে লুকোচুরি।

লেখা, আবার পাঠোদ্ধারযোগ্য কায়দায় কাটা এই অনুচ্ছেদটাই ধরা যাক না।

"সত্য খুব মহৎ, কিন্তু প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য, সরলরেখার মত। আরও সঠিক নিরূপণ হয়, যদি বলা যায়, সত্য হল লাট্টুর শেষ ছুঁচলো বিন্দু। মিথ্যে কিন্তু যত বাজেই হোক না কেন,—বিস্তারে বৃহৎ। অনন্ত তার সম্ভাবনা। সত্য একটাই হতে পারে মিথ্যে আকাশের তারার মত অগুনতি, অনেক। বক্ররেখার রাস্তা বহু। মানে, সে শুধু বক্রই নয়।"

কেন লিখেছিল, জানা যাবে না। সত্যের উপরে সহসা তার বিতৃষ্ণা এসে থাকতে পারে, মিথ্যের প্রতি মমত্ব। আকস্মিক, ক্ষণিক।

কিংবা এই কথাটাই ধরা যাক : "মোহানা। সেখানে নদীর মৃত্যু, না চরিতার্থতা? মোহানায় নদীর শেষ—বরাবর তাই জানি, কিন্তু একমাত্র সেখানেই সে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে,—তাও নয়, সর্বাঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে স্বাদ পেল অপার জীবনের—তাও তো হতে পারে!"

লেখা, কিন্তু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কাটা। কথাগুলো ভুল, সেজন্যে নয় বোধহয়। আসলে এই বাক্যগুলোকে কোনও ছাঁচে ঢালা যায়নি। এগুলো না চিঠি, না ডায়েরি, গল্প তো নয়ই। অনুভূতি, বড় জোর উপলব্ধি। তবে যেমন হস্তাক্ষরে, যেমন পাতার হলদেটে রঙে, তেমনই খাপছাড়া হলেও এমনই হঠাৎ-হঠাৎ অনুচ্ছেদে কোনটা কোন বয়সে লেখা, সেটা আন্দাজ করে নিতে পারি।

আবার চিঠির ধাঁচে লেখা অনেক কথার তাৎপর্য ঠিক করতে পারিনি। লোকটির মন, চিন্তা সময়ে-সময়ে অনিশ্চয়তায় ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসত কি?

উদ্ধৃতি : "লবঙ্গলতা আমি তোমাকে ভালবাসি। যখন বাইরে লোকে লোকে ছয়লাপ, সেই মুহূর্তে ভিতরে তুমি। আবার যখনই একা, তখনই তুমি। দর্পিতা লবঙ্গলতা, ভ্রূভঙ্গী করিল--কি সুন্দর ভ্রূভঙ্গী!...লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম আমি কিছু কখনও বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগ করিয়াছিল,—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, আমি লবঙ্গলতার হাসির মর্ম কখনও বুঝিতে পারিলাম না।"

একটু পরে "লবঙ্গলতা লবঙ্গলতার মতো দুলিতে থাকিল।" আবার "লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে।"

এই পৃষ্ঠাগুলোর রং হলদে, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল সবুজ। কাঁচা বয়স ছত্রে ছত্রে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতিতে। সেই বয়স, মন যখন জল। সেই জল নয়, যে জলের তোলপাড়ে প্রলয়। এই জলে শুধু ছোট ছোট ঘূর্ণি বাইরে খর-চঞ্চল, কিন্তু একটু ডাঙা, একটা পাড় চায়।

এই জায়গাটুকু ধরা যাক। কোম্পানির সিপাহী পাঁচখানা ছিপে, সিপাহীরা ডাঙা পথেও। বন্দুকের শব্দ।

ব্রজেশ্বর। কেন এত সিপাহী এদিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য?

(এই প্রশ্নকারী ব্রজেশ্বর ভীত, না বিস্মিত)

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল....তুমি পূর্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে?...তবে জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

প্রফুল্ল। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

(ব্রজেশ্বর কি তার প্রশ্নের উত্তর পেল? পেলে, বুঝল? তোমাকে আর একবার দেখব বলে, এর নাম কি? বাসনা, তৃষ্ণা অথবা জন্মমৃত্যুপার কোনও ব্যাকুলতা যা জ্যোৎস্না রাতে নদীর চরে শরবনের মাথার উপর দিয়ে বালি হাঁসের মত শব্দহীন পাখায় অথচ ব্যাখ্যাহীন কোনও স্বরে ডাকতে ডাকতে অপার আকাশের ওপার খুঁজতে যায়। প্রেম? আছে কি না জানি না। যাকে প্রেম বলি তা হয়তো শুধু আসঙ্গ। চোখে চোখ রাখার, শুধু সঙ্গটুকুর জন্যে রাগ-রক্তের বোবা চিৎকার। প্রেম-ট্রেম মিথ্যে বলে সাব্যস্ত হয় যদি হোক, কিন্তু যে অবুঝ ইচ্ছা শুধু প্রিয় মানুষটির মুখ আর একটিবার দেখবে বলে জীবনমৃত্যু তুচ্ছ করে ছুটে আসে, তার প্রগাঢ় ওই সংলাপটা আমি কী করে ভুলি, কী করে? সারা জন্ম ওই বিদারী কথাটা 'আর একবার দেখব, আর একবার দেখব, আর একবার আর একবার' কোনও একটা অবিশ্বাস্য চিরন্তনতার চিহ্ন বয়ে অনুসরণ করবে আমাকে। ওই প্রফুল্ল যতটা দেবী ততটাই চৌধুরাণী।

'প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না।....সে সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।' সত্য নয়, সত্য নয়। ডুবেছিল শৈবলিনীও। বরং প্রতাপের চেয়েও বেশি পক্ষপাতী পুরুষ লেখক যদিও লিখেছেন, 'বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না'--তবু আমি স্থির জানি শৈবলিনী, তুমি ডুবেছ, ডুবিয়েছ আমাকেও। আমার উদ্ধার কীসে?

নেই। ওই বয়সে থাকে না। তখন কেবল ডোবা। কেবল বইয়ে-পড়া ভালবাসা বঙ্কিম, শেলির। হার্ডির নভেলের উপরে পরীক্ষার আগের রাতেও উপুড় হয়ে পাতার পর পাতা ভিজিয়ে দেওয়া। দলনী বেগম আর কুলসম। ওই যে দলনী বেগম শিহরিল, বলিল, 'অমঙ্গল' ঘটে ঘটুক, অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর নিকট অমঙ্গলও ভালো, ওই বয়সে এসব নাটুকে সংলাপ বড় মধুর লাগে।

ওটা তৈরি হওয়ার বয়স কিংবা তলিয়ে যাওয়ারও। স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা প্রভৃতির প্রতি অটুট আনুগত্যে। সব খাঁটি, সব সাচ্চা, সব যথাস্থানে।

জলের জোয়ার একদিন সরে বইকি, ভাটায় কাদা বেরিয়ে পড়ে।

তবু তো ঝকঝকে রোদ্দুর! সেই রোদ্দুর শুকনো, তবু তার আলো সব জিনিস ঠিক ঠিক দেখিয়ে দেয়। মানুষী মন ভাসতে, এমনকী সাঁতার দিতেও শেখে।

কম বয়স হল কচ্ছপের বুকের তুলতুলে তলা, আর বয়স বাড়া মানে সেই কচ্ছপেরই পিঠের শক্ত খোলা।

বইয়ে-পড়া নায়িকারা তখন দূর থেকে আরও দূরে।

দূরে আবার কাছেও ঘনিয়ে আসে। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কোনও শচীশ 'কে ও?'

—এই প্রশ্নের উত্তরে শোনে 'আমি দামিনী। তোমার জানালা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।'

ঘর তো আমারও খোলা, বড় বৃষ্টির ছাঁট, কিন্তু কই, কেউ তো নেই! আসেনি। কেন?

জবাবটাও বোধ হয় জানি। কেউ যদি আসত, তাকে কি শচীশের স্বরে বলতে পারতাম 'আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও?'

না। সেই অদ্ভুত ধাতুতে আমার আমিকে তৈরি করতে পারিনি। আমার মন বড় জোর পলকা টালিতে গাঁথা রংবেরঙের মোজাইক।

তবু তোমরাই আমার একতলাটা তৈরি করে দিয়েছ, কোমল ছোঁয়ায়, কঠিনতায়। নারী জাতি সম্পর্কে আমার ধারণা। খুঁজি, ছুঁই তবু মেলে না। খুব কি জোলো শোনাবে যদি লিখি, এই চিঠিটা তোমাদের উদ্দেশে?

তোমরা, তোমরা, তোমরা। তুমি প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী, তুমি শৈবলিনী, অথবা দলনী বেগম—প্রত্যেকে। আর, আর, লিখতে সাধ যাচ্ছে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না, তবু সাধ হচ্ছে যখন, তখন লিখেই ফেলি না, লিখেই ফেলি, আমি আজও তোমার অপেক্ষায়, দামিনী!

এই পর্যন্ত কবে যেন তুমি পড়ে ফেলো, সুভদ্রা। চুরি করে। হঠাৎ মেসে এসেছ, তোমার জন্যে চা বিস্কুট ফরমাশ করতে গেছি, ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপরে ঝুঁকে কাগজগুলোর মারজিনে কী যেন লিখছ।

পড়লাম।

'অপেক্ষায় থাকো। যতদিন অপেক্ষায়, ততদিনই ভালো। মাঝে মাঝে তবে দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না' গানটা মিথ্যে, অসহ্য, প্যানপেনে ন্যাকা। মাঝে মাঝে দেখা পেলে তবু বাঁচোয়া। চিরদিন পেলে? মাঝে মাঝে দেখার ইচ্ছেটাও উবে যেত, একটি দিনও দেখার শখটুকু থাকত না। এবার একটু রিয়েলিস্ট হতে শেখো, বেলা তো নেহাত কম হল না?

তারপর? তোমার মনে আছে সুভদ্রা? পর পর—সিনেমার ছবির মতন।

প্রথমে বলি 'পরের লেখা লুকিয়ে পড়া খুব অসভ্যতা।'

—বাজে সংস্কার। বলেই তুমি দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরো। —এর চেয়েও অসভ্যতা। বলে চোখের পাতায় পাতায় মাখামাখি, নিচের বুকের বোতামেও হাত—

হাত বাড়িয়ে আমি ঠেকাই।

—তাছাড়া, অন্যের লেখার মারজিনে নিজের টিপ্পনী। তুমি যে কী না।

—সেই প্রেজুডিস। সাবেকি। পাছে পোকায় কাটে, তাই ওষুধের গন্ধগুঁড়ো মিশিয়ে তাকে তুলে রাখা শাল, শীত পড়লে পেড়ে আনো। রোদে শুকোতে দেওয়া যত বুকনি, কত আর ঝাড়বে?

—আমার বুঝি মান-সম্মান অভিমান নেই?

—মেয়েলি কথা বোলো না।

হঠাৎ কী যেন ভর করল আমাকে, দেশলাই ধরানোর স্টাইলে ফশ করে বলে ফেললাম, 'কেন, সেদিন পুরুষালি একটা লেখা শোনাইনি?'

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলে সুভদ্রা, মনে আছে?

—পুরুষালি? মানে আফটার শেভ মাখার মত?

—আবার খোঁচা? কেন, সেদিন যখন পড়ে শোনালাম, এক—এক নারী আর নদী। কখনও নদীরা নারীর সুরে কথা বলে, কখনও নদীর স্বরে নারী। তুমি তারিফ করোনি?

চোখ বুজে খানিক কী যেন ভাবলে। —করেছি বুঝি? হবে। তখন খুব জরদা পানে আমার মুখ ভরতি ছিল নিশ্চয়, মাথা সুতোকাটা তকলির মত ঘুরছিল। নইলে ও ক'টা লাইন, ও তো বোকা-বোকা। ভেরি আন-রিয়েলিস্টিক।

—কেন, আনরিয়েলিস্টিক হল কীসে, জানতে পারি?

চোখ তখনও আধবোজা, তুমি বললে, হল এই জন্যে যে, নদী আর নারীর তুলনাটাই ভুল, যদিও কাব্যি করে মেয়েদের সব ভোলাতে ছেলেরা ওসব হরদম বলে, লিখেটিখে থাকে। নদীতে ভাটা আসে, ফের জোয়ার বয়। কিন্তু মেয়েদের বয়স গেলে? সোজা কথা, একবার সময় বয়ে গেলে নারী আর নারী হয় না, যদিও নদী বারবার সেই নদী হতে পারে, হয়।

—এমন নারী কি নেই, যার বাইরেটা যতই বদলাক, সত্যিকার কিছুই যায় না? যা আছে, তাই থাকে?

শুনে হাসলে। চিরস্থির নারী-টারীর কথা বলছ তো? ওসব খালি বানানো পদ্যে। জল যায়, যাবেই, আর তার ঢল নিচের দিকে নির্ঘাত ছুটবেই।

আমি মরিয়া, জোর দিয়ে বলি, না, এমন মেয়ে আছে, যারা আলাদা জাত আর ধাতের।

ভুরু কোঁচকালে।

—দেখেছ?

—উহুঁ। পড়েছি।

—ওহ্, পড়েছ! তোমার তো সব পুঁথি-পড়া বিদ্যে। তা এত মেয়ের কথা পড়েছই বা কোথায়, সে কে?

এবার গলা কেঁপে গিয়েছিল আমার। বলেছি, কেন, দামিনী!

চোখ তখন একেবারে খোলা, চুলের রাশ পিঠে ঢালা, সুভদ্রা তখন লহমায় যেন বাঘিনীর মত তুমি। আমার চোখে স্থির মণি রেখে বলেছ 'আমিই তোমার দামিনী। ভয় হচ্ছে না তো, তোমার? দেখি, নাড়ি টিপে দেখি।

—ভয়? ভয় কীসের?

—কেন, সেই গুহা জন্তুটা যদি বেরিয়ে আসে? যদি তাকে ডেকে আনি?

গালে গাল ঘষছ, ঘষটাচ্ছ সুভদ্রা, আর আমি সব স্নায়ু খুইয়ে গাছ কি পাথর হয়ে গেছি।

আফটার শেভ লোশনটা কোথায়, যার গন্ধ নাকি পুরুষালি? দুর, পেলেই বা কী হত, আমার তো তখনও দাড়ি কামানোই হয়নি!

কী হল, কী, তারপর, তারপর?

মনে নেই, মনে নেই। কত দূর, কত দূর?

কী জানো, আমাকে অদ্ভুত সব ধারণা পেয়ে বসে। হয়তো আগে কিছু ছিল না, পরেও কিছু ঘটেনি। আর যেখানে ছিলাম, সেখানেই চিৎ হয়ে কড়িকাঠ গুনেছি। কীসের কাছে, কোথায় দূর?

মেসবাড়িতে হঠাৎ-ঝলক মেয়ে আসার ব্যাপার তখনকার চলতি নভেলে আকছার। তার সঙ্গে মিশিয়েছি ধ্রুপদী দেবী চৌধুরাণী, দামিনী।

'তোমাকে আর একবার দেখব বলে।'

--দেবী চৌধুরাণী ব্রজেশ্বরকে বলেছিল না? তেমনই 'এই দিনটিতে আমিই তোমার দামিনী, কোনও মুখে একবার, শুধু একটিবার যদি শুনি!'

পূরণ নেই, দিনে রাত্রে প্রহরে প্রহরে ইচ্ছাগুলো যখন শুধু ভাগ হয়ে যায়, তখনকার সরল-ঘোরালো মানসাঙ্কগুলোকে কষ্টে, সাধেও, কষব বলেই এই চিঠি। অধীতা, ধ্যায়িতা, কথা, কাহিনীর অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে পাতার পর পাতায় লিপ্তা প্রার্থিতাদের তো ঠিকানা জানি না, তাই তাদের খানিকটা ছেনে ছেনে পেয়েছি তোমাকে।

তুমি কি তুলতুলে পুতুল, তুমি কি পাথরের প্রতিমা? কী গড়তে গিয়ে কী যে হয়ে যায়। হয়তো তুমি দু'টোই, হয়তো কোনওটাই না।

কাব্য করে পত্রলেখা বলাও ভুল, তুমি যা তুমি অবিকল তাই : সুভদ্রা।

তবে, আর সবাই যেমন, তুমিও যে তেমন--বেঠিকানা! এই ডাকটাও কোথায় পৌঁছবে, কোথাও পৌঁছবে কি? জানি না। ডাকা তো গেল, আসল কথা সেইটাই।

৫. স্বর্গ-খেলনা

কে জানত, তুইও এই পত্রাবলির একটা ভাগ হয়ে যাবি, লিলি? টুকরো টুকরো লেখা, লিখি, চাপা দিই, কিছু খোয়া যায়, কিছু ছড়িয়ে ফেলি--তোর তো এর ভাগ পাওয়ার কথা না!

এসব তো অন্যজাতের চিঠি। যারা ঘা দিয়েছে, তাদের ঘিরে ঘা মারা। এই যে কলম, এর কালি খালি লেখার নয়, কালোয় লেপে দেওয়ারও, একজনের পর একজনকে গুলি--ফায়ারিং স্কোয়াড। অন্তত কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, অতটা যদি নাও পারি।

লিখতে লিখতেই মনে হল, উহুঁ সেটা ঠিক হবে না। হাকিমের আসনে যে বসে হম্বিতম্বি চালাচ্ছে, কোনও কোনও ব্যাপারে সে নিজেই যদি হয় আসামি। হয়, হয়, হতে পারে। যেমন আমি। ছোটমাসির কাছে যত অপরাধ তার খানিকটা তবু কবুল করে হালকা হওয়া গেছে, কিন্তু আর অনেক—অনেকই তো বাকি। লম্বা টানা লাইনে যত লেখা, ততই কাটাকুটি।

কত, কত। হিসেব নেই, এত এত। রায় দেওয়া, জবাবদিহি চাওয়া, জেরা করা তাকেই সাজে, যে নিজের কাউকে কখনো ঢিল ছোড়েনি। দোষ করেনি, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে, একরত্তি। সেই বিচারে কেই বা ধোয়া তুলসী?

কেউ না, আমি তো নই-ই। সবার আগে তাই কাঠগড়ায় খাড়া করা উচিত ছিল নিজেকে। খোলসা হওয়া যেত। সাফও। হাত না ধুয়ে আচমন করে পুজোয় বসার মত। চিঠিগুলো তাহলে হত অঞ্জলি। তা তো নয়, বেশির ভাগ হয়ে যাচ্ছে বিষ মাখানো তীর। এখন বেপরোয়া ছুড়ে চলেছি, কিন্তু নিজের বুকে এক দিন ফিরে এসে বিঁধবেই, যদি নিজের নিকটেই নিজে সাচ্চা না থাকি।

সেইজন্যে মাঝখানে বেশ ক'টা বছর ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। যাক। ফাঁকিটা তো ঠেকানো হচ্ছে। ঠকানোর রাস্তায় কাঁটা দেওয়ার আর উপায়ই বা কী! সবার কাছে স্বীকৃতি, তবে না স্বীকারোক্তি? মুক্তি।

মাসির চিঠিতে ভার কিছু নেমেছে। সেই শোক, সেই খেলাপ-করা কথা। বাল্যকাল আর কৈশোরের ব্যাপার, শোক কবে ধুয়ে মুয়ে গেছে, তবু সারা জীবন তাড়া করে এসেছে শোচনা, অশান্তি।

সব ধুতে হবে। আকাশ যা করে আষাঢ়ে আর শ্রাবণে। ধুলো ময়লা ধুয়ে হয় নীলকমল--উদার, বিদারিত। অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রোদ্দুরে ঝকঝকে হয় প্রত্যহ। মনটাকে তেমন করতে পারলে মরণেও নির্ভার, নির্ভয় শান্তি।

যারা আছে, এসেছিল, কাছে ছিল, তারা থাক। অপেক্ষা করুক। কেয়ামত নাকি ডুমস ডে? তখনকার আত্মার মত। একদিন তাদের যা বলার তা সব গলগল বলে দেব। দেবই দেব। বিনিময়ে তাদের মুখ থেকেও বিষ ঠিকরে পড়ে তো পড়ুক। ঠোঁটে জিভে চেটে চেটে না-হয় নীলকণ্ঠই হব।

কেউ নিজেকে দেখতে পায় না কি না! তাই প্রত্যেকের চোখের সমুখে থাকা চাই একটা করে আয়না। নিজের চেহারা দেখতে পেলে অন্যের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে একটা আসল, আস্ত প্রতিচ্ছায়া তৈরি করা যায়। খালি অপরকে পরখ করলে, ভুষোভুষো ছবি, তাও একপেশে—যা দাঁড়ায়।

হঠাৎ একটা আয়না ধরলাম নিজেরই সমুখে? তাই ধারাবাহিকতা চুলোয় যাক, হঠাৎ, লিলি, এই চিঠি তোকে। সত্যি বলব? তোকেও নয়--আমাকে।

খোঁড়াখুড়ি, কৃত অন্যায়ের খোয়াড়ি।

এই যে লিখছি, সেই থেকে ভনভন করছে একটা মাছি, ওটা মাছি তো নয়, আসলে

একটা প্রাকৃত প্রাণ। কানের কাছে কেবলই বলে কোনটা ঝুটো, সাচ্চাই বা কী?

মিথ্যে কিছু লিখো না, লিখো না, অবিরত এই জানান দিয়ে জ্বালায়।

নিশুতি রাতে লিখতে যখন বসব, তখন এই মাছিটাই মশা হয়ে যাবে। দংশাবে।

দিনের মাছি, রাতের মশা। আবার গরম কালের মাছিরাও শীতকালের মশা। শীতে মশা বড় বাড়ে। সেসব নোংরা বিছানা পিঠে কুটকুট করে। ছারপোকাও কুটুস কুটুস কামড়ায়। পুরনো পাপেরই স্মারকের নাম ছারপোকা।

পোকামাকড়ের কথা যখন উঠলই, তখন খাপছাড়া একটা স্মৃতির কথা এখানেই বলি। চন্দ্রাকে বলতাম। চন্দ্রা আর নেই, সব নিয়ে গেছে, কিন্তু তখনকার যত বলাবলি সব রেখে গেছে। আমারই মগজে।

পোকাপতঙ্গ মানে কখনও কখনও মৌমাছি। মৌমাছিও। অন্তত চন্দ্রাকে আমি ওই নামে একদিন ডেকেছিলাম।

হাওড়ার ওপারের সেই খ্যাতনামা বাগানটার একটা গাছের ছায়ায়। চোখ বাড়ালেই নদী। জোয়ারে একটা দুটো ভোঁ জাহাজ যাচ্ছে, উড়িয়ে আসছে। তাদের ভাঙা গলাও সুরেলা, সেই পরিবেশ। পরিবেশ, না সেই বয়স, সেই ঝিরঝিরে আবেশ, যখন শুকনো ঝরা পাতাতেও সুড়সুড়ি?

একটা মৌমাছি ঘুরে ঘুরে বিরক্ত করছিল খালি। হাতের নাড়া-তাড়া দিই, পালায়, আবার পালায়ও না। ফিরে ফিরে আসে।

—ওরা হল মেয়েদের মতন।

হেসে চন্দ্রাকে বলি।

—কারা?

—মৌমাছিরা। মধু, হুল আর গুনগুন, তিনে মিলিয়ে।

—আর পুরুষেরা? তারা বুঝি স্রেফ ভোমরা? শুধু ভনভন আর হুল। ওদের মধুটধু আছে কি না জানিনে। কিংবা পুরুষ জাতটাই বুঝি প্রজাপতি? শুধু ফুলে ফুলে—

খালি একটা বিয়ারের ক্যান গড়াগড়ি খাচ্ছিল। পায়ের বুড়ো আঙুলে সেটা ঠেলে দিয়ে চন্দ্রাবলি ভুরু নাচিয়ে বলল। আঁকা ভুরুও নাচ জানে।

গায়ের আঁচলটাও জড়িয়ে একটু জড়োসড়ো হয়ে চন্দ্রা বসল। কারণ, শেষবেলার অনুতপ্ত রোদ্দুর তখন ছায়াছমছমে মুখে পায়ের তলায় গুটিয়ে।

হালকা গলায় সময়টাকে হালকা করতে বললাম, প্রজাপতি বললে যে! ফড়িংও তো বলতে পারতে।

চন্দ্রা বলল, বড় ফড়ফড় করে। আর, যা চেহারা! কাব্যিকাব্যি আলাপে মানায় না। তার চোখ—দৈত্যাকার চুরুট একটা ধোঁয়াছড়ানো জাহাজের চিমনির দিকে।

সেই থেকে ভাবছি। কাব্যিকাব্যি? তা হলে তার উলটোটা কী? কড়া বাস্তব নাকি?

সেই থেকে ভেবেছি। কোনটা বাস্তব, আর কাকে বলে কাব্যিকাব্যি। এই যে আমরা ঘন হয়ে বসে আছি, হঠাৎ উড়ে এসে হুল ফোটায় সেই মৌমাছি, তখন যে জ্বালা,

সেটা বাস্তব আলবত।

আবার, ধরা যাক, হঠাৎ চন্দ্রা উঠে গেল। সটান বসল বাসে, ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিতে। তখন যে হুল ফুটবে অবুঝ বুকের ভিতরে, তার বেদনা বুঝি কেবলই কাব্যিকাব্যি? বাস্তব না?

আসলে মানুষ এত অগ্রসর সভ্য হয়েছে, এত বিজ্ঞানী—তবু আজও কোনটা বাস্তব, কোনটা মায়াবী কল্পনা, সেই সীমারেখা আঁকতে শেখেনি। একই প্রাণের রকমফের ফড়িং আর প্রজাপতি, রঙের বাহারে কানা হয়ে এই মৌল সত্যটাই চিনতে পারেনি।

কিন্তু এসব কথা এখন থাক, প্রেম-ট্রেম দৃশ্য কিংবা সূক্ষ্ম ভাবনার জাল বুনানি, যখন, লিলি, নিজেকে উজাড় করে তোকে সব কথা লিখতে বসেছি।

আমাদের সেই বাসাবাড়িটা মনে পড়ে, শহরতলির? ঘিঞ্জি, এর ওর গায়ে পড়া আস্তর-খসা, পাঁজর বের করা বাড়ির পর বাড়ি? টিন বা খাপরাও ছিল, তারা ঝড়েবৃষ্টিতে আরও বেআবরু হত, ছাদ বলতে তো একদম কিছু না। পাকা নড়বড়ে বাড়িগুলোতেও হয় মই, নয়তো কাঠের সিঁড়ি।

সারা পাড়ায় সবুজ শুধু, ঢ্যাঙা একটা নারকেল গাছ। যেন চারপাশে যত নিচু, যত ঠাসাঠাসি, তার বিরুদ্ধে গাছটা একাই একটা প্রতিবাদ। খালি তার পাতার আড়ালেই গোটাকয় পাখি। কার্নিশে, ঘুলঘুলিতেও দু'একটা জিরোত, বর্ষার ধারা নামলে একটু সেঁধিয়ে গিয়ে নিজেদের রোঁয়া বাঁচাত, আবার ওরই মধ্যে এর ওকে ঠোকরানি। গলি বিষ্ঠায় নোংরাও হত। বলতো কি, ওই নারকেল গাছটারও শুধু মাথাই উঁচু ছিল। নইলে তার তলাটা হয়েছিল ছাইয়ের গাদায় আস্তাকুঁড়। খাটা পায়খানা সাফ করে সরু রাস্তা দিয়ে সকালের দিকে গদাই লসকর চালে চলত অন্নপ্রাশনের বমি তোলা লজঝড়ে গাড়ি। তার আশেপাশে কিছু মানকচুও। হাজা-মজা ছোট্ট পানাপুকুরটায় ফনফনে ফণাতোলা কচুরিপানা, কলমি আর গুগলি।

আর অবিরাম কোলাব্যাঙের ডাক। কিন্তু জোনাকিও যে জ্বলত, ঝিঁঝি পোকাও ডাকত যে। ফারলংখানেক দূর দিয়ে মাঝে মাঝে লোকাল গাড়ির শিটি। বিশেষ করে কানে আসত মাঝরাত্তিরে। দিনে এত শব্দ বলেই যেন কোনও শব্দ নেই, সব শব্দই একমাত্র রাত্রিই মেলে ধরতে পারে, প্রতিটিকে আলাদা করে শুনে শুনে শুনে।

রাতই মনে করিয়ে দেয়, গাছের ডালে ভয়-পাওয়া পাখি ডানা ঝাপটায়। খালি কোলাব্যাঙ নয়, ঝিঁঝির সুর আছে, আর ঝিকিমিকি জোনাকি। সবচেয়ে বড় কথা ওই দমবন্ধ বা হল্লাবাজ পাড়াটাই সব কিংবা শেষ নয় পৃথিবীর। দূর বলেও কিছু আছে। এর পাশ কাটিয়ে সোজা লাইন পাতা, এই মুলুক ছাড়িয়ে কোনখানে কে জানে, থেকে থেকেই পাড়ি দেয় গাড়ির পর গাড়ি।

সেই সব দিন, লিলি, সেই সব দিন!

স্কুল থেকে ফিরেছি। মুখচোখ কালি, ধকল কি সোজা, সারাটা দিনের মাস্টারির?

বারান্দার সিঁড়িতে তুই পা ছড়িয়ে বসে আছিস।

—কী রে হাঁড়িমুখ কেন?

—কেন, তা কী করে বলব? আমার মুখ তো হাঁড়িই। টোকা দিও না, দিলে মুখটা কিছু কলসি হবে না।

—বাপ রে বাপ। কথার যেন তুবড়ি। দেখিস, যেন ফেটে পড়িস না।

—ফাটব না।

প্রায় নিত্যি এরকম খুনসুটি। দু'বছরের ফারাক দাদা আর ছোট বোনটির।

—উহুঁ, দু'বছর তিন মাস চার দিন।

ঘরদোর যিনি সামলান বলেন সেই বিধবা বড় মামি।—আমি জানি না? মাধুরী ঠাকুরঝির আঁতুড় তো আমিই সামলেছি। আমার হিসেব একেবারে রাশিনক্ষত্র ধরে ঠিকঠিক।

কিন্তু ওদের ঝগড়া. তো আর মাস দিন তিথি নিয়ে না। ঝগড়ার জন্যেই ঝগড়া। যেন নিষ্কাম পূজার্চনা। কিছু চাই না, তবু হয় মন্ত্রজপ, নয় কথা কাটাকটি। নইলে বেঁচে থাকাটাই আলুনি।

—এই একঠোঙা ডালমুট আনলাম, অথচ চাও দিলি না?

—থাকলে তো দেব। তুলসীপাতা সেদ্ধ চাও তো করে দিতে পারি।

—দরকার নেই। মোড়ের দোকানটায় ভাঁড়ে ভাঁড়ে চা গড়াগড়ি যাচ্ছে। খেয়ে আসতে পারি। চাস তো, তোর জন্যেও আনতে পারি এক খুরি।

—মেটে খুরির চা আমি খাই না।

—টি সেট চাই বুঝি? চিনেমাটির কাপ হলেই চায়েরও স্বাদ বদলে যায় নাকি?

ঠিক তক্ষুনি এই জবাব দিতিস না লিলি। নিমগাছটার আগা, কিংবা তাও ছাড়িয়ে আরও উপরের নীলে। গাছটায় ফুল ধরেছে। ফুল কি ধরে, আকাশেও? এর উত্তর কে-ই বা না জানে। ধরে, ফোটে, ঝরে—অগুনতি। একালের বিজ্ঞানও কি সারা করে উঠতে পেরেছে তারাদের মহাপরিবারের কোনও আদমসুমারি?

খানিক চুপচাপ থেকে শেষে আস্তে আস্তে বলত, বদলে যায় বইকি। কী আছে, তার মজা কীসে আছে, সেইটেই দ্যাখে। গন্ধ নেয়, তারিয়ে তারিয়ে চাখে। নইলে দাদাভাই, কম জনকে ডেকে ডেকে আমাকে তো দেখাওনি, কেউ পছন্দ করেছে, মনে ধরেছে কারুর? বাইরেটায় আমারা সাদামাঠা, সবাই তাই দেখল, ভেতরে কী আছে, কিছু আছে কি নেই, একজনও কি সেসবের দিকে তাকিয়েছে? কেউ না, দাদাভাই কেউ না। খুরির চায়ের স্বাদ কেমন, ভাল না মন্দ, পরখ করার কেউ নেই। সবাই কি চিনেমাটির পালিশ-করা পেয়ালাটাই খায় দাদাভাই?

উত্তর আমার মুখে জোগায়নি। কোনও রকমে, যে জামাকাপড়ে অফিস থেকে ফিরেছি তাই পরেই চায়ের দোকানের দিকে অনিশ্চিত ধরনে পা বাড়িয়েছি, তখন লিলি, তুই পিছন থেকে বলে উঠলি, একটু দাঁড়াও। ফিরে দেখি।

—দ্যাখো তো তোমার গলা দিয়ে ঠিক গলে যায় কিনা। আন্দাজে করা তো, তাই গায়ের মাপটাপ—

তাকিয়ে দেখি, তোর হাতে একটা উলের জাম্পার। কবে কতদিন ধরে বুনছিস, কিচ্ছু টের পাইনি তো!

জিজ্ঞাসাবাদ বাহুল্য। জামাটা গায়ে চড়ালাম। পিছন থেকে তুই আবার বললি, তাড়াতাড়ি ফিরো। আজ দুপুর থেকেই খুব কনকনে হাওয়া। তোমার আবার যা সর্দিকাশির ধাত।

তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি না লিলি, আমার যেমন যেমন স্মরণ হচ্ছে, তেমনই লিখে যাচ্ছি। সেই যে একবার বললি, আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে। আচ্ছা দাদা, এটা তো প্রেমের কবিতা। কিন্তু এর বেশ খানিকটা আর ভেতরের কথাটা ভাইবোন মিলে গলায় গলা মিলিয়েও তো পড়তে পারে, তাই না? পড়লে খুব কি দোষ হয় দাদা?

—দোষ হয় না, আমি বলেছি যদি ভাইবোন মিলেই নৌকাটা হয়। কিন্তু লিলি তোকে তো আলাদা হতে হবেই। পাত্রস্থ করা সে তো আমার কর্তব্য। বিশেষ করে যখন মা নেই বাবা নেই!

বয়ে গেছে আমার পাত্রস্থ হতে। এই বেশ আছি। পাড়ায় সেলাই শেখাই। পিসিমা বুড়ো হচ্ছেন, রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজে তার সঙ্গে হাতে হাত লাগাই—এই তো দিব্যি। আমাকে পর করে দিয়ো না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি।

কিন্তু লিলি, তার মাস দুয়েক পরেই যে তোর তোশকের নিচে সেই চিঠিটা আবিষ্কার করি! ফিকে নীল কাগজ তাতে পুরুষালি হাতের লেখা 'তোমাকে দুঃখ দেবো না কথা দিচ্ছি, সুখ দিতে যদি নাও পারি। একবারটি বলো তুমি আমাকে মেনে নিয়েছ, তাহলে আমি সামান্য একজন স্কুল-টিচার জীবনে অন্তত একবার রাজ্যজয়ের আনন্দ কাকে বলে জেনে যাই। ইস্কুলে ইতিহাস পড়াই, সে তো খালি মড়া হরফের সারি। ওই অক্ষরগুলো আমার জীবনে একবারও যদি ঝলসে ওঠে তাহলে আমিও হয়ে যাই আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের মতো দিগ্বিজয়ী। লিলি তোমার কাছে শুধু ওই জয়ের স্বাদটুকু ভিক্ষে চাইছি।'

হাত কাঁপছে, সেই হাতে ওই কাগজটা। তুই দেখতে পেলি। আমার জন্যে জলের গ্লাস আনছিলি, সেই জল চলকে উঠল। তোর মুখ ঠিক ঐ কাগজটার মতো। সাদা। মাঝে মাঝে কালি।

কড়া গলায় বললাম, এসব কী?

—একটা কাগজ তো শুধু।

—শুধুই কাগজ? আমার গলাটা যেন উলের কাঁটার মতো সরু হয়ে গেল। খোঁচায় বিদ্রূপে। বললাম, শুধু কাগজই যদি হবে তবে তার রং ফিকে নীল কেন?

—তা আমি কি জানি।

—আমি জানি। এই হাতের লেখা আমি চিনি। আমাদের স্কুলের নতুন টিচার নিরুপমের। দু'চারবার বাড়িতে ডেকে এনেছি, তারই ফাঁকে ফাঁকে এতদূর! কতদূর বোনটি? চোরকাঁটা ছাওয়া মাঠে, গাছের গুঁড়ির আড়ালে নাকি মাইল দেড়েক দূরের তিরতিরে নদীটার পাড়ে?

—দূরে যাইনি দাদা, বিশ্বাস করো, কোত্থাও না। ওটাকে বাজে নাটুকেপনার বেশি দাম দিইনি।

—দাম দিসনি, তাহলে যত্ন করে বালিশের তলায়, না না বালিশও নয়, একেবারে তোশকের নিচে এমন পরিপাটি যত্ন করে কেন?

লিলি, আমার স্বর তখন পাখির গলা কাটা ছুরি। ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকেছিস। তারপর কতদিন—কতদিন বলত আমরা এ ওর সঙ্গে কথা বলিনি। দুটি মানুষের কথা কোনও কোনও স্প্রিং-লাগানো বাক্সের ডালার মত আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়—কী অবাক ব্যাপার।

নিরুপমকে অবশ্যি তারপরই একদিন আড়ালে ডেকে আমাদের বাসায় আসতে মানা করে দিয়েছি। মাথা নিচু করে সে তখনকার মত সরে গেল ঠিক, তবে একেবারে যখন সরে গেল তখন মাথা উঁচু করে।

নিরুপম পরে কী হবে না হবে ঠিকঠাক না করেই চাকরিতে ইস্তফা দিল। তারপর একদিন ভোরে কাকটাও জেগে উঠতে না উঠতে রেলস্টেশনে—

বাকিটা তুই তো সব জানিস লিলি। ফের সেই রকম, যে রকম চলছিল। সকালে চা সময়মত। আমার স্কুলে যাওয়া, সময়মত। তোর সেলাইফোঁড়াই—রুটিন সব রুটিন। লিলি, আমাদের জীবন না জেনেই কখন যে আমরা একটা বাঁধা রুটিনে আটকে ফেলি!

সুতরাং আবার যে-কে সেই। ভাই আর বোন। একটি বোঁটার দুটি ফুল। আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা—কবিতাটা দারুণ নারে! আলাদা মানেতেও বেশ মানিয়ে যায়, জুতোয় বড়জোর একটু কাঁকর, তাতে কি, শুকতলাটা তো মোলায়েমই আছে।

মাঝে-মাঝে নিজের ঠোঁট নিজেই চেটে আত্মপ্রসাদের স্বাদও পেয়েছি। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু উঁচু ঘর। নিরুপম তোর জুগ্যি হত না লিলি। আমার ঘরের ইজ্জত, আমার বোনের মান তো বাঁচিয়েছি। দাদা না আমি?

এরই মধ্যে কবে এল চন্দ্রাবলি? আমি খুব সৎ কিনা, তাই তোকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিইনি।

ভাগ্যিস পিসিমার শক্ত একটা অসুখ বাধল তাই তো চন্দ্রাবলি। পিসিমাকে ক'দিনের জন্যে হাসপাতালে পাঠাতে হল, সেখানে লেডি ডাক্তার কে? চন্দ্রাবলি। পিসিমা ফিরে এলেন, সেও আসতে থাকল। মাঝে-মাঝে চেক-আপ খুব জরুরি কিনা, সেইজন্য।

তারপরে কবে থেকে সে আর বাড়িতে আসত না। আমাদের দেখাশোনা এখানে ওখানে। পার্কে ময়দানে নৌকোয় সিনেমায়—প্রায় সবই ছকে বাঁধা সেই রুটিন কায়দায়। এত কিছু বদলায় এই দুনিয়ায় কিন্তু দুটি ছেলেমেয়ের কাছাকাছি আসার খানিকটা সময়

কাটাবার কায়দায় বিশেষ হেরফের হল না।

কোনও কোনওদিন পর্দা-টানা চপ কাটলেটের দোকানের খুপরি! চপ কাটলেট ডেভিল পরোটা।

—আজ আমি আর রাত্তিরে কিছু খাব নারে। পেট কামড়াচ্ছে বেজায়। বড়জোর বাড়ি ফিরে বলতাম।

তাজা ভাল হয়ে যাওয়া ফুরফুরে মনটাকে খারাপ শরীরের ঘাড়ে চাপাতাম। তুই তাড়াতাড়ি হয়তো লেবুর রস মেশানো একগ্লাস জল এনে দিলি!

বোকা মেয়ে লিলি, তুই তো লেডি ডাক্তার নোস, চেক-আপ করতে শিখিসনি।

তারপর? আরও পর আছে। দিনে দিনে চাপ বাড়তে থাকল চন্দ্রার। হর্টিকালচার গার্ডেনেই হোক আর তপোবনেই হোক সুযোগ পেলেই বলতে থাকল, এভাবে আর কতদিন?

—কীভাবে?

—এই বিয়ে না করে?

—করলেই হয় কিন্তু একটা প্রবেলম শুধু। সেটা সামাজিক। ছোট আইবুড়ো বোন থাকতে আমি হুট করে কী করে আগে বিয়ে করি? সেটা ভাল দেখায় না।

—এইটেই বুঝি খুব ভাল দেখায়? বিনে খরচায় এই ফুর্তিটুর্তি? চন্দ্রাবলির মুখে চন্দ্রালোকের চেয়ে তখন কালো কলঙ্কগুলো ফুটে উঠত বেশি। গলা তেতো।

মরিয়া বলে বলতাম, তাছাড়া বুড়ি পিসিমা—বলতে গেলে তিনিই তো গার্জেন আমাদের!

—কচি খোকা, যাও পিসিমার আঁচলের নিচে লুকোও আর বোনের আঁচলের হাওয়া খাও।

অনায়াসে গড়গড় করে চন্দ্রা বলত। একটুও আটকাত না। কারণ সে শিক্ষিত, লেডি ডাক্তার। তাছাড়া গান তো জানেই। তার যে খুব উন্নত সাংস্কৃতিক রুচি।

ওর মুখের মিষ্টি মশলার গন্ধ যদিও বা না পাস মাঝে-মাঝে নিশ্চয়ই সেন্টের সুবাস পেতিস? তবু লিলি একদিনও আমাকে কিচ্ছু বলিসনি।

কোনও আপত্তি বা প্রতিবাদ না। অবাক হবার ভানটুকুও না। অবাক হবার ভান বরং করলাম আমি, যেদিন লিলি তুই একটা আধবুড়ো লোককে হাতছানি দিয়ে ডেকে একশিশি হজমি গুলি কিনে ফেললি। ট্রেনে করে আমরা সেই শহরতলি থেকে শহরে কোথায় যাছিলাম যেন। লোকটা ফিরিওয়ালা কিংবা ক্যানভাসার।

গাড়িতে এমন কতই তো থাকে। কানে সুরে বেসুরে তালা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু গাড়ি ছেড়ে বাড়ি অবধি তারা ধাওয়া করে কদাচিৎ।

একদিন লোকটাকে আমাদের বাড়ির দোরগোড়াতেও দেখলাম। হেসে হেসে কথা বলছিস। আমাকে দেখেও যেন দেখিসনি এমনই ভাব। বুদ্ধি সাফ থাকলে বুঝতে পারতাম ওইটেই তোর প্রতিবাদ।

কী কিনছিলি, কিছু কিনছিলি কিনা তা নিয়ে আমার একটুও কৌতূহল ছিল না।

গোটা লোকটাকেই কিনছিস, তখন কি জানি?

চন্দ্রাকে বললাম। সে ক্যাটবেরি চুষতে চুষতে নির্বিকার জবাব দিল, ভিড়িয়ে দাও, ভিড়িয়ে দাও।

—ওই লোকটার সঙ্গে? একটা হা-ঘরে ফিরিওয়ালা।

—তাতে আমার তোমার কী? আমাদের রাস্তা তো সাফ! বোনটাও পার হয়ে যাবে, হবে না?

সেদিনই প্রথম গায়ে পড়ে আমার গালে আলতো ঠোঁট রাখে চন্দ্রা। আশেপাশে এত চোখ, সে কেয়ারও করে না।

তারপর? চন্দ্রা যা বলল, তাই হল। কিংবা হুবহু তেমনই করলাম, চন্দ্রা শিখিয়ে দিয়েছিল যেমনটি।

সক্কালবেলা। আমি রকে বসে কুলকুচি করছি, তুই ঝাঁপঢাকা কলতলা থেকে বেরিয়ে এলি।

ঘড়ঘড়ে গলায় বললাম, লিলি, একবার এদিকে আয়। তোর চোখের পাতায় তখনও জল।

—কী বলবে?

—কী বলব? মানে, ইয়ে আমি ছেলেটিকে দেখেছি লিলি। গোড়ায় একটু মানে আপত্তি ছিল, ঠিক। আমাদের ঠিক স্বঘর নয় কি না! পরে ভেবে দেখলাম, মন্দ কী! এইরকম ছেলেই তো আমাদের চাই। ফাইটার—সংগ্রামী। তুই আর বেশি টালবাহানা করিস না। ওই ছেলেটির সঙ্গেই।

—ছেলেটি না। লোকটি বলো। তা কী করতে হবে? ঝুলে পড়তে? তাই পড়ব।

বলে ঘাড় ফিরিয়ে বললি, ভেবো না, তোমার রাস্তা সাফ হবে। চন্দ্রাবলি টাইম ক'দিন দিয়েছে?

কুলকুচির জল ফুরর্ করে ছাড়তে গিয়ে আমি বিষম খেলাম।

গলায় কাঁটা তো কাঁটা। মাঝে-মাঝে কী করে যে জলও আটকায়!

তারপর সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যাটা। আধো অন্ধকারেও তোর সিঁথিতে সিঁদুর দেখে চমকে উঠি।

আজ বলি, তোর এত তাড়াতাড়ি নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কিচ্ছু দরকার ছিল না। চন্দ্রা আমাদের শহরতলির ওই ঘুপচি বাড়িতে ঘর করতে এলোই না।

তোরা হয়তো কালীঘাটে কিংবা নমোনমো পুরুত ডেকে বিয়েটা সেরেছিস, আমি আর চন্দ্রা দস্তুর মত রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে—সই সাবুদ সাক্ষী, তারপর রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া, গাদা গাদা ফুলের মালা আরও কত কী?

চন্দ্রা আলাদা ফ্ল্যাট ঠিক করেছিল আমাদের জন্যে। ভাঙা ইটের দাঁত বের করে যার দেওয়াল বিচ্ছিরি হাসে, চন্দ্রার কি পছন্দ হতে পারে সেই বাড়ি, শহরতলির?

তাছাড়া কোনওদিন ধর তুই আমাদের সঙ্গে আছিস, তখন যদি শহরতলির ট্রেনে ওই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তখন কী করব আমরা, তুই বা কী করবি? যেন ও কেউ না এমনভাবে স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকবি?

বৃথা, বৃথা, বৃথা। ওসবের দরকারই হয়নি। শহরতলির বাড়িতে চন্দ্রা ছিল মোটে একটি বেলা। রাত্তিরেই আমরা শহরের ফ্ল্যাটে চলে আসি। তাই বলছি তুই বৃথাই যেচে, লিলি, সাততাড়াতাড়ি নিজেকে বলি দিলি।

বলি? কী জানি? আমি তো আজও ঠিক করে উঠতে পারিনি যে এই দুনিয়ায় কারা জ্যান্ত, আর কারা হাড়িকাঠের বলি।

তবু নাগরিক সামাজিক পারিবারিক সৌজন্য তো হারানো যায় না! তাই সপ্তাহ যেতে না যেতে তোদের দু'জনকে একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে নেমন্তন্ন করি!

ভরপেট খেয়ে সেই হতশ্রী ক্যানভাসার থুড়ি, ওসব ভাষা প্রয়োগ খুব শিষ্ট শোনাচ্ছে না, কারণ সে এখন আমার ভগ্নীপতি। যাই হোক যা বলছিলাম, ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুলে খুশি খুশি লোকটা সন্ধের আগেই বিদায় নিল।

এই সময়টা অনেক লোকাল ট্রেন কিনা। চাহিদা, বিক্রিও বেশি। তুই রাত্তিরটার মত থেকে গেলি।

শুতে এসে চন্দ্রা ফিসফিস করে বলল, জানো লোকটা দোজবর। ওর আগের পক্ষের ছেলেপুলেও আছে। তোমার বোন তো বলল তিন তিনটি।

একটা উত্তরের জন্য খানিক থেমে চন্দ্রা আবার বলল, যাক ওর কপাল ভাল। থাকে তো ভাঙা বাড়িতে। আজ তোমার বাড়িতে থেকে গেল। এই ফ্ল্যাটবাড়িতে রাত্রিবাস, ও কি স্বপ্নেও ভেবেছিল?

আমি তখনও চুপ। চুপ করিয়ে রেখেছে তখনও একেবারে না-মরা বোধ--তাকে বিবেক, মনুষ্যত্ব, স্মৃতি, যে নামেই ডাকি। ভাঙা বাড়িতে তো থাকতাম আমিও।

তোফা সুখে থাকার লোভেই না তোর সুখের সব আশা বিকিয়ে দিয়ে এলাম! ভাইয়ের স্নেহ সুমহৎ সন্দেহ নেই। সুবিধামাফিক সেই দামি স্নেহ, বিবেক বিবেচনায় বোবা হয়!

কখন মোরগ ডাকল, রাত্তিরের এই মস্ত গুণ, সব রাত্তিরই একটা না একটা সময়ে সকাল হয় লিলি।

জানলায় দাঁড়িয়ে দেখি সেই দৃশ্যটা শহরের রাস্তঘাটে যা আকছার। একেবারে পরস্পরের সঙ্গে লেপটে আটকে যাওয়া কুকুর আর কুকুরী। একটু কুয়াশা, বেশ ঝাপসা। সেই আলোয় ওই যৌথ জন্তু যেন জানলার শিক গলিয়ে আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে আমাদেরই মধ্যে মিশে যেতে থাকল, অথবা আমরাই ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ক্রমাগত বিলীন হতে থাকলাম ওদের মধ্যে, আজ ঠিক মনে পড়ছে না।

তাছাড়া স্মৃতির জাল ছিঁড়ে যাবার কারণও ছিল। বন্ধুর ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জোগাড়

করেছিল চন্দ্রা, তাই আসবাবপত্তর তো বটেও, টেলিফোনও ছিল।

চন্দ্রা যখন আমার পাশে টেলিফোনটা তখনই ঝনঝন করে বাজল। একদিকের কথা শোনা যাচ্ছে না বটে কিন্তু চন্দ্রার কথা তো স্পষ্ট শুনতে যাচ্ছি। একতরফের কথা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লাইনের ওদিকে কলকল করছে বাচ্চারা—একটি বা দুটি। আর চন্দ্রা যত সাঁটেই বলুক, আমার বুঝতে বেশি সময় লাগেনি যে ওদিককার গলা যাদের তাদের মা আমারই চন্দ্রাবলি।

তুই যদি বিয়ে করেই বাচ্চা পেয়ে থাকিস, তবে তুই সৎমা। মা চন্দ্রাও—সৎ না অসৎ, জানি না।

সেই মুহূর্তে হাসি আর কান্না মিলে আমাকে কী যে পেল! ইচ্ছে করলে অট্ট হেসে ছাদ ফাটিয়ে দিতে পারতাম, আর না হলে বড় জোর পকেটের রুমালটা ভিজত।

তবে তোরা দু'জনেই যা। এইটে সত্যি। নির্ঝঞ্ঝাট হব বলে আমরা আলাদা হলাম, তুই যেমন তেমন একটা বিয়ে করলি দেখেও আপত্তি করা দূরে থাক, বরং ভেবেছি আমরা নির্ঝঞ্ঝাট, বেঁচে গেলাম! অথচ—অথচ বিধির বিধানে কেমন অদ্ভুত একটা বিচারের দাঁড়িপাল্লা থাকে, একটা সমতলের বিচিত্র সাম্য!

বলি হয়ে, মাথা পেতে শাস্তি নিয়ে, জানিস না তুই আসলে আমাকেই শাস্তি দিয়েছিলি!

এই চিঠিতে সেই জন্যেই তোকে দাঁড় করিয়েছি কাঠগড়ায়। অভিমানটা আমার অভিযোগ। তবে তোর পাশাপাশি সেই এক কাঠগড়াতে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রা!

পুনশ্চ ঃ এখনও ঠিক জানি না, চন্দ্রা, মানে যাকে বিয়ে করেছিলাম, সে বিধবা ছিল, অথবা ডিভোর্সি, না যথেচ্ছবিহারিণী কুমারী।

মধুচন্দ্রিমার পর মাস কয়েকও কাটল না, ওর হাতে এয়ারলাইনস-এর টিকিট আর পাসপোর্ট দেখি।

—হায়ার মেডিকেল কোর্স, কানাডায়। দারুণ চান্স, না?

চন্দ্রা মুখে ক্রিমের প্রলেপ দিতে দিতে ঘাড় ফিরিয়ে ফুল্লকুসুমির মুখে জানায়।

—দারুণ! আমি বলি।

তার সপ্তাহ দুয়েক পরেই বিদায়। এয়ারপোর্টে ওর বাচ্চা দুটোও এসেছিল। টেক-অনের সময় তারা অবজারভেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে ফিনফিনে রুমাল নাড়ল। যেমন কেতা।

পরে কোন আন্টির সঙ্গে ওরা দার্জিলিং না কার্শিয়াং গেল। চন্দ্রা ওদের ওখানেই রেখেছিল।

মানুষ করবে বলে? অথবা নিজের আরও মেয়েমানুষ হওয়ার মওকা মিলবে বলে? জীবনের অনেক জিজ্ঞাসার মত এরও উত্তর আমার জানা নেই।

সম্ভবও ছিল না। কারণ চন্দ্রার কাছ থেকে চিঠিপত্তর আসত না। মুখোমুখি আর কোনওদিন তো হই-ইনি। চন্দ্রা আমায় ডিভোর্স দেয়নি। না ছাড়া, না বাঁধা এক

সংজ্ঞাছুট পরিণয়-দশায় সেই থেকে পড়ে আছি।

আর তুই লিলি? রেলগাড়ির তলায় মাথা দিলি, সেই গাড়িটাতেই তখন তোর হাড়জিরজিরে বর তার গুলি ফিরি করে ফিরছিল না তো? 'গুলি নেবেন বাবু, টাটকা গুলি? হজমি। স্বাস্থ্য আর জীবনীশক্তি বাড়ায়—জীবন। খুব সস্তা, নিন, নিন।'

খুব সস্তা জীবন? না, না। মৃত্যুর দাম তার চেয়ে কম। সবচেয়ে কম খরচায় বোধহয় চলে জীবনমৃত্যু বিকিকিনি।

তাছাড়া খুব চড়ামাত্রার নাটুকে ঘটনা জীবনে বড় ঘটে না। দরকার হয় না। যাপন ব্যাপারটাই-ই তো ঢের। যথেষ্ট নাটক দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। অপসৃত স্বয়ং জীবনই।

[ক্রমশ]

বিশেষ সংখ্যা' ১৩৯১
করকমলেষু
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬. অচিন রাগিণী

তোমার হাতে যদি পড়ে, তুমি নিশ্চয় বলবে প্রভাস, এসব বিলাস ; এই চিঠি লেখালেখি আসলে স্বগত সংলাপেরই বেসমদার চালাকি। নিজেকে বলার সাহস নেই, ডাকে পাঠানোরও না, তাই ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেলা।

তোমাকে, তোমাদের অনেককেই লিখব, লিখব, লিখব। পালা এলে। যারা সুখ দিয়েছ, তাদের। দুঃখ দিয়েছ যারা, তাদেরও। যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তাঁরই পরিচয়—সবারে আমি নমি। এই পর্যন্ত আমিও হয়তো লিখতে পারতাম। কিন্তু যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ, কিংবা কিছুই দাওনি? তারাও যে দিয়ে গিয়েছ, এই কথাটা লেখা ছিল আমার সাধ্যাতীত। আসল কথাটা একটা চরিতার্থটার বৃত্ত সুগোল হওয়া। শুধু সুখ নয়, দুঃখও তাকে পরিপূর্ণতা দেয়। দ্বিতীয়টাও চাই।

সুখ হল বাইরের পাতলা ত্বক, আর দুঃখ হল মজ্জা-মাস-হাড়। দুইয়ে মিললে তবে আমরা। উভয়েই আমাদের গড়ে। একটা রং বুলিয়ে, আর একটা পিঠে পিঠে। ওই গানটা সাধে কি সার, আমার মন্ত্র?

একটু বিরাম, প্লিজ। বড় ক্লান্ত, খুব দরকার। চিঠির আগে একটু অবকাশ।

সেই যে সহপাঠিনী, যার পড়ে যাওয়া রুমাল। তুলে দিই। থ্যাঙ্ক ইউ।

কথা শোনা হল, বলা হল না। রুমালটা নিয়েই সে ঝরবার মত করিডর দিয়ে ছুটে, কোন ভিড়ে মিশে গেল, তার দিশে আর পাইনি। দশটি মেয়ের ভিড়ে তাকে চিনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। একটা উড়তে থাকা রুমাল হাজারটা হয়ে চোখে দোলে, একটু সুগন্ধির রেশ অনেক অনেক দিন ধরে ভাসে, হাওয়ায় হাসে, সুদ্ধ এইটুকু দিয়ে

কাউকে কখনো শনাক্ত করা যায়?

অথবা দলছুট দেহাতি যে মেয়েটিকে ভিড় ঠেলে টিকিট কেটে দিলাম, কোন গাড়ি, সেটাও বুঝিয়ে দিলাম, আর তক্ষুনি ঘোমটাপরা লজ্জাবতী হাঁটুর কাছাকাছি কাপড় তুলে দৌড়—মেলায় যাবে, পুণ্য হবে। পিছু নিয়ে মেলায় গেলেও কি তাকে চিনতাম? অসম্ভব। এমনই কত ব্যাপার। দোকানে, হাটে, স্টেশনে, বিমানঘাঁটিতেও।

ক্রমে ক্রমে একটা জিনিস স্থির জেনেছি। কিছু চেনা হবে, বেশিটাই না চেনা না জানা থেকে যাবে, জীবনের কানুন এইটাই।

তাতে লোকসান। লাভও কি নেই? লোকসান, পেয়ে হারানো। লাভ, নতুন বলে ঠাওরানো, ফের যদি পুরনোদেরই সঙ্গে সহসা মুখোমুখি হয়ে যাই।

দেহাতি মেয়েটির মুখ না হয় ছিল আবক্ষ ঘোমটায় ঢাকা। কিন্তু হঠাৎ যদি আবার একদিন চন্দ্রার দেখা পাই? তার তো, অনুমান করি, ঘোমটা-টোমটার বালাই থাকবে না। তবু। প্রথমে থমকে যাব, থতমতও খাব, দেঁতো হাসির লেনদেনও হতে পারে, তবে একটু উপযুক্ত পরিবেশ, বিস্মৃতির প্রশ্রয়ও চাই।

তারপর? কথা নেই। যদি বা মামুলি দু'চারটে থাকে, চেনাই নেই। চন্দ্রা কি চেনে বা চিনেছিল আমাকে? অথবা আমি চন্দ্রাকে?

তখন অগত্যা এবং অব্যর্থ, দু'জনে দু'দিকে। দেখা যত সহজ, চেনা ততটা নয়।

জানার ব্যাপারেও তাই। এ জগতে অনেক রহস্যের কিনারা মেলে না বলেই বাঁচার মজাটা বাঁচে। কিছু ঢাকা থাক। সব ন্যাংটো, খোলা হয়ে গেলে তো আর খোলবার মত বাকি কিছু নেই! কিছু না। জীবন নামে ধার্য বস্তুটার চলন, শয়ন, অশন ইত্যাদি কিচ্ছু না। ফাঁকা, সাদা সবটাই।

একটু জিরোনোর পর এবার চিঠি। আবার চিঠি। তোমাকে প্রভাস, না করুণাবাবু, আপনাকে?

টস না করেই স্থির করে ফেলতে পারি প্রভাস, তোমাকেই। একজনকে লিখলেই দু'জনকে লেখা হবে।

করুণাবাবুকে প্রভাস তোমার নিশ্চয় মনে আছে, ভবানীপুরের সেই লাল বাড়িটা যাঁর? আমাদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবেন, হাস্যোজ্জ্বল সৌম্য মানুষটি, তখনই সর্বভারতীয় স্তরের ছাত্রনেতা।

বামপন্থী, অবশ্যই। বলতে কি, সেকালে সেই কুড়ি বছরের এপাশে ওপাশে বামপন্থী আমাদের কে নেই? বামপন্থী, তবে পন্থাটা সকলের এক নয়। নানা পথ ; কিন্তু লক্ষ্য এক। সামাজিক সুবিচার, সুবিন্যাস ইত্যাদি প্রার্থিত মহাকাশ।

ওই সঙ্গে কবিতা, গল্প, গানও ছিল, যা আমাদের সকলকে মেলায়। বন্ধুদের মধ্যে করুণাবাবুরাই সচ্ছল, ওঁর বসবার ঘরটাও বেশ বড়ই। সুতরাং সেখানেই ঢালাও আড্ডা, গালগল্প প্রত্যহ, নিজেরা নিজেদের লেখাই বেশ ভাবটা দিয়ে পড়ি। শোনাই।

কেউ কবিতা লিখত, কেউ গল্প। ভাবীকালের বড় নাট্যকার কিংবা প্রাবন্ধিকের

প্রতিশ্রুতি আমাদের মধ্যে কারও বড় একটা ছিল না। সেজন্যে আমরা বাঘা বাঘা অধ্যাপকদের ধরে আনতাম। বিশেষ করে তাঁদের, প্রগতির সদর সড়কের সব ক'টি বাঁক যাঁদের প্রাণ।

একবার ইতিহাসের এক নামজাদা পণ্ডিত, আমার লেখা একটা গল্প শুনে খুব তারিফ করলেন। একটার বর্ণনার একমাত্র প্রতিতুলনা নাকি এলিয়টের ওয়েস্টল্যাসর আর প্রুফুক, তিনি একনাগাড়ে বলে গেলেন।

আমার বুক ফুলে দশ হাত। এলিয়ট না ছাই। তখন অবধি তাঁর লেখার সঙ্গে আমার সেরকম আলাপই হয়নি। ভাসা ভাসা কয়েকটি নাম ভাসত। এলিয়ট পাউনড ছাড়াও অডেন, সোনডার, সি ডে লুইস, ইসারউড। স্পেনের লড়াই শেষ, জার্মানিতে হিটলারের পাঁয়তারা। ইতালিতে মুসোলিনির মহড়া। আবিসিনিয়া গ্রাস করে তিনি বাহিপমের ঢেঁকুর তুলছেন তখন, আর রোমের কোনও পিয়াৎসার অলিন্দে দাঁড়িয়ে মোফৎ মুগ্ধ শান্ত শ্রোতাদের জ্বালাময় ভাষণের উদ্দীপনায় ভ্রান্ত করে দিলেন।

ওসব তো খবরের কাগজ। আমাদের লেখাটেখায় কী?

আমার গল্পটায় যিনি তারিফ করেছিলেন, তিনি পরে একদিন আমাকে একান্তে ডাকলেন।

—তোমার খুব প্রমিস আছে হে! কলমে খুব ধার। কিন্তু ঝকমকে ক্ষুর করলেই তো চলবে না, আমাদের গড়ে তোলার হাতিয়ারও দরকার। বলে সেই প্রবন্ধের বইটা আমার হাতে তুলে দিলেন, বাংলায় যার নামটার মানে দাঁড়ায় "ছবনাই আর উপন্যাস"।

লেখক কি র‍্যাল্‌ফ ফক্‌স?

তখন মাথায় ঢোকেনি, না তাঁর বিদ্যাবত্তা, বিশ্লেষণ, না তাঁর ইংরেজি। এত এলেম ছিল না যে, বুঝি।

তার আগে লিখতাম কী? 'শ্রীকান্ত' পড়ে গরম হয়ে 'শ্রীমান' নামে একটা ডাকসাইটে ছোকরার রোম খাড়া করা কথা। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব নিরীহ, তবু—সম্ভবত সেই জন্যেই—রোমাঞ্চকর ব্যাপার স্যাপার ঢেলে ঢেলে পড়তে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেত। বইয়ে ছাপানো কাণ্ডকারখানা তো! পড়ার বিশেষ ভয়ডর নেই। সেই ছাঁচে নকল ঢালাই করা—সে তো আরও মজা আর সোজা। 'পুনরাবৃত্তি' নামেও একটা মডেলের আধসারা খসড়া তৈরি করেছি।

মূল 'পথের পাঁচালি'। তারও ঢের আগে 'প্রভাতনলিনীর উপাখ্যান' নামে যে চ্যাপটার দুটো লিখেছিলাম, কপাল ভাল, সেই 'লোটাস' এক্সারসাইজ বুক দুটো কবে যেন হারিয়ে গেল। আমার গোড়াপত্তনে এইরকম প্রভাব—কেবলই প্রভাব।

গল্প লেখা? সেও তো প্রভাবই। ইটের উপরে ইট সাজিয়ে বাড়ি গেঁথে তোলা দেখে ঠাউরেছি, গল্প লেখা-টেখা অমনই একটা কসরত বুঝি! যা লিখতাম, তার সঙ্গে যা দেখতাম, জানতাম, তার সম্পর্ক ছিল সামান্যই।

আমাদের আসরে যে গল্পটা পড়ি, সেটার বিষয়বস্তু? গোঁড়া বাপের সঙ্গে উঠতি

ছেলের মনের বনিবনাও হচ্ছে না—মোটের উপরে এই।

তিনি বললেন, এই তো প্রগতি। দুটো জেনারেশানের দ্বন্দ্ব। একটা গটমটিয়ে হেঁটে যায়, আর-একটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যারা হাঁটে, তাদের সাথীর নাম সময়।

আর একটা গল্প। সেটায় বেজায় ব্যঙ্গ। মিছিলে গাড়ি আটকে গেছে বলে রাগে গরগর করছেন একজন শিল্পপতি। শুনলাম, এই যে আটকে যাওয়া, ওটা নাকি রুদ্ধপথ পুঁজিবাদের প্রতীক!

বেশ তো। সহজ সরলরেখা। বাঁচাটা, বেঁচে থাকাটা যে আঁকাবাঁকা লেখা, তা কি তখন জানতাম? লেখাটাও যে আসলে নদী, আঁকেবাঁকে চলে কিন্তু হঠাৎ কোনও একটা জায়গায় আটকে যায় কখন তাও জানা ছিল না।

আমি তবু লিখতাম। গল্প। তুমি কবিতা। একদিন আমাদের এই ভবানীপুরের আসরে মাননীয় অধ্যাপক দারুণ জোরে বললেন, সাবাশ! তোমার লেখাটা দারুণ নিশ্চয়ই, তবে আমার কানে তাঁর 'সাবাশ' কথাটা নিদারুণ বাজে স্বীকার করি।

এই লেখাটা তো আসলে স্বীকৃতিরই। স্বীকৃতি, অথবা বসি। যাই বলো না কেন। যাবার আগে আমাকে একেবারে উদাস বিহ্বল বিশদ হতে হবে। বিশদ, অভিধানে যার মূল মানেটা লিখেছে সাদা।

তোমাকে মুখে কখনো বলতে পারিনি, আজ এই লেখায় উগরে দিচ্ছি এই কথাটা যে তোমাকে তখন হিংসে করেছি আমি।

হ্যা, হিংসা। জ্বলে পুড়ে মরা। তোমার অত ছন্দমিল কখনো কব্জা করতে পারব না, সেই হিংসা। তবু কি লজ্জা তোমার ছাঁদে উচ্চগ্রীব উট-টুট নিয়ে বেশ কয়েকটা লেখা লিখে ফেললাম। হিংসের। এইরকম লাইন ধরো না কেন, তার চেয়ে চলো কোনও হুর্জ্জুরকুঞ্জে? কুঞ্জের সঙ্গে পুঞ্জে বা গুঞ্জে কোন মিলটা দিয়েছিলাম মনে নেই, তবে অচিরে প্রত্যহ হয় ওগুলো ব্যর্থ নকল, কবিতার শ'খানেক মাইলের মধ্যে যদি বা হয়ও। আসলে স্রেফ পদ্য।

তখন থেকে গল্পে মনোনিবেশ করি। দেখা মানুষ, চেনা জগৎ। অথবা সেই জগতের একটু।

জানো ফিলজফির প্রফেসর আমার চেয়ে তোমার তারিফ বেশি করতেন, বলতেন কি ওই বয়সেই তুমি প্রায় কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলে—এসব আমার দলের গর্ব ব্যক্তিগতভাবে আমার জ্বালা।

জ্বালাও জুড়োত। জীবনে আগুন আছে জানতাম, তবু গোটা জীবনটাই আগুন নয় এটা জানার জন্যে একটা ধাক্কা দরকার ছিল। যে অধ্যাপক তোমার জ্বালাময়ী কবিতাকে সহর্ষে বলেছেন সাবাশ, তিনি কি জানতেন যে হঠাৎ একটা বসন্তের বিকেলে দারুণ মেঘ জমবে? তিনি নিজেও লাল দিনকে স্বাগত জানিয়ে খুব জ্বলজ্বলে একটা কবিতা লেখেন। কিন্তু মেঘ যখন জমল, যখন সমস্বরে আমরা অনেকে বললাম, 'আজ স্যর ফিলজফি নয়, আজ কবিতা।' তিনি, সেই প্রগতির অগ্রণী পণ্ডিত লেখক, শোনালেন

কোনও কবিতাটি।

গাঢ় মন্ত্রস্বরে আবৃত্তি করে গেলেন 'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার ফিরেছি ডাকিয়া / সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে'...ইত্যাদি ইত্যাদি।

বড়ই আর্ত কণ্ঠ ষাট-পার এক কবির। পূরবী। কিন্তু অধ্যাপকের বয়স তখনও প্রগতিবাদী, সম্ভবত চল্লিশ পেরোয়নি। কোথায় গেল তাঁর সেই লাল দিন? হঠাৎ আমারে যে ডাক দেবে এই আহ্বানের আকুলতাই বা কেন?

তার মানে কি এই যে বাইরের জীবন যা বলিয়ে নেয় ভিতরের আর্ত কোনও নাদ তাকে অস্বীকার করে? শেষ বেলাতেই ও অপেক্ষা করে কোনও একটা ডাকের।

মৃত্যু তো পোস্টমাস্টার। কিন্তু কোনও অবধি আছে কি ডাকহরকরাদের সংখ্যার? আমারে যে ডাক দেবে। সেই নারীর জন্যে একটা অস্থিরতার সঙ্গে সুস্থির অপেক্ষা। জিজ্ঞাসা। আর্তনাদ। 'কে মোরে ফিরাবে অনাদরে / কে মোরে ডাকিবে কাছে' এই প্রশ্ন যিনি উচ্চারণ করেছেন, ওই লালদিনের কবি অধ্যাপকের মুখে মেঘলা দিনে শোনা কয়েকটি কবিতা-কলিও তাঁর।

প্রশ্ন ওঠে প্রভাস, অপেক্ষা তবে কীসের, কার। অধ্যাপকের বেছে নেওয়া পদ্যটিতেই তো বোঝা গেল কে ডাকবে। এই অনিশ্চয় সংশয় তার মনেও দোদুল্যমান। অপেক্ষা তবে কি খালি একটি প্রার্থিতা নারীর? ('জানি জানি আপনার অন্তর বাণীরে আজিও না চিনি / সন্ধ্যাপতি লগ্নে লগ্নে কেন' ইত্যাদি)।

মানে সন্ধ্যার আরতির লগ্নেও প্রাচীন কবি যার দেখা পাননি, যার অপেক্ষা করছেন, নবীন অধ্যাপকের অপেক্ষিতাও তিনি?

নারী। কেউ। যে হও সে হও। এইসব লাইনও যদি কলেজের ক্লাসরুমে মেঘলা বিকেলে নিদ্রিত হয়ে ওঠে, তবে কি ওই বিদগ্ধ অধ্যাপকের 'লালদিন' বলে চেঁচামেচিটাই মিথ্যে?

কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যে আমি আজও তার হদিস পাইনি। উলুবেড়ে স্টেশনে লালপেড়ে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যদি নেমে যায় তবে তার কোনটা

[অসম্পূর্ণ / শেষ]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপন্যাসটির শেষ অসম্পূর্ণ। সম্ভবত স্বয়ং লেখক বাকি অংশ অসুস্থতার কারণে লিখে উঠতে পারেন নি। আবার পাণ্ডুলিপির শেষ অংশের শেষ বাক্যটিও অসম্পূর্ণ অবস্থায় মুদ্রিত। 'চতুর্দোলা'র সম্পাদক ও উপন্যাসের লেখক উভয়েই স্বর্গত হওয়ায় বাকি তথ্য পাওয়া যায়নি। আমাদের ধারণা, প্রেসের অসাবধানতায় পাণ্ডুলিপির পাতা হারানোয় এমন অসম্পূর্ণ মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে।

বীরেন্দ্র দত্ত

গানে গানে

সন্তোষকুমার ঘোষ

১। খুব কায়দা করে সই করতে করতে সে বলল, 'গ্র্যাণ্ড দিয় এগ্রিমেন্ট' :

অন্য তরফের একজন এগিয়ে দিয়েছিল কাগজটা। সেটা ভাঁজ করে সে বলল, 'সার, ইটস আ ফেভার টু আস, অনেস্ট'।

তখন, সঙ্গে সঙ্গে সে, 'ফেভার বলছ কেন, বলো ফেয়ার দা ডিল বেনিফিটস বোথ।'

ওরা বিদায় নিলে সে ফের একটা সিগারেট ধরাল। ফের একটা ঢোঁক। একটু জ্বালা আর একটু টলমল। সে টনকো, এখনও। যে ক্যামপেনটা হাতছাড়া হচ্ছিল-হচ্ছিল, হয়ে একরকম গিয়েছিলই, সেটা ফের হস্তগত। স্রেফ বুকনির জোরে, চালাকি, হাতসাফাই, তার টাক? মিথ্যে, অন্তত হয়ে যায়। যখনই সে ঢুকঢুক ঢেলে নিজেকে ফিরে পায়। তুখোড় এগ্‌জিকিউটিভ, উড়ো পাখিকে ফের শিস দিয়ে টেনে এনে খাঁচায়। সব চেয়ে উঁচু ডালে লাফ, মানে প্রমোশন ঠেকায়। এবার কার সাধ্যি?

২। সেই মেয়েটাও এল। একবার টেরচা চাউনি। একবার শিস ইনিয়ে বিনিয়ে কথা। কত কথা। সব মিছে। তবু নিজের সেই অ্যাপার্টমেন্ট তো। সেই বিছানা। জামাকাপড় খোলাখুলি। বি-বাস, নিভৃত সব। আদিম। আদমও। আদম এবং ইভ। কথা সেই, তখন কাজ, কেবল কাজ, আন্দোলন, ঢেউ, ছন্দ, শার্দূল বিক্রীড়িত, আবার ভুজঙ্গপ্রয়াতও। অমন ক্ষণে সব এলোমেলো।

সে নিপুণ, নির্ভুল প্রেমিক।

৩। ওই ঘোড়া, আউটসাইডার, তবু তার উপরেই বাজি, আর সেটাই কামাল, বেনড এর মুখেই। কড়কড়ে উইন। নোটস কাগুজে টাকা, খসখস, বুকপকেটে আহ্‌, এই সময়ে, যদি এই সময়েই আরও একঢোঁক যদি।

সে ঝানু পানটার। সিকসথ, সেন্স, তোমাকে বলি, ধন্যি।

এখন কোথায়? পানশালায়, অব কোর্স। উদ্বেল প্রাণ, এখন গলায় ভর্তি ভর্তি, সব টইটম্বুর ভর্তি।

৪। ক্লাব। ব্যালকনি। কেউ নেই, ঝাউগাছটা ছাড়া। তার পাতার ফাঁদে কয়েদি একটু চুঁই-চুঁই জ্যোৎস্না। দারুণ দারুণ টপস। সে কী, সে কোনটা, এই সময়টাতেই জবাব

মেলে ঠিক। হাতঘড়িটা টিকটিক। জানতে চাইছে, ঠিক কোনটা? খেলুড়ে এগজিকিউটিভ, না রেসের মাঠের লাকি জুয়াড়ি পানটার, না কলগার্লকে শিস দিয়ে বিছানায় শোয়াতে সমর্থ শেয়াল প্রেমিক?

ও ইয়েস, একটা অ্যাডমিস, ডেমোক্রেসি ইন ডেনজার নিয়ে সে দুক্কুর বেলাতেই রোটারি ক্লাবে যে জ্ঞানগর্ভবর্তী স্পিচ ঝেড়ে এসেছে, সেটাকে তো এই হিসাবেই ফর্দে তোলা হয়নি।

সে স্কলারলি স্পিকারও তবে, সুরেন বাঁড়ুজ্জে থেকে যে কে সে, বলা যায় না, হয়তো ডিমসথিনিস্।

৫। বাড়ির, সেই স্বকীয় অর্থাৎ লিজের ভাড়ায় দখলীকৃত হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে একলা সে, একলা, নিরন্তর স্রাবে রক্তাল্প, পানসে চাঁদটাকে বাদ দিলে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে ওটা এখন স্রেফ একটা প্রশ্নচিহ্ন। চিহ্নটাকে খুঁচিয়ে তুলছে নিরুৎস হাওয়া। সেই হাওয়ার সুড়সুড়িতে হঠাৎ তার স্বরনালী চিরে গান, সামনে গেলাস, ঢোক। আরও একবার। দূর বেদুর কিন্তু গাঁথা কথা, সেই একলার।

সঙ্গ ছাড়ছে না একলাটা এমনই নাছোড়। 'প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে, দেখা নাই পাই', একটা কলি। তার পরেই শুধু চাই—ধুৎ।

কাচের ফাটা গেলাসের মত ভাঙা গলা, তবু সে ছাড়ছে না, ফের আর একটা। যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে। কার, কার? যারই হোক, সে চুলোয় যাক, এবং / আর চিতায় 'শুধু চাই'। কানে ফিরে ফিরে বাজছে কিনা!

ফের এক ঢোক, সুতরাং।

গান, কেন গান। চতুর এগজিকিউটিভ, ধুরন্ধর বেসুরে, তুখোড় স্পিকার আর সমর্থ প্রেমিকের মনে, অবচেতনে তবে আসলে একটা গাইয়ে।

নিষ্ফল, অসম্ভব ব্যাপারটা তাকে লজ্জা দেয়। একটা অহংকার ফুলন্ত বেলুনও হয় কবরচাপা সত্তাটার হঠাৎ আবিষ্কারে। লুপ্ত সত্তা না সুপ্ত ইচ্ছা? নিকুচি করি ওই তৈরি কথা, যত সব কথার চাকচিকে নিজেকে নিজেই আবিষ্কার করার রোশাতে 'আমি যে গান গেয়েছিলেন, মনে রেখো', এই লাইনটাও গলা আর হাওয়া আর চাঁদটাকে কাঁপিয়ে গেয়ে উঠতে পারত। কিন্তু ভাগ্যিস তখনো কিছু অবশিষ্ট ছিল বোতলের তলানিতে। তাই "হয়নি সে গান গাওয়া"ও গেয়ে ওঠা সম্ভব হল না তার, যদিও সে টনটনে জেনে গেছে "গাওয়া" আর 'হওয়া' আসলে এখানে একাকার।

ফলে সাক্ষী ঝাউগাছ, আর লাউয়ের ফালি চাঁদটা ঈষৎ নিরাশ বিমর্ষ হল। চোখ টিপে তাদের একটু ঠাণ্ডা করবে যে—তখুনি হড়হড়। নিজেকে চিনেছে তবু, নিরুপায় উগরে দিচ্ছে তার সমুদয় অতীতকে। অবচেতন একমাত্র ইচ্ছেকে। যে,......

দুর্গাপুর
২৭ /৮/৮৪

অপ্রকাশিত

[illegible]

[illegible]

রাস্তাটুকু, আস্তে আস্তে, যেই ফুরোবে
জীবনটা কী? — [illegible] মেপেআশ করা ঘর।
ঘরটাও যদি [illegible] পিঠে ধরে?
'খাবে দিতে' জো পাবে! তখন কোথায়?
ওই যে ঝুলছে ঝুলবারান্দা, [illegible] [illegible]?
— সেইখানে ঠাঁই।
আকাশ ভেঙে মহাশূন্য
সেখানেও [illegible] মুড়িয়ে (যদি) নামে!
~~[illegible]~~
— বারান্দার পর আর বারান্দা নেই।

[illegible]

বিধবা বিয়ে

বেথুয়াডহরী থেকে ফিরে গঙ্গোত্রীর সম্পাদককে লেখা স্বাক্ষরিত কবিতা

"আমার মৃত্যু হলে এই পৃথিবী বিধবা হবেই।"
এই বলে—পঞ্চাশ বৎসর পার কোনো যুবা
চোখ বোঝার আগে শুধু উচ্চারণ ক'রে গেলো,
"কিন্তু সেই পৃথিবীকে পুনর্বার বিবাহের অনুমতি পত্র দিয়ে যাবো
(এই সব কথা বলা যায়
বেথুয়াডহরি নামে বন বাংলায়
চনমনে কোনো চাঁদ যদি ওঠে, যদি
চেনা যায়।।)

ক্রোড়পত্র ৩ : পথিকৃৎ সাংবাদিক

একটি সংবাদ প্রতিবেদন

বাংলা সাংবাদিকতায় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রয়াত সাংবাদিক-সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার একাধিক সভা হয়। সভাগুলিতে তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুরা বলেন, সন্তোষবাবু বাংলা সাংবাদিকতার একটা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে বাংলাভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর কীর্তি অম্লান হয়ে থাকবে।

বিকেলে আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিভাগের কর্মীরা মিলিত হয়ে সন্তোষবাবুকে স্মরণ করেন। গভীর দুঃখ ও শোক জানিয়ে এক প্রস্তাবে বলা হয়—নির্ভীক আদর্শবাদী, প্রতিভাবান এই মানুষটির মৃত্যু আমাদের সর্ব অর্থে রিক্ত করে গিয়েছে। তাঁর পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়ে তিনি ছিলেন এক বনস্পতির মতো। আবার বিপদের দিনে 'সহযোদ্ধা' হিসেবে তাঁকে পেয়ে আমরা শক্তিমান হয়েছি। আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক অসাংবাদিক কর্মীদের যুক্ত কমিটি আয়োজিত এই সভায় কানাইলাল সরকার সভাপতিত্ব করেন।

সন্তোষকুমার এই প্রতিষ্ঠানের একান্ত আপনজন ছিলেন এই মন্তব্য করে অরুণ বাগচী বলেন, তাঁর কর্মনৈপুণ্য এখানে প্রতিটি বিভাগে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে।

নীরেন চক্রবর্তী বলেন, নিজের ভাষাকে এমন ভালোবাসতে খুব কম লোককেই দেখেছি। ভাষাটাই 'অস্ত্র' ছিল তাঁর কাছে—তা দিয়েই সন্তোষ লড়াই চালাত। কাজ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত অসন্তোষ ঘুচতো না সন্তোষের।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, সন্তোষবাবুর জীবনীশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রাণে ভরপুর এই মানুষটির বন্ধুপ্রীতিও ছিল অসামান্য। কোনও বিরোধ সেখানে স্থায়ী হতে পারত না।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেন, রোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে কীভাবে নীরবে, বোধবুদ্ধি জাগ্রত রেখে যুদ্ধ করতে হয় সন্তোষবাবু তা দেখিয়ে গেছেন। সেবাব্রত গুপ্ত বলেন, তথাকথিত প্রগতিশীলদের তালিকায় নাম না লিখিয়েও সন্তোষবাবু ছিলেন বুদ্ধিজীবীদের শীর্ষস্থানে। রবীন্দ্রনাথ মিশে ছিলেন তাঁর অস্থিমজ্জায়। পরিতোষ মুখোপাধ্যায় ও স্বপন দত্ত সন্তোষবাবুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শুরুতে তাঁর প্রিয় দুটি গান শোনান সুতপা দাশগুপ্ত।



ইউরোপ ভ্রমণ পথে দমদম বিমান বন্দরে

প্রেস ক্লাবে ঃ এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক শোকসভায় সন্তোষকুমার ঘোষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে উঠে অসীম রায় বলেন, বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ ছিল তা বিরল। কোথায় কী লেখা হচ্ছে তার খুঁটিনাটি সমস্ত ছিল তাঁর জানা।

সভাপতি রণজিৎ রায় সদ্যপ্রয়াত দুই বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ ও শৈলেন দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করে বলেন, এঁরা দুজনেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি মদন প্রামাণিক প্রয়াত দুই সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে এক প্রস্তাব পাঠ করেন। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বাগচী, পরিমল ভট্টাচার্য ও রণেন মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিন এই দুটি সভাতেই নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াতের আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করা হয়।

আনন্দবাজাব পত্রিকা
শুক্রবাব ২৭ ফাল্গুন, ১৩৯১ ১ মার্চ, ১৯৮৫

সাংবাদিক সন্তোষবাবু

কানাইলাল বসু

সন্তোষবাবুর দ্বৈত পরিচয়—সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। আক্ষরিক অর্থে আমি সাহিত্যিক নই—পেশায় সাংবাদিক। সাংবাদিক সন্তোষবাবুর সঠিক মূল্যায়ন করা হয়তো আমার পক্ষে দুরূহ। তবু সাংবাদিক হিসাবে সাংবাদিক সন্তোষবাবুর বৈশিষ্ট্য কী তার সম্বন্ধে আমার মত করে দু'চার কথা বলব। এ বলার ভিত্তি—তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়, একই খবরের কাগজের অফিসে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা, কাজ করতে গিয়ে মতের অমিল, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, বাদানুবাদ ইত্যাদি।

১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস ছিল ১নং বর্মন স্ট্রিটে। সেখানে থেকে ওই বছরেই ১৮ জুন পত্রিকার অফিস উঠে এল তার নতুন বাড়িতে, ৬নং সুতারকিন স্ট্রিটে, (আজ যে রাস্তার নাম প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট)। ইতোমধ্যে প্রায় আট বছর হয়ে গিয়েছে, আমি ইংরাজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে সাংবাদিকতার কাজ করছি। অনেক সাহিত্যিক, সাংবাদিকের নাম জানা হয়েছে, অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, অনেকের সঙ্গে নিছক পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে হৃদ্যতা হয়েছে—আবার অনেকের শুধু নামটুকুই শুনেছি, চাক্ষুস পরিচয় হয়নি তখনও। নতুন বাড়িতে দু' আড়াই বছর কাজ করার পর একদিন শুনলাম সন্তোষকুমার ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক তৎকালীন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের দিল্লি অফিস থেকে কলকাতার অফিসে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হয়ে আসছেন। ভদ্রলোকের নামটা শোনা ছিল-কারণ তিনি স্টেটসম্যান অফিসে কাজ করতেন, পরে সে কাজ ছেড়ে দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে যোগ দিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন দেখলাম সিল্কের পাঞ্জাবি ধুতি পরে এক ভদ্রলোক আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদকের টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন। বার্তা সম্পাদক তখনও আসেননি—তার চেয়ারটা খালি। কী রকম খটকা লাগল? কে এই ভদ্রলোক? ছুতো করে তার সঙ্গে পরিচিত হলাম—জানলাম তিনিই সন্তোষকুমার ঘোষ। বেশ কিছুদিন গেল দেখি তিনি রোজই আসেন, তবে কোনও কাজ করেন না—এ বিভাগ সে বিভাগ, বিভিন্ন জায়গায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটিয়ে চলে যান। কৌতূহল হল। খোঁজ নিলাম। শুনলাম বার্তা সম্পাদকের নির্দিষ্ট চেয়ারে তাকে বসতে না দিলে তিনি কাজ করতে অস্বীকার করেছেন। ভদ্রলোকের চারিত্রিক দৃঢ়তার ইঙ্গিত পেয়ে মনে মনে সন্তোষবাবু সম্বন্ধে যেন একটু সমীহ ভাব এল।

চারিত্রিক দৃঢ়তা মানুষের বৈশিষ্ট্য বৈকি।

সন্তোষবাবু একাধিক দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেছেন। যে কোনও কারণেই হোক, আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত সাংবাদিকতায় তার মুন্সিয়ানা বা প্রতিভার তেমন বিকাশ বা স্ফুরণ ঘটেছিল বলে মনে হয় না। কাজের সুযোগ পেয়েই তিনি বাংলা সংবাদপত্র-জগতে সংবাদ পরিবেশণের ব্যাপারে তৎকালীন গতানুগতিকতা ভেঙে তছনছ করে দিতে লাগলেন। নিত্যনূতন চমক জাগানো শিরোনাম (হেড লাইন) ; সংবাদের কলেবর বৃদ্ধি না করে সম্পাদনার কৌশলে (এডিটিং) 'সংবাদ-সার' পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা—নতুন আঙ্গিকে পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা মারফত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ;—ছবি ছাপার ক্ষেত্রে কোন অংশটুকু ছাপলে ছবির বক্তব্য আরও স্পষ্ট, আরও বলিষ্ঠ, আরও হৃদয়গ্রাহী হবে, ছবি দেখতে আরও সুন্দর হবে, পাঠকের নজরে পড়বে, শুধু সেইটুকুই ছাপা, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় 'ফটো ট্রিমিং' ;—সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে গ্রামীণ সমস্যা ও পরিস্থিতি বিষয়ে দেশের জনসাধারণকে সজাগ করা—অনুসন্ধানভিত্তিক (ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং) সংবাদ পরিবেশন ; ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রবর্তন করে বাংলা সংবাদপত্র-জগতে নিছক আলোড়ন নয় বরং একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করলেন। বলা যেতে পারে একটি নতুন পথ দেখালেন। ইতিপূর্বে বাংলা সংবাদপত্র পাঠকের কাছে এসব বিষয় ছিল অজানা। পাঠক জানল বাংলা সাংবাদিকতার উৎকর্ষের পরিমাপ, জানল তাঁর ব্যাপ্তি। আর জানালেন, প্রথম—সন্তোষকুমার ঘোষ।

বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সন্তোষবাবু যে নিঃসন্দেহে একটি প্রতিভা, সে বিষয়ে দু'একটি উদাহরণ না দিলে হয়তো বুঝবার অসুবিধে হতে পারে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পরলোক গমন করেন ২৭মে, ১৯৬৪। সন্তোষকুমার তখন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক। সারা পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্র বিভিন্ন শিরোনাম দিয়ে সংবাদটি প্রচার করলেন। সন্তোষবাবুও আনন্দবাজারে জহরলালের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করলেন এমন এক আঙ্গিকে, এমন এক শিরোনাম দিয়ে যে, তা দেখে তামাম পৃথিবী সাধুবাদ জানাল। সন্তোষবাবু লিখলেন—"বিশ্ব শোকমগ্ন, নেহরু আর নেই, ভারত রত্নহীন"। সামান্য এই কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে নেহরুজির বিরাটত্ব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ও প্রভাব, ভারতের জনসাধারণের কাছে তার ভাবমূর্তি, ইত্যাদি সব বিষয়ই প্রতিফলিত হল। শুধু তাই নয়, সন্তোষবাবু যে কৌশলে, যে ভঙ্গিতে জহরলালজির ছবি ছাপলেন তাও এক মুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। অস্তাচলগামী সূর্যের প্রেক্ষাপটে চিন্তামগ্ন শেরওয়ানি পায়জামা-গান্ধী-টুপি পরিহিত পদচারণারত নেহরুজি। ছবিটি তোলা পিছন দিক থেকে। মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে না—অথচ প্রতিকৃতি চিনতে পাঠকের কোনওই অসুবিধা নেই। সে এক অপূর্ব বিস্ময় উদ্রেককারী ছবি। সন্তোষবাবুর সাংবাদিক প্রতিভার সে এক অপূর্ব নিদর্শন হয়ে আছে আজও।

মধ্যরাত্রে দু'চার ছত্রের ছোট্ট কোনও একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে সংবাদ-সংস্থার টেলিপ্রিন্টারে। রাত্রে কর্মরত সাধারণ সাংবাদিক হয়তো সেটার তেমন গুরুত্ব

দিলেন না বা গুরুত্ব বুঝলেন না। সন্তোষবাবুর নজরে পড়ল সংবাদটি। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও সাংবাদিক-প্রতিভা দিয়ে বুঝলেন সংবাদটির নিগূঢ় গুরুত্ব। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। হইচই পড়ে গেল সারা বার্তা-বিভাগে। হয়তো নিজেই ছুটলেন লাইব্রেরিতে, রেফারেন্স খুঁজতে, তাতেও হয়তো মন উঠল না, নিজেই শিরোনাম লিখলেন, নিজেই অত রাত্রে প্রেসে নামলেন পাতা সাজাতে। পরের দিন সকালে তথাকথিত সামান্য সংবাদ অসামান্য হয়ে পরিবেশিত হল পাঠকের দরবারে—পড়ে পাঠক বিস্মিত বিমূঢ়। শুধু তাই নয়, সন্তোষবাবুর সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল, পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায় তা প্রমাণিত হল। এই ছিল সন্তোষকুমারের সাংবাদিক প্রতিভা। সুতরাং সাংবাদিক হিসাবে এই প্রতিভাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

মানুষের অনুপস্থিতিতে তার মূল্যায়ন করা মানে নিছক তার গুণগান করা নয়। সন্তোষবাবুর অনেক গুণ অবশ্যই ছিল—তবু মনে হয় মানুষটা ছিলেন বৈপরীত্যে ভরা। চঞ্চলমতি। 'আমি যা বুঝি, সেটাই ঠিক, সেটাই শেষ কথা'—এ জাতীয় মনোভাব বহুবার তাঁর কথায়, কাজে, ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। সময় বিশেষে সন্তোষবাবুর ব্যবহার সভ্যতা ভব্যতার সীমাও হয়তো ছাড়িয়ে গেছে। বলতে বাধা নেই, তাতে ফলাফল যে সব সময় ভাল হয়েছে তা নয়। নিকটবন্ধু সুহৃদদের সঙ্গে সংঘাতও সময় সময় বেধেছে। কাজের ব্যাপারে আমার সঙ্গেও একাধিকবার মতানৈক্য হয়েছে। বাদানুবাদ হয়েছে। অফিসে পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন উঁচুতে। তবু প্রয়োজন মত প্রতিবাদ করেছি। উত্তেজনার বশে সন্তোষবাবু জিদ করেছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত বজায় রেখেছেন।

দেখেছি, যে মুহূর্তে বুঝেছেন যে আমার প্রতিবাদ যুক্তিগ্রাহ্য বরং তাঁর সিদ্ধান্তই ঠিক নয়—তক্ষুনি ডেকেছেন। নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতাপ করেছেন—এমনকী বয়সে বড় হয়েও কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। দোষ স্বীকার করা অবশ্যই উদার হৃদয়ের পরিচয়। লজ্জা পেয়েছি—আবার মিটমাট হয়ে গেছে। এমনও হয়েছে, অফিসে কোনও কাজের ভার দেওয়া হয়েছে আমায়। কিন্তু সে কাজ একলা করা সম্ভব নয়—অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন। খামখেয়ালী, রাগী, বদমেজাজি লোক বলে সহকর্মীদের অধিকাংশ সন্তোষবাবুকে ভয় করত—বিশেষত তাঁর প্রভাব, ক্ষমতা উঁচুপদের জন্য। বড় একটা কেউ কাছে যেতে সাহস করত না। সারা অফিসের দু'চারজন মাত্র এই দলের বাইরে। আমিও ছিলাম এই দ্বিতীয় দলে। সরাসরি গেলাম, বললাম কী সাহায্য চাই। কথা প্রসঙ্গে বললেন—আরে মশাই, আমি কি বাঘ ভাল্লুক নাকি যে লোককে খেয়ে ফেলব। হতে পারি একটু রগচটা লোক। কী করব বলুন, ওটা আমার স্বভাব। তা বলে আমি কি কাউকে সাহায্য করব না বলেছি! সন্তোষবাবুকে বোঝাতে পারলে তিনি বুঝতেন। তখন আর জিদ করতেন না। সাহায্য তো করলেনই, উল্টে আমি কী করতে চাই জেনে নিয়ে—কী করলে কাজটা আরও ভালভাবে করা যাবে তার পথও বাতলে দিলেন। বলতে বাধা নেই খুব কম সহকর্মীর কাছ থেকে আমি এরকম সহযোগিতা পেয়েছি। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর তৎকালীন দ্বিসাপ্তাহিক 'ভূমিলক্ষ্মীর' বার্তা

সম্পাদক থাকাকালীন সহযোগিতার ক্ষেত্রে সন্তোষবাবুর আন্তরিকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার আছে। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট হালকা হাসির ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সন্তোষবাবুকে দিয়ে 'ভূমিলক্ষ্মী' কাগজে লিখিয়েছি। লেখার জন্য পারিশ্রমিকের অঙ্ক যৎসামান্য নির্দিষ্ট করেছি। টাকা পেয়ে ডেকে পাঠিয়ে হেসে বললেন--"এ কী করেছেন? এত কম টাকায় সন্তোষ ঘোষ কলম ধরে না। আরে মশাই, এতে যে আমার একদিনের সিগারেট খরচাও কুলোবে না।" আবার হাসতে হাসতে বললেন--"ঠিক আছে, ঠিক আছে। টাকাটা বড় নয় আপনি চেষ্টা করছেন কাগজটাকে ভাল করতে--আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। নিশ্চয়ই করব। আপনার যখন যা দরকার হবে আমায় জানাবেন। ডোন্ট ওরি। আই উইল হেল্প ইউ।" সন্তোষবাবুর ওই হালকা কথাগুলো আমার আজও মনে আছে--থাকবেও। উদার হৃদয় না হলে এ জাতীয় কথা মুখ দিয়ে বার হয় কি?

কোনও জিনিসের প্রতি আকর্ষণ, দুর্বলতা, পক্ষপাতিত্ব--এসব তো মানুষের জীবনে থাকবেই। দোষেগুণেই তো মানুষ। তবু দোষগুণের মধ্যে কোন পাল্লাটা ভারী সেটা দেখাই তো আসল দেখা। সেই দেখার মাপকাঠিতে অন্তত আমার কাছে সন্তোষবাবুর গুণের পাল্লাটা নিঃসন্দেহে একটু বেশি ভারী।

ভুলিনি ভুলব না

পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কাগজ বের হয় লোকে পড়ে। সমালোচনা করে। আলোচিত হন যারা কাগজ কলম নিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু ঠিক সময়ে কাগজ এল কিনা বইপত্তর ঠিক মত বেরুল কিনা এবং না বেরুবার জন্যে লাভ-ক্ষতির খতিয়ান নিয়ে পাশাপাশি এক বিরাট কর্মকাণ্ড চলে যার নাম—প্রেস। এটার ভারপ্রাপ্ত হয়ে, হাজার লোকের একজন এই আমি আরেক হাজারির ভারপ্রাপ্ত দিল্লি থেকে কলকাতায় অত্যন্ত কাছ থেকে যাকে দেখেছি, যার নাম সন্তোষকুমার ঘোষ।

সেই ১৯৫১ থেকে দিল্লি অফিস থেকে যোগাযোগ। কতরকম বিচিত্রধর্মী কাণ্ডকারখানা হয়েছে। কিন্তু বলতে নেই—আর যার সঙ্গে যা হোক বা না হোক একটি দিনের জন্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া ঝামেলা তো দূরের কথা, হাসিমুখে ছাড়া কথা হয়নি।

দিল্লি অফিসে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের বার্তা-সম্পাদক যখন ছিলেন, তখন আমার সঙ্গে বিবাহসূত্রে সাধনা চট্টোপাধ্যায়—সাধনা মুখোপাধ্যায়, হয়ে এলেন। সন্তোষবাবু ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে অসম্ভব রকমের সামাজিক ছিলেন। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর যে রীতি তা সবার আগে উনিই করেছিলেন। অনেকেই হয়তো জানেন না, কিংবা জানলেও বলতে চান না একজনের নাম—তিনি হলেন বিনোদবাবু মানে বিনোদবিহারী বসু। যিনি সন্তোষবাবুকে এবং স্টেটসম্যান থেকে নিয়ে এসেছিলেন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে। সেখান থেকে আনন্দবাজারে। যাকে বলে পিক-আপ। অসম্ভব রকমের লোক চেনার ক্ষমতা বিনোদবাবুর ছিল। সাংবাদিক জগতে সন্তোষকুমার ঘোষ আজ কিংবদন্তী নাম। আবার সন্তোষকুমার ঘোষের 'সঠিক কলম' চেনার ক্ষমতা ছিল বলেই ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রচারিত পত্রিকা আনন্দবাজার। আর নামকরা কলম? প্রায় সবই ওঁর নির্বাচিত। কাকে কাজ শেখাননি এই সন্তোষবাবু? সব পত্রিকার মাথাগুলো তাঁর কাছে বাঁধা। এত পত্রিকার পুরোভাগের প্রায় সব কাজই হাতে ধরে শেখানো। কী করে হেডিং লিখতে হয়। চমকে যাবার মতন—'ক্যাচি' সেই সব লাইন। দুর্ধর্ষ হেডিং হয়ে কাটাকাটি রিপোর্ট কেটেকুটে যখন প্রেসে এলেন, রাত হয়ে গেছে, কেউ রাজি নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই রোটারিতে যাবে। কারণ আমার বিভাগের সম্পর্কে লেখক বা রিপোর্টারদের কোনও সম্পর্ক নেই, তবু আমাকে উনি বলতেন পবিত্রবাবু দেখবেন, যেন ঠিক ঠিক যায় সেইভাবে আমাকে কর্মীদের বোঝাতে হত। কাজটাকে তুলে দিতে হত।

সেবার 'বাংলাদেশ' যখন হল মধ্য রাত্রিবেলা, কর্তৃপক্ষের প্রায় সবাই এসে হাজির, সন্তোষবাবুও এলেন। কী করে, কীভাবে কাজ সবচেয়ে ভাল করা যায়, কাগজ দারুণ হয়ে বেরুল। এভাবেই চীন আক্রমণ, নেহরুর মৃত্যু, ইন্দিরাজি হেরে যাওয়া, আমাদের অফিস আক্রান্ত, রাজীবের ছাই ফেলা ইত্যাদি। কেনেডির মৃত্যুতে আমরা যৌথভাবে কাজ করেছি। তখন দেখেছি একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষের কত বড় মাথা এবং তার সূক্ষ্ম কাজ হতে পারে। নিমেষে পলকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। 'নেহরু আর নেই' কার হেডিং? এসব আমাদের প্রেসের কর্মীরা জানেন। একে আমরা বলি নিউজ প্লাস প্রোডাকশন ক্লাস। কিন্তু একটা ঘটনা সন্তোষবাবু জানতেন না, তাঁর বিরুদ্ধে একটা ক্রিমিনাল কেস হয়েছিল, যা কোম্পানির হয়ে ট্যাকল করতে হয়েছিল আমাকে। কোর্ট-কাছারি, মানহানি, ট্রাইবুনাল কী নয়। কিন্তু সন্তোষবাবু এ সবের কিছুই জানছেন না। কাজ করছেন, বাড়ি যাচ্ছেন, লিখছেন, এদিকে সব ঝামেলা ওনাকে না জানিয়ে আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। সে এক তুলকালাম কাণ্ড!

ঘটনাটা একটু খুলেই বলি—

সন্তোষবাবুর বরাবরের অভ্যেস হঠাৎ রেগে যাওয়া (রাত্রে!)। উদার হৃদয়ের এটা ছিল মারাত্মক দোষ। পানটান করলে এরকম একটু হয় বোধহয়। শেষের দিকে এটা মাত্রাধিক্য হয়ে গিয়েছিল। একবার খাঁড়া উঠেছিল। এটা ঘটেছিল বীরেন দাশগুপ্ত নামে একজন সাব এডিটারের ক্ষেত্রে। কী একটা গুরুতর ত্রুটির জন্যে সন্তোষবাবু তো তাকে যাচ্ছেতাই বললেন। কেননা কাগজকে তিনি এত ভালবাসতেন যে সামান্যতম ত্রুটি দেখলে আসামিকে ছেড়ে দেবার পাত্র উনি ছিলেন না। তা এক্ষেত্রে ডোজ একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। বীরেনবাবুও রেজিগনেশন দিলেন, এবং ড্রাঙ্ক অবস্থায় তাকে অপমান করা হয়েছে, এ নিয়ে সরাসরি কোর্টে গেলেন। সহজ ব্যাপার নয়, কারণ প্রমাণও ছিল এবং উনি প্রমাণ দর্শিয়ে ছিলেন। প্রথমে আমার চেম্বারে দু-তিনজনকে ডাকলাম, আশ্চর্য ওরই এক ভালবাসার লোক (নাম বলছি না) সন্তোষবাবুর বিপক্ষেই বলে গেলেন। আমি এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে 'ভীষণ' আলোচনায় সন্তোষবাবুকে ডাকলাম না। কেস চলল, কোর্ট কাছারি ট্রাইবুনাল হয়ে রফা হল এবং তাঁকেও রাখা গেল না। মানে বীরেনবাবুকে নিয়ে এত যে কাণ্ড ঘটে গেল সন্তোষবাবু বিন্দুমাত্র জানলেন না। নির্বিকার ছিলেন দপ্তর নিয়ে।

সন্তোষকুমার ঘোষের বিচক্ষণ প্ল্যানিং-এ ইন্দিরার মৃত্যু, 'কেসে হেরে যাওয়া' ইন্দিরার সময় আমাদের কাগজ সাত লাখ থেকে ন' লাখ পর্যন্ত ছাপতে বাধ্য হয়েছিলাম। এত ডিমান্ড ছিল। ওই মানুষটির প্ল্যানিং-এর জন্যে। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কোম্পানির ছিলেন উনি পারিবারিক আত্মীয়ের মত। আমি কয়েক লাখ বলে বলছি, অ্যাকচুয়াল ফিগার জানলেও বলছি না, তাঁর অসুখে ব্যয় হয়েছিল। বিধান শিশু উদ্যানে কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট কোম্পানি থেকে করে দেওয়ায় তার জন্যে উনি সৎভাবে সব প্রাপ্য মিটিয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু কোম্পানি তা নেবেন না। কারণ এই মানুষটির প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধা ভালবাসা কৃতজ্ঞতা।

যে যাই বলুক আমি তো কর্মীদের সহযোগিতা নিয়ে সব ছাপিয়ে দিই সময়মত। আমি তো লিখি না। এই যে কষ্ট করে স্মৃতিচারণ, তা শুধু ওই মানুষটির জন্যেই, যিনি পত্রিকাকে ভালবেসেছিলেন। ৬২ হাজার থেকে সর্বাধিক করেছেন, ইংরেজি কাগজ থেকে বাংলায় এসে আমূল পরিবর্তন করলেন। কত রাত জেগেছেন ওই চারতলার ঘরে। তাকে ভুলে যাব কী করে? শেষ পর্যন্ত সত্যিই ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়েছিলেন। কেন? তা বলা যাবে না। তবে—

কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি হাউস জার্নালের পরিকল্পনা করতে বলেছিলেন। নাম হয়েছিল—'সানন্দা'। অনেক লেখা কম্পোজ হয়ে ব্রোমাইড হয়ে এখনও আছে। একদিন আমার স্ত্রীকে বললেন—নতুন পত্রিকা বের করছি। তোমাকে আমার অনেক কাজে লাগবে। এত কাজ দেব যে দম ফেলবার ফুসরত পাবে না।

কাজ দিয়েছিলেনও। 'মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের সমস্যা', 'বি-টি কলেজের ভেতরের খবর'। আরও—অনেক। লোকজনও নেওয়া হয়েছিল, কেউ কেউ এখনও করে খাচ্ছেন কিন্তু উনি নেই।

তখন সূর্যের শেষ আলো, জীবনেরও। বেলভিউতে সস্ত্রীক গেলাম। তখনো সেই দিল্লির হাসি। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, বারণ করছি তবু ছাড়বেন না। কিন্তু একসময় উঠে আসতেই হয়।

সেই আমাকেই প্রেসে গিয়ে একবার দেখতে হয়—সন্তোষ ঘোষের মৃত্যুসংবাদের লে-আউটের কোনও ত্রুটি হল কিনা। ঠিকমত ঠিকভাবে যাচ্ছে কিনা। গঙ্গোত্রী আমাদের প্রিয় পত্রিকা, সম্পাদকও। এ কাজ করে প্রায় আমাদেরই কাজ করে দিলেন!

শেষ নমস্কার

আনন্দ বাগচী

যাত্রাভঙ্গ (দেশ ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫) অন্তর্জীবনসূত্রে তাৎপর্যজনক এই শেষ গল্পটির পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে আমরা সেদিন চমকে উঠেছিলাম। সঙ্গে একটুকরো চিঠি তাতে পুরো নাম নেই এবং আশ্চর্যের বিষয় তারিখও নেই। নেই তার কারণ, লেখক এবং উদ্দিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক দু'জনেই তখন একই শুশ্রূষালয়ে শয্যাগত, শুধু ঘর আলাদা। পাণ্ডুলিপি সহ সেই চিঠিটা সম্পাদকের জরুরি পত্রাঙ্কিত হয়ে 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে এসে পৌঁছল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫।

সাহিত্যে সমর্পিতপ্রাণ সন্তোষদা নিজের জীবনের সঙ্কটতম মুহূর্তেও এভাবে কথা রাখবেন ভাবিনি। মনে পড়ল গত অক্টোবরের সেই বিষাদে বিস্মিত দিনটির কথা। কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে হল সন্তোষদাকে একবার সশরীরে গল্পের জন্যে তাগাদা দিয়ে আসি, অনেকদিন দেখাও হয় না। গিয়ে দেখি প্রায় বরবেশে বসে আছেন। আমাকে দেখেই ব্যস্ততার হাসি হেসে বললেন, মনে আছে। তবে এক্ষুনি তো বেলভিউ-এ যাচ্ছি, তোমাদের গল্পটা ওখানেই লিখে ফেলব যদি পারি। ফিরে এসেই দেব।

চমকে উঠলাম ওঁর কথা আর স্বর শুনে। শরীর ওঁর ভাল যাচ্ছিল না জানতাম, কিন্তু সঠিক করে কিছু জানতাম না। কিছু না—নিজের গলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আবার একটু ট্রাবল দিচ্ছে, চেক-আপ করিয়ে আসি। দু-তিনদিন।

গলার স্বরটা ভাল ঠেকেনি কানে। ওঁর চরিত্র জানি ; তাই সাজপোশাকটাও কেমন অব্যক্ত রহস্যময়। বুকের ভেতরটা কেমন অমঙ্গল আশঙ্কায় ধক করে উঠল। নিছকই কাকতলীয় হয়তো, তবু জন্মদিন-মৃত্যুদিনের একাসনে বসা সেই কবির অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটা মনে পড়ল : সেথা আমি যাত্রী তব, অপেক্ষা করিব লব টিকা। মনে হল উনি যেন অন্য দিগ্বিজয়ে যাবার আগে কপাল বাড়িয়ে বসে আছেন। কে জানে, সেদিন হয়তো উনি জানতেন, নিশ্চিত আশঙ্কাই করেছিলেন, আর তারই কম্পন আমার অবচেতনায় সূক্ষ্মভাবে ঘা দিয়েছিল।

তারপর দ্রুত ছক বদলে গিয়েছিল। আমাদের কাছেও দিনগুলো দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছিল, হয়তো ওঁর কাছে নয়। বেলভিউ থেকে সোজা চলে গিয়েছিলেন বম্বের হাসপাতালে, সেখান থেকে কিছুদিন পরে ফের যখন বেলভিউতে তখন আর কিছু ঝাপসা নেই, স্পষ্ট। ততোধিক প্রত্যক্ষ সেই গলা-টিপে-ধরা অসহ্য যন্ত্রণা। ছটফটে,

অফুরন্ত, প্রাণবান এই সবাক মানুষটির কষ্ট আর যেন চোখে দেখা যায় না। সেই প্রাণান্তকর নাটকের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা স্বভাবতই ভুলে গিয়েছিলাম গল্পের কথা, কিন্তু জানতাম না সন্তোষদা ভোলেননি। কোনও কিছুই তিনি ভুলতেন না, জীবনে এটাই ছিল তাঁর ট্র্যাজেডি, তাঁর বয়ে বেড়ানো ভয়ঙ্কর বোঝা। গল্পটা পড়তে পড়তে আর একবার চমকাতে হল। সেই নির্ভুল হস্তাক্ষরে যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না, কিন্তু গল্পের তলায় তলায় অন্য কিছু ছিল যা চেতনাকে নাড়া দেয় গভীরে। ভাষা ভঙ্গিতেও তাঁর অব্যবহিত পূর্বের জটিল মুদ্রাচিহ্ন নেই। কথাশিল্পী ছিলেন সন্তোষদা, দ্রুত অনর্গল কথা বলতে গিয়েও যেমন, লেখার মধ্যেও তেমনি, কমা-সেমিকোলনের মার্জিন্যাল ব্র্যাকেটে একই সঙ্গে অনুপ্রসঙ্গ এবং সমীক্ষিত মন্তব্য জুড়ে দিতেন। সব সময় নতুন কিছু, আরও কিছুর জন্যে একধরনের বুদ্ধিদীপ্ত স্মার্টনেস আর অস্থির রীতিবদল জটিল করে তুলেছে গল্পের আঙ্গিক। এই গল্পটির মধ্যে সে ধরনের কোনও বাড়তি কায়দা নেই, তবে ক্ষিপ্র সপ্রতিভতা অনুপস্থিত নয়। তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য এবং মনে রাখবার মত গল্প তাতে সন্দেহ নেই।

এই অসামান্য বাঁচা-মরার গল্পসূত্রে আবার তাঁর প্রসঙ্গেই ফিরে আসতে হচ্ছে। কুল এবং জন্ম দৈবায়ত্ত কিন্তু পৌরুষ, শুধু পৌরুষ নয় মৃত্যুও, কোনও কোনও মানুষের নিজের আয়ত্তে এসে যায়। নিপুণ শিল্পের মত বিরল স্বভাবে এবং প্রতিভার স্বরচিত সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সন্তোষদার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। কেন, কীভাবে সেকথা প্রসঙ্গক্রমে পরে আসবে। কিন্তু নিজের আগুনেই যে সিগারেট দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল, তাকে আচমকা টিপে নিবিয়ে দেবার মতই এই মৃত্যুটা বাইরের চোখে অতিনাটকীয় মনে হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের কৃপায় এই আসন্ন অনিবার্য উপসংহার গত কয়েক মাস যাবৎ আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ফাঁসির রায় তাঁর কণ্ঠদেশে আরোপিত শুধু দিনক্ষণ বাদে। তবু উইংসের আড়ালে যাঁর ঠোঁটে উদ্যত হুইসল, তিনি ছাড়াও আর একটি মানুষের কাছে সম্ভবত চরম ক্ষণটি শেষ মুহূর্তে অশনাক্ত ছিল না। জীবনের শেষ ঘুমের জন্য রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি দেখে অন্তত তাই মনে হয়। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি সকলকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। স্বজনে নির্জনে এমন বিদায় তাঁর মত চরিত্রের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব।

সব ফেয়ারওয়েলের মতই মরণোত্তর স্মৃতিচারণের রেডিমেড ছকে পড়ে অনেকেই অনেক বেশি বড়মাপের মানুষ হয়ে যান, মহৎ হয়ে ওঠেন, সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়ে থাকেন। কিন্তু সন্তোষদার আজকের যে সব প্রশস্তি, শ্রদ্ধা ভালবাসা উচ্ছ্বসিত, লিখিত ও উচ্চারিত তা সেইভাবে পাওয়া নয়, এটা তাঁর পাওনা। বিশেষ কারণে বিলম্বিত, আটকে থাকা পাওনা। এত লোক তাঁকে এত ভালবাসতেন, এটা তিনি যেমন জেনে যেতে পারেননি, তেমনি যাঁরা তাঁকে দূর থেকে, কাছে থেকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন তাঁরাও না। অন্তত নিজেদের ভালবাসার গভীর পরিমাণটা না। আজ তাঁর অনুপস্থিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

সাহিত্যিক সাংবাদিক, গুণগ্রাহী রসগ্রাহী পাঠক এবং মানুষ সন্তোষকুমার প্রচ্ছন্ন এবং বিশাল ছিলেন তাতে বিন্দুতম সন্দেহও নেই। সর্বতোমুখী কৌতূহলে তিনি অনলস এবং উদ্দীপ্ত ছিলেন সব সময়। তাঁর মত বিদগ্ধ এবং হৃদয়বান এবং নিরন্তর আধুনিক ব্যক্তিত্ব বর্তমান সময়ে বিরল। তবু তিনি ছিলেন একটি বিতর্কিত, জটিল চরিত্র। একই সঙ্গে মগ্ন ও মুখর। অনেকগুলি দ্বৈত স্বভাব তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল।

তেলে জলে মেলে না। প্রেসের তেলকালির সঙ্গেও কলমের জলকালির শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় বিচ্ছেদ আছেই। সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা পরস্পরকে শত্রুভাবে ভজনা ছাড়া কিছু নয়। দ্রুতলয়ে তারা মিললেও ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই মেলে। সন্তোষকুমার ঘোষের চারিত্রিক জটিলতার একটা সূত্র এইখানেই। তিনি যত বড় সাংবাদিক হিসেবে চিহ্নিত, তত বড় সাহিত্যিক হতে পারেননি এবং যত বড় সাহিত্যিক তিনি প্রচ্ছন্ন ছিলেন প্রকাশ্যে তত্তুল্য সাংবাদিক হয়ে উঠতে পারেননি। একজন আর একজনের ওপরে সব সময়েই কলম চালিয়েছে। অথচ আদি যৌবনে 'ভগ্নাংশ'র যে গল্পগুলি এবং তার অব্যবহিত পর্বের 'নানা রঙের দিন' ও 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস দুটি যখন বাংলা সাহিত্যে প্রথম আলোড়ন তুলেছিল তখনো তাঁর সেই মৌল স্বতঃস্ফূর্ত রচনার ওপরে দ্বিতীয় ছায়ার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। যদিও বার্তাই ছিল সে সময়েও ঘটনাচক্রে তাঁর জীবিকা।

১৯৪২ সালে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয়, যুগান্তর পত্রিকায়। সেই বিশ্ব যুদ্ধকালীন, অস্থায়ী অন্তরার জীবনের চেয়ে জীবিকা ছিল অনিশ্চিত, বিশেষ করে বার্তাজীবিকা। ফলে কাগজের নৌকোয় ভেসে বেড়ানোর মতই পত্রিকা থেকে পত্রিকায়, কখনো বা একই সঙ্গে একাধিক কাগজে উদয়াস্ত খাটতে হয়েছে। যুগান্তর ছাড়াও বাংলা-ইংরেজি যে কাগজগুলির সঙ্গে আগে-পরে যুক্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে স্টার অফ ইন্ডিয়া, মর্নিং নিউজ, নেশন, প্রত্যহ, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড এবং আনন্দবাজার পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্টেটসম্যান পত্রিকা ছেড়ে তিনি যখন দিল্লিতে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের চিফ সাব এডিটর হয়ে চলে গেলেন এবং পরে নিউজ এডিটরের পদে আসীন হলেন সাহিত্যচর্চায় প্রথম বিঘ্ন ঘটল সেইসময়। একটানা বছর আটেক লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের প্রায় অজ্ঞাতবাস। রচনায় ভাটা পড়ল। অথচ অর্থাভাবে পীড়িত সেই ছাত্রজীবনেও অদম্য উৎসাহে সারস্বত সাধনায় নেমে পড়েছিলেন গুটি কয়েক সহমর্মী বন্ধু জুটিয়ে। তার মধ্যে জগৎ দাস, সঙ্গীত জগতের স্বনামধন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জনপ্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো ছিলেনই, পরবর্তী সময়ে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখও ছিলেন। ১৯৫৮ সালে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। এই ফিরে আসা এক অর্থে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পুনরাগমন সন্দেহ নেই। এলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়, যে পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তাঁর গল্প 'ক্ষণনীড়' প্রকাশিত হয়েছিল সেই কলেজ জীবনেই।

আটান্ন সালে জয়েন্ট নিউজ এডিটর হিসেবে যোগ দিলেও পরের বছর থেকেই

নিউজ এডিটর। একযুগের কাগজকে যুগান্তরে টেনে আনলেন কত সন্তোষবাবু, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। কর্তৃত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্বের সবটুকু ঢেলে, খোলনলচে খুশবু সব বদলে ফেললেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সে এক বিপ্লব। আদল বিলকুল ঢেলে সাজালেন। ভাষা বদলে দিল, খবরের ধারা, সাজানোর কায়দা, শিরোনামের গুরুত্ব। রাতের পর রাত অমানুষিক পরিশ্রমে তিনি গড়ে তুললেন এক অত্যাধুনিক সংবাদ সংস্থা, সুদক্ষ শল্যবিদের মত নির্মমভাবে ছেঁটেকেটে ভেঙেচুরে নিজের হাতে তৈরি করলেন একটি সমবেত চরিত্র, তাঁর টিম, তাঁর সাংবাদিক বাহিনী। তাঁরা এখন স্বক্ষেত্রে বিখ্যাত, কেউ কেউ অবিকল্প।

শুধু কাগজের নয় জনরুচির চরিত্রও রাতারাতি তাঁর হাতে বদলাতে শুরু করল। অনেকেই জানেন না এই বিবর্তনের নেপথ্য নায়ক একজনই, তিনি সন্তোষকুমার ঘোষ। সাংবাদিকতা এসে দাঁড়াল সাহিত্য সংস্কৃতির এবং সমাজ চেতনার পৃষ্ঠপোষক হয়ে। যা ছিল এতদিন নিছক জীবিকা তাই হয়ে উঠল তাঁর নৈশ জীবন এবং নেশার জীবন, আবহমগুলের মত অখণ্ড এবং অপরিহার্য। ১৯৬৪ সালের শেষদিকে ততদিনে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক। সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরুও এই সময় থেকেই। প্রায় সর্বস্তরের অসংখ্য পাঠকের প্রাত্যহিক প্রত্যাশা ও প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে একসময় হয়তো মনে হয়েছিল সাংবাদিকতার আগ্রাসী ঔদ্ধত্য তাঁকে বঞ্চিত ও বিলুপ্ত করে আনছে। তাঁর একান্ত নিজস্ব কলমটি প্রায় খোয়াই। এখন ঐকান্তিক ইচ্ছে নিয়ে ছুঁলেও ঠিক সুরে, সেই বিশুদ্ধ সুরে আর যেন বাজে না।

কথাটা অসত্য বলব না। বলব অর্ধসত্য, বা এক তৃতীয়াংশ সত্য। আমাদের ছেলেবেলায়, বাল্যাদিকৈশোর যখন শ্রীকান্ত শেষের কবিতা আর দৃষ্টিপাতের কষ্টিপাথরে প্রথম বয়ঃসন্ধির ক্ষুর ঘষে চলেছি ঠিক তখন বুকে গোয়ালন্দি ইস্টিমারের ভোঁ-লাগা রাজবাড়ির ছেলেটির আঁতে-তাতে ভাপানো 'নানা রঙের দিন' যেভাবে ছুঁয়েছিল, 'কিনু গোয়ালার গলি' এই বাস্তু কলকাতার চোরা জানলাটা যেভাবে খুলে দিয়েছিল তার মধ্যে জয়কার এবং জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। তবু অবিলম্বে মূলত কবি সন্তোষকুমার ঘোষের পথ বেঁকে গিয়েছিল। তাঁর জাত ছিল আলাদা। পপুলার হননি, প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বাজার-মরশুমি না। পস্টারিটির তাকে তোলার মত অ্যান্টিক লক্ষণও ছিল সেই মুষ্টিমেয়ভেদী আধুনিকতার মধ্যে। একে কী বলব? কালাতিক্রমণ দোষ। সময়কে এক পা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া? একটির পর একটি তাঁর জটিল মনস্তত্ত্বে মোচড় খাওয়া অবিস্মরণীয় গল্পগুলি সে যুগে মূল্যবোধের শিকড়ে ঘা দিয়েছে, বে-আব্রু আবিষ্কারে শিহরণ এনেছে। 'মুখের রেখা'য়, 'মোমের পুতুল'এ জটিলতার অভিনব সমীক্ষা আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে নিয়ে গেছে। আসলে প্রথাচারের কানুন ভাঙার লোক একটি দুটিই আসে এক এক যুগে। তারা কেবল শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যায় না, নিজের বিরুদ্ধেও তাদের ভাঙার কাজ চলে তলায় তলায়। বহুমুখী প্রতিভায় এবং কলমে নিয়তির একটা প্রচ্ছন্ন অভিশাপও বুঝি থাকে। (গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা,

প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, ভ্রমণিকা, সমালোচনা, সম্পাদকীয়—তিনি কোথায় না স্বচ্ছন্দ ছিলেন।)

সন্তোষদাকে যাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরাই জানেন মনগড়া অভিমানে এবং অহংকারে তিনি নিজেকে কীভাবে ভেঙেছেন, ভুলিয়েছেন, নষ্ট করেছেন। কী অস্থির অসহিষ্ণু ছেলেমানুষ ছিলেন তিনি। প্রগাঢ় হৃদয়বানের সঙ্গে প্রখর বুদ্ধিজীবীর অসুখী সহবাস তাঁর মুখের কথাকে মুহুর্মুহু বর্ণচোরা মেজাজে তীব্র তির্যক ও কটুকষায় করে তুলেছে। ফলে অনেকে বুঝতে পারেনি, আহত হয়েছে। অসূয়া-আক্রোশহীন ক্রোধকে ভালবাসার জ্বলে ওঠা বলে চিনতে পারেনি, ঘৃণা ভেবে ভুল করেছে। চোখে পড়েনি একটু ঠাট্টাও ছিল, আত্মমুখী শ্লেষ মাখানো ঠাট্টা, যেমন তাঁর বাঁদিকের ঠোঁটের কোণে কার্নিক খাওয়া তদ্দণ্ডে জন্মানো আবছা হাসি সবসময় লেগে থাকত। আবছা দুষ্টুমীর মত। সন্তোষদার অনেকখানিই চোখে পড়েনি অনেকের। ওই অতিচেতন স্পর্শকাতরতার পাশাপাশি ক্ষিপ্র ব্যক্তিত্ব। অনেক অনুজ লেখক কবি সাংবাদিকদের জীবনে তাঁর অসামান্য অকথিত অনুদান এবং প্রেরণা। উপচে পড়া প্রাণ-প্রাচুর্যের সঙ্গে মিশেছিল তারুণ্যের অবসেশন। সকলের থেকে এগিয়ে আছেন এই কথা জানান দিতে তিনি নিজেকে টুকরো টুকরো করে পাঞ্জা ধরেছেন একই সঙ্গে সর্বত্র। প্রতিটি সভায় সমিতিতে জলসায় ঘরোয়া আড্ডায় তিনি পুরোভাগ নিয়েছেন। বৃহৎ সম্মেলন থেকে শুরু করে হোমসিয়ানার মত খেয়ালী বৈঠকেও তিনি সময় দিয়েছেন অকাতরে। কবিতা ছিল তাঁর প্রাণ। এবং গান। এমন অনুশীলন-জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রভক্ত, এমন গীতবিতান বিলাসী আমি দ্বিতীয় দেখিনি। ভাষা, শব্দ এবং বানান নিয়ে এমন পণ্ডিতি খুঁতখুঁতানিও। তাসুড়ে এবং দাবাড়ু সন্তোষদার আরও গুটি তিনেক স্বাস্থ্যঘাতী নেশা ছিল। সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল তাঁর অবিস্মরণ ক্ষমতা এবং সর্বগ্রাসী দ্রুতপঠন। সকলের লেখা, পাঠ্য অপাঠ্য, ফেলে যাওয়া লিটল ম্যাগাজিন ইস্তক তিনি সমান আগ্রহে পড়ে ফেলতেন, মূল্যায়ন করতেন এবং ভুলতেন না। তাঁর অপ্রত্যাশিত অযাচিত সমালোচনায় নিন্দায় প্রশংসায় অনেক অখ্যাত নগণ্য জনের প্রভূত লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই। এই বিস্ময়কর শ্রুতি ও স্মৃতিধর পাঠককে পেয়ে আমরা উপকৃত হয়েছি কিন্তু তাঁর নিজের লেখা কি তার ফলে ক্ষীয়মান এবং তিলে তিলে বিনষ্টির দিকে গড়ায়নি? আমি তাঁর জীবনের আদি পর্বের কথা জানি না, তবু অনুমান করি তিনি ছিলেন একদা স্বভাবলাজুক, মুখচোরা এবং অস্বচ্ছন্দবাক। অথচ আমাদের জ্ঞানত সাক্ষাৎকারে শেষ পর্বের তিনি ছিলেন বিদগ্ধ এক বাকসিদ্ধ কথক। অফুরন্ত, অনর্গল, দ্রুত। একজন গভীর মননশীল লেখককে এর মাশুল একেবারে দিতে হয়নি এমন মনে হয় না। অন্তত সংখ্যার সাক্ষ্য সেই কথাই বলে। প্রায় ছেচল্লিশ বছরের সাহিত্যপর্বে তাঁর সব রকমের রচনা মিলিয়ে গ্রন্থ সংখ্যা সম্ভবত ত্রিশের কিছু বেশি।

তাই যদি বলি তিনি ছিলেন কর্কটের জাতক, ক্যানসার কেবল তাঁর দেহে-গলায় জন্মায়নি, ক্যানসার ছিল তাঁর স্বভাবে, তাঁর জীবনে। তাঁর প্রতিভা, তাঁর অসামান্য

মানসিক অগ্রগতি জীবকোষের ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথের মতই শারীরবৃত্তিতে কাজে লাগেনি, অন্তর্ঘাতী বাহুল্য হয়ে গিয়েছিল। নিজের কাছে নিজের উদ্বৃত্তিই ক্যানসার, আত্মদহন অদমিত যন্ত্রণা। একেই তিনি লালন করেছিলেন নিজের মধ্যে।

সন্তোষকুমার ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এইরকম, জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২০, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি শহরে। কৈশোর কাটে সেখানেই। ১৯৩৬ সালে গোয়ালন্দ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতায়। ১৯৪০ সালে রিপন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনে বি.এ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম. এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে শেষ অবধি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ১৯৪২ সালে যুগান্তরে প্রথম সাংবাদিকতার জীবন শুরু এবং শেষ আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৮৪র অক্টোবর মাসে। রোগ নির্ণয়ের জন্য বেলভিউ নার্সিং হোমে যান অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে। ২১শে অক্টোবর বোম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ও যশলোক হাসপাতালে তাঁর যথাসাধ্য চিকিৎসা চলে। এই সময়েই দিনলিপি লিখতে শুরু করেন। তাঁকে জানানো হয় না, কিন্তু রোগ তখন নিরাময়ের বাইরে চলে গেছে। পরে আবার বেলভিউ। সেখান থেকে মৃত্যুর দু'দিন আগেই উল্টোডাঙায় নবনির্মিত বাসভবনে। মৃত্যু মঙ্গলবার, (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫) বেলা পৌঁনে এগারোটা।

প্রথম গল্প ছাত্রাবস্থায় 'ভারতবর্ষ'-এ। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ভগ্নাংশ', বন্ধুবর জগৎ দাসের সঙ্গে যুগলবন্দি। প্রথম উপন্যাস 'নানা রঙের দিন'। এই উপন্যাসেই অভিভূত হয়ে সাগরময় ঘোষ তাঁকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে আমন্ত্রণ জানান। 'কিনু গোয়ালার গলি' তারই সার্থক ফলশ্রুতি। যদিও 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'আশ্চর্য মানুষের মন' বেরিয়েছিল তারও বেশ কয়েক বছর আগে, যখন কলেজের ছাত্র। প্রথম বিদেশে যাত্রা ইউরোপ, ১৯৫৭। তারপর একাধিকবার ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া ও পাকিস্তান। পুরস্কার : আনন্দ, অ্যাকাদেমি ('শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে' ১৯৭৩)।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ নানা রঙের দিন, কিনু গোয়ালার গলি, মোমের পুতুল, মুখের রেখা, জল দাও, সুধার শহর, স্বয়ং নায়ক, পারাবত, পরমায়ু, অজাতক, চীনে মাটি, কড়ির ঝাঁপি, সন্ধ্যা সকাল, সমস্ত গল্প (২ খণ্ড), ত্রিনয়ন, আমার প্রিয়সখী, রবীন্দ্রচিন্তা প্রভৃতি।

'দেশ' পত্রিকা ছিল তাঁর প্রিয়সঙ্গী, জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রথম গল্প থেকে শুরু করে শেষ গল্প 'যাত্রাভঙ্গ' শুধু নয়, ছোট বড় মাঝারি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিই এখানেই প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর সর্বশেষ লেখা 'চলার পথে' নামক স্ফুলিঙ্গধর্মী স্মরণিকাটিও 'দেশ' পত্রিকার পাঠকের জন্য এসে পৌঁছেছে, তাঁর মরণোত্তর উপহার হিসেবে। এই পত্রিকার সঙ্গে ছিল চিরদিনের রাগ-অনুরাগের সম্পর্ক।

সাহিত্য আরও পেত তাঁর কাছে

অরুণ বাগচী

কবি ডন-এর সঙ্গে একমত হয়ে আমরা যারা বিশ্বাস করি যে যেহেতু আমরা ইনভলভ্‌ড ইন হিউম্যানিটি এবং সেহেতু যে কোনও মৃত্যুই আমাদের খণ্ডিত ও খর্ব করে, সেই আমরা কতখানি দরিদ্র হয়ে গেলাম সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যুতে! একটি মানুষ কেমন অক্লেশে চলে গেলেন সেই রহস্যময় কুয়াশাকঠিন সীমান্ত পেরিয়ে। এই তো ছিলেন চোখের সামনে। রোগশয্যায় পাণ্ডুরতায়। কথা বলতে পারছিলেন না ভাল করে। খেতে পারছিলেন না। পছন্দসই মানুষ কাছে এলে চোখে বাষ্প জমছিল। মর্মান্তিক কষ্ট পেতে পেতে আগন্তুকের কুশল জেনে নেবার চেষ্টা করছিলেন তবু। যে মানুষ সর্বদা অভিযোগ করতে ভালবাসতেন, সেই তিনিই একবারও বলেননি—বড় কষ্ট পাচ্ছি। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যাঁর ছিল ভয়ের জিম্মাদারি, তিনি সহসা কেমন ভয়হীন হয়ে গেলেন। সিরানো দ্য ব্যরজেরাকের মত হাতে মুক্ত অসি নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন। ঘর থেকে নিকটতম আত্মীয়দের চলে যেতে দিলেন। যাতে তাঁকে তুলে নিয়ে যাবার সময় এতটুকু বাধা না পান, সংকোচ বোধ না করেন মৃত্যুদূত। উজ্জ্বল একজন মানুষ তাঁর জীবনের অন্তিমপর্বে কেমন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলেন। তারপর আমাদের সবাইকে ফেলে রেখে গেলেন অন্ধকারে।

তাঁকে বলা হয়েছে বাংলা সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ। ঠিক কথা। একলার প্রচেষ্টায় বাংলা সাংবাদিকতাকে তিনি কতখানি পোক্ত, কতটা বলিষ্ঠ করে দিয়ে গেলেন। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে সংবাদের ভাষা করে দিয়েছেন তিনি অসীম নিপুণতায়। শুধু চলতি ভাষা তা নয়। তাকে বলতে পারি চলন্ত ভাষা, সংবাদপ্রবাহতে ধারণ, বহন এবং প্রসারিত করে দিতে পারে সেই ভাষা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাকে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় তুলে নিয়ে এসেছেন তিনি। লণ্ডন, মস্কো, ওয়াশিংটনে পৃথিবী স্পন্দিত হচ্ছে একথা সত্য। কিন্তু এই কলকাতায়, এই পশ্চিমবঙ্গে, এই ভারতে যা ঘটছে তা আমার পাঠকের কাছে আরও জরুরি। বাজারে মাছ, চাল, কেরোসিন তেল, কয়লা, রান্নার গ্যাস, প্রাণদায়ী ওষুধ মিলছে না সেটা বোগনর রেজিসে ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সভার বিবরণ বা উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সুঙ মহোদয়ের নবতম কীর্তির (অর্থাৎ ভাষণের) চেয়ে বেশি জরুরি। এমনকী ভারতের বিদেশমন্ত্রীর বক্তৃতার চেয়ে ঢের ঢের জরুরি। তাছাড়া তিনি এটাও শিখিয়েছেন যে খবরের প্রদীপ জ্বলুক, তার আগে সলতে পাকানোর ইতিবৃত্তটাও জানা ভাল।

আমি সাংবাদিক সন্তোষকুমারকে এতটুকু খাটো না করেই বলছি, তাঁর পেশার ক্ষেত্রে যতখানি দেবার ছিল তার চেয়েও বেশি দিয়ে শেষদিকে অনেকখানি নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত খুব বেশি আর দেবারও ছিল না। একটু মাথা ঘামালে যে কোনও সময় একটা ভাল সংবাদ পরিকল্পনা করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। একটা কপি, যে কোনও কপি, হাতে নিলে তাকে এডিট করে শতগুণ সুন্দর করে দেবার ক্ষমতা তাঁর আদৌ লুপ্ত হয়নি। কিন্তু যাকে বলে টোটাল লিডারশিপ দেওয়া, সেই বিষয়ে তাঁর আর খুব কিছু করার ছিল না। তাঁর দেওয়া হেডিং, তাঁর সংবাদ তৈরি ও পরিবেশনের শৈলী কিঞ্চিৎ পুরাতন-গন্ধী হয়ে পড়েছিল। তাঁকে, তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করার জন্যই এই ছোট্ট সমালোচনাটুকু করতে হচ্ছে। এটা তাঁর মৃত্যুর পর বলছি তা যেন কেউ মনে না করে। তাঁর সামনেই এই আলোচনাটা হয়েছে। ব্যাপারটা তিনি নিজেও জানতেন। বস্তুত গত দশ বছরে আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা কোথা থেকে কোথায় গেছে তা আমরা এই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরাও অনেক সময় খবর রাখি না। সন্তোষবাবু রাখতেন।

আমার দুঃখ, সন্তোষবাবুর যতখানি দেবার কথা ছিল সাহিত্যক্ষেত্রে তাই বরং তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। আমাদের একালের মহত্তম সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। চমক দেওয়া তাঁর প্রতিভার প্রধান কথা ছিল না, যদিও চমকে দিতেন তিনি পাঠককে। ক্ষুরধার বুদ্ধি, সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষার জুড়িগাড়ি যা চলত প্রান্তরস্পর্শী স্বাধীন বন্য অশ্বযূথের দুর্বার গতিতে দুর্দম উল্লাসে, রচনার বিশেষ পরিশীলিত রুচিকরোজ্জ্বল শৈলী--এ সমস্ত তাঁর সাহিত্যকর্মকে তাৎপর্যময় করেছে। তিনি বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে পত্রে পতাকায় আধুনিক। তদুপরি পাঠককে জড়রুচি জড়বুদ্ধি কল্পনা করে নেবার স্পর্ধা তাঁর কখনোই ছিল না। পাঠককে তিনি বয়স্কের সম্মান দিতে কখনো ভোলেননি। 'কিনু গোয়ালার গলি' লিখে তাঁর খুব নাম হয়েছিল। ওই ধরনের লেখা আর লেখেননি বলে এই সেদিনও অনেক হাহুতাশ শুনলাম। যাঁরা দুঃখ করেন, তাঁরা ভুলে যান যে একই কথা বারবার বলা সন্তোষকুমারের সাজত না। তাই তিনি বলতেন না। একই প্রথায় যে প্রেমে পড়ে বার বার, সে আর যাই হোক প্রেমিক নয়। একই রমণীর সঙ্গেও যদি প্রতিদিনের প্রেম প্রতিবার নতুনভাবে না হয়, তবে তার বিস্ময়, তার মাধুর্য কতটুকু? 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখক পুনরুক্তি বোকা গলিতে যাননি আর। তা বলে চলাও থামাননি। 'মুখের রেখা' নামক অসাধারণ একটি বই লিখেছেন। লিখেছেন 'জল দাও', লিখেছেন 'শ্রীচরণেষু মাকে'। তাঁর গল্প প্রথম যৌবনের শিহরণ ধরে রেখেছে, ভোরবেলার ফুলের পাপড়ি যেমন করে যতক্ষণ পারে শিশিরের গায়ে অরুণালোক ধরে রাখে।

সব সত্যি। শুধু কষ্ট এই, স্বভাব-অকৃপণ ওই লেখক যথেষ্ট দিয়ে গেলেন না সাহিত্যের ভাণ্ডারকে। অনেক দিয়েছেন, যথেষ্ট দেননি। ওই কম দেওয়ার পিছনে একটা ট্র্যাজেডি সুপ্ত আছে। সেটা অবশ্যই আলোচনার বিষয়। কিন্তু আজ নয়। অন্য কোনও দিন। শুধু এটুকু বলি, সাংবাদিকতা তাঁর সাহিত্যের ধারা ক্ষীণ করেছে, এই যুক্তির সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ কথাটা ঠিক নয়।

চিরঞ্জীব

১. সন্তোষদা ও দুটি খবর

আনন্দবাজার পত্রিকায় তখন ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় সিনেমা, থিয়েটারের বিজ্ঞাপন বের হত। কিছু জায়গা থাকলে, সেখানে ছোট বা কম গুরুত্বের খবর থাকত। ১৪ পয়েন্ট হেডিং-এ একদিন একটি খবর বের হয়। হেডিং 'জলে ডুবে মৃত্যু'। বেশ মনে আছে খবরটি ছিল ভবানীপুরের পুকুরে জলে ডুবে ৬ বছরের একটি বালকের মৃত্যুকে নিয়ে। চার লাইনের খবর।

বার্তা সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ তখন ভবানীপুরের বাসিন্দা। থাকেন আশুতোষ মুখার্জি রোডে দেনা ব্যাঙ্কের উপরে। কলকাতা তাঁর ছোটবেলা থেকেই নখদর্পণে। আর ভবানীপুর? প্রতিটি অলিগলি তাঁর চেনা। ভবানীপুর অঞ্চলে পুকুর একটিই। সেটি পদ্মপুকুর। সন্তোষবাবুর খটকা লাগল। ছোট্ট খবরটি দেখে একজন রিপোর্টারকে বললেন, খবরটি অসম্পূর্ণ। পদ্মপুকুরের নাম নেই কেন? খোঁজ নাও ভবানীপুর থানা, দমকল ও পদ্মপুকুরের ক্লাবগুলিতে।

পদ্মপুকুরে থেকেই কেউ বলতে পারলেন না জলে ডোবার ওই খবর সম্পর্কে। ভবানীপুর থানা এবং দমকলও কিছুই বলতে পারলেন না ওই নিয়ে। তাহলে প্রকাশিত ওই খবরের সূত্র কী? কারণ, এই ধরনের ঘটনা পুলিশ ও দমকলের গোচরে এলে তা রেকর্ড করা থাকে।

ভবানীপুর থানার ও সি-রও খটকা লাগল। রিপোর্টার ভদ্রলোককে বললেন, মশাই ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। লেগে থাকুন।

দু'দিন পর তিনি রিপোর্টারকে জানালেন, ক্লু পাওয়া গিয়েছে। চলুন একসঙ্গে চন্দননগর যাই। তবে শর্ত একটিই। তা হল পুরো ব্যাপারটা জানার পর লিখবেন, এই মুহূর্তে একটি শব্দও নয়। লালবাজার থেকে গোয়েন্দা বিভাগের ঝানু লোকরা গেলেন চন্দননগর। গেলেন ভবানীপুর থানারও কয়েকজন। পাঁচদিন পর গোটা ব্যাপারটা জানা গেল। চন্দননগরের একটি ধনী পরিবারে তারা তিনভাই। বড় ভাই নিঃসন্তান। মেজ ভাইয়ের এক মেয়ে। তৃতীয় ভাইয়ের একটি ছেলে। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ছেলেটি সব পাবে। ছেলেটিকে চন্দননগরের কাছাকাছি কোথাও মেরে ফেলা হয়। তারপর ভবানীপুর থানা মারফত আনন্দবাজারে খবর দেওয়া হয় ওই ভাবে। পুলিশ এবং বড় ও মেজভাইয়ের যোগসাজসে সব কিছু ঘটে। সংবাদপত্রে যেভাবে খবর দেওয়ার কথা

ছিল, পুলিশ সেখানে কিছুটা ভুল করেছিল।

সব কিছু বিস্তরিত বের হল আনন্দবাজারে। প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় শিরোনাম হল। পুলিশ বিভাগ, চন্দননগরের সর্বত্র তোলপাড় হল। অবাক হয়েছিলাম সন্তোষবাবুর দূরদৃষ্টিতে।

হার্ড টাস্ক মাস্টার বলতে যা বোঝায়, সন্তোষকুমার ঘোষ ছিলেন প্রকৃত অর্থে তাই-ই।

১৯৬৯-এ ডিউক-পিনাকীর আন্দামান অভিযান। তখন খবরের কাগজে দুটি বিষয় শিরোনাম। একটি পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু তার পাশাপশি যে একটি অরাজনৈতিক খবর জনসাধারণকে আরও বেশি টানতে পারে, ধারণা ছিল না। তখন উনি সহযোগী সম্পাদক। বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী। চিফ রিপোর্টার শিবদাস ভট্টাচার্য। এখনকার সম্পাদক অভীক সরকারও রীতিমত কাজ শুরু করেছেন। প্রত্যেকেই বলছেন--এই নির্বাচনের মাঝে ডিউক-পিনাকীর দাঁড় বাওয়া কে পড়বে? ওরা কানাঘুষা করছেন মাত্র। কারণ সন্তোষ ঘোষের মুখের সামনে কথা বলার দুঃসাহস কারুর ছিল না।

এদিকে এই প্রতিবেদকের সসেমিরা অবস্থা। কার কথা শুনব! সন্তোষবাবু বললেন--তোমার আর কোনও কাজ নয়, প্রতিদিন ডিউক-পিনাকীর খবর দেবে শুধু। সব কাগজকে বিট করতে হবে।

নির্বাচনী উত্তাপের মাঝে একদিন সার্কুলেশন ম্যানেজার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ডিউক-পিনাকীর খবর বিস্তারিত দাও। ১৫ থেকে ২০ হাজার সার্কুলেশন বেড়েছে শুধু এই খবরের জন্যই।

পরদিন সন্তোষবাবুকে জানালাম, সার্কুলেশন ম্যানেজারের কথা। উনি সিগারেট নিবিয়ে বললেন, টাইম, গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক টাইমস এক একটি এক্সপিডিশন বা এইরকম কিছু স্পনসর করে শুধু সার্কুলেশন বাড়াত। রাজনীতির বস্তাপচা খবর ক'দিন ভাল লাগে।

খবরের কাগজকে পরিবারের প্রত্যেকের পড়ার উপযোগী বা কমপ্লিট নিউজ পেপার করার কথা বাংলা সাংবাদিকতায় তাঁর আগে কেউ ভাবেননি।

২. সন্তোষকুমার ঘোষ--শ্রীচরণেষু

তাঁর কথামত রোজই অফিসে ঢুকে দেখা করতাম। বিশেষ কোনও খবর লেখার ব্যাপার থাকলে বলে দিতেন। ১৯৬৭ বা ১৯৬৮-র কথা। ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলেন ; ছয়ের পৃষ্ঠায় ভবানীপুরে জলে ডোবার খবরটা পড়েছ? চার লাইনের খবর--ভবানীপুরের এক পুকুরে পাঁচ বছরের একটি বালক জলে ডুবে মারা গিয়েছে। মৃতের নাম জানা যায়নি, ঠিকানাও মেলেনি।

পরের প্রশ্ন ঃ ভবানীপুরে কটা পুকুর আছে? বলি একটিই, ওটি পদ্মপুকুর।

যাও, আজ একটাই কাজ তোমার। নির্দেশ সন্তোষকুমার ঘোষের। আনন্দবাজার

পত্রিকার বার্তা বিভাগের সর্বেসর্বা তিনি। সপ্তাহে একটি করে খেলার ফিচার লিখি আর লিখি প্রতিদিন তাঁর ও অমিতাভ চৌধুরীর নির্দেশে ফরমায়েশি খবর।

ভবানীপুর থানায় যেতেই ও সি বললেন, আরে ভাই ওই জলে ডোবার খবরের কিনারা করতে পারছি না। অথচ আপনাদের কাগজে লেখা হয়েছে খবরটি ভবানীপুর থানা সূত্রের। মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোনও গণ্ডগোল রয়েছে। ডায়েরিতে কিছুই নেই, দমকলও জানে না। কোনও হাসপাতালও জানে না।

ও সি বললেন, জিপ রেডি; যাবেন আমার সঙ্গে? চন্দননগর যাচ্ছি। কিছু খবর হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ওখানকার থানায় বসিয়ে রেখে কয়েক ঘণ্টা ঘুরলেন তিনি। তারপর বললেন, কাল আবার আসতে হবে। আপনার আসার দরকার নেই। রাতে ফোন করবেন। পরদিনও কিনারা করতে পারেননি। তৃতীয় দিন যা বললেন, সত্যিই 'গণ্ডগোল'। পুরো কেসটাই সাজানো। চন্দননগরের এক বিত্তবান পরিবারের তিন ভাইয়ের একমাত্র পুত্রসন্তান ওই বালকটি। ওকে খুন করেছে দুই জ্যাঠা। খুন গোপন করার জন্যই ভবানীপুরে জলে ডোবার গল্প। এবং ভবানীপুর থানা মারফতই ওটি আনন্দবাজারকে দেওয়া হয়।

তদন্তের পর সন্তোষদা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সেকেণ্ড লিড করেছিলেন। একটি 'সামান্য' খবর কেমন করে অসামান্য হতে পারে শেখালেন তিনি।

১৯৭৬-এর ১ জানুয়ারির ইডেনে ক্রিকেট টেস্টের কথা হয়তো অনেকেই ভোলেননি। মাঠে অতিরিক্ত দর্শক ঢুকেছেন। গ্যালারিতে জায়গা নেই। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দেখতে ভিড় উপচে পড়েছে। তখন তো ইডেনে এখনকার মত এমন ফ্রেন্সিং ছিল না। দর্শকরা বাউন্ডারি লাইনের ধারে। তবুও কুলোচ্ছে না। খেলা আরম্ভ করা মুশকিল। এদিকে পুলিশ বেশ তৎপর বাউন্ডারির ধার থেকে দর্শক সরাতে। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করছিলেন অতিরিক্ত দর্শক ঢোকা নিয়ে। পুলিশ তাঁর ওপর বেদম লাঠিপেটা শুরু করলেন। ব্যস, গোটা ইডেন গর্জে উঠল। লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। আগুন লাগানো হল ছাউনিতে। বেতের চেয়ারগুলো জ্বলছে। ভাঙচুর শুরু হয়েছে। খেলোয়াড়রা আতঙ্কিত। ক্লাইভ লয়েড ভুল করে ছুটতে ছুটতে গঙ্গার দিকে গিয়ে ফিরে আসেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। বাইরে বাসে ট্রামে আগুন। পুড়িয়ে দেওয়া হল স্পোর্টিং ইউনিয়ন তাঁবু। খেলা হল না। কোনওরকমে বেড়া টপকে ফিরলাম অফিসে। দেখি ওই সাতসকালে অনেকেই হাজির। নিউজরুমে বসে সন্তোষদা, গৌরকিশোর ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, বরুণ সেনগুপ্ত, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশুকুমার বসুও।

গৌরদা, বরুণবাবু, সুধাংশুবাবু, আমি কেউই খবর লেখার জন্য ইডেনে যাইনি। ছিলাম কেবল দর্শক। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বোধহয় ধান ভানে।

স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের লেখা ইডেনের রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন সন্তোষদা। দুটি ডাবল কলম রিপোর্ট ছিল। পড়েই ওর মেজাজ চড়ে গেল। আমরা যারা মাঠে গিয়েছিলাম সকলকে ডাকলেন। বললেন, যে যা দেখেছ লেখো। লালবাজার ও

হাসপাতালে পাঠালেন জনা চারেক রিপোর্টার, দমকলেও দু'জনকে। বললেন, কাল প্রথম পাতায় ইডেন সংক্রান্ত খবর যাবে। ফোটো বিভাগকে বললেন, সব রকমের ছবি চাই। ইডেনের ভেতরের, ট্রাম-বাস পোড়ানোর, তাঁবু ধ্বংসের ছবি। ইন্টারভিউ চাই দুই ক্যাপ্টেন গ্যারি সোবার্স ও মনসুর আলি খান পতৌদির।

সন্তোষদা আমাদের প্রত্যেকের লেখা এডিট করলেন, হেডিং করলেন, ছবির ক্যাপসানও নিজ হাতে, প্রথম পৃষ্ঠার লে আউটও করলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলম ব্যানার হেডিং। সম্পাদকীয়ও এই ঘটনা নিয়ে। পরিসংখ্যান দেওয়া হল ক্রিকেট মাঠে কবে এমন ঘটনা হয়েছে।

কলকাতার কোনও খবরের কাগজ সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকার মত গুরুত্ব দেয়নি ইডেনের লঙ্কাকাণ্ডকে। পরদিন আমরা উপলব্ধি করি সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্যটা কোথায়!

এক সপ্তাহ পরে যখন লন্ডন থেকে 'দ্য টাইমস', 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ', 'দ্য গার্ডিয়ান' প্রভৃতি এল, তারাও দেখি আনন্দবাজারের মতই গুরুত্ব দিয়ে ইডেনের খবর ছেপেছে। সোবার্সের বন্ধুর 'বারবাডোজ টাইমসে'ও আট কলম হেডিং প্রথম পৃষ্ঠায়।

এখন খেলা নিয়ে আকছারই প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে যে খবর হচ্ছে—৩০ বছর আগে সন্তোষকুমার ঘোষ যে তার পথিকৃৎ, এ নিয়ে দ্বিমত নেই। ১৯৬৭-তে প্রবীণদের কেউ কেউ কিন্তু বক্রোক্তি করেছিলেন সন্তোষদার সিদ্ধান্ত নিয়ে। পরে বোঝেন উনি কতটা অভ্রান্ত ছিলেন।

একজন বার্তা সম্পাদককে যে অলরাউন্ডার হতে হয়, বাংলা সংবাদপত্রে তার নজির তিনি যে কত রেখে গিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর শিষ্যরা তা জানেন।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সিনেমার জন্য পৃথক ফিচার পেজ হতে পারে। কিন্তু যাত্রা বা খেলার জন্য? ওই পাঁচ বা ছয়-এর দশকে একথা কেউ ভাবেননি। প্রবোধবন্ধু অধিকারীকে দায়িত্ব দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার যাত্রাপাড়ার খবর, ছবি, যাত্রাশিল্পীদের সম্পর্কে নিবন্ধ—এসব ছিল তাঁরই পরিকল্পনা।

প্রতিদিনের খেলার খবরের জন্য পুরো পৃষ্ঠা তো থাকেই। কিন্তু তার জন্যই আবার পৃথক ফিচার পেজ? ১৯৬৫ তে বের হয় 'মাঠ ময়দান' প্রতি মঙ্গলবার। এর দায়িত্ব দেন মতি নন্দীকে। সাহিত্যিক মতি নন্দী 'কালকেতু' ছদ্মনামে খেলার ফিচার লেখা আরম্ভ করলেন। আর এই আমার ওই পাতাতেই হাতেখড়ি হল খেলার লেখার। সাধারণ রিপোর্টিং-এর ফাঁকে খেলা নিয়ে সপ্তাহে একটি করে লেখা। সেদিন থেকেই চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস হয়ে গেল 'চিরঞ্জীব'। মতি নন্দী খেলাকে রসোত্তীর্ণ করে তুললেন।

'কিনু গোয়ালার গলি', 'শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে'র লেখক খেলাধূলা নিয়ে এত আগ্রহী? একদিন জিজ্ঞাসা করলাম খুব খোশমেজাজে পেয়ে, খেলাকে এত গুরুত্ব দেন কেন?

বললেন : অরণ্যদেবের পরেই লোকে খেলার খবর পড়ে। কাগজ চালাতে গেলে

অনেক দিক দেখতে হয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে দিয়ে ক্রিকেট লেখান সন্তোষবাবুই। ওঁদের মিষ্টি লেখায় আনন্দবাজারের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল পাঠকদের।

১৯৬৯। সাঁতারু মিহির সেনের এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের দাঁড়ের নৌকো আন্দামান অভিযানে যাবে। দুই অভিযাত্রী দাঁড় বেয়ে যাবে কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার। ব্যাপারটা দুঃসাহসের। একদিন ডেকে বললেন, ওদের ব্যাপারটা দেখো তো। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। লেগে গেলাম ওর পিছনে। 'কানোজি আংরে' নৌকো তৈরি, অভিযাত্রী বাছাই। কলকাতা থেকে যাত্রা এবং আমিও হাফ অভিযাত্রী। কখনও ওদের পিছু পিছু মাঝদরিয়ায় হারিয়ে যাওয়ায় বিমানবাহিনীর বিমানে চড়ে অনুসন্ধান। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের মাঝেও প্রতিদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ডিউক-পিনাকীর খবর ফলাও করে। আনন্দবাজারের অনেকেই এর বিরুদ্ধে। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে অ্যাডভেঞ্চার? অন্যান্য কাগজ ছোট করে দু-একদিন পর ভিতরের পৃষ্ঠায় ওদের খবর লিখছে। গুঞ্জন শুনে তিনি সার্কুলেশন ম্যানেজারকে ডাকলেন। ডাক পড়ল তাঁর ঘরে আমারও। 'এই শোনো আর কিস্‌সু না, আরও বিস্তারিত লিখবে অভিযানের খবর। যেভাবে হোক রোজ খবর চাই। খরচ নিয়ে ভাববে না।'

সার্কুলেশন ম্যানেজারকে ভয়ে ভয়ে পরে জিজ্ঞাসা করি, দাদা ব্যাপারটা কী? ওর উত্তর—তোমার গাঁজাখুরি খবরে আমার মিটার উঠছে, চালিয়ে যাও। মিটিং-এ ঠিক হয়েছে, তোমার জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ থাকবে রোজ।

১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট ধস এনেছিল কংগ্রেসে। কিন্তু তা ছাপিয়ে যেতে পারে অ্যাডভেঞ্চারের খবর, বুঝি যেদিন আন্দামানে পৌঁছয় ডিউক-পিনাকী এবং যেদিন আন্দামান থেকে ওদের সঙ্গে দমদমে ফিরি, রানওয়েতে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ ঢুকে পড়েছিলেন।

সন্তোষকুমার ঘোষের সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল সকলেই বুঝেছিলেন।

ওই আন্দামান অভিযানের পরে সারা পশ্চিমবঙ্গে পর্বত অভিযান, সাইকেলে ভারত পর্যটনে ঢেউ এল। এমনকী বিশ্বপরিক্রমায়ও বেরিয়ে পড়েন কেউ কেউ। আর ওই সব খবর ছাপার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় লাইন পড়ে যেত।

সিদ্ধান্তটা কার? সাগরময় ঘোষের, না সন্তোষকুমার ঘোষের কখনো জানার চেষ্টা করিনি। 'দেশ' পত্রিকার 'বিনোদন' সংখ্যায় নাটক নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। এমন কিছু জ্ঞানগর্ভ ব্যাপার নয়। কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার বাংলা নাটক সম্পর্কে। সন্তোষদা বেছে বেছে আমাকে দায়িত্ব দিলেন। আমি তো থ। নাটক নিয়ে আমি? 'অনেক লেগ ওয়ার্ক আছে। শম্ভু মিত্র, বঙ্কিম ঘোষ, নিবেদিতা দাস, মমতা চ্যাটার্জির কাছে যাবে কিছু প্রশ্ন নিয়ে। ওঁরা যা বলবেন লিখবে।'

শম্ভু মিত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু সন্তোষবাবুর। তবুও শম্ভু মিত্র বললেন, 'না কোনও কথা নয়। কথা বললেও লেখা চলবে না। যদি লেখো অস্বীকার করব।' কিন্তু তাহলে একজনকে

তো নিতে হবে ওঁর বদলে। গেলাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সন্তোষদা'র সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা ভাল ছিল না। অনেক লেখাতেই তিনি অজিতেশের কড়া সমালোচনা করেন। তবে নাটক সম্পর্কে ওঁর প্রজ্ঞাকে মর্যাদা দিতেন। অজিতেশবাবু যেদিন তাঁর বক্তব্যের প্রুফ দেখতে আনন্দবাজারে গিয়ে একটি ডায়ালগ বিভিন্ন ভঙ্গিতে শোনাচ্ছিলেন তখন পাশের ঘর থেকে সন্তোষদা চলে এসে ক্ষমা চাইলেন। এবং একই ডায়ালগ বিভিন্ন স্বরে ও ভঙ্গিমায় বলা নিয়ে একটি লেখা চাইলেন। সন্তোষদা তারপর সময় পেলেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। বলতেন শম্ভু মিত্র গ্রেট, অজিতেশ অতুলনীয়।

কখনো কখনো দেখতাম কি বার্তা বিভাগে এসে একে ওকে টাকা দিচ্ছেন পাঞ্জাবির বাঁ বা ডান পকেট থেকে মুঠো করে। বেশ কয়েকবার পেলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামলদাকে জিজ্ঞাসা করি—হঠাৎ টাকা কেন? জানান, ভাল হেডিং করলেই পুরস্কার দেন। তুইও ভাল কিছু কর, ইনাম পাবি। বকাঝকা করলেও ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়াতেও তিনি ছিলেন সবার উপরে।

উনি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রতি সপ্তাহে একটি কলাম লিখতেন—'সন্তোষকুমার ঘোষের কলম'। তাঁর সহজ হেডিং, ঝরঝরে ও মুচমুচে ইন্ট্রো-র সঙ্গে ওই কলামের আসমান জমিন ফারাক। বড্ড প্যাঁচালো লেখা। বুঝতে হলে একাধিকবার পড়তে হত। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমার লেখা পড়েছ। পড়তাম এই জন্যই, যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন।'

অকপটে জানালাম, পড়েছি, তবে বড় কষ্ট হয় বুঝতে। 'আরও একজন একই কথা বলেছেন' ওঁর উক্তি। পরের সপ্তাহে দেখি ওঁর 'কলম' বের হল না। তারপরেও না।

এই-ই ছিলেন সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। থামতে জানতেন।

ওঁর সবচেয়ে দুর্বলতা ছিল রবীন্দ্রনাথে। একদিন খুব চড়া মেজাজে বললেন, 'তুমি কমিউনিস্ট, তুমি কে জি বি-র এজেন্ট।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে। এরপর জিজ্ঞাসা, 'কিছু বলবে?' আমি : 'দেশ' পত্রিকায় রাশিয়ার লেখা সম্পর্কে বলছেন কী?

সন্তোষদা : হ্যাঁ, তাই। উত্তর আছে? অত প্রশংসা কেন?

একটু ঠাণ্ডা হয়েছেন বুঝে বলি : এমন কিছু প্রশংসা করিনি। ওরা খেলাধূলায় ভাল, তাই-ই লিখছি। আর কে জি বি-র এজেন্ট? আমার আগে আরও একজন বাঙালি বড় এজেন্ট ছিলেন।

ওঁর কৌতূহলী প্রশ্ন : কে? কে?

বিনীতভাবে বললাম, যিনি রাশিয়ার চিঠি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ।

উনি এবার পিঠ চাপড়ে বললেন, যাও, নিজের কাজে যাও তো! আজকাল বড়দের সঙ্গে তর্ক করছ।

শেষ নমস্কার : একটি রিপোর্টাজ

"দীপ একবার জ্বলে, একবার নেভে। বারেক নিভিলে তারা চির অন্ধকার।" অধিকাংশ অতিশয়োক্তির পর্যায়ে গিয়া পড়িবে। কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ এমনই এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, যার অবসান সত্যই নক্ষত্রপাতের তুল্য ট্র্যাজেডি। এক ঘনায়মান তিমিরাবরণের অন্তঃস্থলে বসিয়া এই দুঃখময় বাস্তবকে মানিয়া লইতে হইতেছে যে অতি মহৎ, অজস্র গুণসমন্বিত এবং চিরহরিৎ প্রাণবন্ত এক জীবনের সমস্ত স্পন্দন চিরকালের মত থামিয়া গিয়াছে। চারদিকে শুধু ধূসরতা নয়, দৈত্যাকার এক নৈঃশব্দও বিরাজমান। মৃত্যুর নির্মম শিল্প আজ বহুদিকে দারিদ্র্যের ব্যঞ্জনা আনিয়া দিয়াছে।

প্রয়াত সন্তোষকুমার দীর্ঘকাল আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার সাংবাদিক জীবনের শুরু ভিন্ন পরিবেশে, অন্যত্র তাঁহার কর্মকাণ্ডের সূচনা। কিন্তু তাঁহার উত্তুঙ্গ প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে আনন্দবাজারের কর্মী হিসাবে, এইখানেই তাঁহাকে সবাই মহীরুহমূর্তিতে অবলোকন করিয়াছেন। আনন্দবাজার ও সন্তোষবাবুর বিপুল কর্মোদ্যম যেন পরস্পরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। যথার্থ প্রতিভার ধর্মই এই, তাহা আঁধারকে প্রদীপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে পরিপার্শ্বকেও ঐশ্বর্যময় করিয়া তোলে। আনন্দবাজারের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়া যে অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় তিনি দিয়াছেন, সেই দক্ষতাই বাংলা সাংবাদিকতাকে ক্রমেই উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক করিয়া তুলিয়াছে। যথার্থ প্রগতিবাদী এই সম্পাদক সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে সংবাদের ভাষা করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিদিনের সংগ্রাম লিপিকে ঐতিহ্যময় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ভাষণ সর্বস্ব রাজনীতি নয়, রাজনীতি-আচ্ছন্ন মূষিক দৌড়ের বিবরণ মাত্র নয়—সম্পাদক সন্তোষকুমার প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে তথাকথিত সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধনই সাংবাদিকতার প্রেরণা হওয়া উচিত। বাংলা ভাষার সমস্ত ঐশ্বর্য, বাঙালি সংস্কৃতির সকল রুচি-বিকীর্ণ বিস্তার, বাঙলি হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগপরিশুদ্ধতা —সব কিছুই সাংবাদিক কুশলতাকে সমৃদ্ধ করিবে ইহাই তিনি চাহিয়াছেন। তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং যাহাকে বলা হয় মানবিক আবেদনসম্পন্ন সংবাদ—সেই দিকে তিনি দৃষ্টি দিয়াছিলেন। সজীব নেতৃত্ব দিয়া গঠন করিয়াছিলেন এমনই এক দক্ষ সংগঠন যাহা আনন্দবাজারের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনকে ঈর্ষার বস্তু করিয়া তুলিয়াছে।

সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার কীর্তি ও খ্যাতির বিচার করিবার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। শুধু এইটুকু বলা চলে, তাঁহার প্রথম আনুগত্য সাংবাদিকতার প্রতি না সাহিত্যের প্রতি এই কূট প্রশ্নের মীমাংসা কেহই করিয়া উঠিতে পারে নাই, সম্ভবত তিনি নিজেও নয়।

পাণ্ডিত্য যে নিতান্তই ভারবহন নয় এই পরম সত্যটা তাঁহার সব রচনা সমস্ত বক্তব্যের মধ্যেই পরিস্ফুট। অন্যায়ের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁহার চরিত্রের যে বলিষ্ঠ দিক সবাই দেখিয়াছেন তাহা পরম আদর্শবাদী এক সাহিত্যিকের নিষ্ঠার ফল, তাহা যুক্তিবাদী এক সাংবাদিকের বিশ্বাসের অটল দৃঢ়তাজাত। মাত্র গত বছর এই প্রতিষ্ঠানের এক রকম দুর্যোগমুহূর্তে তাঁহার সেই জ্বলন্ত সাহসিক ভূমিকা বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদকে মূর্ত করা সেই তীব্র কিন্তু মহৎ প্রতিবাদ ঘোষণা অনেকেরই স্মৃতিতে চিরভাস্বর হইয়া থাকিবে। সেই নির্ভয়তা বার বার আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাঁহার জীবনের শেষ পর্বে, অসহ্য রোগযন্ত্রণা হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইবার ক্ষমতায়, মৃত্যুকে ভীতির সামগ্রী না করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইবার অমল সাধনায়। মরিতে কে চায়? বিশেষত সন্তোষকুমার ঘোষের মত সার্থক পুরুষ, জীবন যাঁহার কাছে কর্ম ও রসের অফুরান উৎস, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সাহিত্য যাঁহার সত্তাকে অমন অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে? তিনি পলায়নের সাধনা করিবেন কেন? তিনি তাঁহার শেষ প্রহরকে শান্তমনে মানিয়া লইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া গেলেন।

১৬ ফাল্গুন, ১৩৯১
২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

এ কৃতিত্বের রেকর্ড ক্রিকেট-ইতিহাসে কোনওদিন লেখা থাকবে না

মুকুল দত্ত

"....আমি আরও একরকম ঝিরঝিরে বৃষ্টি দেখেছি। শেষ দিনে বাঁধানো স্টেডিয়ামের সারিতে 'টাক' দেখা গেছে। কিন্তু প্রথমদিন ভিড় যখন মাঠে উপচে পড়েছিল, দেখেছিলেন? লাঠি হাতে পুলিশের খবরদারি--সেও ঝিরঝিরে একপশলার মত। শিহরণটা খুব সুখকর হয়নি, লাঠির ছোঁয়া আর সোনার কাঠির জাত যে একেবারে আলাদা।"

কার লেখা? সোনার কাঠির জাত কাদের বলা হয়েছে? কোন প্রসঙ্গেই-বা কথাগুলো লেখা হয়েছে?

১৯৬০-৬১ সালে ইডেনে পাক-ভারত টেস্ট ক্রিকেটে পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে লিখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, যিনি ছিলেন শব্দ নিয়ে খেলা করার যাদুকর, পি সি সরকার এবং কিশোর-কিশোরীদের যিনি মনে করতেন সোনার কাঠির জাত।

যষ্ঠি-মধু নামে একরকম কবিরাজি দাওয়াই আছে শুনেছি। খেলার ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীদের বিরুদ্ধে যষ্ঠি নিয়ে পুলিশের খবরদারি করার বিরুদ্ধে সন্তোষকুমর ঘোষের এই লেখা তাঁর কলমে মধু-মাখানো হলাহল বলা যেতে পারে।

খেলা দেখতে গিয়ে দর্শকদের কষ্ট দেখেও তাঁর মন কেঁদেছে। ওই খেলা প্রসঙ্গেই এক জায়গায় লিখে গেছেন--"শতরান করার চেয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে শীতের রাত কাটানো দর্শকদের কম কৃতিত্ব নয়। কিন্তু এ কৃতিত্বের রেকর্ড ক্রিকেট-ইতিহাসে কোনওদিন লেখা থাকবে না।"

ক্রিকেট খেলা নিয়ে বিস্তর সাহিত্য রচিত হয়েছে। বহু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ক্রিকেট লিখে যশস্বী হয়েছেন। ক্রিকেট নিয়ে সন্তোষবাবুরই সাহিত্যসৃষ্টি এবং রসরচনার ছোট্ট উদাহরণ তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না।

"*আমি পড়েছি কালো ফলকের মত স্কোরবোর্ড। দেখেছি এক-একজনের নাম আঁকা* হতে ও মুছে যেতে। এক-একজন আউট হন, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য দুটি হাত এগিয়ে আসে, নামের বোর্ড কাত হয়ে পড়ে--বিসর্জনের প্রতিমাকে গঙ্গার ঘাটে কাত হতে দেখেছেন?--ঠিক তেমনি।

"*আমার সামনের সারিতে বসা সুকেশী ভদ্রমহিলাকে আপনি হয়তো দেখেননি।* দেখলে কথাটা বুঝতেন। লাঞ্চের আগে মেরুন রঙের, লাঞ্চের পরে টকটকে লাল। চা-পানের পর দেখলুম আবার অন্য রং, খোঁপার ধরনও আলাদা। পাশের ভদ্রলোক ফিসফিস করে আমাকে বললেন, বোলিং চেঞ্জের রকমফেরটা দেখলেন। কতজন ঘায়েল

হয়েছিল জানি না।"

সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় সন্তোষকুমার অসাধারণত্ব এবং মানুষ হিসাবে তাঁর দরদী মন নিয়ে আলোচনা আমার লেখার গণ্ডির বাইরে। শুধু ক্রীড়া সাংবাদিকতায় তাঁর অবদানই আলোচ্য বিষয়।

সংবাদ পরিবেশনায়, সংবাদ সমীক্ষায়, সম্পাদকীয় লেখায় তিনি যেমন ছিলেন নতুন পথের দিশারি, তেমন খেলাধূলার সংবাদ প্রচারের ব্যাপারেও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়ে গেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষই প্রথম সাংবাদিক, যিনি খেলার বড় খবর, শুধু খেলার পাতায় আবদ্ধ না রেখে প্রথম পাতায় তুলে এনেছিলেন, অল্প জায়গায় দেশ-বিদেশের সমস্ত খেলার খবর পরিবেশন সম্ভব নয় বলে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'মাঠময়দান' শিরোনামায় খেলার সাপ্তাহিক সমীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। খেলাধূলার বড় খবর শুধু প্রথম পাতায় তুলে আনাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদক দিয়ে খেলার বিবরণ লিখিয়েছেন-- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মতি নন্দী প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকদের দিয়ে।

ওলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, টেস্ট ক্রিকেট, বিশ্বফুটবল বা বিশেষ কোনও বড় খেলা সম্পর্কে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এখন প্রায় সব পত্রিকার রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। ১৯৫৫ সালের আগে খেলার উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়নি, একথা বলছি না। তবে দেখা গেছে কালেভদ্রে। সেটা প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে সন্তোষবাবুর আমল থেকে। একাধিক প্রতিবেদককে দিয়ে খেলার সংবাদ পরিবেশনা এবং বিদেশ সফরের সময় নিজস্ব প্রতিবেদক পাঠানোর ব্যাপারেও পথিকৃৎ সন্তোষকুমার ঘোষ, যদিও ১৯৪৭ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় আনন্দবাজার পত্রিকা ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড থেকে সর্বপ্রথম একজন বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটারকে প্রতিবেদক হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। ওই সফরের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক ডি বি দেওধর। কিন্তু সেটা ছিল ব্যতিক্রম। সন্তোষকুমার আনন্দবাজারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতি বড় পয়েন্টে প্রতিবেদক পাঠানো প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে ক্রিকেট দলের ইংলন্ড সফরে এবং ১৯৬০ সালের রোম ওলিম্পিকেতে পাঠিয়েছেন বেরী সর্বাধিকারীকে, নন্দাঘুটি পর্বত অভিযানে পাঠিয়েছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ ও ফটোগ্রাফার বীরেন সিংহকে, ডিউক-পিনাকীর কানৌজ আংরে আন্দামান অভিযানে পাঠিয়েছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীবকে। প্রতিশ্রুতিবান এবং নামি খেলোয়াড়দের জীবনী লেখা প্রকাশের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় সন্তোষবাবুর সময় থেকে। বিশেষভাবেই বলার কথা, ক্রীড়াসাংবাদিক মতি নন্দী, চিরঞ্জীব, পরলোকগত পুষ্পেন সরকার ও বিশিষ্ট ক্রিকেট-লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর প্রতিষ্ঠার মূলে সন্তোষবাবুর অবদান অনেকখানি।

খেলাধূলা অত্যন্ত ভালবাসতেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার এমন কোনও খেলার লেখা ছিল না যা সন্তোষবাবুর চোখ এড়িয়ে যেত। তাছাড়া খেলার প্রসার, প্রচার ও উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে, ক্রীড়া প্রশাসনকে কলুষমুক্ত করার অভিপ্রায়ে নিজেও কলম ধরেছেন।

মনে পড়ছে ১৯৬৬-৬৭ সিরিজে ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট খেলার কথা, যে খেলায় প্রশাসনিক গলদে এবং পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ইডেনে আগুন জ্বলেছিল।

আহত হয়েছিল প্রায় দুশো দর্শক। ওই কলঙ্কজনক ঘটনার প্রতিবেদন প্রসঙ্গে 'কোন্ আদি পাপে' শিরোনামায় সন্তোষবাবু লিখেছিলেন—"তদন্ত চাই", "ক্রিকেট কর্তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে"। বলা বাহুল্য এক, দুই, তিন, চার, করে সন্তোষবাবু যে দশ দফা তদন্তের দাবি করেছিলেন সব দাবিই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিচারপতি কমলেশচন্দ্র সেনকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনে।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওই টেস্ট একদিন পণ্ড হবার পর আবার হলেও সন্তোষবাবু আর মাঠে দেখতে যাননি। বলেছিলেন, "যাদের তিক্ত সমালোচনা করেছি তাদের দেওয়া কমপ্লিমেন্টারি কার্ডে খেলা দেখার আমার অধিকার নেই।"

৬০-৬১ সালে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভারত সফরকে কেন্দ্র করে অনেক গরল উঠেছিল। বিশেষ করে ইডেন টেস্টে পাকিস্তানের জয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি-ভেজা পিচে খেলা বন্ধ হওয়ায় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিল পাকিস্তানিরা। সফর শেষে পাকিস্তান দলের ম্যানেজার ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁ (ক্রিকেটার মজিদ খাঁর বাবা) পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। কীভাবে যেন সন্তোষবাবু সেই গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করলেন পঙ্কজ গুপ্তের মাধ্যমে। যুগান্তর পত্রিকার বর্তমান সহযোগী সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী তখন আনন্দবাজারের বার্তা সম্পাদক হননি। অমিতাভবাবুকে দিয়ে ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁর রিপোর্টের তর্জমা করিয়ে সেই রিপোর্ট ধারাবাহিকভাবে আনন্দবাজারে প্রকাশ করলেন সন্তোষবাবু। রিপোর্টটি খেলা মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। রিপোর্টে যেমন ছিল ডঃ জাহাঙ্গীরের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তেমন ছিল চমৎকার তর্জমার প্রসাদগুণ।

ফুটবল মাঠে ফটোগ্রাফাররা সাধারণত বসেন দুর্বল দলের গোলের দিকে জনপ্রিয় দলের গোলের ছবি তুলতে। একদিন মোহনবাগান এক দুর্বল দলের কাছে হেরে গেল। খোঁজ নিয়ে সন্তোষবাবু জানলেন গোলের ছবি ফটোগ্রাফাররা তুলতে পারেনি, মোহনবাগানের ব্যর্থ আক্রমণের ছবি তুলেছে। বললেন, "এ কেমন কথা? জনপ্রিয় দলের হারই তো বড় খবর এবং সেই দলের বিরুদ্ধে গোলের ছবিটিই বেশি প্রয়োজনীয়।" দুই দলের গোলের অ্যাকশন ছবি তোলার জন্য পরদিন থেকে দু'জন ফটোগ্রাফারকে মাঠে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

খেলার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী। কলকাতার বাইরে বসবাসকারী এক প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়া সাংবাদিককে আনন্দবাজারে চাকরি দেবার সময় বলেছিলেন, "আমরা যখন স্কুল-কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন সব খেলাই তো হত দিনের আলোয়। এখন তো দেখছি, টেবিল টেনিস, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল প্রভৃতি খেলা হচ্ছে রাতের আলোয়। এরপর হয়তো ফুটবল ক্রিকেটও রাতে হবে। বাইরে থেকে খেলার রিপোর্ট করে বাড়ি ফিরবেন কীভাবে?"

সন্তোষবাবুর কথা ফলতে খুব দেরি হয়নি। রাতের আলোয় ফুটবল অনেক আগেই শুরু হয়েছে। হয়তো ক্রিকেটও হবে ফ্লাডলাইটে।

সন্তোষকুমার ঘোষের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

স্রষ্টার জীবন

জন্ম—৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০

মৃত্যু—২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

জন্মস্থান—রাজবাড়ি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ

বাবা / মা—সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সরযূবালা ঘোষ

স্ত্রী—নীহারিকা ঘোষ, ছেলে—সায়নতন, মেয়ে—কথাকলি, কৃষ্ণকলি, কাকলি।

শিক্ষা—স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পেশা— সাংবাদিকতা। প্রথম জীবনে যুগান্তর, প্রত্যহ, জয়হিন্দ, মর্নিং নিউজ, নেশন, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করার পর ১৯৫১ সালে দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন। পরে, আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সংযুক্ত সম্পাদক ও শেষে আনন্দবাজারের যুগ্ম সম্পাদক হন।

বিদেশ যাত্রা— ১৯৫৭—বর্মা (বর্তমান মায়ানমার) ও পূর্ব ইউরোপ ১৯৬০—ইংল্যান্ড
১৯৬১—জার্মানি ১৯৬৪—ইংল্যান্ড ও পশ্চিম ইউরোপ
১৯৬৫—জাপান, ইংল্যান্ড ১৯৬৬—আমেরিকা
১৯৬৮—থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ১৯৭২—রাশিয়া
১৯৮২—আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান, হংকং

প্রথম যৌবনের যৌথ সাহিত্যচর্চা—'মিলন সংঘ' নামক সাংস্কৃতিক সংস্থায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সাহিত্যচর্চা। জগৎ দাসের সঙ্গে 'ভগ্নাংশ' নামক গল্পগ্রন্থের প্রকাশ।

পুরস্কার :

আনন্দ ১৯৭১, বিশেষ আনন্দ ১৯৭২, আকাদেমি—১৯৭২, তাইওয়ান কবি সংঘ থেকে ১৯৮৪-তে ডি. লিট উপাধি প্রাপ্তি।

স্রষ্টার সৃষ্টি

১। কিনু গোয়ালার গলি, (১৯৫০, ডি. এম.)

২। নানা রঙের দিন (১৩৫৯, ক্যালকাটা বুক ক্লাব)

৩। মোমের পুতুল (১৩৬১, বেঙ্গল পাবলিশার্স)
৪। মুখের রেখা (১৩৬৬, ত্রিবেণী)
৫। রেণু তোমার মন (মিত্র ও ঘোষ)
৬। ফুলের নামে নাম (এভারেস্ট)
৭। জল দাও (১৯৬৭, আনন্দ)
৮। স্বয়ং নায়ক (১৩৭৬, গ্রন্থপ্রকাশ)
৯। শেষ নমস্কার (১৩৭৮, দে'জ)
১০। সময়, আমার সময় (১৩৭৯, আনন্দ)
১১। ফুল নদী পাখি (১৯৭৬, রামায়ণী)
১২। নিশীথ রাতে ('চতুরঙ্গে' প্রকাশিত, অগ্রন্থিত)
১৩। আমার প্রিয় সখী (১৩৬৭, ক্যালকাটা পাবলিসার্স)
১৪। করকমলেষু (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, 'চতুর্দোলা' ত্রৈমাসিক প্রকাশেও অসম্পূর্ণ)

বড় গল্প :

১। ত্রিনয়ন (১৩৭৬, মিত্র ও ঘোষ)
২। দূরের নদী (১৩৮৪, দে'জ)
৩। সেই পাখি (১৩৮৪, বিশ্ববাণী)

ছোট গল্প :

১। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯, দীপজ্যোতি প্রকাশনী)
২। চীনেমাটি (১৯৫৩, মিত্রালয়)
৩। শুক-সারী
৪। পারাবত (১৩৬০, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং)
৫। কড়ির ঝাঁপি (১৩৬৩, ক্যালকাটা বুক ক্লাব)
৬। পরমায়ু (১৩৬৪, ত্রিবেণী)
৭। দুই কাননের পাখি (১৩৬৬, কারেন্ট বুক শপ)
৮। চিররূপা (১৯৫৯, নাভানা)
৯। কুসুমের মাস (১৩৬৬, ক্লাসিক প্রেস)
১০। ছায়াহরিণ (১৯৬১, সুরভি)
১১। বহে নদী (১৩৭০, গ্রন্থপ্রকাশ)
১২। যুবকাল (১৯৭৬, বিশ্ববাণী)
১৩। সন্ধ্যা সকাল (১৯৭৯, আনন্দ)
১৪। দুপুরের দিকে (১৯৮০, আনন্দ)
১৫। কুসুমাদপি (১৯৮৪, সংবাদ)
১৬। সমস্ত গল্প ৩ খণ্ড (১৩৮৪, ১৯৭৯, ১৯৮৩ স্বরলিপি)

নাটক :

১। অজাতক (১৩৭৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ)

২। অপার্থিব (১৩৭৮, মিত্র ও ঘোষ)

কবিতা :

১। কবিতার প্রায় (১৯৮০, দে'জ)

২। মিলে অমিলে (স্বরলিপি)

প্রবন্ধ :

১। বাইরে দূরে (১৩৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স)

২। বাংলাদেশ কোন্ পথে (১৯৭৩, নবপত্র)

৩। সোজাসুজি (১৩৭৭, দে'জ)

৪। রবীন্দ্রচিন্তা (১৩৮৫, হেমলতা প্রকাশনী)

৫। রবির কর (১৯৮৪, আনন্দ)
